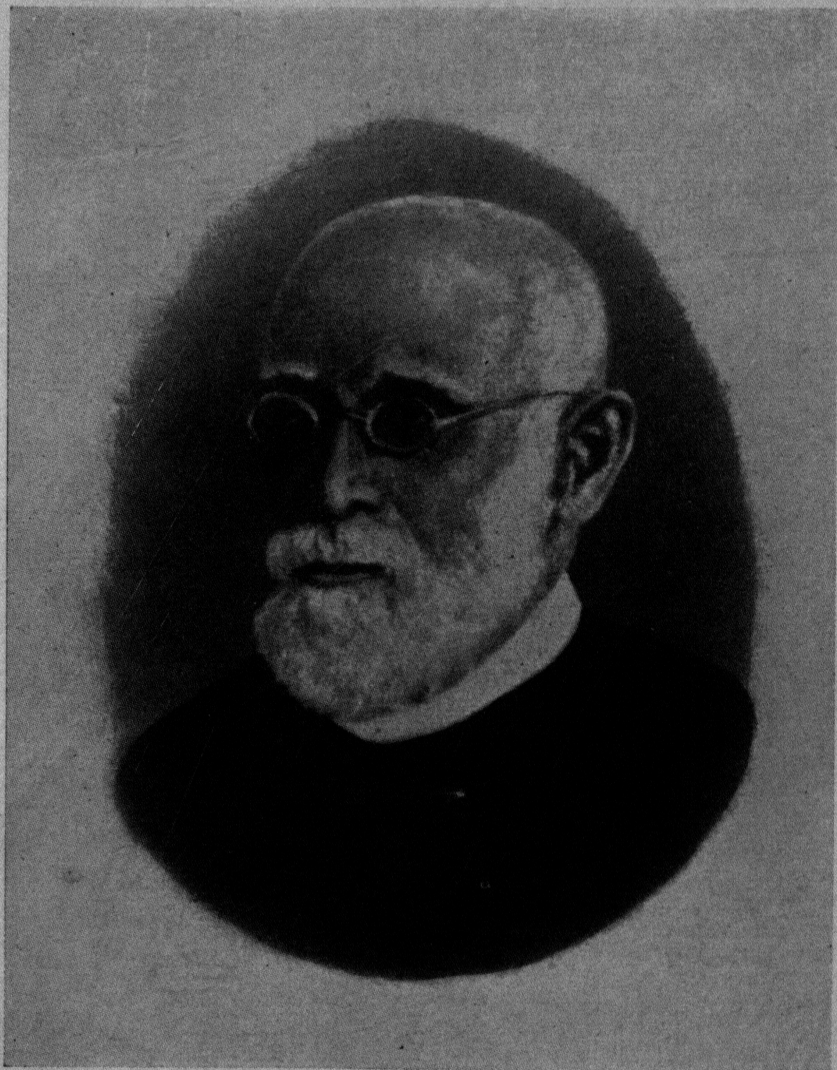
প্রকাশক :
শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সম্পাদক,
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন,
৬২ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম সংস্করণ :
সেপ্টেম্বর ১৯৬০ (মহালয়া)

মুদ্রণ :
শ্রীশুকদেব চন্দ্র চন্দ্র
বিবেকানন্দ প্রেস
১/১/ই, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

গ্রন্থণা
প্রবর্ত্ত আদাস
৪ রামমোহন রায় রোড
কলিকাতা-৯

সূচী



Surendra Nath Banerjee
Father of Indian Nationalism

প্রথম অধ্যায়

শৈশব ও বাল্যজীবন

এক কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে হয়েছিল আমার জন্ম। মহারাজ বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তন করেছিলেন। সেই থেকে আমাদের বংশ গর্ব্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে তার পবিত্রতা রক্ষা করে' এসেছে। ঐশ্বর্য্যের লোলুপতা বা অনায়াস জীবন যাপনের কোন সম্ভাবনাই কোনদিন তাকে তার চিরাচরিত দৃঢ় সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সততার পথ থেকে নড়াতে পারে নি। সরল জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের উপযুক্ত আদর্শ অনুসরণ করে' আমাদের বংশ সেদিন যে মর্য্যাদা লাভ করেছিল কোন বৈভবই কোনদিন তা দান করতে সক্ষম হ'ত না।

আমার পিতামহ ছিলেন একজন প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। বংশগত সংস্কারে অত্যন্ত আস্থাশীল, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংযত ছিল তাঁর জীবনযাপনপ্রণালী। অতীতের উপযোগী সন্তোষ ও আরামের ধারণা, বিশেষত ধর্ম্মীয় জীবনযাত্রার নিখুঁত ধারা মেনে চলার রীতি, যা প্রাচ্য জীবনে এক প্রকার বিরল, তাঁর জীবনে রূপায়িত হয়েছিল। এ সব থেকে বিগত শতাব্দীর ছয় দশকের ধর্ম্মপরায়ণ পরিবারের জীবনধারার এক সুন্দর ও পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। তবে তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অর্থাৎ আমার পিতার জন্য সে-যুগে ইংরেজী শিক্ষার জন্য যা ব্যবস্থা ছিল তার সর্ব্বোৎকৃষ্টটাই অবলম্বন করেছিলেন।

আমার পিতা হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ডেভিড হেয়ার মহাশয় তখন বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে অগ্রণীদের অন্যতম। কৃতিত্বের গুণে আমার পিতা হেয়ার সাহেবের প্রিয়ছাত্রদের মধ্যে একজন বলে গণ্য হতেন। হেয়ার সাহেব পরলোক গমন

করেছেন প্রায় দুপুরুষ হয়ে গেল। তবু আজও তাঁর স্মৃতিপূজা বন্ধ হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পর খৃষ্টানদের কবরস্থানে এই মহাপুরুষের দেহ কবরস্থ হতে পারে নি। গোঁড়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা তুলেছিল আপত্তি। এজন্য এক অতি সাধারণ জমিতে তাঁর মরদেহ কোন বিশেষ ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াই অনাড়ম্বরে সমাহিত করা হয়েছিল। আজ সেই সমাধির উপর এক অতি সাধারণ মর্ম্মর স্তম্ভ স্থাপিত হয়েছে। এই পবিত্র বেদী বা স্তম্ভের সঙ্গে কোন ধর্ম্মবিশেষের কোন সম্পর্ক কখনো ছিল না। প্রতি বছর জুন মাসের প্রথম তারিখে তাঁর মৃত্যুদিবস পালিত হয়। তাঁকে যাঁরা কোনদিন চোখে দেখেন নি, অথচ যাঁদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি রয়েছেন চিরজাগ্রত, তাঁরাই তাঁর প্রত্যেক মৃত্যুবার্ষিকীতে মালাফুল প্রভৃতি এনে স্তম্ভের পদতলে অঞ্জলি দিয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সামান্য এক ঘড়ি মেরামত করার কাজ নিয়েই হেয়ার সাহেব একদিন এই ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু যেদিন তিনি দেহত্যাগ করেন সেদিন তিনি বিশ্বের উচ্চস্তরের মানব-প্রেমীদের অন্যতম। হিন্দুদের বাড়ীঘরেও তাঁর যাতায়াত ছিল। তাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল সৎভাব ও বন্ধুভাবাপন্ন। অপর পক্ষে হিন্দুরাও তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। আমি শুনেছি, এবং আমাদের পরিবারে একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, একবার আমার পিতা হিন্দুদের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে আপত্তি তুললে আমার পিতামহের তিরস্কারের ভয়ে তিনি গৃহ থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হন। এ সময় হেয়ার সাহেব স্বয়ং আমাদের বাড়ীতে এসে আমার পিতামহীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁকে সান্ত্বনা দেন।

এ ঘটনার কিছুকাল পরে আমার পিতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। এবং সেখান থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাঁর সময়ে একজন সুদক্ষ ভারতীয় চিকিৎসাবিদ বলে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে যে সমস্ত ভ্রান্তধারণা দানা বেঁধেছিল,

তিনি তাঁর শিক্ষার প্রভাবে তাঁর মন থেকে সে সব অপসারিত করে দিয়েছিলেন। তিনি এমন এক যুগের মানুষ ছিলেন যখন অনেকে ডিরোজিও মহাশয়ের কাছ থেকে নূতন চিন্তাধারায় দীক্ষিত হয়ে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষদের চিরাচরিত ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সমাজ থেকে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ডেভিড সাহেবের একখানি জীবনী রচনা করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সদ্য সম্পর্কিত হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা প্রকাশ্যে কি ভাবে সে যুগের প্রচলিত গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত এবং কিভাবে আনন্দ করতে করতে অখাদ্য ভক্ষণ করে ভুক্তাবশিষ্ট ইত্যাদি প্রতিবেশী গোঁড়া হিন্দুদের বাড়ীতে নিক্ষেপ করত তার একাধিক বিবরণ প্যারীচাঁদের পুস্তকে পাওয়া যায়। আমার পিতৃদেবও এই নূতন ভাবধারায় হয়েছিলেন পরিপূর্ণ। এভাবে আমাদের পরিবারের ভিতরেই চলেছিল দুটি বিপরীতমুখী ভাবধারা। অথচ একটির সঙ্গে অন্যটির কোন সংঘর্ষ ছিল না। তবে পরিবারের সবার উপর, এমন কি, তাদের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্পর্কেও কর্ত্তা হিসাবে আধিপত্য করবার যে গোঁড়ামী আমার পিতামহের ছিল, তা কোনদিনও ক্ষুণ্ণ হয় নি।

যাই হোক, এ পরিবারে বাদানুবাদের এই যে একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে সেখানে আলোচনা, অনুসন্ধান ও সত্যের খোঁজ করবার একটি স্পৃহাও জেগে উঠেছিল। এই বিপরীত শক্তি-সমূহের সংঘাতের মধ্যেই কেটেছিল আমার জীবনের শৈশব ও কৈশোর। আর আমাদের পরিবারের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা সমগ্র বঙ্গদেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচ্য রক্ষণশীলতার যে সংঘর্ষ চলছিল তারই একটি প্রতীক মাত্র। তবে মুহূর্ত্তের জন্যও একথা মনে করবার কারণ নেই যে, এই নূতন অবস্থার ফলে কচিৎ দু'এক ক্ষেত্রে ভিন্ন কোথাও শান্তি বিঘ্নিত

হয়েছে। হিন্দু মানসে সহনশীলতা স্বভাবতই বদ্ধমূল। এবং সে সময় যে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি আমাদের ধর্ম্মীয় বিশ্বাস বা আচার অনুষ্ঠানকে আঘাত না করত সে পর্য্যন্ত এমন কি আমাদের নিকটতম আত্মীয়েরাও কে কি করছেন বা বলছেন সেদিকে আমরা মনঃসংযোগ করতাম না। বর্ত্তমানে আমাদের অনেকের মধ্যে যে সহনশীলতার অভাব এবং বিবাদপ্রবণতা দেখা দিয়েছে, সে যুগে তার চিহ্নমাত্র ছিল না। পরিবারের কর্ত্তার প্রতি ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিই ছিল প্রতিটি হিন্দু পরিবারের বৈশিষ্ট্য।

যতদূর মনে পড়ে, আমার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন বাংলা শিখবার জন্য আমাকে পাঠশালায় প্রেরণ করা হয়। আমার পিতৃদেবের সুনাম এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় বলে আমার যতদূর প্রাপ্য সে দিকে দৃষ্টি রেখেই গুরুমহাশয় আমার সঙ্গে ব্যবহার করতেন। তবে তিনি ছিলেন কঠোর নিয়মতান্ত্রিক। একবার তিনি আমাকে "মেড়া বামুন" বলে তিরস্কার করেন। তারপর থেকে আমি ঐ পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করি। মা ও বাবা আপত্তি জানালেন। পরে আমার জেদের সামনে হার মানলেন। এর পর মাতৃভাষায় পারদর্শিতা লাভ করবার উদ্দেশ্যে আমাকে বাংলা বিদ্যালয়ে পাঠান হল। বছর দুই এখানে থাকার পর ইংরেজী ভাষা শিখবার জন্য আমাকে পেরেণ্ট্যাল একাডেমিক্ ইনষ্টিট্যুশনে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। এখানেই আমার বাস্তবিক ছাত্রজীবনের আরম্ভ। ক্যাপটেন ডাভটন বলে এক ভদ্রলোক নিজাম সরকারে চাকরী করতেন। প্রধানতঃ তাঁর দানের উপর ভিত্তি করেই এই বিদ্যালয়ের স্থাপনা। বিশেষভাবে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্রেরাই এ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করত। সবে যখন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়েছি তখন ইংরেজীর একটি শব্দও আমি জানি না। বর্ণমালা শেষ করে বানান শিক্ষার বইতে হামাগুড়ি খাচ্ছি। বেশীদূর অগ্রসর হতে পারি নি। একমাত্র ইংরেজী ভিন্ন অপর কোন ভাষায় যারা কথা

বলত না সে সমস্ত ছেলেদের মধ্যে যখন আমাকে এক প্রকার ছুঁড়েই ফেলে দেওয়া হল তখন ইংরেজী ভাষার ওটুকু সম্বল ভিন্ন আমার আর কিছুই ছিল না। অসুবিধার অন্ত ছিল না। এবং আমার নিজের অবস্থাও তখন উদ্বেগজনক। কিন্তু তার মধ্যেও আমি কোন প্রকারে এগিয়ে চললাম। আর অনতিপরে ইংরেজী ভাষায় কোন রকমে কথাবার্ত্তাও বলতে লাগলাম। অবশ্য খুব বিশুদ্ধ ভাবে যে বলতে পারতাম তা নয় আর ব্যাকরণের জ্ঞান ত একেবারেই ছিল না।

এ ঘটনা থেকে একটি সত্য প্রমাণিত হয়। অবশ্য তার স্বীকৃতিও আজকাল কিছু কিছু হচ্ছে। আর তা' হচ্ছে কোন ভাষা উত্তমরূপে শিখবার প্রশস্ত উপায় হল তা' কানে শোনা। ব্যাকরণ বা শব্দকোষের সাহায্যে তা' কখনো সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে আজকাল আমাদের ছেলেরা ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করে আমি নিজে কখনো সেভাবে ইংরেজী ব্যাকরণ শিক্ষা করি নি। আমি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে যাই তখন আমার ব্যাকরণের জ্ঞান ছিল লেনির লিটল বুক পর্যন্ত। বর্ত্তমানে ট্যুটোরিয়্যাল শিক্ষণ পদ্ধতি ও ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের ব্যক্তিগত দৃষ্টির দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সম্ভবত এরূপ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমার সমস্ত স্কুল ও কলেজ জীবনে আমার কোনই গৃহশিক্ষক ছিল না। ইংরেজী ও ল্যাটিনের ন্যায় দুটি দুরূহ ভাষা শিখবার জন্য আমাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল। আমার বাবা নিজেও ছিলেন একজন শিক্ষক। কখনো কখনো যখন মনে হত আমার নিজের চেষ্টায় কিছু হওয়ার আর কোন আশা নেই তখন বাবার কাছে আবেদন জানাতাম। সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে ছিল ভীষণ কঠিন কাজ। প্রায় পাহাড় ভেঙ্গে ওঠার সামিল। তবে তাহাই আমাকে দিয়েছিল আত্মনির্ভরতার শিক্ষা। আর তাই হয়েছে আমার জীবনে এক অমূল্য সম্পদ। কি

স্কুলে, কি কলেজে, কি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বত্রই আমি কৃতিত্ব অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। প্রতি বৎসরেই একটি পুরস্কার আমার জন্য যেন বাঁধা থাকত। সব সময়েই যে সর্ব্বোচ্চ স্থান আমি অধিকার করতে সক্ষম হতাম তা নয়। তবে তার থেকে খুব দূরেও থাকতাম না। কয়েক বছরের মধ্যেই এবং শেষ পর্য্যন্ত, যে সমস্ত ছেলেদের কাছে আমাকে প্রথমে হার মানতে হয়েছিল, তাদের অনেককে পেছনে ফেলে আমি এগিয়ে গেলাম। আমার মনে হয় জীবনে আমি আমার সেই স্কুল ও কলেজের প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীকেই বহু পশ্চাতে ফেলে আসতে সক্ষম হয়েছি। সম্ভবত উদ্দেশ্যের প্রতি একাগ্র দৃঢ়তাই আমাকে এভাবে বিজয়ীর সম্মান দান করেছে।

আমার য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয় শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ বরাবরই আমার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতেন। তাঁদের ব্যবহারে কণা মাত্র জাতিবৈষম্যও কোনদিন তাঁরা আমার প্রতি দেখান নি। আজ সমগ্র দেশ জাতিভেদ ও শ্রেণীবৈষম্যের দ্বন্দ্বকলহে জর্জ্জরিত। যে বিদ্যামন্দিরে আমার জীবনের সর্ব্বাধিক সুখের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিল, সেখানে তার ক্ষীণ মাত্র ধ্বনিও আমার কাণে প্রবেশ করবার সুযোগ তাঁরা কোনদিন দেন নি। শিক্ষার প্রভাবে যে ভেদাভেদহীন সমতার জ্ঞান জন্মে তার একটি বাস্তবরূপ বাল্যাবস্থা থেকেই এভাবে আমার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এবং এও ছিল আমার শিক্ষার একটি অঙ্গ। বি.এ. ডিগ্রী নেবার পর আমি যখন কলেজ ছেড়ে যাব, তখন আমার অধ্যক্ষ সেন্ট এণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ জন সাইম্ আমাকে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য বিলাতে পাঠাতে আমার বাবাকে বিশেষ ভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন। মিঃ সাইম্ পরবর্ত্তীকালে পাঞ্জাবের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্ত্তার পদ গ্রহণ করেছিলেন। আমার পিতা মিঃ সাইমের সঙ্গে একমত হলেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে' আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমার

পিতা বরাবরই ছিলেন আমার সমস্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার শাশ্বত উৎস। তিনি কেবল যে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসকই ছিলেন তা' নয়, মানুষকে বিচার করবার ক্ষমতাও ছিল তাঁর অসাধারণ। ১৮৫৩ সালে যখন আমার বয়স বছর পাঁচেকের মত, তিনি তখন একখানি উইল সম্পাদন করেন। পরবর্ত্তীকালে তার একখানি নকল আমার হস্তগত হয়। এই উইলে তাঁর নির্দ্দেশ ছিল আমার শিক্ষার পরিপূর্ণতার জন্য আমাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করতে হবে। আমার শৈশবেই তিনি স্থির করে নিয়েছিলেন যে, বিলেতে গিয়ে শিক্ষালাভ আমার জীবনে সহায়ক হবে। ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ্চ তারিখে আমার সুহৃদ রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের সঙ্গে আমি ইংলণ্ডে যাত্রা করি।

আমার স্কুল ও কলেজ জীবনের এই স্মৃতিচারণ শেষ করবার পূর্ব্বে আর একটি বিষয়ের এখানে অবতারণা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এও আমার জীবনের অপর এক শিক্ষা, যার চর্চ্চা করে জীবনে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। আমি যখন সামান্য বালক মাত্র তখন থেকেই আমাকে দৈনিক নিয়মিত শরীরচর্চ্চা অভ্যাস করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমার এই শিক্ষাটির বিষয়ে আমার পিতার ব্যক্তিগত উৎসাহ ছিল। কারণ, তিনি নিজে ছিলেন একজন চিকিৎসাবিদ। আর তার ফলে তিনি জানতেন যে, জীবনের সফলতার মূলই হল স্বাস্থ্য। আমাদের বাড়ীতেই আমাদের একটি আখড়া ছিল। এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে শরীরচর্চ্চা শিক্ষা দেবার জন্য সেখানে একজন পলোয়ানও নিযুক্ত করা হয়েছিল। আমরা নিয়মমত যেমন স্কুলে যেতাম, তেমনি প্রতিদিন এই আখড়ায় উপস্থিত হতাম। আমার ভাই ক্যাপটেন জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ব্যায়ামে অত্যুৎসাহী ছিল। প্রয়োজন হলে যে কোন ব্যায়ামবীরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারত। বাঙ্গালীদের মধ্যে তাকেই সর্ব্বাধিক শক্তিশালী বলে গণ্য করা হত। অনেক সময় আমি তার অসাধারণ শারীরিক শক্তির বিষয়ে

চিন্তা করেছি। আমার সব সময় মনে হয়েছে শরীরচর্চ্চা সে যতই করে থাকুক না কেন, বাস্তবিকপক্ষে তার মধ্যে তার নিজস্ব এমন কোন এক শারীরিক শক্তির ভাণ্ডার ছিল যা থেকে তার শক্তি বিকাশ লাভ করেছিল।

তিন পুরুষের অধিককাল যাবৎ আমাদের পরিবারে বাল্য বিবাহের চিহ্ন মাত্র ছিল না। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা কেউ সংস্কারক ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ। এই গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে আমাদের পরিবারের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বাল্য বিবাহের অবসান তারই ফল। তাঁরা ছিলেন উচ্চ কুলীন বংশীয়। তাঁদের সম পর্য্যায়ের বিবাহযোগ্য পাত্রসংখ্যা ছিল সীমিত। এই হেতু তাঁদের বিবাহ-যোগ্যা কন্যাদের জন্য উপযুক্ত পাত্র সহজে পাওয়া যেত না। ফলে মেয়েদের বিবাহের জন্য বহুদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হ'ত। কাজেই বেশী বয়সেই এই মেয়েদের বিয়ে হ'ত। আমার মা এবং ঠাকুরমাদের যখন বিয়ে হয় তখন তাঁদেরও বয়স বেশীই হয়েছিল। সম্ভবত আমার প্রপিতামহীর বিবাহও অধিক বয়সেই হয়েছিল। তিনি শতাধিক বছর বেঁচে ছিলেন। আমার ছেলেবেলায় আমি তাঁকে দেখেওছি। আমাদের পরিবারে এই দীর্ঘায়ুর ইতিহাসে আমি বাল্য বিবাহের বিরোধী মতেরই সমর্থন লক্ষ্য করেছি। আর এজন্য যখনই সুযোগ পেয়েছি, কি ঘরোয়া আলোচনায় কি জনসমাবেশে আমি একাধিক বার বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছি। আমাদের পরিবারের প্রত্যেকেই বরাবর সুন্দর স্বাস্থ্য উপভোগ করেছেন। পুরুষানুক্রমে বাল্যবিবাহের প্রতি বিরাগই তার মূল কারণ বলে আমি মনে করি। লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর সঙ্গে আমার প্রথম প্রথম যখন দেখা সাক্ষাৎ হয় তাঁকেও আমি একথাই বলেছিলাম। আমার শারীরিক কর্ম্মোদ্যম দেখে তিনি বিস্মিত হন। তিনি মনে করতেন আমার মত বয়সে ভারতীয়দের মধ্যে এ বস্তু দুর্লভ। হাজার হাজার মণ তত্ত্বকথার

চেয়ে এক কণা বাস্তব ঘটনার মূল্য কে না অধিক বলে মনে করবে? এঘটনাগুলি আমি এবিশ্বাসেই লিপিবদ্ধ করছি যে, আমাদের দেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও এসব থেকে অনেক আলোক পাওয়া যাবে। বস্তুত একটি জাতির উন্নতির পক্ষে জাতির স্বাস্থ্য ও শরীর গঠন একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ।

আমার তরুণ বয়সে আমাদের দেশের গণআন্দোলন সম্পর্কে আমি এখনো কিছুই বলি নি। বাস্তবিক পক্ষে পরবর্তীকালে তার পরিসর ও গভীরতা যেরূপে দেখা দিয়েছিল, পূর্ব্বে সেরূপ কিছুই ছিল না। সে সময়ের আন্দোলন ছিল মুষ্টিমেয় জনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার পেছনে বৃহৎ জনসাধারণের কোন সমর্থনই ছিল না। সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের ক্ষমতা বলে কিছুই তখন ছিল না। মঞ্চে দাঁড়িয়ে জনসাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা করার প্রথা তখনো প্রচলিত হয় নি, জনসভায় বাগ্মীপ্রবর রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতা যখন হ'ত তখন খুব অল্পসংখ্যক লোকই উপস্থিত থাকত। তখন মাঝে মাঝে জাষ্টিস্‌দের সভা বসত। এসব ছিল বর্তমান পৌর সভার মত। কোল্‌কাতা সহরের পৌরকার্য্যাদি তাঁরাই পরিচালিত করতেন। রামগোপাল সেখানেও বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু শ্রোতা সংখ্যা হ'ত খুবই সামান্য।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে' জনগণকে প্রথম আকৃষ্ট করেন কেশব চন্দ্র সেন। ভারতীয় জনমানসে বাগ্মিতা কিভাবে যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে তিনি তা' দেখিয়ে দিলেন। বিগত শতাব্দীর ছয় সাত দশকের প্রথম পর্য্যায়ে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন এক জীবন্ত শক্তিরূপে দেখা দিল। পরোক্ষ ভাবে হলেও তা', এমন কি, অতি-রক্ষণশীল ও গোঁড়া হিন্দুসমাজের উপরও এক গভীর রেখাপাত করে। সে সময় সারা দেশে খ্রীষ্টধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরিত হবার এক স্রোত বয়ে চ'ছিল। কেশবচন্দ্রের প্রচারে তা'তে ভাটা পড়ল। প্রাচীন ধর্ম্মে যাঁরা আস্থা

হারিয়েছিলেন এই ব্রাহ্মনেতার বাগ্মিতার ভিতর দিয়ে তাঁরা এক নূতন পথের সন্ধান পেলেন। তাঁরা স্বাদ পেলেন এক নূতন আনন্দের। এবং এই নূতন ধর্ম্মের মধ্যে পেলেন এক নূতন আশ্বাস। প্রথমে কেশবচন্দ্র ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতাবলম্বী। পরে তিনি মহর্ষির অনুসৃত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সংসর্গ ত্যাগ করেন। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের অনুসরণে হিন্দুসমাজের রীতিনীতির সংস্কারে উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বেদকে ভিত্তি করেই এ সমস্ত সংস্কার করা হোক। কিন্তু কেশবচন্দ্র হিন্দুসমাজ ব্যবস্থাকে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করলেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা তরুণদের মনে গভীর ও স্থায়ী রেখাপাত করল। তা'রা দলে দলে তাঁর বক্তৃতায় যোগ দিতে লাগল। দেখা দিল ধর্ম্মীয় এক নবজাগরণের সূচনা। তাঁর অসামান্য বাগ্মিতা, সুরেলা কণ্ঠস্বর, সুষ্ঠু বাচনভঙ্গী, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং গভীর উদ্দীপনা শ্রোতাদের মোহিত করতে লাগল। আমি নিজেও তাঁর অনেক বক্তৃতায় উপস্থিত থাকতাম। আর বাকরুদ্ধ হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে শুনতে তাঁর প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে পড়তাম।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ছিলেন কেশবচন্দ্রের অপর এক বাগ্মী সহকারী। প্রতাপ চন্দ্রের বক্তৃতার রূপ ছিল ভিন্ন। তা' ছিল প্রচুর কল্পনাশক্তিপূর্ণ, ছবির মত স্বচ্ছ এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু কেশবচন্দ্রের তুলনায় তাঁর বক্তৃতা মানুষের প্রাণে সাড়া জাগাতে পারত না—পারত না মনকে আকুল করে তুলতে।

সাংগঠনিক হিসাবেও কেশবচন্দ্র ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর দৃষ্টিশক্তি মানবপ্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করত এবং মানুষের নেতৃত্ব করবার জন্যেই যেন তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর পরিবারস্থ বৈষ্ণবীয় ভাব ও বৈরাগ্য তাঁর অন্তরে ছিল বদ্ধমূল। এবং তিনি ছিলেন এক প্রকৃত ধর্ম্মগুরু। তবে তিনি সাংসারিকও ছিলেন। জাগতিক বিষয়ও ভাল

মতই বুঝতেন। সংসারে কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় সেসবও তাঁর অজানা ছিল না। তিনি যদি ধর্ম্মীয় নেতার পথ বেছে না নিতেন, তা'হলে উপযুক্ত পরিবেশে হয়ত তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা হয়ে উঠতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিল এক মোহনীয় ভাব। তাঁর সমাজে যাঁরা তাঁকে অনুসরণ করতেন তাঁরা তাঁর মধ্যে পেয়েছিলেন একজন প্রিয় বন্ধু ও এক মহান নেতা। কেশবচন্দ্রের প্রচারের পরোক্ষ ফলও ছিল বিরাট। ধর্ম্মগত ও সমাজগত বিষয়ে একদিকে যেমন তা' শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের চিন্তা-ধারাকে ব্যাপক ও উদার করে দিল, অপর দিকে তার এক বিপরীত ফলও প্রকাশ পেতে লাগল। সমস্ত রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিও অধিকতর বলবান হয়ে উঠল। তা'রা হ'ল ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত। নিজেদের বাঁচাবার উদ্দেশ্যে তারা আপন আপন খোলসের মধ্যে আত্মগোপন করল। তারা তাদের চারিদিকে গড়ে তুলল সমস্ত সংকীর্ণতা ও জীর্ণ কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। আধুনিক প্রভাবে হিন্দুধর্ম এখন ক্রমশ উদারমনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু যখনই হঠাৎ সাংঘাতিক কিছু করবার চেষ্টা হয় তখনই দেখা দেয় ভয় ও সন্দেহ; আর তার ফলে অগ্রগতি হয় বিঘ্নিত।

গত শতাব্দীর ছয় সাত দশকের আরম্ভে যে ব্রাহ্ম আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তার সঙ্গে সহযোগিতা করল প্যারীচরণ সরকার পরিচালিত নৈতিক আন্দোলন। তাঁর কাছে শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য কোনদিন আমার হয় নি। তবে তিনি ছিলেন তরুণদের এক অতি মহান শিক্ষক। তাঁর জন্য বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত। সেই দুর্দ্দিনে তরুণদের রক্ষা করবার জন্য এক নৈতিক আন্দোলনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে তখন ছিলেন জঘন্য সুরাসক্ত। সুরাপানকে তখন ইংরেজী সংস্কৃতি ও সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই গণ্য করা হ'ত। যে ব্যক্তি সুরা পান করত না তাকে শিক্ষিত

বলেই গণ্য করা হ'ত না। সাত্ত্বিক রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্ম-জীবনীতে লিখেছেন (এবং আমি তাঁর মুখ থেকেও শুনেছি) এক অপরাহ্নে তিনি রামগোপাল ঘোষের বাড়ীতে যান। অন্যান্য অনেক বন্ধুও সেখানে উপস্থিত। রামগোপাল অনুপস্থিত থাকাতে তাঁরা রামগোপালের চাকরকে তাঁদের জন্য সুরা পরিবেশন করতে নির্দ্দেশ দেন। রামগোপাল কর্ম্মস্থল থেকে ফিরে এসে দেখতে পান তাঁর বন্ধুরা পানোন্মত্ত অবস্থায় মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। এই সাংঘাতিক পাপের হাত থেকে বঙ্গদেশের তরুণদিগকে উদ্ধার করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তরুণদের মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে তাদের সু-পথে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে বিলম্ব তখন মারাত্মক।

এ পরিস্থিতিতে তরুণদেরই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্যারীচরণ ভিন্ন অপর কোন সুযোগ্য ব্যক্তি ছিল না, যার উপর এই গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হতে পারত। প্যারীচরণকে বাইরে থেকে দেখে মনে হ'ত তিনি অনুসরণ করতেই কেবল সমর্থ। নেতৃত্ব দেওয়া তাঁর কর্ম্ম নয়। এমন ভদ্র, সভ্য, নম্র লোকের মধ্যে নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত দৃঢ়তার আশা দুরাশা মাত্র। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল অন্য রূপ। তখন প্রমাণ পাওয়া গেল কুসুমের কোমলতার মধ্যেই যেন লুকিয়েছিল বজ্রের কাঠিন্য। দেখা গেল, কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের অতি শান্ত প্রকৃতির প্রধান শিক্ষকের চরিত্রের মধ্যে শিশুসুলভ সরলতা ও বিস্ময়কর নম্রতার সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে এক বাস্তবিক জননেতার উপযুক্ত শক্তি ও মনোবল।

এই নৈতিক আন্দোলন বিশেষ সফল হয়েছিল। আমরাও সকলেই তা'তে যোগ দিয়েছিলাম। আমাদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। সভা করতাম, বক্তৃতা দিতাম। কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেভারেণ্ড সি. এইচ. এ. ডাল নামে ইউনিয়ন চার্চ্চ-এর

একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় আমেরিকান মিশনারী এঁরা সকলেই এই নৈতিক আন্দোলনের সক্রিয় প্রবর্ত্তক ছিলেন। এই আন্দোলন তরুণদের মনকে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করে' তা'দিগকে নৈতিক অবনতির গহ্বর থেকে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়।

এ ছাড়া আমার ছাত্রজীবনে আরও একটি জন-আন্দোলন চলছিল। এখানে তারও কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। এটি হল হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলন। মহামতি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। সারা বঙ্গদেশে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। আমার মনে হয় আমাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রাজা রামমোহনের পরে তাঁর নামই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমি তাঁকে বিশেষরূপে জানতাম এবং তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে অসীম শ্রদ্ধা করতাম। তাঁর আদর্শের দৃঢ়তা ও ব্যাপকতা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা, দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি তাঁর সহানুভূতি আমাকে অভিভূত করত। বিশেষভাবে তাঁর চরিত্রের এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট টুকুই তাঁকে হিন্দুবিধবাদের ত্রাণকর্ত্তার আসনে স্থাপিত করেছিল। সে সময় সরকারী মহলে তাঁর খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি। তার ফলে তিনি আইন পাশ করিয়ে হিন্দুবিধবাদের বিবাহ সমাজে বৈধ বলে গ্রহণ করাতে সক্ষম হন।

আমার বেশ মনে আছে, সেদিন এই আন্দোলন হিন্দুসমাজে কি সাংঘাতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল, সমাজের গোঁড়া সমাজপতিরা তাঁর বিরুদ্ধে কিভাবে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। বয়সে তরুণ হলেও চতুর্দ্দিকের ঘটনাবলীতে আমারও ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না। যতদূর স্মরণ হয়, একবার এক ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর সদ্য বিধবা কন্যার করুণ আর্ত্তনাদ আমাকে আমার বাল্যকালেও দারুণ মর্ম্মাহত করেছিল এবং আমার স্বতঃই মনে হয়েছিল যে, এই বিধবার পুনর্বিবাহ হওয়া একান্তই প্রয়োজন। নিতান্ত বালক হলেও আমি যখনি তাদের

বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে যেতাম আমার মন আকুল হয়ে উঠত। এত সত্ত্বেও এই আন্দোলন সে সময় সমাজে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় নি। আমার পিতামহও এই আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু অপর পক্ষে এই আন্দোলনে আমার পিতার খুবই সমর্থন ছিল। তখনকার মত গোঁড়ামীই জয়ী হল। আর হিন্দু-বিধবাদের দেবতুল্য ত্রাণকর্ত্তা গভীর হতাশার মধ্যেই পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করলেন। রেখে গেলেন তাঁর মানবিকতা ও দেশপ্রেমের অমর বাণী তাঁর অনুগামীদের জন্য, যাতে তাঁরা তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে পারেন। ১৮৯১ সাল থেকে এই আন্দোলনের অগ্রগতি আশানুরূপ ত্বরান্বিত হয় নি। তাঁর উত্তরপুরুষদের নিয়ে এক নূতন জাতিও গড়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী এখনো দুর্লভ। তার ফলে অর্দ্ধ শতাব্দীপুর্ব্বে হিন্দুবিধবাদের যে অবস্থা ছিল আজও তার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নি। তাদের অশ্রু মুছাতে পারে, তাদের হতভাগ্য বৈধব্যময় জীবনের অবসান ঘটাতে পারে এরূপ ব্যক্তি একান্ত বিরল। সহানুভূতির ভাবপ্রবণতার বন্যা সৃষ্টি করবার মত বা বিদ্যাসাগর জয়ন্তীতে বক্তৃতার তুবড়ি ছুটাবার মত লোকের সংখ্যা বেড়েছে সত্য, কিন্তু আসল অবস্থা যে তিমিরে সে তিমিরে। হিন্দুবিধবার ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগাবার চেষ্টার আজও একান্তই অভাব। আমার তরুণ বয়সে আমি উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলাম, "কবে সে বাণী সার্থক হবে?" আজ জীবনসায়াহ্নে এসেও তারই পুনরুক্তি করছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথমবার বিলাত যাত্রা

আগেই বলেছি ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ্চ তারিখে আমি ইংলণ্ড যাত্রা করি। রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত ছিলেন আমার সহযাত্রী। আমাদের সবারই বয়স খুব অল্প। বিশের নীচে। আজকাল-কার তুলনায় তখন বিলাত যাওয়া ছিল এক অতি গুরুতর ব্যাপার। এ যে শুধুমাত্র আত্মীয়স্বজন বাড়ীঘর ছেড়ে কয়েক বৎসর ধরে দূরে পড়ে থাকা তাই নয়, তার সঙ্গে ছিল আবার জাতি ও সমাজচ্যুত হওয়ার বিভীষিকা। সৌভাগ্যবশতঃ এ সমস্ত ভয় আজকাল অবশ্য এক প্রকার কেটেই গেছে। যাই হোক, আমাদের তিনজনকেই অত্যন্ত গোপনে যাবার সব আয়োজন করতে হ'ল, যেন কি এক মহা অন্যায়ের পথে আমরা পা বাড়াচ্ছি, যা' জগতের কারও জানা উচিত নয়। বাবা আমাকে সর্ব্বপ্রকারেই সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু তাও আবার মা'র কাছ থেকে গোপন করে'। অবশেষে যখন যাত্রা করবার সময় ঘনিয়ে এলো মা'কে তখন না বলে আর উপায় ছিল না। এ খবর মা'র কাছে এক ভীষণ দুঃসংবাদ বলে মনে হ'ল। তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

মাত্র তার কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয় বিলাত থেকে ফিরে এসে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর নিকট থেকে আমরা অনেক সাহায্য পেয়েছিলাম। এমন একজন মহৎ ও চমৎকার লোক আমি কমই দেখেছি। তিনি ছিলেন একজন বাস্তবিক দেশপ্রেমিক। দেশের লোক আরও অধিক সংখ্যায় বিলাত যাক এই ছিল তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। এবং এজন্য সুপরামর্শ দিয়ে ও যথাশক্তি উৎসাহ দিয়ে তাদের সাহায্য করতেও তিনি চেষ্টার ত্রুটী করতেন না। এ বিষয়ে তাঁর এত

উৎসাহ ছিল যে, তা' দেখে আমাদের জাতীয় মহাকবি মাইকেল মধুসূদন তাঁর নাম দিয়েছিলেন "ইউরোপগামী ভারতীয়দের রক্ষক" (প্রোটেক্টর অব ইণ্ডিয়ান এমিগ্র্যান্টস্ প্রোসিডিং টু ইউরোপ)। আমরা যেদিন যাত্রা করলাম তার আগের রাত্রিটা মনোমোহন ঘোষের কাশীপুরের বাড়ীতেই কাটালাম। আর ভোর হবার আগেই আমরা চাঁদপাল জাহাজঘাটে রওনা হলাম।

৩রা মার্চ্চ ভোরে বাবা এলেন আমাকে বিদায় দিতে। এ জীবনে তাঁর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। আমি বিলাতে থাকতেই তিনি পরলোক গমন করেন। আমি বাবার গাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলাম। তিনি সাধারণ ধুতিচাদর পরেই এসেছিলেন—সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আমার দিকে তাকিয়ে বিদায় দিয়ে বললেন, "ফেয়ারওয়েল"। তারপর ফিরে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ তখনো আমার দিকে। আর তখন তাঁর তুগাল বেয়ে পড়ছে অশ্রু। তাঁর কথা শুনবার সৌভাগ্যও এজীবনে আমার আর হয়নি। জানি না তিনি বাস্তবিকই ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত বুঝতে পেরেছিলেন কি না যে, এ-জগতে এই আমাদের শেষ দেখা এবং সেজন্যই এভাবে চিরবিদায়ের ভাষা ব্যক্ত করে আমার নিকট থেকে বিদায় নিয়েছিলেন কি না। কোন্ অজ্ঞাত ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে সেদিন এই চিরবিদায়ের বাণী উৎসারিত হয়েছিল তা' কে বলবে? সেই থেকে পঞ্চাশ বছরের অধিককাল কেটে গেছে। কিন্তু সে ঘটনা আজও আমার স্মৃতিতে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। চিরদিনের মত হয়ে গেল পিতাপুত্রের ছাড়াছাড়ি। আমি চলে গেলাম জীবনের বৈচিত্রময় বন্ধুর পথে দূর হতে দূরান্তরে। আর তিনি ফিরলেন সেই পুরাতন বাড়ীতে আমার দুঃখিনী মা'কে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে। আমরা পরস্পর থেকে জীবনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আমার জীবনগঠনে যে-পিতার

দান ছিল যে-কোন মানুষের চেয়ে বেশী তাঁর প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনই আমার জীবনে একমাত্র কর্ত্তব্য হয়ে রইল। তাঁর বৈরাগ্য, দরিদ্রের প্রতি তাঁর সহানুভূতি, অন্যায়ের প্রতি তাঁর ঘৃণা, এ সমস্ত আমার জীবনে এক গভীর রেখা পাত করে রেখেছে। হিন্দু পরিবারের সন্তানসন্ততিদের কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রধান যে পিতৃভক্তি তাহাই আমার মনে আরও বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। আমার এ-সমস্ত কাহিনী কোন ইউরোপীয় পাঠকের কাছে হয়ত অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু যে কোন হিন্দু পাঠকই বুঝতে পারবেন, আমার অন্তরের কি গভীর বেদনা থেকে আমার এই কথাগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে উৎসারিত হচ্ছে।

তখনকার দিনে লোকে মনে করত বিলাত যাওয়া বোধ হয় উত্তরমেরু যাওয়া থেকেও সংকটজনক। রামমোহনের আমলের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। তাঁর জীবনীকার বলেছেন, রামমোহন যখন দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ী থেকে জাহাজে উঠতে যাচ্ছিলেন, তখন সে বাড়ী লোকে লোকারণ্য। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, রামমোহনকে তাঁরা জীবদ্দশায় আর দেখবার সুযোগ পাবেন না। তাই তাঁকে শেষবারের মত দেখাই ছিল তাঁদের অভিপ্রায়। এখন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে যে সব পরিবর্ত্তন হয়েছে আমাদের বিলাত যাত্রা তাদের অন্যতম দৃষ্টান্ত।

সমুদ্রযাত্রা আমাদের কাছে খুব উপভোগ্য হয়েছিল। আমাদের কেহই সমুদ্র যাত্রাজনিত অসুস্থতায় কোন কষ্ট পাই নি। যে সব বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করল সে সব স্থানে আমরা অনেক কিছুই দেখলাম। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে আমাদের জাহাজ সাউথেমটন পৌছাল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ শ্রীযুক্ত ডবল্যু. সি. বোনার্জীর কাছে পূর্ব্বেই চিঠি দিয়েছিলেন। তিনি সাউথেমটনে এসে আমাদের

সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' আমাদের লণ্ডনে নিয়ে যান। সেখানে লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের নিকটেই এক যাত্রীনিবাসে আমাদের নিয়ে তুলে দেন। কয়েকদিন সেখানে কাটিয়ে আমরা আমাদের নিজ নিজ আবাসে গিয়ে আমাদের সম্মুখে যে কাজ পড়ে আছে তাতে একাগ্র ভাবে মন দিলাম। লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজিয়েট স্কুলে মিঃ টেলফোর্ড এলি নামে একজন ল্যাটিনের শিক্ষক ছিলেন। তিনি থাকতেন হেমপ্‌ষ্টিড হিথ-এর কাছে। একজন ছাত্র হিসাবে আমি সে পরিবারেই বাস করতে লাগলাম। এ বাড়ীতে থেকে আমি বিশেষ উপকৃতও হয়েছিলাম। মধ্যবিত্ত ইংরেজ পরিবার। এ বাড়ীর পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুগ জীবনযাত্রা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এ বাড়ীর সর্ব্বত্রই বিরাজ করত নিয়মানুবর্ত্তিতা। এ বাড়ীতে প্রত্যেকে আমাকেও পরিবারের একজন হিসাবেই গণ্য করত। আঠার মাস আমি সেখানে ছিলাম। তারপর আমি ছাত্রনিবাসে চলে যাই। যাবার মুহূর্ত্তে উভয় পক্ষই অভিভূত হয়েছিলাম। কঠোর পরিশ্রম করে সবার সঙ্গে পরীক্ষায় বসে আমি ১৮৬৯ সালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় আমার নাম প্রকাশ হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমার বিপদ দেখা দিতে লাগল। আমি ছিলাম কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৮৬৩ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসবার জন্য আমি যখন ফরম্‌ দাখিল করেছিলাম তাতে আমি আমার বয়স ষোল বছর বলে লিখে দিয়েছিলাম। উপরোক্ত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার তখনকার নিয়ম ছিল, —প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে উনিশ বৎসরের অধিক ও একুশ বৎসরের কম বয়সের হতে হবে। এ অবস্থায় যখন ১৮৬৩ সালে আমার বয়স ছিল ষোল তখন ১৮৬৯ সালে আমার বয়স নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে যাবে। আর তার ফলে আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসবার

অযোগ্য বলে বিবেচিত হ'ব। অবশ্য আমি অনায়াসে এই পার্থক্যের কারণ বুঝিয়ে দিলাম। আমি বললাম, আমার জন্ম হয়েছিল ১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসে। সুতরাং আমি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিলাম তখন আমার বয়স ছিল ষোল নয়, পনর বছর। আর তখন যদি আমার বয়স পনর হয় তাহলে পরীক্ষার নিয়ম অনুসারে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য আমার বয়স নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে নি। এখন প্রশ্ন হ'ল, আমার প্রবেশিকা পরীক্ষার ফরমে আমার বয়স ষোল বছর লিখবার কারণ কি? আসল কথা হ'ল লোকের বয়সের হিসাব রাখার ভারতীয় পদ্ধতি ইংরেজদের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। আমরা শিশুর বয়সের হিসাব করি জন্মের মুহূর্ত্ত থেকে নয়, মায়ের গর্ভ সঞ্চারের সময় থেকে। সেই অনুসারে কোন বালকের বয়স যখন পনর বৎসর পূর্ণ হ'ল তখন তাকে যথার্থত ষোল বছর বয়সের বলা হবে। [সাধারণত বলা হয়, পনর বছর পার হয়ে ষোল বছর চলছে—অনুবাদক]। কিন্তু ইংরেজদের রীতি অনুসারে উক্ত বালকের বয়স বলা হবে পনর। [কিম্বা বলা হয় পনর বছর এত মাস। অর্থাৎ মাস বাদ দিয়ে বলতে গেলে বলা হবে পনর বছর। কিন্তু ষোল বছর কিছুতেই বলা হবে না। —অনুবাদক]।

এ ক্ষেত্রে বলে রাখা যেতে পারে যে, আমার স্কুলের সমস্ত কাগজ-পত্র থেকে প্রমাণিত হয়েছিল যে, আমি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিলাম তখন ইংরেজী হিসাব মত আমার বয়স পনরই ছিল। বাড়ী থেকে যে সংবাদ স্কুলে পেয়েছিল তার উপর নির্ভর করেই স্কুলের সব খাতাপত্র তৈরী হয়েছিল। এবং আমি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষার ফরম্ লিখে দিয়েছিলাম, আমাদের দেশের নিয়ম অনুসারে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই আমি আমার বয়স ষোল বছর বলেই লিখে দিয়েছিলাম।

যাই হোক, আপাত দৃষ্টিতে আমার প্রবেশিকা পরীক্ষার ফরমে

বর্ণিত বয়স আর সিভিল সার্ভিস কমিশনারের কাছে দেওয়া সার্টিফিকেটে বর্ণিত বয়সের এই পার্থক্যের কথা আমার লণ্ডনস্থ বন্ধুদের জানা ছিল। তখন আমরা ছিলামই ত মাত্র জন কয়েক। আর তারা কেউ ভাবেও নি যে, এতে এমন কিছু ছিল যাতে নির্ব্বাচিত পরীক্ষার্থীদের তালিকা থেকে আমার নাম বাদ দেওয়া যেতে পারে। আমার পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার সপ্তাহ কয়েক পরে খবরের কাগজে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হ'ল। কারও কারও ধারণা তার পেছনে ছিল কোন একজন ভারতীয়। বিজ্ঞাপনে বলা হল, যদি একান্ন নম্বর পরীক্ষার্থী এক নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় একজন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তা' হলে তিনি তাঁর পক্ষে হিতকর কিছু তথ্য পেতে পারেন। যে-সমস্ত পরীক্ষার্থী পাশ করতে পারেন নি একান্ন নম্বর পরীক্ষার্থী ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম। লণ্ডনে সে সময়ের ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের কারও বুঝতে বাকী রইল না, কে ঐ বিজ্ঞাপনখানা প্রকাশ করেছেন।

উপরোক্ত বয়সের বৈষম্যের কথা ত সিভিল সার্ভিস কমিশনারদের নজরে আনা হল। কিন্তু দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্র অনুযায়ী বয়স আর সিভিল সার্ভিস কমিশনারদের কাছে দেওয়া বয়সের পার্থক্য আরও দুজন সফল পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে পাওয়া গেল। তাঁদের একজন ছিলেন বিহারীলাল গুপ্ত। ইনি পরে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। অপর ব্যক্তি ছিলেন শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর। ইনি পরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে জেলা জজের পদ লাভ করেন। আমাদের কাছে জবাব চাওয়া হ'ল। আমাদের উত্তরও এক রকমই হল। আমরা বুঝিয়ে দিলাম যে, এই আপাত পার্থক্য ভারতীয় ও ইংরেজী হিসাব পদ্ধতির পার্থক্যেরই ফল প্রসূত। আমাদের উত্তর তাঁদের মনঃপূত হ'ল না। আমার ও ঠাকুরের নাম কৃতী পরীক্ষার্থীদের তালিকা থেকে অপসারিত করা হল। মিঃ গুপ্ত কোন রকমে বেঁচে গেলেন, কারণ, প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় তাঁর বয়স

যদিও বা ষোল হয়ে থাকে, তবুও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার সময় তাঁর বয়স নির্দ্দিষ্ট সীমার ভিতরেই ছিল।

আমি চুপ করে থাকতে রাজী ছিলাম না। তা ছাড়া কৃতী ছাত্রদের তালিকা থেকে আমাদের নাম বাদ দেওয়ার ফলে সারা ভারতে বিশেষভাবে বঙ্গদেশে সকলের মনে এক দারুণ ঘৃণার উদ্রেক হল। মহারাজা রমানাথ ঠাকুর, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর প্রমুখ ভারতীয় নেতৃবর্গ সম্মিলিতভাবে শপথনামা দ্বারা জানালেন যে, আমি ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় পদ্ধতিতে বয়স হিসাবের যে রীতি বর্ণনা করেছি তাহাই প্রাচ্য দেশের প্রকৃত রীতি।

সে সময়ের ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলিও বিবিধ প্রবন্ধে সিভিল সার্ভিস কমিশনারদের অন্যায় কার্য্যের তীব্র নিন্দা করে ধিক্কার জানাল। এই কমিশনের প্রধান ছিলেন স্যার এড্ওয়ার্ড রায়েন। ইনি বহু বছর বঙ্গদেশে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরূপে কাজ করেছিলেন। এটিই ছিল আশ্চর্য্যের যে, এদেশে কিভাবে বয়স গণনা করা হয় সে সম্পর্কে তাঁর কোনই ধারণা ছিল না। অথবা থাকলেও আমাদের ক্ষেত্রে তিনি তা' প্রয়োগ করতে পারলেন না।

আমরা সিভিল সার্ভিস কমিশনারের উপর আদালতের নির্দ্দেশনামা (মেণ্ডেমাস রিট) দাবী করে কুইনস্ বেঞ্চ আদালতে মামলা দায়ের করার সাব্যস্ত করলাম। আমাদের স্থানীয় বন্ধুরাও আমাদের সঙ্গে একমত হলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। এ প্রসঙ্গে দুজন লোকের কথা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ না করে পারি না। তন্মধ্যে একজন ছিলেন মিঃ জন. ডি. বেল, অন্য জন স্যার তারকনাথ পালিত। পালিত মহাশয় তখন বিলাতে। সবে মাত্র ব্যারিষ্টার হয়েছেন। খুব যত্ন ও উৎসাহের সঙ্গে তাঁরা আমাদের বিষয়টি গ্রহণ করলেন। মিঃ

বেল অনেক বছর ধরে কোলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করে সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। পরে অবসর নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যান। তিনি এখন সেখানে প্রিভি কাউন্সিলে ব্যবসা করেন। তিনি আমার মামলায় কোন পারিশ্রমিক নিতে অস্বীকার করলেন। বললেন, আমার মামলা চালান তাঁর পক্ষে একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যেহেতু বহু বছর তিনি ভারতের নুন খেয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের মামলার সাফল্যের জন্য তাঁর ঐকান্তিক ও পক্ষপাতহীন বাগ্মিতাই ছিল বিশেষভাবে দায়ী। যাঁরা স্যার তারকনাথ পালিতকে তাঁর জীবনের শেষের দিকে জানতেন, তাঁরা তাঁর অন্তরের উৎসাহ, উদ্যম, বন্ধুপ্রীতি, আপন উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ প্রভৃতি গুণের সঙ্গেও বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। যে সকল গুণের ফলে তিনি পরে একজন খ্যাতনামা নাগরিক ও আইনজীবী বলে পরিগণিত হন, সে সব প্রথমাবধিই তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল।

শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর এ বিষয় নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। তিনি বুদ্ধিমানের মত ধরেই নিয়েছিলেন যে, আমি যদি মামলায় জয়ী হই তার ফল থেকে তিনিও বঞ্চিত হবেন না। যেহেতু উভয় ক্ষেত্রেরই বিষয়বস্তু ছিল অভিন্ন। মিঃ মেলিশ-কে আমার মামলার জন্য প্রধান আইনজ্ঞ হিসাবে নিয়োগ করলাম। মিঃ বেল তাঁর সহকারী হিসাবে কাজ করতে লাগলেন। ১৮৬৯ সালের ১১ই জুন কুইন্স্ বেঞ্চ ডিভিশনে আমার মামলা দায়ের হ'ল।

ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি স্যার আলেকজাণ্ডার কক্‌বারণ ও অন্যান্য খ্যাতনামা বিচারপতির সামনে আমার মামলার শুনানী হল। তাঁরা খুব মনোযোগের সঙ্গেই মিঃ মেলিশের বক্তব্য শুনতে লাগলেন। বিচারপতিগণ মামলা সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব গ্রহণ করছিলেন নিম্নোক্ত বিষয় থেকে তার এক সাধারণ ধারণা পাওয়া যাবে :

মিঃ মেলিশ বললেন, অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও একজন ভারতবাসীর পক্ষে এভাবে পরীক্ষায় সফলতা লাভের এটিই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। কিন্তু এরূপ এক অযৌক্তিক কারণে তাঁকে তার ফল থেকে বঞ্চিত করা হবে এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। এ ভদ্রলোক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। ছাত্রজীবন শেষ করে অনেক কষ্টে ইংরেজী ভাষায়, ইংরেজী পঠিতব্য বিষয়েই ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছেন। পরীক্ষায় সাফল্যও লাভ করেছেন। এ অবস্থায় এরূপ এক ভিত্তিহীন কারণে তাঁকে যদি শূন্য হাতে ভারতে ফিরতে হয় তা' হবে নিতান্তই দুঃখজনক। ভদ্রলোক তাঁর বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর বয়স নির্দ্দিষ্ট সীমার ভিতরেই ছিল। কিন্তু কমিশনারগণ প্রত্যুত্তরে লিখে জানালেন যে, উনি "স্বীকার করেছেন" যে, তাঁর বয়স সীমা অতিক্রম করেছে (হাস্য)। তাঁরা এ সম্পর্কে কোন প্রমাণ নিতে পর্য্যন্ত অস্বীকার করেছেন।

প্রধান বিচারপতি—অর্থাৎ তাঁরা বলতে চান যে, "তুমি প্রমাণ দিলেও আমরা সব অগ্রাহ্য করে দেব।"

বিচারপতি মেলোর—তাঁরা বলছেন, "তুমি কোলকাতায় যা বিবৃতি দিয়েছ, তারপর তোমাকে তার বিপরীত কিছু বলতে দেওয়া চলে না।" অবশ্য এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, ওঁর বর্ত্তমান বিবৃতির সঙ্গে তার কোনই অসামঞ্জস্য নেই।

বিচারপতি ব্ল্যাকবার্ণ—"তাঁর বিবৃতিকে তাঁরা সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন। তারপর আবেদনকারীর প্রতি তাঁদের বক্তব্য হ'ল, তাঁর সে বিবৃতির যা (ভুল) অর্থ তাঁরা করেছেন, তাঁদের মতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে সেটিই চূড়ান্ত। যদিও বাস্তবিক পক্ষে তা' ঠিক নয়।"

বিচারপতি হেনেন—মনে হচ্ছে, তাঁরা যেন বলতে চান যে,

প্রাচ্য পদ্ধতি অনুসারেই হিসাব করতে হবে। অন্যথা করা চলবে না।

প্রধান বিচারপতি—আমাদের এতে এক্তিয়ার আছে কি না আগে দেখান। যদি থাকে আমরা অবশ্যই তা' প্রয়োগ করব।

মিঃ মেল্গিশ বললেন, এক্তিয়ার যে রয়েছে তা'ত পরিষ্কার। আইনই প্রত্যেক ভারতবাসীকে এ ক্ষমতা দিয়েছে যে, কতকগুলি সর্ত্ত পূর্ণ করে তারাও পরীক্ষায় বসতে পারে। আবেদনকারী বলছেন যে, তিনি সে সমস্ত সর্ত্ত পূর্ণ করেছেন। কতকগুলি নিতান্ত অযৌক্তিক কারণের উপর নির্ভর করেই কমিশনারেরা আবেদনকারীকে তাঁর এই বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। এমন কি, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পর্য্যন্ত তাঁরা নিতে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের এই কাজ সাধারণ ন্যায়বিচারের (ন্যাচারাল জষ্টিস্) ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রত্যেক ট্রাইব্যুন্যালের ও যে কেহই বিচারকার্য্য করেন, সে যত ঘরোয়া বিচার ব্যবস্থাই হোক না কেন, এ ধারা মেনে চলা তাঁদের একান্ত কর্তব্য। সুতরাং কমিশনারগণ যাতে সাক্ষ্যপ্রমাণসহ শুনানী করে সুবিচার করে এ বিষয়ের নিষ্পত্তি করেন এরূপ এক নির্দ্দেশসূচক "মেণ্ডেমাসের" আদেশ আবেদনকারী আশা করতে পারেন।

আদালত থেকে আদেশসূচক "রুল" পাওয়া গেল। কিন্তু এ মামলা চালাবার জন্য কমিশনারগণ আর অপেক্ষা করলেন না। তাঁদের কাজটি অতিরিক্ত তাড়াহুড়ার মধ্যেই করা হয়েছিল। কাজেই এখন পক্ষ সমর্থন করবার মত তাঁদের কিছুই ছিল না। মামলার শুনানী আরম্ভ হবার বহু পূর্ব্বেই তাঁরা আমাকে ও শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুরকে লিখে জানালেন যে, আমাদের নাম পুনরায় ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আমি মামলায় জিতলাম বটে। কিন্তু এ সংবাদ পাবার আগেই বাবা পরলোক গমন করলেন।

প্রথমবার বিলাত যাত্রা

১৮৭০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারীতে বাবার মৃত্যু হয়। সে সময় আমি আমার বন্ধু মিঃ কে. এম. চাটার্জীর সঙ্গে থাকতাম। ইনি পরে কোলকাতার ছোট আদালতের জজ হয়েছিলেন। তিনি তখন থাকতেন কেনটিশ সহরের গেইশফোর্ড ষ্ট্রীটের এক আবাসে। যে অবস্থার মধ্যে আমি বাবার মৃত্যুসংবাদ পাই তা' এতই অদ্ভুত যে, তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যাঁরা আত্মা, ইহলোক, পরলোক ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাসী তাঁদের পক্ষে এটি হয়ত সহায়ক হবে।

বাবার মৃত্যুর খবর পাই আমি জুন মাসের মাঝামাঝি নাগাদ। আগের দিন রাত্রে আমার মন ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠে। কেন যে আমার মন এত অস্থির, এত বিষাদগ্রস্ত হয়েছিল আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বাড়ীর কথা আমার বারবার মনে হচ্ছিল। যাদের ফেলে এসেছি আমি তাদের কথা ভাবতে লাগলাম। বিশেষ ভাবে বাবার কথাই বারবার স্মরণ হতে লাগল। অঘোর নিদ্রাতে অভ্যস্ত আমার মত লোকের পক্ষে এ রকম রাত্রি যাপন দুঃসহ। ভোরে ভোরেই বিছানা ছেড়ে উঠলাম। জামাকাপড় পরলাম। তারপর দালানে নেমে গেলাম। এখানেই আমি ও মিঃ চাটার্জী খাওয়াদাওয়া করতাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনিও এসে পড়লেন। আমরা প্রাতরাশ শেষ করলাম। তার কিছুক্ষণ পরেই দরজায় ডাকপিওনের কড়া নাড়ার শব্দ। চিঠি অসার দিন এ টি। চাটার্জী দেশের চিঠি পেলেন। কিন্তু আমার জন্য কিছুই ছিল না। এতে আমার অস্থিরতা বেড়েই চলল। আমার মুখ দেখে আমার অবস্থা বুঝতে আমার বন্ধুর বাকী ছিল না। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর চিঠি খুলে জোরে জোরে আমার কাছে পড়তে লাগলেন। খুব মনোযোগের সঙ্গে আমি তাই শুনতে লাগলাম। ঘরের এক প্রান্তে তিনি বসে ছিলেন একখানি ইজিচেয়ারে। অন্য প্রান্তে আমি সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিলাম।

পড়তে পড়তে হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। মুখ বেদনায় কাল হয়ে গেল। চোখের পাতাগুলি জলে ভিজে গেল। মনের ভাব গোপন করতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। গভীর সৌহার্দ্দ্যের ভাবে তিনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সে সময় থেকে বহু বছর কেটে গেছে। আজ আমি জীবনসন্ধ্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। সে দিন যাঁর জন্য শোকাকুল হয়েছিলাম হয়ত আর কিছু কালের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আবার মিলিত হব। কিন্তু সেদিন আমি যে রকম অধীর হয়েছিলাম আজও আমি তা ভুলতে পারি নি। আমার বন্ধুকে বললাম, "থামলেন কেন? পড়ে যান।" তিনি পড়লেনও না, জবাবও দিলেন না। শুধু আরও দুঃখের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার সামনে যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে আমি যেন তারই ছায়া দেখতে পেলাম। আমার মনের মধ্যে কেউ যেন আমাকে জোর করে বলাতে লাগল আর আমি কম্পিত কণ্ঠে আমার বন্ধুকে বলতে লাগলাম, "পড়ছেন না কেন? বাড়ীতে কি কারও অসুখ হয়েছে?" তিনি তবুও সাড়া দিলেন না। যে চাটার্জী সব সময় এত খোলাখুলি, এত কথা বলতে ভালবাসেন, তিনি নীরব। কিন্তু আমি ছাড়বার পাত্র নই। আমি জোর দিতে লাগলাম। আমার মন যে আমাকে কিছুতেই শান্ত হতে দিচ্ছিল না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার বাবা কি অসুস্থ?" তবু চাটার্জী নিরুত্তর। পাথরের মূর্ত্তির মত চাটার্জী কেবলমাত্র নিঃশব্দে বসে রইলেন। অবশেষে আমি ফেটে পড়লাম। কাঁদতে কাঁদতে আমি প্রশ্ন করলাম, "আমার বাবা বেঁচে আছেন, না, মারা গেছেন? তৎক্ষণাৎ চাটার্জী চিঠিখানি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে সোফার উপর আমায় বুকে চেপে ধরলেন। আর তারপর তাঁর আর আমার চোখের জল মিলে একাকার হয়ে গেল।

তখন আমার আর কিছু চিন্তা করবার ক্ষমতা ছিল না। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। অধীর হয়ে পড়লাম। লালমোহন ঘোষ,

তারকনাথ পালিত (পরে স্যার তারকনাথ পালিত), উমেশচন্দ্র মজুমদার, কেশবচন্দ্র সেন সকলেই তখন ইংলণ্ডে ছিলেন। তাঁরা সবাই একেএকে এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধব এসে আমার সঙ্গে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করলেন। আমার বন্ধুরা সে অবস্থায় আমাকে ঘরে একা থাকতে দিতে রাজী ছিলেন না। মজুমদার এসে সে-রাত্রে আমার সঙ্গেই রইলেন। ইনি এ ঘটনার তিন বৎসর পরে অশ্বচালনার সময় এক দুর্ঘটনায় মারা যান। আমার সেই সর্ব্বাধিক শোকের দিনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল এবং বর্ত্তমানে লোকান্তরিত যে সমস্ত বন্ধু আমার সঙ্গে সেদিন সহযোগিতা করেছিলেন, আমার শোকের অংশ গ্রহণ করেছিলেন, আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, সে সমস্ত ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

মামলা করতে করতে আমাদের প্রায় এক বছর কেটে গিয়েছিল। আমাদের বছরের (অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের) ব্যক্তিদের সঙ্গে অথবা ১৮৭০ সালে যারা নির্ব্বাচিত হবে তাদের সঙ্গে আমাদের যেরূপ ইচ্ছা সেই অনুযায়ী শেষ পরীক্ষার জন্য বসতে আমাদের সুযোগ দেওয়া হল। আমি প্রথমটির সুযোগ গ্রহণ করব স্থির করলাম। শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর ১৮৭০ সালের দলের সঙ্গে যাওয়ার মনস্থ করলেন।

এখানে শ্রীপদ বাবাজী সম্পর্কে দু'একটি কথা বলে রাখা যেতে পারে। সব দিক থেকেই তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য্য রকমের লোক। ভাষা আয়ত্ত করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। শারীরিক গঠনের দরুণ তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমে অনাগ্রহী। কিন্তু তাঁর চরিত্রের এই অভাব পূরণ করত তাঁর অত্যধিক সদয় চরিত্র।

তাঁর কথা বলতে গিয়ে আমার একটি ছোট গল্প মনে পড়ছে। বিপদ-আপদ মানুষের জীবনে যে কি বিরাট অংশ গ্রহণ করে এবং তখনই যে মানুষের বাস্তবিক পরিচয় পাওয়া যায় এ গল্প তারই

প্রমাণ। পরীক্ষার মুখে আমরা সকলেই তখন খুব ব্যস্ত। শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর কিন্তু ছিলেন অন্য প্রকৃতির। দাবা খেলতে তিনি খুব ভালবাসতেন। খেলতে পটুও ছিলেন যথেষ্ট। এমন কি যেখানে খেলা হচ্ছে তা থেকে অন্য ঘরে বসেও তিনি দাবার চাল বলে দিতে পারতেন। সেদিনও যথারীতি একদান খেলা শেষ হয়েছে। হঠাৎ যেন তাঁর মনে হল পরদিন সকলকেই ত পরীক্ষায় বসতে হবে। কাজেই কিছু অন্তত করা উচিত। ওয়েবষ্টারের অভিধানখানা তাঁর হাতের কাছেই ছিল। তা নিয়ে তিনি একটা অভিধান ভাল হতে হলে তার মধ্যে কি কি থাকা প্রয়োজন সে বিষয়ে একটি পুরো অধ্যায় পড়ে ফেললেন। তাঁর ছিল অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি। সেই অধ্যায়ে যা কিছু ছিল সবই যেন তাঁর মনের মধ্যে মুদ্রিত হয়ে গেল। ঘটনাচক্র এমন হল যে, ইংরেজী কম্পোজিশনের প্রশ্নপত্রে দেখা গেল, তাতে একটি ভাল অভিধানের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপরেই একটি রচনা লিখতে বলা হয়েছে। আগের রাত্রেই ঠাকুর এ বিষয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং তাতে তিনি যে ভালই করলেন তাতে আর সন্দেহ কি?

অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্বেও ঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির। স্যার তারকনাথ পালিত ছিলেন তাঁর বন্ধু, গুরু ও পরিচালক। ঠাকুর প্রথম যখন লণ্ডনে আসেন তখন তিনি ছিলেন নিরামিষাশী। তাঁর গোঁড়া দেশীয়দের অনুকরণে তিনি চুল রাখতেন। স্যার তারক নাথের প্রভাবে তিনি মাংসাশী হলেন। ইংরেজদের অনুকরণে চুল ছাঁটাতে ও পোষাক-আশাক করতে লাগলেন। এতে তিনি যেরূপ আরাম বোধ করতে লাগলেন এরূপ বোধ হয় পূর্ব্বে আর কখনো করেন নি। আমরা এ নিয়ে তাঁকে ক্ষেপাতাম। কৌতুক উপভোগ করে তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাসতে থাকতেন। তাঁর মন যে কত নির্মল ছিল এ থেকেই তা বোঝা যায়। তাঁর সেই হাসি আমাদের আনন্দ

হুল্লোড় আরও বাড়িয়ে তুলত। তাঁর সেই হাসির লহর আজও আমার কাণে লেগে আছে।

১৮৬৯ সালে আমাদের সঙ্গে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য আরও একজন পরীক্ষার্থী ছিলেন। আমি আনন্দরাম বড়ুয়ার কথা বলছি। ইনিও একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যু এক অতি সম্ভাবনাময় সংস্কৃতজ্ঞকে সরিয়ে নিয়ে গেল। পূর্ব্ববর্ণিতভাবে এ ভদ্রলোকের বয়স নিয়েও কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। তবে আমার মামলায় এ বিষয়ে নিষ্পত্তি হওয়ার ফলে তাঁর ক্ষেত্রে তা আর বেশীদূর গড়াল না। ভদ্রলোকের বাড়ী ছিল আসামে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তারপর সরকারী বৃত্তি নিয়ে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য ইংলণ্ডে যান। ১৮৭০ সালে তিনি সফল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে স্থান পেলেন। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হয়েও তিনি ছিলেন অত্যন্ত কর্ত্তব্যজ্ঞান-সম্পন্ন প্রশাসক, আবার সাহিত্যের প্রতি অসাধারণ অনুরাগী। আমি শুনেছি, তাঁর মৃত্যুকালে তিনি একখানি সংস্কৃত ভাষার অভিধান রচনায় নিবিষ্ট ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তা' আর প্রকাশ পেল না। প্রচুর সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল। যদি তিনি তা' সফল করে তুলবার সময় পেতেন, তবে সাহিত্যজগত বিশেষরূপে লাভবান হত।

আমার দুজন পরমবন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত সম্বন্ধে কি যে বলব বুঝতেই পারছি না। তাঁরা ছিলেন আমার কাছে সহোদর অপেক্ষাও অধিক। যদিও সারা জীবন আমাদের পরস্পরের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণ পৃথক, তবুও আমরা সৌহার্দ ও প্রীতির সূত্রে একে অন্যের সঙ্গে আবদ্ধ ছিলাম। মৃত্যু সেই স্মৃতিকে পবিত্রতর করেছে। বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসে তখন পর্য্যন্ত কোন ভারতীয়

পদার্পণ করবার সুযোগ পায় নি। এরাই ছিল এ পথের অগ্রদূত। তাদের অবস্থাও ছিল কষ্টকর। আর তাদের দুশ্চিন্তারও অবধি ছিল না। কিন্তু যে সমস্ত গুণে পথপদর্শক মাত্রেই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন, তাঁদের মধ্যে সে সমস্ত গুণ ছিল প্রচুর। তাঁদের কর্ম্মজীবনে বা যখনই তাঁদের চাকরী এবং স্বদেশের স্বার্থে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে, তাঁরা শেষোক্তকেই বরণ করে চাকরীর সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থকে বর্জ্জন করেছেন। এবং মাতৃভূমির স্বার্থকেই প্রসারিত করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইলবার্ট বিল সম্পর্কিত বাদানুবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বাদানুবাদের প্রবর্ত্তক ছিলেন কোলকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বিহারীলাল গুপ্ত। রমেশচন্দ্র দত্তের সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় তিনি ছিলেন একজন মানুষের মত মানুষ। তাঁর জুড়িদারদের মধ্যে সেরা। যখনই তিনি কোন সমাবেশে উপস্থিত হতেন তখনই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যেত। অথচ সে যুগের প্রতিক্রিয়া এতই তীব্র ছিল যে, এত দক্ষতা সত্ত্বেও এই সরকারী কর্ম্মচারীকে কোন দিন কেবলমাত্র বিভাগীয় কমিশনারের কাজ চালিয়ে যাবার অধিক দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করা হয় নি। অবশেষে দত্ত যখন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ করলেন তখন সাম্রাজ্যের এক শ্রেষ্ঠ রাজন্য বরোদার মহারাজা তাঁকে তার প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। তিনি যখন বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য নিযুক্ত হন, তখন কারও জানতে বাকী ছিল না যে, একজন লোকের মত লোক পাওয়া গেছে। আমি নিজেও একজন সভ্য ছিলাম, কাজেই আমি নিজেও তা' লক্ষ্য করেছি। কেবল সরকারী চাকার ভিতর ঘুরঘুর করা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। সরকারী মহলে এ নিয়ে বেশ একটু চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি হয়েছিল। স্যার চার্লস ইলিয়ট তখন এ দেশের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর। সেজন্য তিনিই ছিলেন পরিষদের সভাপতি। রমেশচন্দ্রকে নিয়োগের ফলে

এই যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার প্রশমনের জন্য তিনিও এক উৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, সরকারী সভ্যদের মধ্যে মিঃ দত্ত যে স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গীর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তাকে তিনি সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

আমার স্মৃতিচারণের এই অংশ সম্পূর্ণ করার আগে আমি আমার ইংরেজ অধ্যাপক ও শিক্ষকদের সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমরা বিলাতে আসার অল্প কয়েকদিন পরেই লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে কিছু কিছু ক্লাসে আমি যোগ দিতে আরম্ভ করি। এবং তাঁদের কারও কারও কাছ থেকে একান্তভাবে পাঠ নেবারও সুযোগ পাই। তাঁদের প্রত্যেকেই আমাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতেন। আবার কেউ কেউ, বিশেষভাবে অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার ও অধ্যাপক হেনরী মর্লি, বলতে পারি নিতান্ত অযাচিত ভাবেই স্নেহ বর্ষণ করেছেন। হয়ত তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে, আমরা আমাদের আত্মীয়-পরিজনদের কাছ থেকে বহু দূরে এক অজানা দেশে অতিথি মাত্র। মিঃ মর্লি আমাকে তাঁর সংসারেরই একজন বলে মনে করতেন। ডক্টর গোল্ডষ্টাকার ছিলেন অকৃতদার। তাঁর সংসার বলতে ছিল কেবলমাত্র একটি কুকুর ও এক একদন্তী বৃদ্ধা পরিচারিকা। যখনই তাঁর বাড়ী যেতাম কুকুরটির ঘেউঘেউ আরম্ভ হ'ত। ভদ্রলোক এসে সস্নেহে অথচ গম্ভীরভাবে আমাদের স্বাগত জানাতেন। তাঁর কঠোর মনোভাব দেখে আমার হিন্দু গুরুমহাশয়দের কথাই মনে পড়ত। একবার আমার আসতে দেরী হয়। কুকুরের ঘেউঘেউ সাঙ্গ হবার পর, তিনি প্রথমে যা বললেন তা হল "আচ্ছা ব্যানার্জী, তোমার পূর্ব্বপুরুষদের ত কোন সময়ের বালাই ছিল না। আর তুমিও ত দেখছি তাদের ধারাই বহন করে চলেছ। লণ্ডনে কিন্তু তা চলবে না। এখানে সময়ের মূল্য আছে, তাই সময় বলতে এখানে বোঝায় টাকা পয়সা।" আমি যথাসাধ্য

ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। এবং স্থির করলাম ভবিষ্যতে আর কোনদিন এ রকম পাপ করব না। সেই থেকে আমি এই উপদেশ অভ্যাসে পরিণত করতে চেষ্টা করেছি যে, সময়ানুবর্ত্তিতা জগতের সেরা ব্যক্তিদের সদ্‌গুণ ত বটেই, যারা সেরা ব্যক্তি নয় বা কখনো হবেও না তাদেরও তাই।

ডক্টর গোল্ডষ্টাকার ছিলেন ইউনিভার্সিটি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক এবং আমার সংস্কৃতের শিক্ষক। তিনি ছিলেন একজন যথার্থ পুরোণো ধরণের পণ্ডিত। নিতান্ত সোজাসুজি, গুরুগম্ভীর এবং সামান্য কারণেই অগ্নিশর্ম্মা। কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল প্রচুর করুণার সুধাভাণ্ডার। তাঁর একখানি পা ছিল খোঁড়া। সেজন্য তিনি একখানা কাঠের পা ব্যবহার করতেন। একবার কথা প্রসঙ্গে বললাম, ট্রামে আসতে অনেক সময় নষ্ট হয়। তিনি বললেন, "ঠিক কথা। তাই আমি সারা পথ হেঁটেই আসি। ট্রামের মত লোক তুলবার জন্য পথে পথে দাঁড়াই না।" তাঁর অনেকগুলি সৎগুণ ছিল। আমার মতে ম্যাকস্‌মুলার সম্পর্কে তাঁর এক বিরূপ মনোভাব ছিল। যদিও ম্যাকস্‌মুলার তাঁরই স্বদেশীয় জার্মান, তবুও তাঁর নাম শুনলে তিনি যেন অস্থিরতা বোধ করতেন।

সংস্কৃত আবহাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত হবার ফলে আমাদের দেশীয় পণ্ডিতদেরই মত তিনি অতি সহজেই রুষ্ট হতেন। একবার আমরা সবাই চারিংক্রসের পথে চলেছি। হঠাৎ অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার নিতান্ত সামান্য বিষয় নিয়ে রেগে আগুন। অধ্যাপক মর্লিও তখন সে দলে ছিলেন। তিনি চুপিচুপি আমায় কাণে-কাণে বললেন, "ব্যানার্জী, তুমি কিছুই মনে করো না। ওঁর এক পায়ের জুতোর হিল্ ত নেই। কাজেই হোঁচট খাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।" তখন আমরা সবাই হেসে ফেললাম।

এই সংস্কৃত অধ্যাপকের ঠিক বিপরীত ছিলেন অধ্যাপক হেনরী

সহজে তিনি রাগ করতেন না বা অসন্তুষ্ট হতেন না। সব সময়েই তাঁর ব্যবহারে ছিল এক শান্ত মধুর ভাব, আর জীবন ও জীবনের কাজের প্রতি এক গভীর প্রীতি। জীবন তাঁর কাছে ছিল সূর্য্যালোকের মতই উপভোগ্য। তা ছাড়া বাড়ীর প্রফুল্ল আবহাওয়া তাকে আরও আকৃষ্ট করেছিল। ভদ্রলোক ছিলেন সদা হাস্যময় এবং সব সময়েই কর্ম্মে রত। সিভিল সার্ভিস কমিশনারদের সঙ্গে আমার যখন বিবাদ চলছে, ভদ্রলোক তখন আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য দিয়েছিলেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সএর নিকট থেকে আমার জন্য সহানুভূতির ব্যবস্থা করেছিলেন, যার ফলে তাঁর "গুড্ ওয়ার্ডস্" সাহিত্য পত্রিকায় এ-বিষয়ে মন্তব্য করে তিনি একখানি প্রবন্ধও প্রকাশ করেন। আমার বিপদের দিনে তিনি সব সময়েই আমাকে আনন্দ দিতে ও উৎসাহিত করতে চেষ্টা করতেন। একবার তিনি বলেছিলেন, "ব্যানার্জী, এত সত্বেও এই যে তুমি সংগ্রাম করছ এজন্য এসমস্ত লোকেরা একদিন তোমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতেও কুণ্ঠিত হবে না"। ইংরেজ মাত্রেই, যেখানেই থাক বা যাই করুক, সংগ্রামীর জন্য তাদের একটা দুর্ব্বলতা থাকে। আর তার চরিত্রের ঐ বৈশিষ্ট সে যখন তার নিজস্ব পরিবেশের বাইরে চলে যায়, তখনো তাকে পরিত্যাগ করে না।

আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে লোকের মনে নানা রকম আজগুবি ধারণা আছে এবং তারা নাকি ভারতীয়দের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না। আমাদের সময়ে না ওরকম কোন ধারণা ছিল, না এরূপ দোষ দেবার মত কোন কারণ ছিল। যেখানেই গেছি আমরা সাদরে আমন্ত্রিত হয়েছি এবং অতিথির যোগ্য আদরযত্ন পেয়েছি। আমরা সংখ্যায় ছিলাম কয়েকজন মাত্র এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরেজদের সঙ্গেই সময়

কাটাতাম। কাজেই আমরা ইংরেজদের দৈনন্দিন জীবন, তাদের আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিবিড়ভাবে জেনে পরস্পরের সুবিধার্থে ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি। আমি দেখেছি, অজ্ঞতাই যত ভ্রান্ত ধারণার মূল। লোককে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারলে অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়ে মানুষের মধ্যে সদ্ভাব গড়ে উঠে। একজন ইংরেজ ভদ্রলোক একবার খোলাখুলিভাবেই আমাকে বলেছিলেন যে, আমি নাকি ইংরেজদের অপেক্ষাও অধিক ইংলিশভাবাপন্ন। সত্যি বলতে দ্বিধা নেই যে, যে সকল ইংরেজ প্রতিষ্ঠানাদি ইংরেজদের জীবন গঠনে ও বৃটিশ জাতির সাংবিধানিক স্বাধীনতার ভিত্তি রচনায় সহায়তা করেছে সে সমূহ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

———

তৃতীয় অধ্যায়

আমার স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন ও চাকরী জীবন

১৮৭১-১৮৭৪

১৮৭১ সালে শেষ পরীক্ষা দেওয়া স্থির করায় আমার দু'বছরের কাজ এক বছরে শেষ করতে হ'ল। তখন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের শিক্ষানবিশদের জন্য পাঠ্য সময় নির্দ্ধারিত ছিল দুবছর। আর সেই সময়ের হিসাব করে পরীক্ষার জন্য যে পাঠ্যক্রম রচিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল ভারতীয় ও ইংলিশ আইন এবং জ্যুরিসপ্রুডেনস, রাজনৈতিক অর্থবিজ্ঞান এবং ভারতীয় ভাষা। কাজ বেশ পরিশ্রমের ছিল। তবে তাতে আমার কোন ক্ষোভ ছিল না। মামলায় জয়ী হওয়ায় এমনিতেই আমার উৎসাহের অন্ত ছিল না। তার উপর বাবার মৃত্যু হওয়ায় যথাসত্বর কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরবার জন্য আমি উৎসুক হয়ে পড়লাম। পঞ্চাশ বছর অতীত হয়েছে। ইতিমধ্যে আমার জীবনে ও দেশের মধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। কিন্তু এখনো আমার সে সব পুরোনো দিনের কথা মনে আছে। তখন আমি কেবল আমার বই আর পরীক্ষার কথা ছাড়া অন্য কিছুর কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। এমন দিনও গেছে যখন বই পড়তে পড়তে রাত কাবার হয়ে ভোর হয়ে গেছে। ভোরের আলো ঘরে উঁকি দিচ্ছে অথচ আমি তখনো বইএর উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছি। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারি নি প্রকৃতির জগতে কি পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। না ঘুমিয়েই আমি পরীক্ষা দিতে গেছি। কিন্তু কোন শ্রম বা ক্লান্তি কোনদিন অনুভব করি নি। বাস্তবিক পক্ষে উৎসাহই তখন আমার শরীরের পরিচালক।

আমার সুহৃদ রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ও আমি এক সঙ্গে ১৮৭১ সালে সিভিল সার্ভিসের শেষ পরীক্ষা পাশ করলাম এবং সে বছর আগষ্ট মাসে এক সঙ্গেই দেশের দিকে রওনা হলাম। যাত্রার পূর্ব্বে আমরা ইউরোপের কয়েকটি দেশ ঘুরে আসবারও পরিকল্পনা স্থির করলাম। তারপর তা প্রায় সামরিক কার্য্যের অনুকরণেই যথারীতি সাঙ্গ করলাম। গেলাম প্যারিস নগরে। সেখান থেকে রাইন নদী ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম। সেণ্ট গোথার্ড-এর পাহাড়ে উঠলাম। সুইজারল্যাণ্ড-এর রমণীয় পর্ব্বতমালা, ঝিল প্রভৃতি দেখলাম। তারপর কয়েকদিন ভেনিস সহরে কাটিয়ে ইতালির ভিতর দিয়ে এসে বৃণ্ডিসি বন্দরে পি. য়্যাণ্ড. ও. জাহাজে আরোহণ করলাম।

পুলিশেরা যে কেবল কোলকাতাতেই বোকার মত কাজ করতে পারে তা' নয়। অন্যদেশেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অথচ এসব দেশ কোলকাতার তুলনায় অনেক বেশী আলোকপ্রাপ্ত। আমরা ভারসাই সহরে থাকতে এ-রকম এক ঘটনা হয়। বুর্বোন্ রাজাদের প্রাচীন রাজধানী ভারসাই নগরীতে প্যারিস্ থেকে একদিনের জন্য গিয়েছিলাম। সন্ধ্যাবেলা আমরা ফিরে আসছি। প্যারিসের ট্রেন ধরবার জন্য ষ্টেশনে গেলাম। তিনজনেই অপেক্ষা করছি কখন ট্রেন আসবে। পৃথিবীর বহু লোক যায় প্রমোদ ভ্রমণে প্যারিসে। ফলে ইউরোপের অনেক সহর অপেক্ষা প্যারিসে বিভিন্ন দেশের লোক অধিক দেখা যায়। কিন্তু ভারসাই-এর পুলিশ সম্ভবত ইতিপূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় দেখে নি। বিশেষভাবে ভারতীয় পোষাকে। আমাদের তিনজনেরই তখন ভারতীয় পোষাক। এরূপ অদ্ভুত ভাষাভাবী তিনজন লোককে দেখে তাদের যেমন হ'ল সন্দেহ তেমনি ভয়। তারা ধরে নিল আমরা নিশ্চয়ই প্রুসিয়ার গুপ্তচর। মাত্র বছর খানেক পূর্ব্বে ফরাসী—প্রুসিয়ার

যুদ্ধ সাঙ্ঘাতিক ভাবে শেষ হয়েছিল। তার উত্তেজনা থেকে তখনো ফরাসীজাতি মুক্ত হয়ে ওঠে নি। কিছুদিন আগে প্যারিসের উপর দিয়ে কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহীদের মধ্যে অনেকের তখনো বিচার চলছে। প্ল্যাটফরমে আমাদের পায়চারি করতে দেখে ফরাসী পুলিসের একজন লোক আমাদের কাছে এসে তাদের সঙ্গে থানায় যেতে বলল। আমরা প্রথমে আপত্তি করলাম। পরে ভাবলাম, বীরত্ব প্রকাশ করার চেয়ে সুবিবেচকের ন্যায় কাজ করাই অধিকতর শ্রেয়। সেই ভেবে আমরা চললাম সে যেখানে আমাদের নিয়ে যেতে চায়। একখানা ঘরে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী নিদ্রা উপভোগ করছিলেন। সেখানেই আমাদের নিয়ে উপস্থিত করা হল। ভদ্রলোক উঠলেন। চোখ ঘষলেন। তারপর আমাদের একদৃষ্টে দেখতে লাগলেন। (সম্ভবত তিনি তেমন প্রকৃতিস্থও ছিলেন না।) আমাদের বললেন ছাড়পত্র দেখাতে। আমরা দেখালাম। কিন্তু তাঁর সন্তোষ হ'ল না। সমস্যা দাঁড়াল ছাড়পত্রে যাদের নাম রয়েছে আমরাই যে সেসব লোক তিনি কি করে বুঝবেন। আমার পকেটে একখানা চিঠি ছিল। সে চিঠি আমার ঠিকানাতে আমাকেই লেখা হয়েছিল। আমি চিঠিখানা এগিয়ে দিলাম। চিঠিতে যে নাম ছিল ছাড়পত্রে দেওয়া নামের সঙ্গে তা মিলে যাচ্ছে। কিন্তু তাতেও সন্দেহের নিরসন হ'ল না। যে লোকটি আমাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাঁর সঙ্গে সে ফরাসী ভাষায় কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলল। আমরা ফরাসী ভাষার বিন্দুবিসর্গও জানতাম না। কি যে বলল কিছুই বুঝতে পারলাম না। শেষমেষ বুঝা গেল, আমরা যে প্রুসিয়ারই গুপ্তচর এ বিষয়ে তিনি সন্তোষজনক প্রমাণ পেয়েছেন।

প্রধানত কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির ফলেই এই হাঙ্গামাটি পোয়াতে হ'ল। সারা জগতে তাই হয়ে থাকে। আমরা জানতাম

না ফরাসী ভাষা। আর সেই পুলিশ কর্ম্মচারীরা ছিল ইংরেজী ভাষাতে অজ্ঞ। আমার বন্ধুরা যৎসামান্য ফরাসী ভাষা শিখেছিলেন। কাজেই দুএক শব্দে সে ভাষায় কথা বলতেও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে পুলিশের লোকটির সন্দেহ আরও বেড়েই গেল। সে ভাবল, আমরা সম্ভবত ভাণ করছি, যদিও যতটুকু দেখাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশী জানি।

কথা কাটাকাটি চলল প্রায় আধ ঘণ্টা। অবশেষে সে আমাদের আদেশ দিল রাস্তা পার হয়ে অন্য একটি ঘরে যেতে। দেখে মনে হল ওটি পুলিশের হাজত। ঘরটির দরজা খুলে আমাদের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। লক্ষ্য করলাম একজন মাতালকে সে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তাকে সেখান থেকে সরিয়ে আমাদের জন্য জায়গা করা হ'ল। তারপর আমাদের সেই ঘরের ভিতর রেখে পুলিশের লোকটি বাহির থেকে তালা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ক্ষুদ্র একখানি ঘর। তাতে একখানা কাঠের তক্তাপোষ পাতা। রাত দশটা থেকে সকাল নয়টা অবধি আমরা সেখানে আবদ্ধ রইলাম। অতি কষ্টে আমরা তিনজনে সেই তক্তাপোষের উপর শয়ন করলাম। বন্ধুরা কথাবার্ত্তা বলেই রাত কাটিয়ে দিলেন। পরে তাঁরা বলেছিলেন তক্তাপোষের ফাঁকে ফাঁকে অনেক পোকা ছিল। এবং সেগুলি সারা রাত উপদ্রব করছিল। আমি কিন্তু ঘুমের কোলেই ঢলে পড়েছিলাম। কাজেই ওসবে আমার কোন নজরই ছিল না। পোকাগুলি যে সারা রাত আমাকে রেহাই দিয়েছিল সে কথা ভাববার কারণ নেই। তবে আমার যা ঘুম তাতে তাদের সব উপদ্রবই বৃথা হয়েছিল।

পরদিন সকালে একজন পুলিশের লোক এসে তালা খুলল। তারপর যে ঘরে পূর্ব্বের রাত্রে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল সেই অফিসে নিয়ে গেল। প্রথম থেকেই আমরা জোর দিতে

লাগলাম যে, এমন কোন একজন লোককে নিয়ে আসা হোক যে ইংরেজী ভাষা বুঝবে এবং ইংরেজী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলতে পারবে। তদনুসারে একজন ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মচারীকে নিয়ে আসা হ'ল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে লোকটি সমস্ত পরিস্থিতিটি বুঝতে পারল এবং আমাদিগকে যে এভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, অপমানিত করা হয়েছে, তজ্জন্য আমাদের নিকট ক্ষমা চাইতে লাগল। সে আমাদের নিয়ে গেল পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছে। তাঁকে বলা হয় প্রিফেক্ট। ইনি একজন সুশিক্ষিত ফরাসী। স্পষ্ট ইংরেজী বলেন। তিনি অধিকতর ভাবে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগলেন। এ সময় কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহীদের বিচার চলছিল। তার ফলে ইউরোপীয়দের মধ্যে উত্তরোত্তর আগ্রহ ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নানা দেশ থেকে লোকেরা এসেছিল বিচার দেখবার উদ্দেশ্যে। উপরোক্ত প্রিফেক্ট ভদ্রতা করে আমাদিগকেও আদালতে প্রবেশের পত্র দিতে আগ্রহী ছিলেন। আমরা ধন্যবাদের সঙ্গে তা' প্রত্যাখ্যান করলাম। আমরা মনে করলাম আমাদের ফ্রান্স দেখা যথেষ্ট হয়েছে। আর প্রয়োজন নেই। অবিলম্বে আমরা ষ্টেশনে ছুটলাম। এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফ্রান্স অপেক্ষা অধিকতর অতিথিপরায়ণ দেশের উদ্দেশে এদেশের সীমা ছেড়ে চলে গেলাম। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় এমন কি ইউরোপীয়সভ্যতার অনেক পীঠস্থানেও পুলিশের মন কি অমূলক সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণায় পূর্ণ থাকে।

আমাদের ইউরোপ ভ্রমণ আমরা বেশ দ্রুতই সম্পন্ন করলাম। দুর্গাপূজা আমাদের জাতীয় উৎসব। সাধারণতঃ সেপ্টেম্বরের শেষ বা অক্টোবরের প্রথমের দিকে দুর্গাপূজা পড়ে। অনেক কাল আমরা দেশের বাইরে। সেজন্য পূজার আগেই কোলকাতা পৌঁছবার মনস্থ করলাম। ভেনিস এক অসাধারণ নগরী। আমার খুবই ভাল লেগেছিল। যেমন তার ঐতিহাসিক দিক্, তেমনি তার

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। তার চলাচলের পথগুলি সমুদ্রেরই শাখা-প্রশাখা। আর তার প্রাসাদগুলি যেন গম্ভীরভাবে তাদেরই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমি যখন ডগেস্ প্রাসাদ, বন্দীশালা, ব্রিজ অব সাইস ইত্যাদি দেখছিলাম তখন ঐতিহাসিক স্মৃতিগুলি একে একে এসে আমার মনে জমা হতে লাগল। যে বন্দীশালা নেপোলিয়ন পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তা' আজ এক অতীত অন্ধকার যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এক সময় এ সমস্ত কারাগারের অন্তরালে কি অকথ্য অত্যাচারই না বন্দীদের উপর সংঘটিত হয়েছে। ভেনিস্ থেকে আমরা গেলাম ব্রিণ্ডিসি। এখান থেকে একখানা ইতালীয় জাহাজে আমরা বোম্বাইতে ফিরে এলাম। এসেই সোজা কোলকাতা রওনা হলাম। আসার পথে আমরা একবার এলাহাবাদে থামলাম। এখানে তখনকার ভারতীয় সমাজের নেতা বাবু নীলকমল মিত্র মহাশয় আমাদের জন্য এক অভ্যর্থনার আয়োজন করেছিলেন। সেই সমাবেশে আমি আমার বন্ধুদের এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করি। আমার মনে হয় জীবনে এটিই আমার সর্বপ্রথম বক্তৃতা। যখন আমরা হাওড়া ষ্টেশনে এলাম তখন দেখি কেশবচন্দ্র সেন এবং আমাদের অন্যান্য বন্ধু আমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য সেখানে উপস্থিত।

আমি সোজা বাড়ী চলে গেলাম। মা'র সঙ্গে দেখা করলাম। বিলেত যাবার আগের দিন মায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তারপর এতদিন পরে মা'কে দেখলাম। মা'র কি রকম পরিবর্ত্তন! হিন্দু বিধবার বৈধব্য এবং কৃচ্ছ্রসাধন তাঁর দেহে ও মনে কি পরিবর্তন না এনে দিয়েছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ও আমি তিনজনেই আমাদের বাড়ীতে রইলাম। কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় "হিন্দু পেট্রিয়ট" নামে একখানা পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনা করতেন। তখনকার দিনে

অন্যান্য হিন্দু পত্র-পত্রিকা অপেক্ষা এই পত্রিকাখানাই খুব খ্যাতি লাভ করেছিল। এই পত্রিকায় প্রচার করা হল যে, আমাদিগকে আমাদের বাড়ীতে ও হিন্দু সমাজে পুনরায় গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আমাকে রেখে আমার সঙ্গে পানভোজন ও বসবাস করা আমার মা ও ভাইদের পক্ষে যে অত্যন্ত এক সাহসিকতার কাজ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আমার বাবার মধ্যে তেমন গোঁড়ামী ছিল না। সমাজের বহু গুরুতর রীতিনীতি, আচার ব্যবহার তিনি অবজ্ঞা করতেন। আমার বিলেত যাওয়া অবশ্য তার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অখাদ্য ভোজন ও সুরাপান তিনি এত খোলাখুলি ভাবে করতেন যে, আমার পিতামহের পক্ষে তা' ছিল এক প্রকার অসহ্য। কিন্তু হিন্দু সমাজ তাতে কিছুই বলত না। বরং চুপ করে সব ভুলেই থাকত।

কিন্তু বিলেত যাওয়া ছিল এক নূতন ধরণের ধর্মবিরোধ। আমাদের সমাজ তখনো তা' সহ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি। তার উপর বিলেত প্রত্যাগতদের ইংরেজী ধরণধারণ দেখে মানুষের মনে আশংকা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমাকে বাড়ীতে পুনরায় গ্রহণ করে আমাদের পরিবারের লোকজন যে সৎসাহস দেখিয়েছিলেন সেজন্য নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছ থেকে তাঁরা ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সমস্ত হিন্দু সমাজের জনসাধারণ তা' অগ্রাহ্য করল। তার ফলে আমাদের পরিবার এক প্রকার সমাজচ্যুতই হয়ে গেল। ব্রাহ্মণসমাজে আমাদের স্থান ছিল সবার উপরে। কিন্তু যারা পূর্বে সমস্ত উৎসবে-পার্বণে আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত এখন তারা সে সমস্ত বন্ধ করে দিল এবং তাদের কোন ব্যাপারেও আমাদের ডাকত না বা নিমন্ত্রণাদি করত না। কোন-কোন লোক ছিল যারা আমার পিতার খ্যাতি ও যশ এবং আমার সাম্প্রতিক সফলতা দেখে আমাদের ঈর্ষা করত। এখন

সুযোগ পেয়ে তারাও তার সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি করল না। এ ধরণের সামাজিক দলাদলি ও বিবাদবিসম্বাদ অনেক ক্ষেত্রেই হয় ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের অপূর্ব সুযোগ। গত দু'এক বছরের মধ্যে এমন কয়েকটি ঘটনা আমার নজরে এসেছে যা' ব্যক্তিগত ঈর্ষাপ্রণোদিত হয়েও ধর্মকে পর্য্যন্ত লাঞ্ছিত করেছে।

আমি যা' বলছি তা' হ'ল প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্বের ইতিহাস। কিন্তু ইতিমধ্যে নীরবে বিরাট পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। এখন সমুদ্র-যাত্রায় বা ইউরোপে গেলে আর জাত যায় না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে এ বিষয়ে কিছুটা আপত্তি থাকলেও অন্যদের মধ্যে এ সমস্ত এখন আর নেই। তারা এখন পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে। যতবার ইচ্ছা সমুদ্র পাড়ি দিতে পারে। তা'তে তাদের জাত যায় না। অবশ্য ব্রাহ্মণেরাও যে অদূর ভবিষ্যতে তাদেরই সঙ্গে পা ফেলে চলবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এ শুধু সময়ের ব্যাপার। বহু লোক আছে যারা অবিরাম বলে যায় প্রাচ্য প্রাচ্যই, তার কোন পরিবর্ত্তন হয় না বা হতে পারে না। হিন্দুসমাজ স্থবির হয়ে গিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে এ সমস্ত কথা অমূলক। ধীরে হলেও এ সমাজও চলছে স্থির পদক্ষেপে। বিশ্বের বিভিন্ন শক্তির প্রভাব তার মধ্যেই পরিস্ফুট। আমি পঞ্চাশ বছর আগে যে হিন্দু দেখেছিলাম আজ আর সে হিন্দু নেই। আর পঞ্চাশ বছর পরে এই সমাজকে চেনাই যাবে না। উন্নতির রথচক্র ঘুরে চলেছে। এগিয়ে চলেছে সম্মুখে। আর যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই তার শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন দিন আসবে যখন তার গতি অবিশ্বাস্যরূপে বৃদ্ধি পাবে। আমাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আমাদের সমাজের উপরেও তার প্রভাব বিস্তার করছে। এবং সাময়িকভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাহত হলেও তার অগ্রগতির যে বিরাম নেই তা' সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে আমি কোলকাতা আসি। কোলকাতার জনসাধারণ সেভেন ট্যাঙ্কস্ গার্ডেনে আমাদের জন্য এক সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেন। কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কিশোরীচাঁদ মিত্র ছিলেন তার উদ্যোক্তা। ভারতীয়দের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম সিভিলিয়ান। তার পরবর্ত্তী দলে ছিলাম আমরা। সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল ছিল বোম্বাই। আমাদের ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী। একই বছরে আমরা তিনজন একসঙ্গে পাশ করাতে ভারতের জনসাধারণের মনেও খুব আশার সঞ্চার হয়। কোলকাতার ভারতীয়দের অঞ্চলের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক এই সমাবেশে যোগ দেন। আর সমস্ত লোকের দৃষ্টি তখন আমাদের উপরে। তখনকার দিনে বাঙ্গালী সমাজের এধরণের বড় বড় জনসমাবেশের স্থান ছিল বেলগাছিয়া গার্ডেন আর সেভেন ট্যাঙ্ক। পাইকপাড়ার রাজপরিবার ও মল্লিকদের পরিবার ছিলেন এ-সমস্ত রম্যোদ্যানের মালিক। অত্যন্ত ধনী ও সমাজের আস্থা-ভাজন নেতা ছিলেন তাঁরা। আজকাল অন্যরাও এগিয়ে এসেছেন এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণও বাঙ্গলার জনসাধারণের চিন্তাধারা ও কাজকর্ম পরিচালনের বিষয়ে তাঁদের যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করেছেন।

ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে মাসেককাল কোলকাতায় ছিলাম। তারপর সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়ে শ্রীহট্ট যাত্রা করলাম। ১৮৭১ সালের ২২শে নভেম্বর আমি সেখানে কার্য্যভার গ্রহণ করি। শ্রীহট্ট তখন বঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৪ সালে বঙ্গদেশ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমস্ত অঞ্চলটি বাংলা ভাষাভাষী হওয়া সত্বেও সে সময় থেকে তা' আসামেরই অংশ হয়ে রয়েছে। কোলকাতা থেকে শ্রীহট্ট পৌঁছতে পুরো এক সপ্তাহ সময় লেগেছিল। আজকাল একদিনেই

পৌঁছান যায়। মিঃ এইচ. সি. সাদারল্যাণ্ড তখন শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেট এবং আমার ঠিক উপরস্থ কর্মচারী। আমি তাঁর কাছে শিক্ষানবিশি করে কাজ শিখব এই ছিল সরকারী ব্যবস্থা। কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোক ছিলেন একজন য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। লোকে তাঁকে পছন্দ করত না। আমি যত পারি তত কাজ তিনি আমায় দিতেন এবং প্রথম প্রথম খুব ভাল ব্যবহারও করতেন। তিনি দেখাতে চাইতেন যে, তিনি আমার এক পৃষ্ঠপোষকের কর্ত্তব্য করে যাচ্ছেন।

আমি সত্বরই সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট্যাল পরীক্ষা পাশ করে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পেলাম। আমার এই কৃতিত্বই আমার চাকরী জীবনের সর্বনাশের কারণ হল; অন্তত পক্ষে তা' বিশেষরূপে দায়ী বলেই আমার ধারণা। মিঃ পোস্‌ফোর্ড নামে আমার একজন সিনিয়র য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি ও আমি একসঙ্গেই ডিপার্টমেণ্ট্যাল পরীক্ষা দিলাম। আমি পাশ করলাম। কিন্তু তিনি পারলেন না। তিনি আমার চেয়ে দু'বছরের সিনিয়র ছিলেন। তিনি ছিলেন ইউরোপীয় আর আমি ভারতীয়। আমার পাশ আর তাঁর ফেল করা নিয়ে শ্রীহট্টের মত একটি ছোট এলাকায় নানা রকম কথাবার্ত্তা হতে লাগল। মিঃ সাদারল্যাণ্ড জাতিতে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হলেও জাত্যভিমান তাঁর কিছু কম ছিল না। তার উপর ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন হওয়ার ফলে তার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমার পাশ করা আর মিঃ পোস্‌ফোর্ডের ফেল করাটা তাঁর মনকে পীড়িত করল। তিনি মনে করলেন, আমাদের দু'জনের এই পার্থক্য রাজার জাতির পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক। বর্ত্তমান নিয়ম আমার জানা নেই। তবে ১৮৭৩ সালে, ডিপার্টমেণ্ট্যাল পরীক্ষা পাশ করলেই পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হ'ত। আমার ক্ষেত্রেও সে নিয়মের অন্যথা হ'ল না।

আমাকে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা দেওয়া হ'ল এবং আমার বেতনও যথারীতি বৃদ্ধি পেল। মিঃ সাদারল্যাণ্ড সরকারের কাছে লিখে মিঃ পোস্‌ফোর্ড্‌কে পুনরায় ডিপার্টমেন্ট্যাল পরীক্ষা দেওয়া থেকে নিষ্কৃতি লাভের ব্যবস্থা করে দিলেন।

এ সময় মিঃ এ্যাণ্ডারসনকে শ্রীহট্টের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হ'ল। তিনি ও আমি বেশ বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে পড়লাম। মিঃ সাদারল্যাণ্ড-এর সঙ্গে তাঁর তেমন সদ্ভাব জমল না। এ সমস্ত স্থানীয় বিবাদ-বিদ্বেষ তখনো আমার কাছে নূতন। আমি নিতান্ত সরলভাবে য়্যাণ্ডারসনদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলাম। এ সমস্ত কারণে ম্যাজিষ্ট্রেট আর আমার মধ্যে ক্রমশ দূরত্ব সৃষ্টি হতে হতে অবশেষে আমাদের বন্ধুতা ও ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পর্কেরও অবসান হয়ে গেল। তখন থেকেই আরম্ভ হ'ল আমার দুর্গতি। এমন একটি দিনও যেত না যেদিন কোন-না-কোন বিষয় নিয়ে আমার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাওয়া হ'ত না। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ইচ্ছা করলেই তাঁর নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীর জীবন দুর্বিসহ করে তুলতে পারেন। যখন থেকে এ সমস্ত গোলযোগ আরম্ভ হ'ল তখন থেকে আমার অবস্থা সম্পূর্ণ অসহ্য না হলেও হয়ে উঠল অত্যন্ত অপ্রীতিকর।

এ অবস্থা চরমে এসে দাঁড়াল এক চুরির মামলাকে কেন্দ্র করে। যুধিষ্ঠির নামে এক ব্যক্তি ছিল এ মামলায় আসামী। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সে একখানি নৌকা চুরি করেছে। প্রথমে এ মামলা ছিল মিঃ পোসফোর্ড-এর বিচারাধীন। পরে তা আমার কাছে পাঠান হয়। আমার হাতে তখন প্রচুর কাজ। এজন্য বহুবার মামলা মুলতুবী করতে হ'ল। ১৮৭২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর আমার সই করা এক নির্দ্দেশে বলা হ'ল যে, ঐ আসামীকে ফেরারীদের তালিকাভুক্ত করতে হবে। যে সব অপরাধী

আত্মগোপন করে এটি তাদেরই তালিকা। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপরাধী কিন্তু আত্মগোপন করে নি। তা' সত্বেও ওরূপ নির্দ্দেশ দেবার কারণ ছিল, বারবার এই পুরাতন মামলার মুলতুবীর জন্য কারণ দর্শানো থেকে অব্যাহতি পাওয়া। দোষারোপের হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে পেশকারেরা অনেক সময় এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। আমার মত একজন অনভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন কর্ম্মচারীর পক্ষে মামলার এই বিলম্বের জন্য পেশকারকেই দোষের ভাগী করা হতে পারত। কারণ এ সমস্ত দপ্তর সংক্রান্ত কাজকর্ম্মে আমাকে পরামর্শ দিয়ে চালিত করা ছিল তারই কর্ত্তব্য। অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে কোন এক সময় উপরোক্ত নির্দ্দেশযুক্ত কাগজখানিও আমি সই করে দিয়েছিলাম। বাস্তবিক পক্ষে কাগজ যখন সই করি তখন তার বিষয়বস্তুর প্রতি আমার দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হয় নি। আর আমিও বুঝতে বা জানতে পারি নি এরূপ নির্দ্দেশের পরিণতি কি হতে পারে। অপর একটা বিষয়ের জবাব দিতে দিতে আমি অন্যমনস্ক ভাবেই এ বিষয়েরও জবাব দিয়ে বসি। আমি যদি জেনে সই করতাম বা তার তাৎপর্য্য বুঝতাম তা' হলে এরকম এক ভুল করা আমার পক্ষে কখনো সম্ভব হত না। কারণ সেক্ষেত্রে আমার তৎক্ষণাৎ মনে পড়ত যে, লোকটির নাম ফেরারীদের তালিকায় রয়েছে, কাজেই তার জন্য কোন জবাব নিষ্প্রয়োজন। ম্যাজিষ্ট্রেট নথি চাইলেন। আমায় নির্দ্দেশ দিলেন সে সম্পর্কে আমার পুরো জবাব দাখিল করতে। আমিও তাই করলাম। তিনি লিখলেন জিলা জজের কাছে। জিলা জজ লিখলেন হাইকোর্টকে। তারপর তা' গেল সরকারের কাছে। অতঃপর ১৮৫০ সালের ৩৯নং আইন অনুসারে সমগ্র ব্যাপারটার অনুসন্ধানের জন্য কমিশন বসে গেল।

এই কমিশনের সদস্য ছিলেন তিনজন। মিঃ এইচ. টি. প্রিন্সেপ,

ইনি পরে হাইকোর্টের জজের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ; মিঃ এইচ. জে. রেণোল্ডস্, যিনি পরে রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য হয়েছিলেন ; এবং মেজর হোলবয়ড্, ইনি ছিলেন আসাম কমিশনে। তিন জনই ইউরোপীয় এবং পদস্থ কর্ম্মচারী। প্রথমে ত আমার বিরুদ্ধে চোদ্দ দফা অভিযোগ ছিল। পরে কেবল দুটি মাত্র অভিযোগ পেশ করা হ'ল। প্রথম অভিযোগ ছিল, আমি যুধিষ্ঠিরকে আত্মগোপনকারী অপরাধী নয় জেনেও অসৎ উদ্দেশ্যে তার নাম ফেরারী আসামীদের তালিকাভুক্ত করেছি। আর দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল, যখন তার কারণ দেখাতে বলা হ'ল আমি তখন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে বলেছি, আমি সে বিষয়ে কিছুই জানতাম না। এর উপর আরও একটি অভিযোগ ছিল যে, আমি উত্তর দেওয়া থেকে অব্যাহতি পাবার অভিপ্রায়ে যুধিষ্ঠিরকে অন্যায়ভাবে মামলায় খালাস দিয়ে মামলার সমাপ্তি ঘটিয়েছি।

আমি আবেদন করলাম, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানী কোলকাতায় হোক। আর আমার পক্ষ সমর্থনের জন্য সরকার থেকে আইনজ্ঞ নিযুক্ত করে দেওয়া হোক। আমার দুটি আবেদনই অগ্রাহ্য হ'ল। মিঃ মনট্রিও আমার পক্ষ সমর্থন করলেন। এবং শুনানীর শেষে ব্যক্তিগতভাবে আমাকেও কিছু বলবার সুযোগ দেওয়া হ'ল। মিঃ ডবল্যু. সি. বোনার্জী তখন আইন ব্যবসার ক্ষেত্রে চরম উন্নতির পথে। আমার বন্ধুদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁকে আমার পক্ষসমর্থনের জন্য নিযুক্ত করতে। কিন্তু তখন সরকারী মহলের যে রকম মনোভাব তা' দেখে কোন বিলেতফেরত ব্যারিষ্টার দিয়ে কোন বিলেতফেরত সিভিলিয়ানের পক্ষ সমর্থন অনুচিত বলে মনে হ'ল।

কমিশনের সদস্যেরা আমাকে দোষী সাব্যস্ত করলেন বটে, কিন্তু কোন মন্তব্য করলেন না। আমি শ্রীহট্ট থেকে কোলকাতা

ফিরে এলাম এবং ভারত সরকারের মন্তব্যটুকু বাদ দিয়ে রিপোর্টের নকল সংগ্রহ করলাম। পরে জেনেছিলাম ভারত সরকার আমাকে অনুগ্রহসূচক মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাতা মঞ্জুর করে আমাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন।

এ ঘটনায় তখন ভারতীয়দের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দেশে আপামর জনসাধারণের মনে এই ধারণা জন্মাল যে, আমি যদি ভারতীয় না হতাম তা' হলে আমাকে এত দুর্গতি ভোগ করতে হ'ত না। আর আমার সর্ব্বপ্রধান অপরাধ ছিল আমি একজন ভারতীয় হয়েও এদেশের সন্তানদের থেকে এত সতর্কভাবে সুরক্ষিত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রাঙ্গনে পদক্ষেপ করে' তার পবিত্রতা নষ্ট করেছি। বহু বৎসর পরে একজন লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর আমাকে বলেছিলেন, আমার বিরুদ্ধে এই যে কাজগুলি হয়েছিল সে সবই ছিল দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত। স্যার এডওয়ার্ড বেকার ছিলেন অপর একজন লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর। তিনি আমাকে ভাল ভাবেই জানতেন। মিঃ গোখলে আমায় জানান মিঃ বেকারের সঙ্গে একবার তাঁর কথাবার্ত্তার সময় মিঃ বেকার তাঁকে বলেন, "সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার মনে একটা দুর্ব্বলতা আছে। আমরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছি। অথচ আমাদের প্রতি তাঁর কোনই আক্রোশ নেই।" মিঃ হিউম ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জনক। ইণ্ডিয়া নামক পত্রিকাতে এক পত্রে তিনি এমন এক ভাষার ব্যবহার করেছিলেন যে, তা' থেকে সমকালীন শিক্ষিত ভারতের মনোভাব সহজেই পরিস্ফুট হয়। (পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।)

এ প্রসঙ্গে এও লক্ষ্য করার বিষয় যে, আমাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করার মাত্র আট বছর পরে, ১৮৮২ সালে আমাকে কোলকাতার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ও জাষ্টিস্ অব পিস্

নিযুক্ত করা হয় এবং দু'বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস ও হাজার টাকা অবধি জরিমানার আদেশ দিয়ে দণ্ড দেবার ক্ষমতাও আমাকে দেওয়া হয়। ভারতীয় আইনে ম্যাজিষ্ট্রেটদের এই ছিল সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা। সুতরাং এ থেকে পরিষ্কার ধারণা করা যায় যে, হয় যাঁরা আমার উপর এরূপ অবাধ ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন তাঁরা আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ ছিল তাতে আমাকে নির্দ্দোষ বলে গণ্য করেছিলেন, অথবা মনে করেছিলেন যে, আট বছর সময়ের মধ্যে আমার সমস্ত পূর্ব্বচরিত্র স্খলিত হয়ে গিয়েছিল এবং আমি সম্পূর্ণ এক নূতন মানুষে পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছিলাম। এ দুয়ের মধ্যে কোনটি অধিকতর গ্রাহ্য তা পাঠকেরাই বিবেচনা করবেন।

আর একটি কথা এখানে বলে রাখি। ১৯১০ সালের পার্ল্যামেণ্টরী ষ্ট্যাট্যুট অনুসারে লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য যে সমস্ত নিয়মাবলী রচিত হয়েছিল তদনুসারে চাকরী থেকে বরখাস্ত হওয়ার দরুণ আমার সদস্য নির্ব্বাচিত হবার যোগ্যতা ছিল না। পরে আমি যখন ইম্পিরিয়্যাল লেজিস্লেটিভ কাউনসিলের সদস্য পদের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করি, প্রথমে বঙ্গীয় সরকার এবং তৎপরে ভারত সরকারও আমার উপরোক্ত অযোগ্যতা অপসারণ করে দিয়েছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

১৮৭৫ থেকে ১৮৮২ সাল

ইতিপূর্বেই বলেছি যে, ভারত সরকার থেকে আমি কমিশনের রিপোর্টের নকল পেয়েছিলাম। আর আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁরা আমাকে চাকরী থেকে পদচ্যুত করবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। আমি ইংলণ্ডে গিয়ে ইণ্ডিয়া অফিসের কর্ত্তৃপক্ষের সামনে আমার বিষয়টি উপস্থিত করার মনস্থ করলাম। ১৮৭৪ সালের মার্চ্চ মাসের শেষাশেষি আমি কোলকাতা থেকে যাত্রা করলাম। আর এপ্রিলের মাঝামাঝি লণ্ডনে উপস্থিত হলাম। গিয়েই ইণ্ডিয়া অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি। কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে বুঝলাম এতে তাঁদের না আছে কোন আগ্রহ না কোন সহানুভূতি। কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে এক পাও নড়তে তাঁরা রাজী ছিলেন না। আর শুনানীর আশা ত সুদূর পরাহত। সেখানে পৌঁছানর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অফিস থেকে আমাকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, আমাকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে অপসারিত করা হয়েছে।

জীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হল। আমি মরণ সংগ্রাম করেছি। পরাজিত হয়েছি। আমার চাকরী-জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। আমার সে দিনের মানসিক অবস্থার স্মৃতি আজও লোপ পায় নি। আমার মনে হতে লাগল এ যেন আমাকে শেষ করে দিয়ে গেল। এ রকম ধাক্কা সামলান আমার পক্ষে কষ্টকর হয়েছিল। কিন্তু আমার শরীর ও মনের উপর এতদিন যে অসহ্য বোঝা চেপে বসেছিল তা' থেকে আমি অব্যাহতি পেলাম। আমার ভাগ্যে যা' আছে তারজন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। এক প্রকার

আশা করেই বসেছিলাম বলা চলে। একদিন মিঃ বি. মুখার্জীর বাড়ী থেকে সান্ধ্য ভোজন সেরে বাড়ী ফিরলাম। আমি থাকতাম কেন্টিস্ সহরে এক যাত্রী নিবাসে। ফিরে দেখি আমার টেবিলের উপর অফিসের চিঠিখানি পড়ে আছে। একটি গ্যাসের বাতির স্তিমিত আলোকে চিঠিখানি পড়লাম। লেখা আছে আমাকে কর্মচ্যুত করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "মৃত্যুর বিভীষিকা দূর হল"। ১৮৭৩ সালের এপ্রিল থেকে ১৮৭৪ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত চলছিল এই সংগ্রাম। প্রথমে মিঃ সাদারল্যাণ্ডের সঙ্গে। তারপর সরকার আর আমার মধ্যে। যখন সংগ্রামের সমাপ্তি হ'ল আর আমি জানতে পারলাম আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, তখন আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমার এই চরম সংকটেও আমি মুহূর্ত্তের জন্য নিরাশ হই নি। কোন কোন সময় আমি একজন লোকের কথা ভাবতাম। সে অনেক অনেক দূরে থেকে আমার ব্যথার ভাগী হ'ত, অথচ আমি জানতাম সে কোন ব্যথার ভারে কখনো মাথা নত করবে না। অতীত থেকে আমি চোখ ফিরিয়ে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' পরিস্থিতির উপযোগী নূতনের রঙ্গীন স্বপ্ন রচনা করতে লাগলাম। আমি এক সময় আইন অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে মিডল টেম্পলে ভর্ত্তি হয়েছিলাম এবং আটটা টারম-এর পাঠ্যক্রমও শেষ করেছিলাম। 'বার-এ কল' হয়ে ব্যারিষ্টার হতে আমার আর মাত্র চারটি 'টারম' বাকী ছিল। আমি ইংলণ্ডে থেকে অবশিষ্ট চার টারম শেষ করে আইন ব্যবসাতে যোগ দেবার সংকল্প করলাম। কিন্তু এখানেও যে আমাকে নিরাশ হতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

যথারীতি আমি 'ডিনার' খেয়ে চললাম। ক্রমে আমার পাঠ সাঙ্গ করে 'কল' হবার সময় হয়ে এল। তখন ১৮৭৫ সালের এপ্রিল কি মে মাস হবে। যথারীতি আমার নামও টাঙ্গিয়ে দেওয়া হ'ল।

এ সময় এক আপত্তি উঠল। কে যে কোথা থেকে এই আপত্তি তুলল আমি জানিও না, খোঁজও আজ পর্যন্ত করি নি। সিভিল সার্ভিস থেকে কর্মচ্যুত হওয়া আমার ব্যারিষ্টার হওয়ার বিরুদ্ধে এক মারাত্মক কারণ বলে গণ্য হল। তার ফলে মিডল টেম্পলের কর্তৃপক্ষীয় 'বেঞ্চারেরা' আমাকে 'বার-এ কল' করতে অস্বীকার করলেন। মিঃ কক্‌রেন্‌ নামে অতি বৃদ্ধ একজন ব্যারিষ্টার প্রায় যুবজনোচিত শক্তি দিয়ে আমার পক্ষে সুপারিশ করলেন। এ ধরণের আদর্শস্থানীয় ব্যক্তির সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সুফল কিছুই হ'ল না। আমার ব্যারিষ্টার হওয়াও আর হ'ল না। সিভিল সার্ভিস থেকে আমি বহিষ্কৃত। আইন ব্যবসার দরজা আমার জন্য বন্ধ। সুতরাং কোন সম্মানজনক উচ্চ অভিলাষ পূর্ণ করবার সমস্ত পথই আমার জন্য হয়ে গেল রুদ্ধ।

চারদিকে কেবল অন্ধকার। বন্ধুরা বললেন, আমার সব শেষ। এ জীবনে আর আমার কোনই আশা নেই। এমন কি, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক মহান কৃষ্ণদাস পালও সেই অভিমত প্রকাশ করতে দ্বিধা করলেন না। আমার নাম পরিবর্ত্তন করে অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করতেও আমার এক বন্ধু সহানুভূতির সঙ্গে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। আইনজীবী হিসাবে কোলকাতা 'বার'-এ তাঁর বেশ খ্যাতি ছিল। বর্ত্তমানে তিনি পরলোকে। আমি শান্তভাবে এ সমস্ত বন্ধুদের পরামর্শ শুনতাম। কোনদিন নিরাশ হতাম না। এমন কি, আমার তরুণ মনের আনন্দোচ্ছ্বাসকেও এ সমস্ত দুর্যোগের ঘন কালমেঘ কোনদিন বিষাদে ভরে দিতে পারে নি। পতনের লৌহকবলে পড়েও আমি আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার এক পরিকল্পনা মনে মনে স্থির করে ফেললাম। আমার বুঝতে কিছুমাত্র বাকী ছিল না যে, আমার সমস্ত দুর্গতির কারণ ছিল, আমি ভারতবাসী। আমার সম্প্রদায়ের

মধ্যে না ছিল শৃঙ্খলা, না কোন সংগঠন, না কোন জনমত। আর সরকারী মহলে তার ক্ষীণ কণ্ঠ ত শোনাই যায় না। আমার যৌবনের সমস্ত উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে আমি অনুভব করতে লাগলাম যে, আমরা পরের গোলাম মাত্র। আমাদের আপন জন্মভূমিতে কাঠকাটা ও জলটানার অতিরিক্ত কোন অধিকার আমাদের নেই। আমার প্রতি এই যে অন্যায় করা হয়েছে তা' শুধুমাত্র আমাদের জাতির চরম দুর্বলতা ও অসহায় অবস্থার কথাই প্রমাণ করে। তবে কি ভবিষ্যতে অন্যেরাও আমারই মত দুর্গতি ভোগ করতে বাধ্য হবে? আমার মনে হল, করাই উচিত, যদি না আমরা সম্প্রদায় হিসাবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে আমাদের স্বার্থরক্ষা করতে ও আমাদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিরোধে সমর্থ হই। আমার জীবনের ধ্বংসস্তূপে দুর্ভাগ্যের অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি সংকল্প করলাম, আমাদের অসহায় জাতিকে বাঁচাতে হবে।

১৮৭৪ সালের এপ্রিল থেকে ১৮৭৫-এর মে মাস পর্যন্ত আমি ইংলণ্ডে ছিলাম। এই তের মাস ধরে আমি হেমপটন্ কোর্টের নিকটেই ইষ্ট মোলেসি নামে এক গ্রামে বাস করতাম। কোথাও না গিয়ে ঘরে বসে পড়াশুনা করতাম যাতে আমার ভবিষ্যতের কাজের জন্য যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারি। প্রাতরাশের পর সকাল দশটা থেকে সুরু করে বিকেল আটটায় সান্ধ্যভোজের সময় পর্য্যন্ত অবিরাম আমার পড়া চলত। যে সমস্ত পুস্তক আমার ভবিষ্যত জীবনের কাজের পক্ষে সহায়ক হবে, আমাকে উদ্দীপিত করে তুলবে, সে সমস্ত পুস্তক মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করতাম। সূচীসহ প্রচুর টিকা-টিপন্নি লিখে নিতাম। আজ অবধি সে সব আমার কাছে রয়েছে। মাঝে মাঝে লণ্ডনে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করতাম আইন ব্যবসায়ের উপযোগিতা অর্জ্জন করতে হলে আমার কি করা উচিত। কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত

না করে বলতে পারি যে, আমি প্রকৃত পক্ষে বইয়ের মধ্যেই ডুবে থেকে পণ্ডিতদের সাহচর্য্য লাভ করে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করতাম।

এই এক বৎসর সময়কে আমি আমার ভবিষ্যৎ কর্ম্মের শ্রমসাধ্য শিক্ষানবিশী ও প্রস্তুতির কাল বলে অভিহিত করতে পারি। আমার জীবনে এ সময়টি অত্যন্ত মূল্যবান। এবং যখন অতীতের দিকে ফিরে তাকাই তখন প্রচুর আনন্দ লাভ করি। একদিন অসীম অন্ধকার আমায় ঘিরে ফেলেছিল। যখন স্থির করলাম আমার অবনত জন্মভূমির সেবায় আমি আত্মনিয়োগ করব তখন এক নব জীবনের স্বপ্নে আমার সমস্ত তিমির কেটে গেল এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে তখন অবিরাম কর্ম্মে লিপ্ত করে রাখত। এক নূতন আশার স্বপ্নে আমি তখন ভেসে চলেছি। এ নূতন আশা আমাকে অধিকার করে বসল। আমি অনুভব করতে লাগলাম, সব কিছু আমার হারিয়ে যায় নি। এখনো করবার মত আমার অনেক কাজ রয়েছে এবং তা' পূর্ব্বের কাজ অপেক্ষা অধিকতর উচ্চস্তরের। মৃত্যু থেকেই ত আসে জীবন, উচ্চতর জীবন এবং মহত্বর পুনরুত্থান। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

১৮৭৫ সালের জুন মাসে দেশে ফিরে আসি। আমার স্ত্রী আর আমি ভিন্ন অন্য সকলেই মনে করল আমার আর কোন আশা নেই। আমার সব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার স্ত্রী আমাকে হাসিমুখে খুব উৎসাহের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। কোন দুঃখ বা মালিন্য তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করলাম না। আজ আমি আমার পরলোকগতা প্রিয়তমা ও প্রশংসনীয়া স্ত্রীর স্মৃতির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আজকাল এদেশে তাঁর মত মহিলাদের অনেকেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা। আমার স্ত্রীর কিন্তু সেরূপ কোন শিক্ষা ছিল না। অথচ সাহস, সহানুভূতি, সাধারণবুদ্ধি ইত্যাদি

গুণে তিনি ছিলেন অনন্যা। আমার ঘোর দুর্দ্দিনেও তিনি কোনদিন হতাশায় বা বিহ্বলতায় ভেঙ্গে পড়েন নি। একদিনের নিমিত্তও অতীতের জন্য আক্ষেপ না করে, সর্ব্বদা সাহসের সঙ্গে ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতেন। তাঁর সেই সাহস ও বিশ্বাস কোনদিন অমূলক বলে প্রমাণিত হয় নি।

১৮৭৫ সালের জুন মাসে কোলকাতায় ফিরে এলাম। কি কাজ করব, কি ভাবে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ও দেশের পক্ষে হিতকর কিছু করব এই ছিল আমার চিন্তার বিষয়। চারদিকেই নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকার। সকল দরজাই তখন আমার জন্য বন্ধ। উকিল, ব্যারিষ্টার হবার পথ নেই এমন কোন শিল্পোদ্যোগ নেই যে সেদিকে আমি চেষ্টা করতে পারি। এ অবস্থাতেও আমি তখনই জনসেবায় অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করলাম। কোলকাতা ফিরে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই মেডিক্যাল কলেজের প্রেক্ষাগৃহে মাদকতা নিবারণী আন্দোলনের প্রবর্ত্তনে এক জনসমাবেশ হয়। বহু লোক তাতে উপস্থিত ছিলেন। সে সময় এই আন্দোলনের প্রতি সবারই খুব উৎসাহ। এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক প্যারীচরণ সরকারের পরিশ্রমের ফল তখন কিছু কিছু লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। আন্দোলনটির প্রাণ ছিল বলতে হবে। কারণ সে সময় তরুণদের অবনতি এমন একটি স্তরে নেমে গিয়েছিল যে, তাতে যথেষ্ট ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গত এক পুরুষ ধরে দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সুরাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তরুণদিগকে তার সংক্রামক প্রভাব থেকে রক্ষা করা হয়েছিল অপরিহার্য্য। এ সমস্ত কারণে এই আন্দোলনে জনসাধারণের প্রচুর সমর্থন ছিল। বহু লোক এ সমস্ত সভায় উপস্থিত থাকতেন। সেদিন সভায় আমাকেও কিছু বলতে বলা হ'ল। কোলকাতার বড় কোন সমাবেশে তৎপূর্বে আমি বিশেষ বক্তৃতা করি নি। আমার বক্তৃতা শ্রোতাদের মনে আমার

সম্বন্ধে ভাল ধারণার সৃষ্টি করে। পরদিন সকালে আমার এক বন্ধু আমায় বলেন, আমার সেই বক্তৃতার ফলে আমিও নাকি খ্যাতনামা বক্তাদের মধ্যে আমারও স্থান করে নিতে সমর্থ হয়েছিলাম।

অনতিপূর্বে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে মেট্রোপোলিটন ইনিষ্টিট্যুশনে ইংরেজীর অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। আমি সে পদ গ্রহণ করি। প্রকাশ্য সভায় আমার বক্তৃতার ফলে আমি ছাত্রসমাজের প্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। বোধ হয় আমার অধ্যাপকের পদ লাভে তাও বিশেষ সাহায্য করেছিল। আমার মাসিক বেতন হ'ল দুই শত টাকা। য়্যাসিসষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট থাকার সময় আমি তার দ্বিগুণের বেশী বেতন পেতাম। তবে আমি যে কিছু করতে পারছি তাতেই আমি সন্তুষ্ট। আমি এই যে সুযোগ পেলাম তার সদ্ব্যবহারে চেষ্টার ক্রুটি করি নি। তরুণদের মধ্যে জনসেবার স্পৃহা জাগিয়ে তুলবার জন্য আমি যথা সম্ভব চেষ্টা করতাম। দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ, মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গের প্রেরণা দিয়ে তাদের উদ্দীপিত করতাম। ক্লাসের মধ্যে অধ্যাপকের কর্তব্য সম্পন্ন করতাম। কিন্তু সব সময়ে মনে হ'ত আরও উচ্চ স্তর থেকে আমায় যেন কেউ ডাকছে। ছাত্রসমিতি গড়ে উঠেছে। আমি তাদের একজন সক্রিয় সদস্যরূপে কাজ করতে থাকি। অন্যান্য কলেজেও তাদের শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে ছাত্রদের উৎসাহিত করতে থাকি।

অল্প দিনের মধ্যেই কোলকাতার ছাত্রদের মধ্যে আমি এক নূতন জীবন সঞ্চার করতে সক্ষম হই। ভারতীয় ঐক্য, ইতিহাস পাঠ, ম্যাজিনীর জীবনী, চৈতন্যদেবের জীবনী, উচ্চ ইংরেজীশিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কোলকাতা, উত্তরপাড়া, খিদিরপুর ও অন্যান্য স্থানে বক্তৃতা দিতে থাকি। বক্তৃতা করবার জন্য সর্বত্রই আমার ডাক পড়তে লাগল। আমিও সম্ভব হলে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে

বিমুখ করতাম না। ক্রমশঃ ছাত্রসমাজ ও আমার মধ্যে এক নিবিড় হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। এবং আমার পক্ষে তা' হ'ল এক অতি মূল্যবান সম্পদ। সে সময় যে সমস্ত ব্যক্তি সভায় নিয়ম মত যোগদান করতেন তাঁদের মধ্যে মিঃ বি. চক্রবর্ত্তী, স্বামী বিবেকানন্দ, মিঃ নন্দকিশোর বোস, মিঃ এস. কে. অগস্তি এবং আরও অনেকে থাকতেন।

১৮৭৯ সালে সিটি কলেজ স্থাপিত হয়। তৎপূর্বে কেশবচন্দ্র সেন কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্ম সমাজে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং তার ফলও হয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সিটি কলেজ ও অন্যান্য অনেক আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। এই বিরোধী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বোস, শিবরাম শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস এবং অপরাপর ব্রাহ্ম নেতা। সিটি কলেজ প্রথমে ছিল সিটিস্কুল। স্কুলটি পরে কলেজে পরিণত হয়। আমাকে সিটি কলেজ স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানান হয়। তাতে আমার আয় বৃদ্ধি হবে এবং অধিকতর সংখ্যায় ছাত্রদের সংসর্গে আসবার আমার সুযোগ হবে ভেবে আমি সানন্দে আমন্ত্রণ গ্রহণ করি।

ছাত্রদের মধ্যে প্রচার কাজ, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে উৎসাহের সঙ্গে রাজনৈতিক কাজ ইত্যাদি কাজের সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক চারঘণ্টা ধরে শিক্ষকতার কাজ আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু শ্রম বা ক্লান্তিতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ ছিল না। কাজের উত্তেজনার মধ্যে আমি চিরদিন আনন্দ অনুভব করেছি। আর উহাই আমার সকল বিপদে, পরাজয়ে ও হতাশায় আমাকে কর্মপ্রেরণা যোগাত। আমি এখন পঁচাত্তর বৎসর বয়স অতিক্রম করেছি। তবু আজও

আমি কাজের মধ্যে এত মত্ত হয়ে যাই যে, অনেক সময় স্বাস্থ্যের খাতিরে আমাকে কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে হয়।

এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এ সময় আমি এক চাকরীর সুযোগ পাই। আমি যদি তা গ্রহণ করতাম তা হলে আমার জীবনের গতির আমূল পরিবর্তন হয়ে যেত। ত্রিপুরার রাজসরকারে ইংলিশ সচিবের পদ গ্রহণের জন্য আমার কাছে অনুরোধ আসে। তার মাসিক বেতন ছিল সাত শত টাকা। কোলকাতায় তখন আমার মাসিক আয় মাত্র তিন শত টাকা। তাতে কোন উন্নতির বা বেতন বৃদ্ধির কিছু সম্ভাবনা ছিল না। তা' সত্ত্বেও মন স্থির করতে আমার বিশেষ সময় লাগল না। আমি ঐ সাত শত টাকা বেতনের চাকরী গ্রহণ করতে অস্বীকার করলাম। আমি নিজেকে নিজে বললাম, ভালই হোক আর মন্দই হোক আমার জীবনের গতি স্থির হয়ে গিয়েছে। একবার যখন লাঙ্গলে হাত দিয়েছি, আর ফিরে তাকান যায় না।

১৮৮০ সালে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিট্যুশন ছেড়ে দিলাম। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা ছিল আমি সিটি কলেজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করি। সিটি কলেজ ছেড়ে দিলে আমার যে আর্থিক ক্ষতি হতে পারত তা' তিনি পূরণ করে দিতে সম্মত ছিলেন। মেট্রোপলিটন ইনিষ্টিট্যুশনে পড়াবার জন্য আমি আরও এক ঘণ্টা অধিক সময় দিতেও প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না। অবশেষে আমি পদত্যাগ পত্র দাখিল করলাম। তিনি তা গ্রহণ করলেন।

তার একমাস পরে ফ্রি চার্চ্চ কলেজের অধ্যক্ষ রবার্টসন তাঁর কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে আমাকে অনুরোধ জানান। আমি সে পদ গ্রহণ করে সে কলেজে ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করি। ইতিমধ্যে আমি যে সমস্ত শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেছিলাম তাতে আমার এত সময় ও মনোযোগ দিতে হ'ত যে, আমি কিছুতেই সময় কুলাতে পারতাম না, এজন্য আমি ফ্রি চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করি।

১৮৮২ সালে আমি প্রেসিডেন্সী ইনিষ্টিট্যুশনের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করি। এখানে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়ান হত। এখানেই রিপন কলেজের সূত্রপাত। আমি যখন তার ভার গ্রহণ করি তখন তার ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র দুই শত। আমি তাকে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে সংগঠিত করি। উহা কোলকাতা বিশ্ববিত্তালয়ের অধীনে প্রথমে ইণ্টারমিডিয়েট, পরে বি. এ. ও বি. এসসি. ডিগ্রী কলেজ এবং শেষে আইন কলেজে উন্নীত হয়। লর্ড রিপনের কার্য্যকাল শেষ হলে তাঁর দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি এই কলেজ তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করি। এখন এই কলেজের নাম রিপন কলেজ। [বর্ত্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ—অনুবাদক]। এটি সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ। তার সঙ্গে একটি স্কুলও রয়েছে। তার মোট ছাত্র সংখ্যা আড়াই হাজার। প্রায় দেড় লাখ টাকা ব্যয়ে তার জন্য একটি নিজস্ব বাড়ীও নির্ম্মাণ করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে আমার যা কিছু স্বত্ব ছিল, তজ্জন্য একটি ট্রাষ্টী গঠন ক'রে আমার সমস্ত স্বত্ব জনসাধারণের কল্যাণে সেই ট্রাষ্টীর হাতে ন্যস্ত করেছি।

১৮৭৫ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর আমি সক্রিয়ভাবে শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত ছিলাম। ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি ইম্পিরিয়্যাল লেজিস্‌লেটিভ কাউনসিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হই। এজন্য তখন প্রায়ই আমাকে দিল্লী ও কোলকাতার মধ্যে যাওয়া আসা করতে হ'ত। সে সময় অধ্যাপনার কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না। আমার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যেমন ছিল বিস্তর তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। পরে আমি

এবিষয়ে আরও বিশদভাবে বলব। তবে আমার শিক্ষকতার কাজ ব্যক্তিগত ভাবে আমার পক্ষে ছিল অত্যন্ত আনন্দ দায়ক।

অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই আমি শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ করি। কারণ আমি ছাত্রদের ভালবাসতাম ও তাদের সঙ্গে থেকে আনন্দ উপভোগ করতাম। স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমি একবার বলেছিলাম, "ছাত্রদের জীবন গঠনের ক্ষেত্রে আমি যদি কিছু দিয়ে থাকি তবে আমি সেজন্য বলতে পারি যে, আমি আজ যা' হয়েছি তাতে তাদের দানও সামান্য নয়। আমি যদি তা'দিগকে সেবাব্রতে উদ্দীপিত করে থাকি, তারাও আমাকে তাদের যৌবনের উচ্ছ্বাস দিয়ে নবজীবনে সঞ্জীবিত করেছে।" তাদের সঙ্গ লাভ করে আমার বয়স যেন কমে গিয়েছে। এবং দিনের পর দিন তাদের সঙ্গে থেকে এই বৃদ্ধ বয়সেও আমি তরুণোপম অনেক গুণ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। ১৮৮৩ সালে আমি যখন কারাগারে, তখন অক্সফোর্ড মিশনের মিঃ ফিলিপ স্মিথ আমাকে দেখতে যান। এখন তিনি পরলোকে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোন্ মন্ত্রবলে আমি ছাত্রসমাজের উপর আমার এই অসামান্য ক্ষমতা বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাঁকে চূড়ান্ত উত্তর দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমি ছাত্রদের ভালবাসি। তাদের আনন্দে আমি আনন্দ উপভোগ করি, তাদের দুঃখে আমি দুঃখ অনুভব করি এবং তারাও তাদের তারুণ্যের নিঃস্বার্থ উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে দেয় তার প্রতিদান।

আমার কার্য্যকে আমি এক পবিত্র কর্ত্তব্য বলে গণ্য করতাম। আমার কার্য্য ছিল বহুমুখী। কিন্তু আমার শিক্ষণ কাজকে আমি এক বিশেষ স্থান দিতাম। অধ্যাপনার জন্য লেকচার রুমে আসবার পূর্ব্বে আমার কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হয়ে নিতাম। কোন কোন সময় লেকচার রুমে এসে আমার উৎসাহ এত বৃদ্ধি

পেত যে, কোন কোন শক্ত বিষয় যা' বাড়ীতে পড়বার সময় আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এখানে তা' জলের মত তরল হয়ে যেত। পরিবেশের এমনি ছিল গুণ। কাজেই ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে দেখা যেত এক সজাগ চৌম্বক শক্তির খেলা। যে শিক্ষকই শিক্ষণ কাজে আনন্দ অনুভব করেছেন তিনি আমার কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারবেন। আমার শিক্ষণ কাজকে আমি চিরদিনই মূল্য দিয়েছি। এবং আমার সমস্ত কাজের অগ্রেই তাকে স্থান দিয়েছি। এই প্রসঙ্গে আমার কোন কোন বক্তৃতাতে আমি যা' বলেছি তার কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি।

"নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় না হলেও রাজনৈতিক কাজকর্ম্ম অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ কর্ম্মের প্রয়োজনের মধ্যে অনেক অধিক স্থায়িত্ব আছে। এজন্য শিক্ষকের সাম্রাজ্য চিরপ্রিয় ও সুদূরপ্রসারী। শিক্ষকেরাই ভবিষ্যতের কর্ত্তা। শিক্ষকের কর্ম্ম অপেক্ষা মহত্তর কর্ম্মের কথা আমি চিন্তাই করতে পারি না। তাঁদের এই পবিত্র কর্ম্মে ঈশ্বরই যেন তাঁদের নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁদের এই দায়িত্বের কথা কয়জন অনুভব করতে পারেন! কয়জন এই পুণ্যব্রত পূর্ণভাবে পালন করতে সক্ষম হন! আজকের শ্রম সার্থক করে কার্য্যকে যদি স্থায়ী করতে হয় তবে ভবিষ্যতে যারা নাগরিক হবে তাদের ভিতর দিয়েই তা' করতে হবে। খৃষ্ট ধর্ম্মের মহান প্রবর্ত্তক একদিন বলেছিলেন, "শিশুদের আসতে দাও আমার কাছে।" যাদের অন্তর ছিল কঠোর, মানুষের উন্নতি অবনতির প্রতি যাদের কোনদিন কোন দৃষ্টি ছিল না, যিশু খৃষ্টের কথা তাদের মনে কোনই রেখা পাত করত না। যারা ছিল শান্ত, নম্র. সরল প্রকৃতির, সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে যাদের মন কঠিন হয়ে যায় নি, তারাই তাঁকে অক্ষরে অক্ষরে বুঝতে পারত। তাঁর কথার অর্থ অনুভব করত।"

আমার শিক্ষণ কার্য্য ও আমার রাজনৈতিক কার্য্যাবলী আমার কাছে পরস্পরের থেকে অভিন্ন বলে বোধ হ'ত। আমার ধারণা হয়েছিল, জনসাধারণের কাজে তরুণদের সুসংগত উৎসাহ ও বাস্তবিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মনোভাবের উপরেই দেশের রাজনৈতিক উন্নতি নির্ভর করবে। এই কাজের বীজ তাদের মনেই রোপন করতে হবে। এ বিষয়ে তাদেরও শিক্ষা নবিশী করে নাগরিক কর্ত্তব্য পালনের দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হবে। ১৮৭৫ সালে সমাজ ছিল রাজনৈতিক বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। ছাত্রসমাজকে একদিকে এরূপ মনোভাব থেকে মুক্ত করতে হবে এবং অপরদিকে তাদের মন যাতে কোনরূপ চরম ভ্রান্তধারণার পঙ্কে নিবদ্ধ না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। গোঁড়ামীর পথ যে কত বিপদ-সঙ্কুল, ইতিহাস তার প্রচুর সাক্ষ্য বহন করে। আমি সঙ্কল্প করলাম, ছাত্রদের মনে এক নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে এক নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করতে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব। আর এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি ছাত্র সমিতিগুলি গঠনে সাহায্য করতে থাকি।

আমার এই কার্য্যে আমার সহযোগী ছিলেন মিঃ আনন্দমোহন বসু। আমার কিছুদিন আগেই আনন্দমোহন বিলেত থেকে ফিরে এসে কোলকাতায় এক ছাত্রসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজে ছিলেন এই সমিতির সভাপতি। তিনি ছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। তাঁর জন্ম হয়েছিল ময়মনসিংহ জিলায়। আমার এক বছর আগে তিনি মনমনসিংহ জিলা স্কুল থেকে ডিষ্টিংশন নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীদের তালিকায় তিনি অধিকার করেছিলেন ষষ্ঠ স্থান। ইণ্টারমিডিয়েট, বি. এ., ও এম. এ. পরীক্ষার প্রত্যেকটিতে পরপর প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি এক অনন্য কীর্ত্তি স্থাপন

করেন এবং বিশ্ববিত্তালয়ের নীল ফিতে (ব্লু-রিবণ) লাভের গৌরব অর্জ্জন করেন। তারপর তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেছিলেন। অতঃপর তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিত্তালয়ে পড়তে যান। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় র‍্যাঙ্গলার। সেখানে পরীক্ষায় তিনি কৃতী ছাত্রদের তালিকায় অষ্টাদশ স্থান লাভে সমর্থ হন। তাঁর বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ। লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান য়্যাসোশিয়েশনের এক সভায় তিনি একবার বক্তৃতা করেন। মিঃ কচেট এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন। আনন্দমোহনের বক্তৃতা শুনার পর তাঁর বাগ্মিতার ভূয়সী প্রশংসা করে' তিনি বলেছিলেন, "সমস্ত হাউস অব কমনস্-এ তাঁর মত শক্তিধর বক্তা ছয়জনও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে।" এরূপ একজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে তাঁর দেশবাসী প্রচুর আশা করেছিল। আনন্দমোহনও জনসেবার কার্য্যে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন যা' তাঁর মত মহৎ জীবিকার্জনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল বিরল। আইন ব্যবসার ক্ষেত্রে তিনি শীর্ষের দিকেই এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকত দেশসেবার কার্য্যে। নিজ ব্যবসা ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্য এই দু'দিকে মন দেওয়ার ফলে তাঁর ব্যবসার কাজের যে প্রায়ই ক্ষতি হত সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারত সভা (ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন)

১৮৭৫ সালে ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে ছাত্র সংগঠন ও ছাত্রদের মধ্যে নূতন শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আমি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মতামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে ও জনসেবার কাজে মধ্যবিত্ত সমাজকেও উদ্দীপিত করবার জন্য একটি সমিতি গঠনের কথা চিন্তা করতে থাকি। অবশ্য তখন বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি ছিল। তার সম্পাদক ও কর্ণধার ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল। প্রকৃত পক্ষে এ সমিতি ছিল জমিদার শ্রেণীর। কোন সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন করা বা জনগণের কাছে আবেদন করে' কোন জনমত গঠন করা ইত্যাদি কাজ এই সমিতির কার্য্য তালিকার মধ্যে ছিল না। সুতরাং আরও গণতান্ত্রিক ভিত্তি-মূলক আর একটি রাজনৈতিক সমিতির তখন বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবর্গও এ সত্যটির যাথার্থ্য অনুভব করছিলেন। এই সমিতির উদ্বোধনী সভায় তাঁদের মধ্য থেকে মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ, বাবু কৃষ্ণদাস পাল এবং আরও অনেকে উপস্থিত থেকে এই নূতন সমিতি গঠনে উৎসাহ দান করেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে একথাও আমি স্বীকার করছি যে, নূতন য়্যাসোসিয়েশন ও বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন এ দুটির মধ্যে বরাবরই অত্যন্ত সৎভাব ছিল আর বঙ্গদেশের তথা ভারতের এক শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক নেতা কৃষ্ণদাস পালের চেষ্টা ও আদর্শের ফলেই তা' সম্ভব হয়েছিল। মিঃ আনন্দমোহন বসু এবং আমি যুক্ত ভাবেই এ কাজে অগ্রণী ছিলাম। যদিও তাঁর তুলনায় আমার সময় ছিল অধিক তবুও প্রায়ই আমরা উভয়ে আলাপ আলোচনা করেই কাজ করতাম।

আমাদের এই প্রচেষ্টায় আরও একজন অত্যন্ত আগ্রহশীল সহযোগী ছিলেন। খুব অল্প লোকেই তাঁকে জানত। আজও অবশ্য বেশী লোক তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। বিস্মৃতির এই অন্ধকার থেকে তাঁকে উদ্ধার করা আমাদের সাধ্যমত একান্ত কর্তব্য। তাঁর নাম ছিল দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী। শিক্ষক হিসাবেই তাঁর প্রথম কর্মজীবন আরম্ভ। অতি অল্প বয়সে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের দুই দলের মধ্যে যখন বিবাদ চলছিল তখন তিনি বিরোধী পক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠনে সহায়তা করেন। সত্যের প্রতি তাঁর ছিল অসাধারণ অনুরাগ। একবার সত্য বলে যা' গ্রহণ করতেন, মনপ্রাণ দিয়ে তার সহায়তা করতেন। আমাদের এই নূতন সমিতিতে তাঁর সহযোগ ছিল অত্যধিক মূল্যবান। যতদিন পর্যন্ত তাঁর স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য ছিল ততদিন তিনি এই সমিতির কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। আজ তিনি ইহলোকে নেই। তবুও যখন তাঁর কথা স্মরণ হয় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর বন্ধুগণ অভিভূত হয়ে পড়েন।

প্রায় এক বছর যাবৎ প্রস্তুতির পর ১৮৭৬ সালের ২৬শে জুলাই তারিখে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতির নাম কি হবে সে নিয়ে আমরা বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করতে থাকি। এক সময় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকাকালে জাষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র মধ্যবিত্তদের মতামত প্রকাশের উপযোগী এই ধরণের একটি সমিতি গঠন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন উপযুক্ত জনসমর্থনের অভাবে তাঁদের সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। কিন্তু তাঁদের সমিতির নাম বেঙ্গল এ্যাসোসিয়েশন রাখবার মনস্থ করেছিলেন। আমাদের মনে হ'ল এরূপ নাম রাখলে আমাদের কাজের পরিসর অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ হয়ে যাবে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের এই সমিতি এক সর্বভারতীয় আন্দোলনের

কেন্দ্র হোক। ম্যাজিনী থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে বঙ্গদেশের ভারতীয় নেতৃবর্গের মনে সমগ্র ভারতকে একই রাজনৈতিক পতাকার নীচে এনে এক সংযুক্ত ভারত গঠনের ইচ্ছা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল: এ সমস্ত কারণে আমরা এই নূতন সমিতির নামকরণ করি ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (ভারত সভা)।

এই সমিতির উদ্বোধনী সভার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা এখানে বলে রাখা উচিত মনে করি। এই সমিতি গঠিত হবার কয়েক মাস পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান লীগ নামে আর একটি সমিতি গঠিত হয়েছিল। সে যুগের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী নেতৃবর্গের মধ্যে রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জীর পরেই ছিল বাবু কালিচরণ ব্যানার্জীর স্থান। ইনি পরবর্ত্তী সময়ে এই ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির পদেও মনোনীত হন। কিন্তু এই সমিতির উদ্বোধনী সভার সময় এই সমিতি গঠনে তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল। তাঁর আপত্তির প্রধান কারণ ছিল, যেহেতু কয়েকমাস পূর্ব্বে "ইণ্ডিয়ান লীগ" নামে অন্য এক সমিতি গঠিত হয়েছে সেহেতু এই সমিতি গঠন অনাবশ্যক। তাঁর যুক্তি খণ্ডন করে আমি বক্তৃতা করার পর সভা এই সমিতি গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করে এবং গ্রহণ করে।

"ইণ্ডিয়ান লীগ" অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সম্পাদন করেছিল। অমৃত বাজার পত্রিকার বাবু শিশিরকুমার ঘোষ, রায় রায়তের ডক্টর শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন ঐ সমিতির উদ্যোক্তা। ঐ সমিতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তার নেতৃস্থানীয় অনেকেই ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে এসে যোগদান করেন।

আমি যখন ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের উদ্বোধনী সভায় যোগ দিচ্ছিলাম তখন আমার মাথার উপর ছিল বিরাট এক শোকের ছায়া। সেই দিনেই সকাল ১১টার সময় আমার পুত্রের মৃত্যু হয়। এই সভার কাজ যে নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হবে না এবং এই সমিতি গঠনের প্রস্তাবে যে

বিশেষ আপত্তি উঠবে সে বিষয়ে আমার কিছু কিছু ধারণা পূর্ব্বেই হয়েছিল। শোকার্ত্ত হওয়া সত্ত্বেও সে জন্য আমি সভায় যোগ দেওয়ার সঙ্কল্প করি। আমার স্ত্রীও তাতে তাঁর পূর্ণ সমর্থন দেন। আমি যে শোকার্ত্ত সে কথা সভায় কেহই জানতে পারলেন না। পর দিনই এ সংবাদ সকলের গোচরীভূত হয়। শোকার্ত্ত অবস্থায় জনসেবার কাজে যোগদানের দৃষ্টান্ত আমার জীবনে যে কেবল এই একটি তা' নয়। ১৯১১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর আমার স্ত্রীবিয়োগ হওয়া সত্ত্বেও তার মাত্র তিন দিন পরে ২৬শে তারিখে আমি সে বছরের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করি। এই অধিবেশনে পণ্ডিত বিষেণ নারায়ণ ধরকে সভাপতি মনোনীত করবার প্রস্তাব উঠলে তার বিরোধিতা করবার ভার যে-ব্যক্তির উপর ন্যস্ত ছিল, তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাকেই সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে হয় যদিও বিষেণ নারায়ণের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছুই জানা ছিল না।

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন গঠনের ফলে এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটল। অনতিকাল পরে মধ্যবিত্ত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল এদিকে। বঙ্গদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের কর্ম্মকেন্দ্র হয়ে উঠল এই সমিতি। মিঃ আনন্দমোহন বসু সম্পাদক মনোনীত হলেন। খ্যাতিমান বাঙ্গালী লেখক বাবু অক্ষয়কুমার সরকারকে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করা হ'ল। আমি নিজে সমিতির কোন পদ গ্রহণ করলাম না। তবে তার সক্রিয় সদস্যদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। সরকারী কার্য্য থেকে বিতাড়িত হওয়ার দরুণ আমি নিজে সাধারণত পশ্চাতেই থাকতে চেষ্টা করতাম, তবে এ্যাসোসিয়েশনের জন্য পূর্ণোদ্যমে কাজ করতাম। এর চেয়ে আনন্দের কাজ তখন আমার আর কিছুই ছিল না। নিতান্ত অল্প বয়স থেকে যে সমস্ত আদর্শ আমার অন্তরে দানা বেঁধেছিল এই সমিতির সাহায্যে সেগুলি সফল

করে তুলতে আমি তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার এ সকল আদর্শের মধ্যে ছিল: (১) দেশে এক শক্তিশালী জনমত সৃষ্টি করা, (২) ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়কে একই রাজনৈতিক আশা ও স্বার্থের ভিত্তিতে একত্র সম্মিলিত করা, (৩) হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন বিস্তৃত করার চেষ্টা করা, এবং সর্ব্বশেষ (৪) তদানীন্তন বিরাট গণআন্দোলনের সঙ্গে আমাদের জনসাধারণকে যুক্ত করা। আমি এ সমস্ত আদর্শের জন্যই কাজ করতাম। অন্যেরাও এজন্য কাজ করতেন। কারণ প্রত্যেক চিন্তাশীল ও স্বদেশপ্রেমী ভারতীয়ের অর্থসম্পত্তি সমস্ত কিছুর মূলেই ছিল এসব। আজ পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক জীবনের পর আমি এই ভেবে আনন্দ পাই যে, আমাদের আদর্শগুলি সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত না হয়ে থাকলেও সেগুলি সফল হতে আর বিশেষ বিলম্বও নেই। আর ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনও এ সমস্ত আদর্শের অনুসরণে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল. এগুলি সবই অতীতের শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ব্যক্তিদের যত্ন ও চেষ্টার স্বাভাবিক পরিণতি। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে আমাদের দেশের মহৎ অন্তঃকরণের নিবিড় সংযোগের ফলে যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল এ সমস্ত তারই ফল।

ম্যাজিনার লেখা সে সময়ে আমার মনের উপর এক গভীর রেখাপাত করেছিল। তাঁর পবিত্র দেশপ্রেম, তাঁর আদর্শের উচ্চতা, তাঁর অন্তরনিঃসৃত মুখর ভাষার মাধ্যমে সর্ব্বগ্রাসী বিশ্বপ্রেমের প্রকাশ আমার অন্তরে যেরূপ সাড়া জাগিয়েছিল, তৎপূর্ব্বে আর কিছুই তেমন করে নি। ভারতীয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বৈপ্লবিক শিক্ষাকে আমি উপযুক্ত মনে করতাম না। সেজন্য তা' গ্রহণও করতাম না। আমি মনে করতাম দেশের সুনিয়ন্ত্রিত ও শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির পক্ষে সেই বৈপ্লবিক শিক্ষা সাজ্ঘাতিকরূপে ক্ষতিকারক হবে। কিন্তু তাঁর আদর্শ জীবনবাদ, তাঁর অসামান্য স্বদেশপ্রেম, তাঁর পরহিতব্রত, তাঁর

আত্মত্যাগ, মানবত্বার স্বার্থে তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক একাগ্রতা ইত্যাদি মহান আদর্শগুলি ছাত্রদের মধ্যে উদ্দীপিত করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নৈতিক শক্তির অবতার ছিলেন ম্যাজিনী। ইতালীয় ঐক্যের প্রচারক ছিলেন ম্যাজিনী। মানবজাতির পরম বন্ধু ছিলেন ম্যাজিনী, এই মহাত্মাকেই আমি বঙ্গদেশের যুবসমাজের সম্মুখে অনবরত তুলে ধরতাম। ম্যাজিনীর কামনা ছিল ইতালীর একতা। আমাদের বাসনা ছিল ভারতের একতা। তরুণদের ভিতর দিয়েই ম্যাজিনী কাজ করতেন। আমিও চেয়েছিলাম তরুণবঙ্গ তার আত্মশক্তি অনুভব করে আপনাদিগকে দেশের মুক্তির জন্য কাজ করবার উপযোগী করে তুলুক। তবে বৈধ উপায়ে যেন তারা একাজে অগ্রসর হয়। ম্যাজিনীর সম্পর্কে আমি বক্তৃতা করতাম। তাঁর আত্মত্যাগ ও একাগ্রতা অনুসরণ করে রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে সকলকে উৎসাহ দিতাম। সঙ্গে-সঙ্গে এও বলে দিতাম যেন তাঁর প্রদর্শিত রাজনৈতিক বিপ্লবের পথ সকলে পরিহার করে। যে সব লোক ইংরেজী ভাষা বুঝতে পারত না তাদের সুবিধার্থে আমি বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত ও বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নামে দুজন খ্যাতনামা লেখককে আমার বক্তৃতা অনুসারে ম্যাজিনীর জীবন ও কর্মকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করতে সম্মত করি। এভাবে অল্পদিনের মধ্যেই আমি ম্যাজিনীকে বঙ্গদেশের যুবসমাজে অত্যন্ত প্রিয় করে তুলতে সক্ষম হই। তাতে কোনই প্রতিক্রিয়া কখনো দেখা যায় নি। কারণ যা-যা থাকলে বৈপ্লবিকশক্তি স্ফুরিত হয় সে সকলের কিছুই আমার বক্তৃতার মধ্যে থাকত না। কালের গতিচক্রকে অবহেলা করে সরকারই এ সমস্ত সৃষ্টি করেছিল। যে দেশভক্তগণ দেশের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য পূর্ণোদ্যমে কাজ করেছিলেন, সে সমস্ত তথাকথিত উত্তেজনাকারী কোন দিন বিপ্লববাদের বীজ রোপণের চেষ্টা করেন নি।

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হওয়ার মাত্র এক বছরের মধ্যেই ঈপ্সিত মহান আদর্শের পথে এগিয়ে যাবার তার প্রথম সুযোগ উপস্থিত হ'ল। সচরাচর সর্বত্রই দেখা যায় বিরাট গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টির জন্য দায়ী তাদের স্ব-স্ব প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গ। সে-সব সরকার যে এই অভিযোগ অস্বীকার করবে বা এজন্য তাদের প্রাপ্য সম্মান প্রত্যাখ্যান করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে বস্তুত তারাই প্রকৃত বীজ বপন করে। আর সেই বীজ যথাসময়ে অঙ্কুরিত হয়ে গণআন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সফল করে এবং মানবের মনসিংহাসন অধিকার করে। মারকুইস অব্ সেলিসবারি তখন সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া। তাঁরই এক নির্দ্দেশে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার উচ্চতম বয়সের সীমা একুশ বছর থেকে কমিয়ে হঠাৎ উনিশ বছর করা হয়। এই ঘটনার ফলে ভারতের সর্বত্রই অসন্তোষ দেখা দেয়। এ পরীক্ষায় সমস্ত ভারতীয় প্রতিযোগীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যেই যে তা' করা হয়েছে একথা বুঝতে আর কারও বাকী থাকে না। আর তাই নিয়ে এক জাতীয়আন্দোলন আরম্ভ করবার ভার নিল ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। ১৮৭৭ সালের ১৪শে মার্চ্চ টাউন হলে এক বিরাট জনসভা হ'ল। সমগ্র বঙ্গদেশের প্রতিনিধি হিসাবে মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এ সভায় সভাপতিত্ব করলেন। কেবল যে কোলকাতার নেতৃবর্গই এ সভায় উপস্থিত ছিলেন তা' নয়, এ প্রদেশের দূরদূর অঞ্চল থেকেও প্রতিনিধিরা এসে তাতে যোগ দিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন যিনি জীবনে কখনো কোন রাজনৈতিক সভায় অংশ গ্রহণ করতেন না তিনিও এক্ষেত্রে এ সভায় সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাব করতে সম্মত হলেন। জনমত প্রদর্শন উপলক্ষে এত বিরাট জনসভা কোলকাতায় এই বোধ হয় প্রথম। তারপর থেকে সেরূপ এবং তদপেক্ষা বৃহৎ সভাও ভারতের প্রায় সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হ'তে

থাকে। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য উচ্চতম বয়স বর্দ্ধিত করা এবং একই সময়ে একই সঙ্গে বিলাতে ও ভারতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ব্যবস্থা করাই ছিল আন্দোলনের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, আর আন্দোলনটি ছিল সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। কিন্তু এই সিভিল সার্ভিস আন্দোলনের পশ্চাতে আরও একটি মূলগত উদ্দেশ্য ছিল। আর তা' হ'ল বাস্তবিক পক্ষে ভারতীয়দের মধ্যে সংহতি ও ঐক্য সাধনের জন্য উৎসাহ উদ্দীপনাকে জাগ্রত করা। ইতিপূর্বে ভারতের জনগণ কোনদিন একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে একই সুরে তাদের কোন দাবীদাওয়া উত্থাপন করে নি। এবার স্থির হ'ল ভারতের প্রদেশে-প্রদেশে আবেদন করা হ'বে যাতে দেশের সর্বসাধারণের দলগত স্বার্থ ও দুঃখদুর্দ্দশার কথা ঐক্যের ভিতর দিয়ে একসঙ্গে একই মঞ্চ থেকে এক সুরে উপস্থিত করার ব্যবস্থা হয়। এই আদর্শের মধ্যে প্রেরণা ছিল এবং আমার কাছে তা বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল।

বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে এ উদ্দেশ্যে কাজ করবার জন্য আমাকে বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হ'ল। আমি নিজেও তাই চেয়ে নিয়েছিলাম বলা চলে কারণ এই পরিকল্পনা ছিল আমারই। এবং তাকে রূপ দেবার দায়িত্বও তাই আমিই গ্রহণ করলাম। আমি এবার চাঁদা সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলাম এবং মনপ্রাণ দিয়ে কাজে লেগে গেলাম। তখনো আমি মেট্রোপলিটন ইনিষ্টিট্যুশনে অধ্যাপনা করি। গ্রীষ্মের অবকাশের সুযোগে ১৮৭৭ সালের ২৬শে মে তারিখে এ উদ্দেশ্যে আমি উত্তর ভারতে যাত্রা করলাম। সঙ্গে চললেন সে সময়ের বাংলাভাষার একজন খ্যাতনামা সুবক্তা ও আমাদের কমিটির সদস্য বাবু নগেন্দ্রনাথ চাটার্জী। প্রচণ্ড গরম। পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে এলাহাবাদের বাবু নীলকমল মিত্র পূর্বেই আমাকে এই সাঙ্ঘাতিক বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আপদই হোক আর নিরাপত্তাই হোক একবার যখন মন স্থির করে' ফেলেছি তখন

আর ফেরা যায় না। আমরা দুজনে সোজা আগ্রায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমার বন্ধু পরলোকগত বাবু অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জী তখন সেখানে ছিলেন সাবজজের পদে অধিষ্ঠিত।

অবিনাশচন্দ্র ও আমি ছিলাম খেলার সাথী। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি তিনি খুব কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছিলেন। বি. এল. ডিগ্রী পাওয়ার পর তিনি উত্তর প্রদেশেই কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। উদ্দেশ্য ওকালতি। কিন্তু অনতিকালপরে তিনি ওকালতি থেকে জজিয়তিকে শ্রেয় মনে করেন। প্রথমজীবনে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের একজন গোঁড়া অনুগামী। কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতায় কোলকাতা তখন তোলপাড়। কিন্তু ১৮৭৭ সালে আমি যখন তাঁকে আগ্রায় দেখি তখন তিনি তাঁর পুরাতন ধর্মেই ফিরে গেছেন। তবে ব্রাহ্মই হোন আর হিন্দুই হোন, তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত চমৎকার মানুষ এবং অমায়িকপ্রকৃতির সঙ্গী। অতি অল্প বয়সেই মৃত্যু তাঁর উজ্জ্বল বিচারকজীবনে যবনিকা টেনে দেয়। যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁরা আজ অবধি তাঁর কথা ভুলতে পারেন নি। ডক্টর সতীশচন্দ্র ব্যানার্জী ছিলেন উপযুক্ত পিতার অধিকতর উপযুক্ত সন্তান। এই সন্তানের অকাল মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও উত্তরপ্রদেশ আজও শোকসন্তপ্ত। অবিনাশচন্দ্র সতীশচন্দ্রের পিতারূপেও কম খ্যাতিবান ছিলেন না। বহুকাল পরে আমাদের দুজনের দেখা। পুরোনো দিনের কত স্মৃতিই তখন আমাদের মনে পড়তে থাকে। আমার ভবিষ্যতের সমস্ত কর্মপন্থাও আমি সেখানে বসেই স্থির করলাম।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, সে-যুগে সরকারী কর্মচারীদের রাজনৈতিক সভায় যোগ দিতে ও রাজনৈতিক কার্য্যাদিতে অংশ গ্রহণ করতে কোন আপত্তি ছিল না। এ বিষয় নিয়ে বাঁকীপুরে যখন সভা হয় তখন কুচবিহারের তরুণ মহারাজা ও মেজর হিদায়াৎ খাঁ বাহাদুর, সি. এস. আই. একটি প্রস্তাবও সমর্থন করেন। মহারাজা তখন

ছিলেন সরকারী অভিভাবকের অধীন। এবং খাঁ বাহাদুর একজন উচ্চপদস্থ সেনাবিভাগীয় কর্মচারী। তবুও রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগদানে বা তাতে অংশ গ্রহণে তাঁদের কোন বাধা ছিল না। কিন্তু দেশে জনজীবনের অগ্রগতি এবং জনজাগৃতির সঙ্গে-সঙ্গে সরকারী মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটেছে সরকারের সাম্প্রতিক নির্দ্দেশের ফলে সরকারী উচ্চতর কর্মচারীরা রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যদিও বা যোগ দেয় কিন্তু তাতে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। বাস্তবিক পক্ষে তারা আজকাল সভাতেও আসে না। কারণ সরকারের প্রচারিত নির্দ্দেশ যাই হোক না কেন, সরকারী মনোবৃত্তি পরিপন্থী হয়ে জনসাধারণের সমস্ত প্রচেষ্টাকে অবিশ্বাস না করলেও সব সময়েই সন্দেহের চোখে দেখে থাকে। তাঁদের অধস্তন কর্মচারীরাও এজন্য কর্তৃপক্ষের দিকে চেয়েই নিজ-নিজ কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ করে। আমি বিশেষ বিবেচনা করেই "জনসাধারণের সমস্ত প্রচেষ্টা" কথাগুলি ব্যবহার করছি। কারণ কে না জানে যে, রামকৃষ্ণ মিশন একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে কোথাও রাজনীতির গন্ধমাত্র নেই। অথচ তার প্রতিও সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের সন্দেহের অন্ত নেই। রিফরম বা সংস্কারের পর থেকে কর্তৃপক্ষ অবশ্য এ সমস্ত রাজনৈতিক অভিমত ও জনমত প্রদর্শন ইত্যাদিকে কিছু-কিছু বিচারবিবেচনা করে দেখবার চেষ্টা করেছেন।

কোলকাতায় একখানা সিভিল সার্ভিস স্মারকলিপি রচিত হয়েছিল। আগ্রা যাবার সময় তার একখানি নকল আমি আমার সঙ্গে করে নিয়েছিলাম। সেখানে তা' উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়ে তাকে লিথোগ্রাফের সাহায্যে ছাপান হয়। স্থির হয়, আমি অবিলম্বে পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে গিয়ে প্রথম জনসভা আহ্বান করার ব্যবস্থা করব। সকলের মনে হল, উত্তর ভারতের অন্য কোন স্থানে সভা করার পরিবর্ত্তে লাহোরে সভা করলেই তা' অধিকতর কার্য্যকরী

ও ফলপ্রসূ হবে। আমি লাহোরে গেলাম। সেখানে আমার দেশবাসীগণ হিন্দু, মুসলমান, শিখ, নির্ব্বিশেষে সকলে সাদরে আমাকে গ্রহণ করলেন। তাঁদের যেরূপ সৌহার্দ ও প্রীতির ভাব ছিল তা' আমার চিন্তার অতীত। তা' থেকে বোঝা গেল সকলের নিমিত্ত একই প্রকার শাসন পদ্ধতি ও একই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থার ফলে আমাদের কাম্য আদর্শ লাভের উপযোগী একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে একযোগে কাজ করতে পারলে আমাদের সর্ব্বসাধারণের ও দেশের আশাআকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা সহজ হবে। যথাসময়ে লাহোরে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হ'ল। সেখানে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সম্পর্কে কোলকাতার সভায় যে সমস্ত প্রস্তাব ও যে-স্মারকলিপি গৃহীত হয়েছিল, সে-সমস্ত গ্রহণ করা হ'ল। এ সভায় লাহোরের ভারতীয় প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক উপস্থিত ছিলেন। অপর এক জনসভায় ভারতীয়দের ঐক্যের উপর আমি এক বক্তৃতা করি এবং লাহোর ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি গঠনে সহায়তা করি। কোলকাতার ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের নিয়মাবলীর অনুকরণে লাহোর ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের নিয়মাবলীও রচিত হ'ল এবং কোলকাতার এ্যাসোসিয়েশনের শাখা হিসাবে তার সঙ্গে এ সমিতি যুক্ত হ'ল। ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের একযোগে কাজ করার উপযুক্ত পাঞ্জাবের এটিই সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ-প্রতিষ্ঠান এ-প্রদেশের জনসাধারণের কাজে অনেক মূল্যবান অংশ গ্রহণ করেছে।

পাঞ্জাবে থাকতে-থাকতে বহু লোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন ইহজগতে নেই। কিন্তু তাঁদের স্মৃতি আমার জীবনে এখনো এক অমূল্য সম্পদ। সর্দার দয়াল সিং মাজিথিয়ার সঙ্গে সেখানেই আমার প্রথম পরিচয়। আমাদের এই পরিচয় কিছুকালের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

তাঁর মত একজন মহৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমি কমই দেখেছি। তাঁর মধ্যে সাধারণত একটা অভিজাতসুলভ গাম্ভীর্য্য থাকত। এজন্য তাঁকে সহজে বোঝা বা তাঁর হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করা যেত না। আর তারই ফলে তাঁর প্রকৃতির মধ্যে যে এক অমূল্য সামগ্রী ছিল তার সন্ধান সাধারণ লোক পেত না। যে-কার্য্য সাধনের জন্য আমি পাঞ্জাবে গিয়েছিলাম তিনি তাতে সক্রিয় ভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমি তাঁকে লাহোর থেকে একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ করতে সম্মত করালাম। কোলকাতা থেকে আমি "ট্রিবিউন" পত্রিকার জন্য প্রথম মুদ্রাযন্ত্রখানি ক্রয় করি। এই পত্রিকার জন্য প্রথম সম্পাদক নির্ব্বাচনের ভারও তিনি আমার উপরেই ন্যস্ত করেছিলেন। সে পদের জন্য আমি ঢাকার স্বর্গীয় শীতলাকান্ত চ্যাটার্জীর নাম সুপারিশ করেছিলাম। তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ কার্য্যাবলী আমার সুপারিশকে বিশেষরূপে সার্থক করে তুলেছিল। তাঁর নির্ভীক সাহস, কোন বিষয়কে গভীরভাবে বিচার করবার ক্ষমতা এবং সর্ব্বোপরি উদ্দেশ্যের প্রতি সর্ব্বাধিক সততা, যা' একজন ভারতীয় সাংবাদিকের পক্ষে সর্বপ্রথম ও সর্ব্বশেষ গুণ বলা যায়, অবিলম্বে তাঁকে, দেশের স্বার্থরক্ষার্থে যাঁরা লেখনী ধরেছিলেন তাঁদের প্রথম সারিতে অধিষ্ঠিত করে।

অতি শীঘ্রই 'ট্রিবিউন' পত্রিকা জনমত প্রকাশের খুব এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে পাঞ্জাবের এটিই সর্বাধিক ক্ষমতাশালী ভারতীয় সংবাদপত্র। যিনি এ পত্রিকার সম্পাদক তিনি তাঁর কর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থায় আমার "বেঙ্গলী" পত্রিকার কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সহকারী হিসাবে কাজ করতেন। সর্দারের পক্ষ থেকে শুধু এই পত্রিকাখানি যে পাঞ্জাবের পক্ষে একখানা উপহারস্বরূপ ছিল তা' নয়, বস্তুত সর্দারের নিজস্ব বলতে যা' কিছু ছিল সবই তিনি দেশহিতে অর্পণ করে গিয়েছেন। সর্দারের অকাল মৃত্যুতে তাঁর জন্মভূমি পাঞ্জাব প্রদেশের সঙ্গে সমস্ত ভারতও শোকে মুহ্যমান।

দয়াল সিং কলেজ পাঞ্জাবের এই সুযোগ্য সন্তানের স্থায়ী স্মৃতিসৌধরূপে আজ বিরাজ করছে।

সর্দার দয়াল সিং মাজিথিয়ার এই জনহিতকর কাজের সঙ্গে অন্যান্য যাঁরা বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ডক্টর সুরজবল, পণ্ডিত রামনারায়ণ ও সর্বশেষ হলেও অসামান্য বাবু কালীপ্রসন্ন রায়ের নাম উল্লেখনীয়। ডক্টর সুরজবল ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। তিনি কাশ্মীর রাজ্যে এক উচ্চপদে আরোহণ করেছিলেন। পণ্ডিত রামনারায়ণ ছিলেন একজন খ্যাতনামা আইনজীবী। পাঞ্জাব চিফ্ কোর্টের ভারতীয় বিচারকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথমে অস্থায়ী জজ নিযুক্ত হয়েছিলেন। মৃত্যু যদি তাঁকে অকালে ছিনিয়ে না নিত তা' হ'লে তিনি স্থায়ী জজও নিযুক্ত হতেন। কালীপ্রসন্ন রায়ও ছিলেন একজন স্বনামধন্য আইনজ্ঞ। আইনব্যবসা করবার উপযুক্ত শিক্ষা লাভের পর তিনি লাহোরে বসবাস করে' ওকালতি আরম্ভ করেন। য়্যাডভোকেট হিসাবে লাহোরে তাঁর জোড়া ছিল না। তবে আইনজ্ঞ হিসাবেই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। কারণ তাঁর মত একজন অমায়িক বন্ধু ও একাগ্র স্বদেশপ্রেমিক ছিল অত্যন্ত বিরল। জনসাধারণের যে-কোন আন্দোলনে তিনি থাকতেন পুরোভাগে। যখন স্বাস্থ্যের অবনতির দরুণ তিনি বঙ্গদেশে তাঁর নিজের গ্রামে গিয়ে অবসর নিতে বাধ্য হন তখনও তাঁর গ্রামকে তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত করেন। এরূপ লোককে কোন দিন ভোলা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে জনসাধারণের সেবার ইতিহাস লোকে সহজেই ভুলে যায়। কারণ মানুষের সাধারণ মনোবৃত্তিই হ'ল কাজের প্রশংসা করা নয়, কাজ করা নয়, কেবল মাত্র দোষত্রুটি ধরা।

লাহোর থেকে আমি অমৃতসর, মীরাট, এলাহাবাদ, দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আলীগড়, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে যাই। সে সকল স্থানেও বহু জনপূর্ণ সভায় লাহোরের অনুকরণে কোলকাতায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি

ও স্মারকলিপিখানি গ্রহণ করা হ'ল। যেখানে যেখানে সম্ভব, নূতন নূতন সমিতিও গঠন করে' কোলকাতার ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজকর্ম্ম করবার ব্যবস্থা করা হল। লাহোর, মীরাট, এলাহাবাদ, কানপুর ও লক্ষ্ণৌতেও এরূপভাবে সমিতি গঠন করা হয়েছিল। পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ থেকে দেখা যাবে যে, এভাবে কোলকাতা থেকে লাহোর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু সংখ্যক সমিতি গঠন করে প্রতিনিধিস্থানীয় লোকদের নিয়ে একযোগে কাজকর্ম্ম করবার উপযুক্ত এক দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। পরের বছর একই উদ্দেশ্যে আমি মাদ্রাজ, বোম্বাই ও পশ্চিম প্রদেশের অনেক সহর পরিভ্রমণ করি। তার ফলে আমাদের আন্দোলনের শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়।

আমার উত্তর ভারত পরিভ্রমণে একদিকে যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছিল অন্যদিকে তেমনি আমি ব্যক্তিগত জ্ঞান ও আনন্দ লাভের দিক দিয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছিলাম। এতে গত যুগের উত্তর ভারতের সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার আমার সুযোগ ঘটে। স্যার সৈয়দ আমেদ, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ, মামুদাবাদের রাজা আমীর হোসেন, বাবু ঐশ্বর্য্যনারায়ণ সিং, বাবু হরিশ্চন্দ্র, বারাণসীর বাবু রামকালী চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিদের জন্য যেকোন সম্প্রদায়ই গৌরব অনুভব করতে পারে। মেজাজের দিক থেকে, বোধশক্তির দিক থেকে, এমনকি নাগরিকতার প্রতি উৎসাহের দিক থেকেও তাঁরা ছিলেন পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন স্বদেশানুরাগী ও দেশসেবার জন্য একান্ত আগ্রহশীল।

যে সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাধিক খ্যাতনামা ছিলেন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আমেদ। বৃটিশ শাসনকালে ইনি

ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান নেতা। ইংরেজী ভাষার একটি শব্দও তিনি জানতেন না। তবুও তাঁর সমকালীন সমস্ত মুসলমান নেতার চেয়ে তিনি একথা অধিকভাবে বুঝেছিলেন যে, তাঁর সমাজের অগ্রগতির জন্য ইংরেজী শিক্ষার অত্যধিক প্রয়োজন। এই অভাব পূরণ করবার জন্য তাঁর ছিল আকুল আকাঙ্ক্ষা। এই উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী ও কার্য্যক্ষম আন্দোলন গড়ে তুলবার উপযুক্ত সংগঠনশক্তি যাতে স্থায়ী হয় এবং সমাজের পক্ষে হিতকর হয় তজ্জন্য তিনি প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। আর তাহাই তাঁকে আজ অমরত্ব দান করেছে। তিনি অত্যন্ত সৌহার্দের সঙ্গে আমায় গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে কংগ্রেস আন্দোলনের ফলে যদিও আমাদের উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল, তবুও আমাদের বন্ধুত্ব কখনো ক্ষুণ্ণ হয় নি। আলিগড়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সম্পর্কে যে সভা হয়, তাতে কোলকাতায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি সহ বিলাতে ও ভারতে একই সঙ্গে পরীক্ষা নেবার সুপারিশ করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ-সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন স্যার সৈয়দ আমেদ। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ১৮৮৭ সালে তিনি যখন পাবলিক্ সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টে সই করেন তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অভিমত সমর্থন করেছিলেন। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ও রায় বাহাদুর মুলকর একই সঙ্গে ভারতে ও বিলাতে পরীক্ষা নেবার যে কথা সমর্থন করেছিলেন, স্যার সৈয়দ আমেদ তা'তে মত দেন নি।

আজ এতদিন 'পরে সেই পুরোনো দিনের ভুলে যাওয়া মত পার্থক্য স্মরণ করা অনর্থক। কংগ্রেস আন্দোলনকে কেন্দ্র করে' যে সকল বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে আমরা স্যার সৈয়দ আমেদের সাহসিকতা, তাঁর কর্তৃত্ব, তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রভৃতি সমস্ত কিছু থেকেই বঞ্চিত হয়েছিলাম। কংগ্রেসের বিরোধিতা করেও তিনি দেশপ্রীতিমূলক অপর এক সমিতি গঠন করেছিলেন। কিন্তু আমরা

যতই বড় হই না কেন, আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা-রেখা আছে। তার উর্দ্ধে আমরা কিছুতেই উঠতে পারি না। সেই দেশপ্রীতিমূলক সমিতি এখন লুপ্ত। কিন্তু কংগ্রেস এখনো আছে। এবং উত্তরোত্তর তার উন্নতিই হচ্ছে। আজ অবশ্য সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। কি হিন্দু কি মুসলমান আমরা প্রত্যেকেই স্যার সৈয়দ আমেদের কাছে অশেষ প্রকারে ঋণী। আমরা যেন তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার কথা কখনো ভুলে না যাই। তিনি একদিন যে বীজ রোপণ করেছিলেন তার ফসল আজ পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর আলীগড় কলেজ আজ বিশ্ববিদ্যালয়পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আজ তা হয়েছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক মহান কেন্দ্র। তারই ফলে ভারতে ইসলামিক সম্প্রদায় বর্ত্তমান যুগের প্রেরণায় উদ্দীপিত। দেশপ্রেমের উৎসাহে উল্লাসিত। হিন্দু ও মুসলমানের ভবিষ্যৎ দৃঢ়বদ্ধতার দ্যোতক আজ এই প্রতিষ্ঠান।

উত্তর ভারতে আমার কার্য্যের সফলতা লক্ষ্য করে আমার সহকর্ম্মীগণ আমাকে একই উদ্দেশ্যে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে পাঠাতেও উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। ১৮৭৮ সালের শীতকালে আমি বোম্বাই যাত্রা করি। আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সেখানকার নেতৃবর্গকে পূর্ব্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরাও আমাকে প্রীতি ও সহৃদয়তার সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। সে সময়ের বোম্বাইয়ের জনমতের নায়ক ছিলেন মিঃ বিশ্বনারায়ণ মেণ্ডলিক ও মিঃ কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং। তাঁরা সকলেই আজ পরলোকে। বোম্বাইতেও এক-এক জনসভায় সেই সিভিল সার্ভিস প্রস্তাব ও প্রস্তাবাকারে স্মারকলিপিগুলির সারমর্ম্ম গৃহীত হয়। এর পর আমি সুরাটে এবং গুজরাটের রাজধানী আমেদাবাদে যাই। উভয় স্থানেই জনসভায় কোলকাতার সিভিল সার্ভিস প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। তারপর বোম্বাই হয়ে আমি পুণাতে যাই। সেখানে আমি মিঃ রাণাডের আতিথ্য গ্রহণ করি।

সে সময় মিঃ রাণাডে ছিলেন সবজজ কিন্তু তাঁর সরকারীপদ তাঁকে তাঁর নাগরিক কর্ত্তব্য থেকে কখনো বিচ্যুত করতে পারে নি। পরিদর্শক হিসাবে অবিরতই তাঁকে কংগ্রেস মঞ্চে দেখা যেত। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত শক্তি ছিলেন তিনিই। কংগ্রেস নেতাদিগকে তাঁদের কাজে তিনিই পরিচালিত করতেন, পরামর্শ দিতেন এবং উৎসাহিত করতেন। তাঁর সরলতা, হৃদয়গ্রাহী আচারব্যবহার, তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি, তাঁর বিশুদ্ধ সর্ব্বগ্রাসী দেশপ্রেম তাঁর নিকট যে যখনই এসেছে তাকে মুগ্ধ করেছে। আমি পুণাতে যখন তাঁর অতিথি ছিলাম তিনি তখন আমাকে আপন পরিবারের একজন বলেই মনে করতেন এবং আমার সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার করতেন।

পুণার সভায় আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করবার পর আমি মাদ্রাজ যাই। সেখানে আমি মিঃ ধনকাটুরাজুর আতিথ্য গ্রহণ করি। মিঃ চেনসল রাও, মাননীয় হুমায়ুন খাঁ বাহাদুর প্রমুখ মাদ্রাজের নেতৃবর্গের সঙ্গে সেখানে আমি দেখা করি। সভা আহ্বান করে' সিভিল সার্ভিস সম্পর্কিত বিষয়টি আলাপ-আলোচনা করতে তাদের অনুরোধ করি। কি একটা কারণে কিন্তু সেখানে জনসভা ডাকা সম্ভব হল না। কেবল পাচেপ্পা হলে একটি আলোচনা সভা আহ্বান করে' আমাদের স্মারকলিপি ও প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। যে মাদ্রাজ আজ ভারতের জনসাধারণের কাজের সঙ্গে এত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, ১৮৭৪ সালে কিন্তু সে মাদ্রাজ ছিল না। আজ মাদ্রাজ ভারতের অপরাপর অংশের সঙ্গে এক তালে পা ফেলে জনসাধারণের শক্তি ও চেষ্টাকে বর্দ্ধিত করছে। ১৮৭৮ সালে আমি সমগ্র ভারতে কেবল ঐ জায়গাটিতেই দেখেছিলাম জনসভা আহ্বান করা অসম্ভব। যে প্রশ্ন নিয়ে সর্ব্বত্র এত আলোচনা চলছিল তার বিশেষ গুরুত্ব ও সক্রিয় আবশ্যকতা থাকা সত্ত্বেও এবং সমগ্র ভারতে এ-বিষয়ে কোন দ্বিমত না থাকা সত্ত্বেও সে-সময় মাদ্রাজ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া সম্ভব হয় নি।

কোলকাতায় বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ থাকায় আমি কালবিলম্ব না করে' বাড়ী ফিরলাম। আমাদের কর্ম্ম-পরিকল্পনার মধ্যে ছিল ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে সভাসমিতির মাধ্যমে দেশের অধিকসংখ্যক লোকের মতৈক্য প্রকাশ করবার পর আমরা ইংলণ্ডে গিয়ে আন্দোলন চালাব। আমাদের দেশীয় ও আমাদের মনোভাব প্রকাশে সমর্থ এরূপ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে' তাঁদের সাহায্যে সেদেশে ভারতের বক্তব্য শুনাব। 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' নামক পত্রিকার পরলোকগত সম্পাদক মিঃ রাউটলেজ আন্দোলনের এই নূতন কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একে একটি প্রত্যাদিষ্ট কল্পনা বলে' অভিহিত করেছিলেন। আমরা কিন্তু একে কোন নূতন আলোর সন্ধান বলে মনে করি নি। মানুষের মনের পবিত্রতা ও উদ্দীপনার আলোকে আলোকিত দেশপ্রেম থেকেই হয়েছিল তার উদ্ভব। আমাদের এই অভিপ্রায়টি যে চমৎকার ও বিস্তর ফলপ্রসূ ছিল পরবর্ত্তী ঘটনাবলী থেকেও তা' প্রমাণিত হয়েছিল।

আমি উত্তর ভারতে যে পরিভ্রমণ করেছিলাম এবার তার মোট ফলাফল কিছুটা বিচার করা যাক। ভারতের বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মের লোককে একই উদ্দেশ্যে একত্র একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে দাবী তুলবার দৃষ্টান্ত বৃটিশশাসিত ভারতে এই ছিল প্রথম। হাতে-কলমে দেখিয়ে দেওয়া হ'ল যে, জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, তারাও সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে। এই যে শিক্ষা পাওয়া গেল পরে পরে তা' আরও গভীর ও বিশেষভাবে প্রমাণিত হ'ল কংগ্রেস আন্দোলনের ভিতর দিয়ে। এ-বিষয়ে পরে আমি আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। যাই হোক, তখন এভাবে এক বিরাট ঐক্যপূর্ণ জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি রচিত হ'ল। তদানীন্তন জননায়কগণ

এই বিষয়টি কোনদিন ভুলতে পারেন নি। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের ঘরে এক আলোচনা সভায় পুণার সার্ব্বজনিক সভার প্রতিনিধিবর্গও স্পষ্ট ভাষায় একথা বলেছিলেন যে, এই শিক্ষার ফলে জাগ্রত ভারতের একযোগে রাজনৈতিক প্রচেষ্টাসমূহ চালাবার পথ খুলে গিয়েছে।

স্যার হেনরী কটন "নিউ ইণ্ডিয়া" নাম দিয়ে একখানি পুস্তক রচনা করেছিলেন। তার ফলে সে সময়ে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়: সে-পুস্তকে আমার পরিভ্রমণ সম্পর্কে তিনি নিম্নোক্তরূপ মন্তব্য করেছিলেন:

"দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই হ'ল দেশের মস্তিষ্ক ও দেশের কণ্ঠস্বর। চট্টগ্রাম থেকে পেশোয়ার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী বাবুরাই জনমত নিয়ন্ত্রিত করেন। শিক্ষা ও রাজনৈতিক স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে উত্তর পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরা বাঙ্গালীদের তুলনায় অনেক পশ্চাতে। তবে তারাও ক্রমশঃ তাদের নিম্নপ্রদেশীয় ভাইদের মত আপনাদিগকে বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। পঁচিশ বছর পূর্ব্বে এর কিন্তু কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। পাঞ্জাবে বাঙ্গালীদের প্রভাব পড়বে এ-রকম ধারণার কথা লর্ড লরেন্স বা কোন মনট্গোমারী বা ম্যাকলিয়ডের ছিল কল্পনার অতীত। অথচ বাস্তবিক পক্ষে এখন তাই হয়েছে। গত বছর একজন বাঙ্গালী বক্তা উত্তর ভারতময় ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করে' বেড়িয়েছিলেন। আজ তা' এক বিজয়যাত্রার রূপ পরিগ্রহ করেছে। বর্ত্তমানে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নাম শুনা মাত্রই যেমন মুলতান তেমনি ঢাকায় সমগ্র যুব সম্প্রদায় উত্তেজনায় নেচে উঠে।"

সিভিল সার্ভিস সমস্যা সম্পর্কে নিখিল ভারতীয় স্মারকলিপিখানি হাউস অব্ কমনস্-এর নামেই পাঠান হ'ল। এই স্মারকলিপির উদ্দেশ্য ছিল ভারত সম্পর্কিত সেক্রেটারী অব এষ্টেটের নির্দ্দেশ

পরিবর্ত্তন করে' পরীক্ষা দেবার বয়সের উর্দ্ধসীমা এখনকার মত বাইশ বছর করা এবং এই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা একই সময়ে যেমন বিলাতে তেমনি ভারতেও নেবার ব্যবস্থা করা। পূর্ব্বপ্রথা অনুসারে এই স্মারকলিপি হাউস অব্ কমনস্-এ ডাকযোগেই পাঠান যেত। কিন্তু মানুষের মনে তখন এক নূতন ধারণার উদ্ভব হ'ল। সমগ্র ভারতের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের স্বার্থজড়িত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে সারা ভারতকে তখন আমরা একতাবদ্ধ করেছি। আমরা মনে করলাম আমাদের এই অচিন্তনীয় ভাবে জনমত প্রদর্শনের প্রচেষ্টাকে আমাদেরই কোন এক ভারতীয় প্রতিনিধির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলে বৃটিশ জনসাধারণের কাছে ভারতের অসন্তোষের কথাটি তুলে ধরব। আমাকেই প্রতিনিধি করে এ উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে পাঠাবার প্রস্তাব হ'ল। অত্যন্ত স্পষ্ট কারণে আমি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হলাম। আমাকে যে চাকরী থেকে পূর্ব্বোক্ত কারণবশত কর্ম্মচ্যুত করা হয়েছিল আমি নিজেই যদি সেই চাকরীতে অধিকসংখ্যক ভারতীয় নিযুক্ত করবার জন্য আবেদন জানাতে যেতাম, ইংলণ্ডের জনসমাজ আমাকে নিশ্চিতই ভুল বুঝত। সেজন্য ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন মিঃ লালমোহন ঘোষকেই একাজের জন্য নির্ব্বাচিত করে। পরে এ-কার্য্যে মিঃ লালমোহন ঘোষের সাফল্য থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছিল যে, সে নির্ব্বাচন যোগ্য পাত্রকেই করা হয়েছিল। বাগ্মিতায় লাল মোহনের অত্যাশ্চর্য্য কুশলতা বরাবরই আমাদের অজ্ঞাত ছিল। তার কারণ তার পূর্ব্বে জনসাধারণের এরূপ আর কোন কাজকর্ম্মে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তিনি কখনো যোগ দেন নি। কিন্তু যখন তিনি তাঁর এই অসাধারণ ক্ষমতার এমন পরিচয় দিলেন যে, এমন কি, তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী জন ব্রাইট-এর মত শ্রোতারাও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন, তখন এই শুভ সংবাদে আমাদের আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা রইল না। অজানা অচেনা এক সাধারণ সৈনিকের মধ্যে

নেপোলিয়নকে আবিষ্কারের গৌরব ছিল কারনটের। যে প্রথম ভারতীয় পার্ল্যামেন্টের সদস্য হিসাবে সম্মান অর্জ্জনের জন্য দাঁড়াবার সাহস রাখতেন এবং যিনি আমাদের জাতীয় জীবনের নায়কত্বের জন্য পূর্ব্ব থেকেই ভাগ্য দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছিলেন, তাঁকে আবিষ্কার করতে পারার জন্য ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবর্গ যে আপনাদের কৃতার্থ বোধ করবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

তখন ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ ছিল একটি ব্যয়বহুল কাজ। ট্রয়রাজকুমারী কেসেন্দ্রার ন্যায় নিরাশাব্যঞ্জক ভবিষ্যৎবাণী করবার লোকের তখন অভাব ছিল না। তারা বলতে লাগল, ইংলণ্ডে প্রতিনিধিপ্রেরণ অর্থের অপব্যয় মাত্র। তাতে সুফল কিছুই হবে না। সারা ভারতে সিভিল সার্ভিস আন্দোলনের সফলতা থেকে আমরা অনেক শক্তি ও বিশ্বাস অর্জ্জন করেছিলাম। আমরা আর এ সমস্ত দুর্ব্বলচিত্ত মানুষের কথায় কাণ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না। আমি চাঁদা সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করলাম এবং মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই প্রধানত মধ্যবিত্ত সমাজের লোকদের নিকট থেকেই আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করলাম।

একটি মোটা অংকের টাকা পেয়েছিলাম কেবলমাত্র মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর কাছ থেকে। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্ব্বদা আমাদের আন্দোলনকে অত্যন্ত সহানুভূতির চোখে দেখতেন। তাঁর কাছ থেকে একখানি চিঠি নিয়ে আমি আমার হাত আরও শক্ত করে নিয়েছিলাম। এই চিঠি নিয়ে আমার নিরলস বন্ধু বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীকে সঙ্গে নিয়ে আমি মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর এষ্টেটের ম্যানেজার রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুরের সঙ্গে তাঁর বহরমপুরের বাড়ীতে দেখা করি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক সস্নেহে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু আমরা যে পরিমাণ অর্থ চেয়েছিলাম প্রথমে তিনি তার অর্দ্ধেক মাত্র দিতে স্বীকৃত হলেন। আমরা তাঁকে

ধন্যবাদ জানালাম এবং বললাম যে, আমরা তাঁর নিকট থেকে আরও অধিক আশা করেছিলাম। আমরা তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে সবে রাস্তায় নামবার জন্য সিঁড়িতে পা দিয়েছি, তখনি তিনি আমাদের পুনরায় ডেকে পাঠালেন। বললেন, "আমি বিষয়টি আবার ভেবে দেখেছি। আপনারা যে পরিমাণ টাকা চেয়েছেন সবটাই আমি দেব।" আমরা তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম এবং ভগবানের কাছে তাঁর ও মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর কল্যাণ কামনা করলাম। রাজীবলোচন রায়ের সঙ্গে আমার এই প্রথম ও শেষ দেখা। বর্ত্তমান যুগের লোকেরা তাঁকে জানে না। শীঘ্রই দেশের সমস্ত লোকের মন থেকেই হয়ত তাঁর স্মৃতি লোপ পেয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী যে কাশিমবাজারের "দয়াবতী রমণী" বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, রাজীবলোচন রায়ই ছিলেন সেই দয়ার উৎস ও মহারাণীর বাস্তবিক শক্তি। তিনিই কাশিমবাজারের এষ্টেটকে সরকারের কাছে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবার হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁরই সুপরামর্শে মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী তাঁর প্রচুর অর্থসম্পদ জনসাধারণের প্রয়োজনে নিয়োগ ও উপযুক্ত পাত্রে দান করেছিলেন। আর এরই ফলে তাঁর জীবনকালেই মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর নাম বঙ্গদেশের ঘরেঘরে প্রবাদের মত প্রচার লাভ করে।

মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে কি ভাবে যে দান করতেন সে সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে না করে পারছি না। গজনী থেকে একবার আমার কাছে এক আফগান ব্যবসায়ী ভদ্রলোক এসে আমাকে জানালেন, ১৮৭৮ সালে আফগান যুদ্ধের সময় তিনি সরকারের কাছে উট সরবরাহ করেছিলেন। কিন্তু সরকার থেকে তাঁর সেই পাওনা টাকা কিছুতেই আদায় করতে পারছিলেন না। এজন্য তাঁকে সাহায্য করতে তিনি আমায় অনুরোধ জানান। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল

ও সর্ব্বস্বান্ত হয়েই তিনি এসেছিলেন। তাঁর মামলায় তিনি হেরে গিয়েছিলেন এবং এমন কি, তখন তাঁর স্বদেশে ফিরবার উপযুক্ত প্রয়োজনীয় অর্থও তাঁর কাছে ছিল না। হিসাব করে দেখলাম অন্তত একশত পঞ্চাশ টাকার মত তাঁর তখন প্রয়োজন। আমি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর নিকট উক্ত ব্যবসায়ীর জন্য এক আবেদন করি। তিনি অবিলম্বে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন একশ পঞ্চাশ টাকা। টাকা নিয়ে আফগানী ভদ্রলোক মহারাণীর মঙ্গল কামনা করতে-করতে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

অর্থ সংগ্রহ হওয়ার পর পার্ল্যামেণ্টে সিভিল সার্ভিস স্মারকলিপি দাখিল করবার দায়িত্ব দিয়ে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ লালমোহন ঘোষকে ইংলণ্ডে পাঠান হ'ল। সেখানে লালমোহন ঘোষের কার্য্যাবলী আমাদের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করল। ভারতীয় প্রতিনিধিকে ইংলণ্ডে পাঠালে কি পর্য্যন্ত সুফল পাওয়া যেতে পারে তা' এতে পরিস্ফুট হ'ল। দৃঢ়সংকল্প হয়ে মিঃ ঘোষ কাজ আরম্ভ করলেন। এবরিজিনস্ প্রোটেকশন সোসাইটির সম্পাদক মিঃ চেস্‌সন ও স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবারণের ভ্রাতা স্যার ডেভিড ওয়েডারবারণের নিকট থেকে তিনি অনেক মূল্যবান সহায়তা লাভ করেছিলেন। বর্ত্তমান যুগের লোকেরা স্যার উইলিয়ামকে যত জানেন, স্যার ডেভিডকে তত জানেন না। অথচ ভারতে প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠনের জন্য সর্ব্বপ্রথমে যাঁরা প্রস্তাব দিয়েছিলেন স্যার ডেভিড ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পত্রযোগাযোগ করবার আমার সৌভাগ্যও হয়েছিল। জন ব্রাইটের সভাপতিত্বে উইলিস ঘরে এক মস্ত সভা হ'ল। মিঃ ঘোষ সেখানে এমন এক বক্তৃতা করেন যে, তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা দেখে সকলেই মুগ্ধ হন এবং সভাপতি নিজেও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এই সভার ফল হাতে হাতেই পাওয়া গেল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই

হাউস অব কমনস্‌-এর সামনে কতকগুলি নিয়মাবলী উপস্থিত করা হ'ল। পরে এগুলিই সিভিল সার্ভিসের বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীরূপে প্রকাশ পেল। ১৮৭০ সালের পার্ল্যামেণ্টের আইন অনুসারে অন্য কোন নিয়মাবলী রচিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতের যোগ্যতাসম্পন্ন অধিবাসীদিগকে কোভেন্যাণ্টেড সিভিল সার্ভিসে সরাসরিভাবে নিযুক্ত করবার জন্য ভারত সরকারকে এ-নিয়ম দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া হ'ল। এর পূর্ব্বে প্রায় সাত বছর যাবৎ ভারত সরকার এ-বিষয়টি নিয়ে নিদ্রা দিচ্ছিল। কিন্তু উইলির ঘরে যে সভা হয় তার প্রভাব এবং তার সঙ্গে একতাবদ্ধ ভারতের অসন্তোষের প্রবণতা মিলিতভাবে এত শক্তিশালী হয়ে উঠল যে, মাত্র চারিটি নিয়ম রচনা করতে যে সরকারের সাত বছর কেটেছিল এখন সভার মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তা' প্রকাশ করতে সে সরকার বাধ্য হ'ল।

কাজেই ভারতের প্রতিনিধি ইংলণ্ডে গিয়ে ভারতের অসন্তোষের কথা প্রচার করার ফলেই যে আমাদের উদ্দেশ্য অভাবনীয়ভাবে সফলতা লাভ করেছিল একথা বলাই বাহুল্য। তারপরেও আমরা বারবার আমাদের এই কর্ম্মপরিকল্পনা বিভিন্ন কারণে ব্যবহার করে আশানুরূপ ফল লাভ করেছি। এবং যাঁরা সর্ব্বপ্রথম এই কল্পনাটি করেছিলেন তাঁদের বুদ্ধি ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির প্রশংসা করেছি। বস্তুত মিঃ লালমোহন ঘোষ ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসার অনতিকালের মধ্যেই ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন পুনরায় তাঁকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করে। এবার তিনি ইংলণ্ডে থাকাকালে লিবার্যালদের স্বার্থে পার্ল্যামেণ্টের নির্ব্বাচনে সদস্যপ্রার্থী হয়ে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে আইরিশ ভোটগুলি তাঁর বিপক্ষ দলের কাছে যায়। কেবল মাত্র এ-কারণেই তিনি পরাজিত হন। তার অনেক পরে ভারতের "গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান" দাদাভাই নওরোজী পার্ল্যামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হ'তে সক্ষম হন। আইরিশেরা যদি শেষ মুহূর্ত্তে তাঁদের মত পরিবর্ত্তন না

করতেন তা' হলে পার্ল্যামেন্টের প্রথম ভারতীয় সদস্য হওয়ার গৌরব মিঃ লালমোহনই অর্জ্জন করতেন। যাই হোক, অন্তত এই বহু-আকাঙ্ক্ষিত পথের অগ্রদূত ছিলেন তিনি এবং তিনিই তার ভিত্তি রচনা করে' গিয়েছিলেন।

এর অনেককাল পরে ১৮৯০ সালে মিঃ লালমোহন ঘোষের নির্ব্বাচনী এলাকা ডেফট্‌ফোর্ডে গিয়ে কতকগুলি ভারতীয় সমস্যার উপর জনসভায় বক্তৃতা করবার আমার সুযোগ হয়। আমি লক্ষ্য করি তখনো তাঁর বন্ধু ও সমর্থকেরা মিঃ লালমোহন ঘোষের কথা প্রীতিপূর্ণ ভাবেই স্মরণ করছেন। যাঁরাই তাঁর কাছে এসেছিলেন বা তাঁর বক্তৃতা শুনার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের মনে তাঁর প্রতিভা ও তাঁর বাগ্মিতা এক স্থায়ী রেখাপাত করেছিল। এরূপ একজন ব্যক্তির অকাল মৃত্যু ভারতবাসীদের পক্ষে এক মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনার সামিল। ১৮৬৯ সাল থেকে আমি তাঁকে জানতাম। চল্লিশ বছর ধরে আমরা পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ ছিলাম। পরবর্ত্তীজীবনে ভগ্ন স্বাস্থ্য ও শারীরিক দুর্ব্বলতার দরুণ তিনি জনসাধারণের কাজে আর পূর্ব্বের মত যোগ দিতে পারতেন না। কিন্তু সে সমস্ত বিষয়ে তাঁর উৎসাহ তবুও কোনদিনই ম্লান হয় নি। যখনই এ-সব কাজে তিনি কোন অংশ গ্রহণ করতেন তখনই দেখা যেত তাঁর বিচারবিবেচনা পরিষ্কার এবং বক্তব্য যথারীতি শক্তিশালী রয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও তার পরিণতি

এই স্মৃতিকথায় আমি আমার জীবনের ঘটনাবলী সবক্ষেত্রে যে কালক্রম অনুসারে লিখেছি তা' নয়। কোন একটি অধ্যায় আরম্ভ করবার পর অনেক ক্ষেত্রে তা বন্ধ করে' আবার একটি নূতন অধ্যায় সুরু করাই সুবিধাজনক মনে হয়েছে। তার মধ্যে অনেক আগের ঘটনাবলীও বর্ণনা করা হয়েছে। লর্ড সেলিসবারি ছিলেন রক্ষণশীল দলের ভারতসচিব (সেক্রেটারী অব এষ্টেট ফর্ ইণ্ডিয়া)। তাঁর প্রশাসনকালে ভারতে যত রকম প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসৃত হয়েছিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স কমানো ছিল তন্মধ্যে একটি। ভারতকে দলগত রাজনীতির বহির্ভূত বলা হয়। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতে তা' একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যবস্থা। কারণ আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না যে, দলগত রাজনীতিতে ভারতের একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল বলেই ওয়ারেন হেষ্টিংসকে গুরু অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বার্ক-এর জীবনীপ্রণেতা লর্ড মর্লির ভাষায় বলা যায়, তাতেই প্রথমবারের মত "নিশ্চিত ভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, বৃটিশ শাসনে এশিয়াবাসীদের ছিল অধিকার আর ইউরোপীয়দের—দায়িত্ব।" এই অভিযোগের নৈতিক ফল ছিল ভারতের পক্ষে এক লক্ষনীয় লাভ। কিন্তু তারপর থেকে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। নরমপন্থী ও রক্ষণশীল উভয় দলের প্রথম সারি থেকে সংকেত দেওয়া হয়েছে যে, ভারতকে সমস্ত দলগত আলোচনাদির বাইরে রাখতে হবে। স্যার হেনরী ফাউলার যখন সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া, তখন পার্ল্যামেণ্টের আসন থেকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, পার্ল্যামেণ্টের প্রত্যেক সদস্যই ভারতের সদস্যের দায়িত্ব বহন করে।* একটি পরাধীন ও

প্রতিনিধিহীন জাতির প্রতি তাঁর এই মহৎ অনুরাগ হর্ষের সঙ্গেই সেদিন গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু ভারতে তা' কেবল এক অবিশ্বাসজনিত বিদ্রূপের হাসিরই উদ্রেক করেছিল। কারণ আমাদের জানতে বাকী নেই যে, সবার যেখানে দায়িত্ব সেখানে আসল দায়িত্ব কারুর থাকে না। বছরের পর বছর যখনই হাউস অব কমনস্-এর ইণ্ডিয়ান বাজেটের বিতর্কের বিবরণাদি সংবাদপত্রে পড়েছি তখনই লক্ষ্য করেছি যে, সদস্যেরা যখন বক্তৃতা করতেন সভাগৃহ প্রায় শূন্য হয়ে যেত এবং তখনই বুঝতাম এ-সমস্ত সুনীতিবাচক বুলি কত অসার! দেখেছি ভারতের মঙ্গলের প্রতি উদাসীনতার বিষয়ে উভয় পক্ষই থাকত সযত্নে নীরব।

যিনি সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া হতেন তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করত। তারই ব্যক্তিগত চরিত্র ও সহানুভূতির পরিমাণের উপর নির্ভর করত ভারতে কিরূপ নীতি অনুসৃত হবে বা হবে না। তাঁর দলের সাধারণ নীতির স্রোতের নিতান্ত ক্ষীণ ধারাই তার মধ্যে প্রবাহিত হ'ত। পার্ল্যামেণ্টের মধ্যে সদস্যদের মাধ্যমে প্রতিফলিত জনমতের কথা বাদ দিলে প্রত্যেক মন্ত্রীই ছিলেন স্ব স্ব বিভাগে সর্ব্বপ্রধান। অবস্থা পর্য্যালোচনা করে' আমরা অন্তত তাই বুঝেছি। ১৮৫৮-সালের ঘোষণা এসেছিল রক্ষণশীলদলের সেক্রেটারী অব ষ্টেট লর্ড ডার্বির নিকট থেকে। যে সমস্ত ভারতীয় ছাত্র বিলাতে গিয়ে শিক্ষা শেষ করবার ইচ্ছা করত তাদের উৎসাহ দেবার জন্য সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন স্যার ষ্ট্যাফোর্ড নর্থকোট (পরে আর্ল ইদেস্‌লে)। আবার এই বৃত্তির ব্যবস্থা যিনি পরে বাতিল করে' দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন নরমপন্থীদলের সেক্রেটারী অব ষ্টেট ডিউক অব আর্গিল। ১৮৯২ সালের পার্ল্যামেণ্টারী আইনের বলে লেজিসলেটিভ কাউনসিলকে সংস্কার করে' ও প্রসারিত করে' যাঁরা আমাদের জন্য জনপ্রতিনিধিমূলক সরকারের সূচনা করেছিলেন তাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল দলের মন্ত্রীমণ্ডলীরই অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি অবশ্য নরমপন্থীদল

ভারত শাসন বিষয়ে তাঁদের নিজ দলনীতিকেই অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন। এবং তার প্রধান-প্রধান দৃষ্টান্ত হল ১৯০৯ সালের লর্ড মর্লের সংস্কার পরিকল্পনা, বঙ্গভঙ্গ রদ এবং ১৯১১ সালের ২৫শে আগষ্টের ডেসপ্যাচে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি।

সেক্রেটারী অব ষ্টেট হিসাবে লর্ড সেলিসবারির শাসন ছিল বিশেষ ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল। লর্ড লিটনের মত একজন ভাইসরয় পাঠাবার জন্য দায়ী ছিলেন তিনি। এই লর্ড লিটন সম্বন্ধে মারকুইস অব হার্টিংটন (পরে ডেভনসায়ারের ডিউক) পার্ল্যামেণ্টে মন্তব্য করেছিলেন যে, ভারতের ভাইসরয় বাস্তবিক যা' হওয়া উচিত লর্ড লিটন ছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে তাঁরই পুত্র বঙ্গদেশের বর্ত্তমান গভর্ণর লর্ড লিটন একজন ভিন্ন প্রকৃতির শাসক। রক্ষণশীল বলে স্বীকার করেও তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক। ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর বাস্তবিক সহানুভূতি লক্ষ্য করা যায়। তারও অনেক পরে গত শতাব্দীর প্রায় নবম দশকে লর্ড সেলিসবারি প্রধানমন্ত্রী হয়ে লর্ড কার্জ্জনকে পাঠান। এঁর ভাইসরয়-স্বরূপ কার্য্যকালের কালিমা টাইমস্ পত্রিকার মিঃ ফ্রেজারের সমস্ত কুশলতা সত্ত্বেও ধৌত করা সম্ভব হয় নি।

হয়ত আগামী দিনের ঘটনাগুলি আমি অনেক আগেই প্রত্যাশা করছি। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়সের সীমা নামিয়ে দেওয়ার ফলে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল সে-কথা আমি পূর্ব্বেই বলেছি। লর্ড সেলিসবারির নির্দ্ধারিত ভাইসরয় লর্ড লিটন দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করলেন এবং ভারতবাসীদের নিরস্ত্র করলেন। অস্ত্র আইন ও ভারণাকুলার প্রেস আইন রূপ দুটি ব্যবস্থা অবলম্বনের পর দেশের সর্ব্বত্র ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তাতে আমিও আমার শক্তি অনুযায়ী অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

সিপাহী বিদ্রোহের তমসাবৃত দিনগুলিতে যখন ভারতে বৃটিশ

সাম্রাজ্য বাস্তবিকই সাঙ্ঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল তখনো লর্ড ক্যানিং বা তাঁর উপদেষ্টারা ভারতের জনগণকে কখনো নিরস্ত্র করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। লর্ড লিটনের সময়ে যে আফগান যুদ্ধ হয় তা' হয়েছিল এক মস্ত বড় ভুল। যে নীতির উপর নির্ভর করে তা' হয়েছিল অবশেষে তা' হয়েছিল সম্পূর্ণ নিষ্ফল। এ যুদ্ধের ফলে সম্ভবত একমাত্র সীমান্তে ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও তখন হিন্দুদের মধ্যে ত নয়ই, মুসলমানদের মধ্যেও কোন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় নি। আভ্যন্তরীন কোন বিদ্রোহের দরুণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা হিসাবে অস্ত্র আইনের কিছুমাত্র প্রয়োজনও ছিল না। এটা ছিল বাস্তবিক পক্ষে অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ এতে কেবল মাত্র ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে এক জঘন্য পার্থক্যেরই সৃষ্টি হয়েছিল। এ পার্থক্য অবশ্য আজ আর নেই। ঐ নীতির ফলে অকারণে দেশময় অবিশ্বাস ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়। জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে কারণ ঐ নীতি বাস্তবিক পক্ষে আমাদের উপর এক হীনম্মন্যতার চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। সে সময় আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম। আমরা মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। তিনি তাঁর মিড্‌লোথিয়ান নির্ব্বাচনী প্রচার কার্য্যের সময় তাঁর বক্তৃতায় আমাদের প্রতিবাদের সমর্থন করেন এবং অস্ত্র আইন ও ভারণাকুলার প্রেস আইনের তীব্র নিন্দাও করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি যখন প্রধান মন্ত্রী হন, তখন কেবল আংশিকভাবেই আমাদের প্রতি সুবিচার করেছিলেন। ভারণাকুলার প্রেস আইন তিনি প্রত্যাহার করলেন বটে, কিন্তু অস্ত্র আইনটি স্পর্শও করলেন না।

১৮৭৮ সালের এপ্রিল মাসে একদিনেই ইম্পিরিয়্যাল লেজিস্‌লেটিভ কাউনসিলে ভারণাকুলার প্রেস আইনটি পাশ হয়ে যায়। সরকারের কাছে এ ব্যবস্থা এতই জরুরী মনে হয়েছিল যে, দেশকে এ-বিষয়ে আলোচনা করবারও সময় দেওয়া হয়নি। কাউনসিলের

কার্য্যাদির সাধারণ নিয়মাবলী স্থগিত করে', যেদিন এ আইন উপস্থিত করা হ'ল সেদিনই তা' পাশ করিয়ে নেওয়া হ'ল। আমলাতন্ত্রী সরকারের ধর্ম্মই হ'ল—অনেক সময় উত্তেজনার বশে তারা কোন আলোচনাই বরদাস্ত করতে পারে না। তারা মনে করে জনগণের মধ্যে জানাজানি হলে, তা' তাদের পূর্ব্বনির্দ্ধারিত নীতির পক্ষে হবে মারাত্মক। কিন্তু একবার যদি সে নীতিকে আইনের রূপ দিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে মিশিয়ে দিতে পারে তা' হ'লে সেই স্থিরীকৃত ব্যবস্থাকে পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব মনে করে সকলেই তা' মেনে নেবে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সেই ভ্রান্ত ধারণারই অবসান ঘটিয়েছে। আমাদের বর্ত্তমান যুগের রাজকর্ম্মচারীরা নানাভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, জনমতের শক্তি যে কি বস্তু সে সম্পর্কে তাঁদের ধারণা অনেক বেশী। ভারণাকুলার প্রেস আইন প্রত্যাহৃত হয়েছে। সর্ব্বাধিক স্থায়ী ব্যবস্থা যে বঙ্গভঙ্গ তাও রদ হয়েছে। যখনি কোন জনমতবিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, ভাগ্যের বিড়ম্বনা বলে জনগণ কিছুকালের জন্য হয়ত তার কাছে মাথা নত করে। তারা তখন কেবল সুযোগ ও সময়ের জন্যই অপেক্ষা করে। শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। তারপরই পুনরাক্রমণ করে। আর তখন তা' আমলাতন্ত্রের পুতুলগুলিকে তাদের পূজামণ্ডপ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। স্থায়ীভাবে পড়ে থাকে কেবলমাত্র আমলাতান্ত্রিক নির্ব্বুদ্ধিতা এবং প্রশাসনিক শক্তি ও সামর্থ্যের অপব্যয়ের স্মৃতিসৌধগুলি।

শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ভারণাকুলার প্রেস এসেছিল বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত। তবে এরূপ একটা কিছু যে আসছে পূর্ব্ব থেকেই তা' আশঙ্কা করা গিয়েছিল। ১৮৭৭ সালে দিল্লীতে যে সমাবেশ হয়েছিল সেখানে সংবাদপত্রগুলিকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ভারতীয় সাংবাদিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হ'ত বঙ্গদেশের প্রধান সংবাদপত্র "হিন্দু পেট্রিয়ট"। এই

কাগজের প্রতিনিধি হিসাবে আমি দিল্লীর সমাবেশে যোগ দিয়েছিলাম। এ সময় বিশেষ কোন ভাবে আমি এ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। কিন্তু ১৮৭৪-৭৫ সালে যখন লণ্ডনে ছিলাম তখন আমি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতাম। আমার কাছে এটি ছিল একটি সখের খাটুনি, একটা নিয়মানুবর্ত্তিতা, একটা অনুশীলনের মত। তা ছাড়া যাঁর সঙ্গে আমি জনগণের প্রতি কর্ত্তব্যের খাতিরে ও আমার প্রতি তাঁর স্নেহের ডোরে আবদ্ধ ছিলাম, তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সুযোগও এতে পেতাম। দিল্লীর সমাবেশে যে সব সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নিয়ে আমি একটি সাংবাদিক সংঘ গঠন করি। তারপর আমরা একখানা স্মারকলিপিসহ ভাইসরয়-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সেই প্রতিনিধি দলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ হয়েও আমি বৃহত্তম ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিত্ব করছিলাম। এই প্রতিনিধিমণ্ডলীর মুখ্য বক্তা কে হবেন তা নিয়ে যখন মতবিরোধ দেখা দেয় তখন আমি কঠোরভাবে আমার নিজ অধিকারের উপর নির্ভর করতে লাগলাম। অবশেষে আমাকেই মুখ্য বক্তার পদ দেওয়া হ'ল। আমিই স্মারক লিপিখানি পাঠ করলাম। এই স্মারকলিপির জন্য কোন আধারের ব্যবস্থা ঐ অল্প সময়ের মধ্যে দিল্লীতে করা গেল না। সে জন্য তখন আমরা লিপিখানি আধারের মধ্যে করে' দিতে পারি নি। সংবাদপত্রের উপর যে সমস্ত বিধিনিষেধের ব্যবস্থা হচ্ছিল আমরা স্পষ্টভাবে তার উল্লেখ করেছিলাম। এতদিন যাবৎ সংবাদপত্রগুলি যে স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিল তা ক্ষুণ্ণ করা হবে না বলেও আশা প্রকাশ করলাম। ভাইসরয় কয়েকটি মাত্র কথা বললেন। স্মারকলিপির এ অংশের উত্তরে কিছুই বললেন না। আমরা মনে করলাম আমাদের আশা-আশংকার কথা তাঁকে জানান আমাদের কর্ত্তব্য ছিল। আমরা তাই করেছি। তখনকার মত বিষয়টি সেখানেই সমাপ্ত হ'ল।

পনরটি মাস কাবার হতে না হতেই একমাত্র মাদ্রাজ ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্র ভারণাকুলার সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করা হ'ল। কাউনসিল চেম্বারে একটি লোকও তখন সরকারী মতের বিরোধিতা করতে সাহস পেল না। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সে সময় ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের একজন সদস্য। শুনা যায়, ভাইসরয় তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সাথে কথা বলেন। এবং যতীন্দ্রমোহনও সরকার পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে লিখেছিলেন বটে, কিন্তু স্বদেশপ্রীতিসম্পর্কিত অপরাপর লেখাগুলির মত এ লেখায় তেমন ঝাঁঝ ছিল না। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের এক প্রধান সদস্য। সরকার পক্ষে তাঁর ভোট দানের ফলে এই সংস্থা থেকেও কোন নিরপেক্ষ মত পাওয়া সম্ভব হ'ল না। এরূপ একজন নির্ভরযোগ্য সহকর্ম্মীকে বাদ দিয়ে স্বাধীন মত ব্যক্ত করা তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। সে সময় ভোট দেওয়ার জন্য মহারাজার কার্য্যকে আমি সমর্থন করবার চেষ্টা করছি না। তবে কোন জনসেবক যখন কোন চরম অবস্থার চাপে পড়ে' কোন কাজ করেন তখন তাঁর দোষগুণ বিচার করতে হ'লে আমাদের উচিত সে অবস্থায় পড়লে আমরা কি করতাম তার সম্যক বিচার করা। এ-কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, তখন জনমত এখনকার মত এত প্রবল হয় নি। এমন কি, মাত্র কিছুকাল আগেও লর্ড মিণ্টো যখন ভাইসরয়, তখন মাত্র দুজন মাননীয় ব্যক্তি ভিন্ন ইম্পিরিয়্যাল কাউনসিলের সমস্ত ভারতীয় সদস্যই এমন এক মুদ্রাযন্ত্র আইনের (বর্ত্তমানে প্রত্যাহৃত) সমর্থন করেছিলেন যার বিধানগুলি ছিল মহারাজা যে আইনের জন্য ভোট দিয়েছিলেন তদপেক্ষাও বহুগুণ কঠোর। তা ছাড়া পদমর্য্যাদার কারণেও মহারাজার কাজকর্ম্মের একটা সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট ছিল। এজন্য সব সময় সকল রকম কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কিন্তু তা' বাদ দিলে একথা

অনায়াসে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন বাস্তবিকই একজন স্বদেশপ্রেমী এবং যখনই পারতেন জনসাধারণের আন্দোলন সমর্থন করতেন। একথা সত্য যে, তিনি যে কাউনসিলের সভায় সরকার পক্ষের সমর্থনে ভোট দিয়েছিলেন তা' কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। তবে সে দোষ যে অত্যন্ত গুরুতর তাও বলা যায় না। মৃতের সম্মান বলে একটি কথা আছে। মহারাজা আজ লোকান্তরে। তাঁর যথাযথ বিচার করতে হ'লে তাঁর দোষ ও গুণ দুই বিচার করে দেখা দরকার। আর তা' করলেই দেখা যাবে তাঁর দোষের চেয়ে গুণের মাত্রাই ছিল অধিক।

ভারণাকুলার প্রেস আইন পাশ হওয়াতে এবং যেভাবে তা' পাশ করান হল তা' দেখে বঙ্গদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে ভয় ও উদ্বিগ্নতার সঞ্চার হ'ল। তার উপর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ও আমাদের নেতৃস্থানীয়েরা যখন সকলেই হাত গুটিয়ে রইলেন, তখন জনসাধারণের মনের ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পেল। সৌভাগ্যের কথা এই যে, তার পাঁচ বছর আগে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানই এখন এগিয়ে এল মধ্যবিত্ত সমাজের মনোভাবকে রূপ দিতে। আমরা সঙ্কল্প করলাম প্রেস আইন প্রত্যাহার করাবার জন্য আমরা যথাশক্তি চেষ্টা করব। আমি দেশের নেতাদের কাছে নিজে গিয়ে-গিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝাতে লাগলাম। আমার বেশ মনে আছে, শতকরা পঁচিশ জনের বেশী লোক আমাদের নিরুৎসাহ করতে লাগলেন। নাম না বলে বলতে পারি একজন ব্রাহ্ম নেতা আমায় বলেছিলেন, "প্রেস কমিশনের মিঃ লেথব্রিজ এ বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। আমাদের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হয়েছে। বুঝতেই পারছেন, আমার একটা দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠা রয়েছে। সেটা আমার বজায় রাখতে হবে। কাজেই আমি ত আপনার সঙ্গে যোগ দিতে পারি না।" অপর এক নেতার সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন, "আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করি। কিন্তু

কিন্তু আমরা ত আপনাদের কোন সহায়তা করতে পারব না।" যাঁদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে আমরা এত সহযোগিতা আশা করেছিলাম, যাঁদের উপর নির্ভর করার অধিকার আমাদের ছিল বলে' আমরা মনে করতাম, কার্য্যক্ষেত্রে তাঁদের হিমশীতল ভাব ছিল আমাদের অপ্রত্যাশিত।

ডক্টর কে. এম. ব্যানার্জী, ফ্রি চার্চ্চ অব স্কটল্যাণ্ড-এর ডক্টর কে. এস. ম্যাকডোন্যালড প্রভৃতি আমাদের কয়েকজন খৃষ্টান বন্ধুর আচরণ কিন্তু ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথম দিন থেকেই তাঁরা ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আমাদের সাহায্য করেছিলেন এবং আমাদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন। একেবারে প্রথমের দিকে যাঁরা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী (বিশেষভাবে কে. এম. ব্যানার্জী নামে পরিচিত) ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি। জীবনের কেবল শেষ দিকেই তিনি রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতেন। ইণ্ডিয়ান লীগ-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। পরে তিনি ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনেরও সভাপতি হন। রাজনৈতিক জীবনের ঘূর্ণিতে একবার যখন পড়লেন গভীর স্রোত তাঁকে টেনে নিয়ে গেল। তিনি করপোরেশনে যোগ দিলেন এবং তার একজন সক্রিয় সদস্য হলেন। সে সময় তিনি ষাটের কোঠা পার হয়ে গেছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তিনি তরুণ বয়সের তৎপরতা হারিয়েছিলেন সত্য, তবুও তাঁর উৎসাহ, তাঁর তেজ, তাঁর স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি গুণ আমাদের যে কোন তরুণ সদস্যের তুলনায় কম ছিল না। যা' একবার সত্য বলে মনে করেন তা' থেকে বিচ্যুত হয়ে তার সঙ্গে রফা করবার চেষ্টা করেন না এরূপ লোক তাঁর মত আমি কখনো দেখি নি। তাঁর মত সঙ্কল্পে অটল ও দৃঢ়মনোভাবাপন্ন অথচ এত বিনয়ী লোক কচিৎ দেখা যায়। আমার মনে হয়, এরূপ চরিত্রের লোক আমাদের মধ্য থেকে দ্রুত

লোপ পেয়ে যাচ্ছে। পুরোণো দিনের ভদ্রতা-সভ্যতা আজকাল দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। আর সর্ব্বদাই তার স্থান অধিকার করছে এক পাশ্চাত্য 'যুদ্ধং দেহি' ভাব। ডক্টর ব্যানার্জী আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর এবং রেভারেণ্ড ডক্টর ম্যাকডোন্যাল্ড-এর সহযোগের ফলে এই আন্দোলন জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের গণআন্দোলনের রূপ পেল। রাজনৈতিক আন্দোলনের ধ্বনিগুলি রাজদ্রোহমূলক বিবেচিত হওয়ায় পরিত্যক্ত হ'ল। কিন্তু বঙ্গদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের এই প্রথম ও বিরাট রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কোলকাতার খৃষ্টান সম্প্রদায়ের এই দুই অতি উচ্চ স্তরের মাননীয় প্রতিনিধি সেদিন হয়ে উঠেছিলেন আমাদের বিশেষ শক্তি ও প্রেরণার উৎস।

টাউন হল যোগাড় হ'ল। এবং জনসভার দিনও স্থির হ'ল। একটি ঘটনার কথা এখানে বলে' রাখি। যেদিন আমাদের সভা হবে বলে স্থির ছিল সেদিন কোলকাতায় এক সংবাদ এল, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন। এজন্য প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলী ছয় হাজার ভারতীয় সৈন্যকে অবিলম্বে মালটায় পাঠাবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু কোন যুদ্ধই হ'ল না। আসলে এ ছিল সেই অর্দ্ধপ্রাচ্য প্রধানমন্ত্রীর কল্পনাপ্রবণ সৃজনীশক্তির রাজনৈতিক আতসবাজী সৃষ্টির প্রকৃতিগত বিলাস মাত্র। যা' হোক, সংবাদ প্রচার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সারা কোলকাতায় তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। কোলকাতার 'বার'-লাইব্রেরীতে এবং যেখানে-সেখানে এ নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। বার-লাইব্রেরীতে মিঃ আনন্দমোহন বোসের আইনজীবী বন্ধুরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন, টাউন হলের সভা বন্ধ করা উচিত। তাঁরা তাঁকে এমন ইংগিতও দিলেন যে, ইউরোপে যখন অবস্থা এত অনিশ্চিত, তখন সভা করলে তার ফল গুরুতর হতে পারে। এমন কি, তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। মিঃ আনন্দমোহন

বোস আমার বাড়ীতে ছুটে এলেন। তখন বেলা প্রায় তিনটা। পাঁচটার সময় সভা হওয়ার কথা। আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি বললাম, এটি বঙ্গদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রথম বড় অভিযান। একবার যদি এটি বন্ধ হয় তা' হ'লে ভবিষ্যতে তা' আর হবে না। লোকে আমাদেব প্রতি বিশ্বাস হারাবে। আর এই হবে আমাদের সমাপ্তির আরম্ভ। আরও বললাম, আমাদেরও নিযুক্ত করেছে জনগণ। আমার বন্ধু নিজেই ছিলেন আইনজ্ঞ। ফলাফলের বিষয়ে আমাদের মতৈক্য হ'ল। বিবেচনা করে' দেখলাম যতক্ষণ আমরা নম্রভাবে থেকে সাংবিধানিক সীমারেখা অতিক্রম না করব ততক্ষণ গুরুতর কোন ফলাফলের আশংকা অমূলক। আমরা স্থির করলাম, যা' হবে হোক, সভা আমরা করবই এবং দরকার হলে তার ফলাফলও মাথা পেতে নেব।

কোলকাতায় এরূপ সাফল্যজনক সভা তার পূর্ব্বে কমই হয়েছে। ভারণাকুলার প্রেস আইনের মরণবিষাণ বস্তুত সেদিনই বেজে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, সেদিনই প্রকাশ পেয়েছিল যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন কি, সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রভাব যদি খোলাখুলি ভাবেও তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং এমন কি দেশের বিত্তশালীরাও যদি তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে না আসে, তবুও মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম। বঙ্গদেশে মধ্যবিত্তদের এই যে শিক্ষা হ'ল, তা' তারা কোনদিন ভুলতে পারে নি। এই শিক্ষাকে তারা বিভিন্ন দিকে প্রয়োগও করেছে। জাতীয় বিবর্ত্তনে এটি ছিল একটি সুনিশ্চিত ও প্রগতিশীল পদক্ষেপ। আর ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতাগণই করেছিলেন তার সৃষ্টি।

ভারণাকুলার প্রেস আইনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন চলতে

লাগল। মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন ভারতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবীকে যে সমর্থন জানিয়েছিলেন সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে' ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন এক পত্র পাঠাল। এই পত্রের খসড়া আমিই করেছিলাম। রেভারেণ্ড ডক্টর কে. এম. ব্যানার্জি খসড়াখানি দেখে দিয়েছিলেন। তার ফলে সেই অতি মাননীয় ভদ্রলোকের নিকট থেকে তাঁর নিজ হাতে সই-করা একখানি উত্তর পাওয়া গিয়েছিল। এ্যাসোসিয়েশনের সংগ্রহশালায় সে চিঠি এখনো সুরক্ষিত। ১৯০৯ সালে ইম্পিরিয়্যাল প্রেস কনফারেনস-এর সদস্যদের সঙ্গে আমি যখন অকস্‌ফোর্ড ইউনিয়নে যাই, তখন তার কার্য্যাবলীর কাগজপত্রের মধ্যে মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের হাতে লেখা বিবরণাদি আমাকে দেখান হয়। আমার ঠিক মনে নেই, সম্ভবত তখন তিনি ইউনিয়নের সেক্রেটারী বা প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। সুন্দর ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার লেখা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের কাছে তাঁর যে চিঠিখানি ছিল, তাঁর লেখার কিন্তু ধরণ ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। বয়সের ছাপ পড়েছিল সেই লেখার মধ্যে।

লর্ড রিপনের প্রশাসনের প্রথম দিকের কাজগুলির অন্যতম ছিল ভারণাকুলার প্রেস আইন প্রত্যাহার। হাসির কথা এই যে, যাঁরা একসময় প্রেস আইন দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেছিলেন তাঁরাই এখন একই রকম দৃঢ়তার সঙ্গে তার প্রত্যাহার সমর্থন করতে লাগলেন। সিভিল সার্ভিসের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা তার অপর এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সঙ্গতি রক্ষা করার দায়িত্ব বলে তার কিছু নেই। প্রাচীনেরা এবং উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা যখন যা' নির্দ্দেশ দেন তা' তাঁরা নির্ব্বিচারেই মেনে চলেন। বঙ্গভঙ্গ রদ করার বিষয়ে এরূপ একটি লক্ষণীয় ঘটনা কিছুদিন আগেও দেখা গেছে। বঙ্গদেশে রাজকর্ম্মচারীরা বঙ্গভঙ্গ রদ করাতে ভীষণ আপত্তি তুলেছিলেন। তাঁরা একে তাঁদের চাকরী জীবনের মর্য্যাদার বিষয় বলে ধরে' নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯১১ সালের

২৫শে আগষ্টের যে ডেসপ্যাচ'এ বঙ্গভঙ্গ পরিবর্ত্তনের সুপারিশ করা হয়েছিল, তার মধ্যে বঙ্গদেশের একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন রাজকর্ম্মচারীরও সই ছিল। ইনিই এক সময় বঙ্গভঙ্গের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের পর যে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসৃত হয়েছিল তার জন্ম হয়েছিল এবং তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল এক সরকারী সার্ক্যুলারে। এই সার্ক্যুলারের সঙ্গেও উক্ত রাজকর্ম্মচারী বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। জননায়কগণ রাজকর্ম্মচারীদের এ সমস্ত পরস্পর-বিরোধী উক্তি বা কার্য্যাবলী নিয়ে ঝগড়া করেন না। তবে তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, কিছুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে ভারতে সরকারী চাকরীতে উন্নতি করা যায় না। উন্নতি করতে হলে যখন যে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী যে রকম মত প্রকাশ করবেন তখন নিজের মতকেও তদনুসারে পরিবর্ত্তন করতে পারলেই উন্নতি সম্ভব।

লর্ড রিপন ভাইসরয় হওয়ার পর ভারতের জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জনসাধারণের মধ্যে পূর্ব্বে যে একটা উদাসীনতার ভাব ছিল লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল প্রশাসনে তারা তা' ত্যাগ করে' আন্দোলনে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। কাজেই রাজনৈতিক ক্রমবিবর্ত্তনের পক্ষে মন্দ প্রশাসকেরা তখন হয়েছিল শাপে বর। তারাই তখন জনসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে তাদের অপকর্ম্ম দিয়ে সহায়তা করেছিল, যা হয়ত বছরের পর বছর ধরে' আন্দোলন চালিয়েও সম্ভব হ'ত না। মানুষকে তারাই সংগঠিত হতে বাধ্য করে। তারপর তা' যে তাদের সমস্ত কুকীর্ত্তিকে কেবল ধুয়ে মুছে নিয়ে যায় তাই নয়, তা' হতে গণচেতনার এবং গণজীবনেরও সৃষ্টি হয়। আর এ-সবই ভবিষ্যতের উন্নতি ও প্রতিশ্রুতি স্বরূপ হয়ে চিরকালের মত থেকে যায়। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও লর্ড লিটন ছিলেন দেশের এক মহান উপকারক। এবং সেই অর্থে সাম্প্রতিক কালে লর্ড কার্জ্জন দেশের আরও অধিক উপকার করেছেন।

লর্ড রিপনের পূর্ব্ব ইতিহাস বা তাঁর নিজের সম্পর্কে ভারতে আমাদের বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। তবে দুটি বিষয় ছিল তাঁর অনুকূলে। যে গ্ল্যাডষ্টোন ভারণাকুলার প্রেস আইন বিষয়ে ভারতের জনমতের সমর্থন করতেন, লর্ড রিপন ছিলেন তাঁরই মনোনীত ব্যক্তি।

দ্বিতীয়ত, রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় তাঁকে অশেষ দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি যখন ইংলণ্ডের জনজীবনে ও সামাজিক জীবনে তাঁর প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করে' রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে স্বেচ্ছায় ধ্বংশের মুখোমুখী, সে সময় টাইমস্ পত্রিকা যা' লিখেছিল তা' মনে পড়ছে। তখন আমি ইংলণ্ডে। সে-সময় সেখানে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তা' আমি ভুলি নি। ধর্ম্মের পার্থক্যে তখন মানুষের মনের যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যেত আজকাল বোধ হয় সেরূপ বিরল। টাইমস্ পত্রিকা তার এক প্রধান প্রবন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল, লর্ড রিপনের আর কোন আশা নেই। কিন্তু কোবডেনের মত অবলম্বন করে' তখন শিক্ষিত ভারত টাইমস পত্রিকা যা' নিন্দা করেছিল তারই সমর্থন করেছিল। নিজে যা' বিশ্বাস করতেন তার প্রতি তাঁর একাগ্রতা দেখে আমরা লর্ড রিপনকে প্রশাসক হিসাবে স্বাগত জানিয়েছিলাম। পরবর্ত্তী ঘটনা থেকে দেখা গিয়েছিল আমরা উচিত কাজই করেছিলাম। কারণ কার্য্যভার গ্রহণ করার পর অন্যান্য কথার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, মহামান্যা সাম্রাজ্ঞী তাঁকে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন দেশের নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে দৃষ্টি দেন। কেন না লোকের রাজনৈতিক শিক্ষা বস্তুত সেখানেই আরম্ভ হয়।

যাঁরা দেশের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করছিলেন এই মহৎ নীতি ছিল সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে তা' পূর্ণ করবার জন্য তাঁদের প্রতি খোলা আমন্ত্রণ। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন থেকে আমরা

সকলেই কাজে লেগে গেলাম। আমরা একখানা সার্কুলার জারী করলাম। এবং আমাদের প্রতিনিধিদের মফস্বল সহরগুলিতে পাঠিয়ে দিলাম, যাতে তাঁদের চেষ্টায় সমস্ত সহরের পৌরপ্রতিষ্ঠান-গুলিকে জনমত ও নির্ব্বাচনভিত্তিক করে' পুনর্গঠিত করবার জন্য সেখানকার জনগণ সরকারের কাছে প্রস্তাব করেন। আমি নিজেও ভাগলপুর, মুঙ্গের (বর্ত্তমানে বিহার প্রদেশে), রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা ও বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলে পরিভ্রমণ করি। এসমস্ত স্থানে জনসভার আয়োজন হয় এবং আমি বক্তৃতা করি। আমাদের প্রতিনিধিগণ আরও ভিতরের দিকে বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তখনকার দিনে গোয়েন্দা বিভাগ বলে কিছু ছিল না। রাজনৈতিক কর্ম্মীরা কোথায় যাচ্ছেন, কি করছেন, এসব দেখবার জন্য তাঁদের পেছনে-পেছনে ঘুরে বেড়ান পুলিশ তাদের কর্ত্তব্য বলে মনে করত না। কাজেই আমাদের কাজকর্ম্ম ছিল অনেক সহজ। আমরা যেখানেই গিয়েছি দেশের লোক আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

মফস্বল অঞ্চলে কাজ করা ছিল তখন এক নূতনত্ব। দেশের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য আমরা দেশের দূরদূর অঞ্চলে যে সত্য উৎসাহের সঞ্চার করতে পেরেছিলাম আমার জীবনে তা' আনন্দের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যেখানে গিয়েছি আইনজীবীসংঘগুলি আমাদের সমর্থন করেছে। আর জমিদারগণও আমাদের বঞ্চিত করেন নি। প্রকৃত ঘটনা হ'ল সরকারী মহল তখন রাজনৈতিক কার্য্যকলাপকে সন্দেহের চোখে দেখত না। আর লোকেও সকল প্রকার অসহযোগের প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে আপন-আপন ভাবাবেগ অনুযায়ী নিজ-নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করতেন। একথা সত্য যে, বঙ্গদেশে যত সহর ছিল তার প্রত্যেকটিতে যাওয়া বা সেখানে প্রতিনিধি প্রেরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে এসকল অঞ্চল থেকেও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে আমরা স্থানীয়

অধিবাসীদের লিখিত মতামত সংগ্রহ করেছিলাম। ভাইসরয়-এর প্রস্তাব সম্পর্কে এভাবে দেশের লোকের মতামত জেনে নিয়ে আমরা একখানা স্মারকলিপির খসড়া প্রস্তুত করে টাউন হলে এক জনসভা করলাম।

আমাদের দেশের মনোভাব প্রকাশের এই সুযোগে ভারণাকুলার প্রেস আইন রহিত করার জন্য আমরা ভাইসরয়কে ধন্যবাদ জানালাম এবং অস্ত্র আইন রহিত করতেও অনুরোধ করলাম। এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের উপর আমি নিম্নলিখিত ভাবে এক প্রস্তাবও উপস্থিত করলাম—

"মহামান্য ভাইসরয় বাহাদুর তাঁহার সাম্প্রতিক প্রস্তাব দ্বারা এদেশের জনগণকে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনরূপ যে অপরিমেয় বরদান করিয়াছেন তজ্জন্য এই সভা তাঁহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে। এ সভা সাহস সঞ্চয় করিয়া একান্ত ও দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত এই আশা প্রকাশ করিতেছে যে, মহামান্য ভাইসরয় বাহাদুর এই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন সেগুলির স্বরূপ এ প্রকার হইবে যাহাতে সমুচিত ও সন্তোষজনক ভাবে সমগ্র পরিকল্পনাটিকে সার্থক রূপ দেওয়া যায়। এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়াই এ সভা শ্রদ্ধার সহিত নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে, যথা—(১) স্থানীয় বোর্ড ও পৌর প্রতিষ্ঠান-সমূহের বিধানাবলী নির্ব্বাচনভিত্তিক হওয়া উচিত; (২) তাহাদের সভাপতি তাহাদের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত এবং কোন কারণেই জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা কালেকটর সে সমস্ত পদে নিযুক্ত হইবে না; (৩) যেহেতু এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তাবিত স্থানীয় বোর্ডের সহিত সম্মিলিত করা হইতেছে, সেই হেতু বর্ত্তমান কমিটিসমূহের উপর যে সমস্ত কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা অর্পিত রহিয়াছে তাহাদের পরিসর বৃদ্ধি করা আবশ্যক।"

লক্ষ্য করা যাবে, লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কে যে প্রস্তাব প্রকাশ করেছিলেন, তার প্রধান-প্রধান অংশ উপরোক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই প্রস্তুত হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল (১) জনমত ও নির্ব্বাচনের ভিত্তিতেই লোক্যাল বডিগুলির গঠন, (২) তাদের ক্ষমতার সম্প্রসারণ এবং (৩) লোক্যাল বডিগুলি দ্বারা নিজ-নিজ সভাপতি নির্ব্বাচন। এগুলিই ছিল ভারত সরকারের প্রস্তাবগুলির মৌলিক নীতি। ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ১৮ই তারিখে সভা হয়। সরকারী প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালের অক্টোবর ও ১৮৮২ সালের মে মাসে। জনমত ও সরকারী মতের এক বিশেষ ঐক্যের উদাহরণ এখানেই পাওয়া যায়। এটাও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য হিসাবে লর্ড রিপন তার কিছুদিন পরেই বলেন, দ্রুত গতিতে এমন একটি সময় আসছে যখন ভারতেও জনমত দুর্নিবার হ'বে এবং সরকারের উপর অপ্রতিহত ভাবে প্রভুত্ব করবে। এই পবিত্র পরিপূর্ণতাকে সার্থক করে তুলতে অন্য কোন ভাইসরয় তাঁর চেয়ে অধিক কিছু করেন নি। তাঁর অনুসৃত নীতি ভারতের প্রশাসনের ক্ষেত্রে এক স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে এবং পরে একাধিক ভাইসরয় তারই পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু জনমতকে শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে যে বিরাট আন্দোলন চলছিল, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্ন ছিল তার একটি অংশ মাত্র। এমন কি, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্ন হাতে নেবার আগেও আমাদের যা' ছিল সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা, যথা ভারতে প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠন, তার প্রতি বঙ্গদেশের জননায়কদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছিল। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন একটি কমিটি গঠন করেছিল। আমি তার পূর্ব্বেই এ-বিষয়ে বম্বে সিভিল সার্ভিসের ভূতপূর্ব মিঃ শ এবং

স্যার ডেভিড ওয়েডারবার্ণ-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলাম।

আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাও যে ধীরে-ধীরে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলছিল তাও এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গত শতাব্দীর ছয় দশকে ও তারও আগে আমাদের দেশের নেতাদের সমস্ত চেষ্টা ছিল ভারতের সরকারী দপ্তরগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যক বড়-বড় আস্থাসম্প্রন্ন ও দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপর্য্যায়ের চাকরী যোগাড় করা। ১৮৫৮ সালে মহারাণীর ঘোষণায় মানুষের সমস্ত উচ্চাশা এদিকেই ছুটে চলেছিল। যখন-তখন তাঁরা সেই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করবার জন্য জোর দিতেন। পশ্চিম ভারতে এই আন্দোলনের নায়ক ছিলেন মিঃ নওরোজী ফারছুনজী এবং ভারতের "গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান" মিঃ দাদাভাই নওরোজী। বঙ্গদেশে এই আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করত বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন এবং উৎসাহী প্রচারকদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমানাথ ঠাকুর ও দিগম্বর মিত্রের মত ব্যক্তিগণ।

কিন্তু তখন ক্ষেত্র পরিবর্ত্তনের সময় এসে গেল। উচ্চতর এক মঞ্চ দেখা গেল। আর শিক্ষিত ভারতের সম্মুখে উপস্থিত হ'ল এক উজ্জ্বলতর প্রত্যাশার আলো। সব কিছুর যেমন একটা ক্রমবিবর্ত্তন আছে, জনজীবনের মন্থর গতির মধ্যেও সেরূপ লক্ষ্য করা যায়। গত কয়েক বছরের চেষ্টার ফলে দেশের লোকের মনে এমন এক জাগরণ লক্ষ্য করা গেল যা' অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব। আর তাই করল এক নূতন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি। তখন আর কেবল পূর্ণমাত্রায় চাকরী পাওয়াই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, জাতির আইনপরিষদগুলিতে আমাদের বক্তব্য রাখবার ক্ষমতা লাভের জন্যও আমরা উৎসুক। ওদিকে রয়েছে আমলাতন্ত্র, তা' ভালই হোক

আর মন্দই হোক। আমরা যে কেবল ভারতীয় সামগ্রী মিশিয়ে সেই আমলাতন্ত্রের সদস্য হতে আগ্রহী ছিলাম তা' নয়, আমরা চেয়েছিলাম তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে, তার ব্যবস্থাগুলিকে রূপ দিতে ও পরিচালিত করতে এবং সর্বশেষ সমস্ত প্রশাসন ব্যবস্থাকে জনমতের সম্পূর্ণ অধীনে নিয়ে আসতে। আমাদের এই পথ পরিবর্ত্তন সেদিন খুব কম লোকেই লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে ছিল প্রচুর সম্ভাবনাময় শক্তি। আমাদের দেশের লোকের জন্য অধিক স্থান ও ক্ষমতা আদায়ের সংগ্রামের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমশ আমাদের এই ধারণা হ'ল যে, এটিই আমাদের সব নয়। এটি আমাদের লোকের রাজনৈতিক উৎকর্ষ লাভের একটি অংশ হলেও তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিবেচনা করা চলে না। উচ্চ আদর্শকে অনুসরণ করলে মানুষের মনও উন্নত হয়। অভীষ্টে পৌঁছতে পারলে লাভ যেমন প্রচুর, তার পরোক্ষ ফলও হয় তেমনি দীর্ঘস্থায়ী ও ভবিষ্যতের বহু অভাবনীয় সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। জাতির সমস্ত কাজকর্ম্মের ভিতর দিয়েই তার প্রত্যাশা বিস্তার লাভ করে এবং তার নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ সময় প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠনের দাবী সুনির্দ্দিষ্টভাবেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তার পূর্বে যে সকল গণ-আন্দোলন হয়েছিল সে-সমস্ত ছিল তারই স্বাভাবিক ও সুসংগত পরিণতি।

সপ্তম অধ্যায়

সাংবাদিকতা

যে সকল রাজনৈতিক কাজকর্ম্মে আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম তার বিবরণ দেওয়া আপাততঃ বন্ধ করে' আমি আমার একটি ব্যক্তিগত কাজের কথা উল্লেখ করব, যা, আমার বিশ্বাস, আমাদের রাজনৈতিক কাজকর্ম্মের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে ভারতে সংবাদপত্রের কণ্ঠ ছিল ক্ষীণ আর আজকের তুলনায় তার শক্তিও ছিল অত্যন্ত দুর্ব্বল। তবুও প্রচার কার্য্যে তাহাই ছিল এক বড় রকমের অস্ত্র। আমার মনে হ'ল আমাদের রাজনৈতিক কাজের জন্য নিজেদের একখানা সংবাদপত্র থাকা বিশেষ দরকার। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার দৃষ্টান্ত আমার সামনেই ছিল। কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদনায় তা' বঙ্গদেশে এবং সম্ভবত ভারতেও এক প্রধান ভারতীয় সংবাদপত্র হয়ে উঠেছিল। আর সরকারের উপর ও সে সঙ্গে জনসাধারণের উপর তার প্রভাবও ছিল বিস্তর।

আমি ইচ্ছা করলে আমার নিজের পক্ষে একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ করা বা কোন এক পুরাতন সংবাদপত্র নিয়ে চালান সম্ভব ছিল। আমি শেষের পথটিই বেছে নিলাম। আমি চিরদিন পুরাতন ভিত্তির উপর কিছু গড়ে তোলাই পছন্দ করতাম। সারা জীবন আমি যা কিছু করেছি, তাতে সব সময়েই নূতনকে এড়িয়ে চলেছি। হয়ত ব্রাহ্মণ হিসাবে পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই ছিল আমার স্বভাব। প্রাচীন ভিত্তির উপরেই আমি সব সময় নির্ভর করতাম। অবশ্য তাকে যে আমি নির্দোষ মনে করতাম তা' নয়। তবে নূতন কিছু করা অপেক্ষা জীর্ণ-পুরাতনের পুনর্গঠনেরই পক্ষপাতী ছিলাম আমি।

ঘটনাচক্রে আমার একখানা নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ এল। সে-সময় বাবু বেচারাম চাটার্জীর সম্পাদনায় 'বেঙ্গলী' নামে একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ হ'ত। তিনি নিজেই ছিলেন তার স্বত্বাধিকারী। পত্রিকাখানির কাটতি তখন খুব কমে গেছে। শ' দুই মাত্র তার গ্রাহক। আমাদের উভয়েরই বন্ধু বাবু রমানাথ লাহার সাহায্যে বেচারাম বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। বাবু রমানাথ লাহার নাম লোকে আজকাল ভুলে গেছে। তিনি ছিলেন গত শতাব্দীর ছয়-সাত দশকে হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা সলিসিটর। আজকাল ভারতীয় সলিসিটরের সংখ্যা অনেক। কিন্তু তখন এদেশীয়দের মধ্যে কেবল মিঃ ডবল্যু. সি. বোনার্জীর পিতা গিরীশচন্দ্র ব্যানার্জী এবং রমানাথ লাহাই আইনের এই শাখায় ব্যবসা করার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছিলেন। রমানাথ-বাবু একজন ভাল আইনজ্ঞ ছিলেন। বন্ধু হিসাবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বাসী ও সরল। তাঁরই চেষ্টায় দরদস্তুর ঠিক করে' ১৮৭৯ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে আমি 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হই। দশ টাকা দিয়ে আমি বেচারাম চাটার্জীর নিকট থেকে পত্রিকার সুনাম বা গুডউইলও কিনে নিলাম। বেচারাম-বাবু বিনা পয়সাতেই কাগজের সব স্বত্ব দানপত্র করে দিতে চেয়েছিলেন। রমানাথ-বাবু যখন বললেন যে, আমাদের ক্রয়বিক্রয় বিষয়কে আইনত সিদ্ধ করতে হলে যা হোক কিছু একটা মূল্য দেওয়ার প্রয়োজন, তখন বেচারাম-বাবু এই প্রতীক মূল্য স্বরূপ উক্ত সামান্য পরিমাণ টাকা গ্রহণ করতে রাজি হন। মুদ্রাযন্ত্রটি ক্রয় করতে লেগেছিল ১৬০০ টাকা। তারও ৭০০ টাকা আমি আমার এক বন্ধুর নিকট থেকে ধার করি। বন্ধু সুদ নিতে আপত্তি করলেন। দু' বছরে এ ধারটি আমি পরিশোধ করি। বিষয়গুলি নিতান্তই তুচ্ছ। তবুও যাঁদের শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদের ফলে 'বেঙ্গলী'

পত্রিকাখানি আমার হাতে আসে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্য এগুলি উল্লেখ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ব্যবসা করব এরকম কোন ধারণা আমার মনের কোণেও ছিল না। যে জনসেবার কাজে আমি নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলাম তার সুবিধার্থেই আমার এই পদক্ষেপ। কাগজ হাতে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি তা ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলাম। যদি পত্রিকা পরিচালনার অন্যান্য খরচা এ্যাসোসিয়েশন বহন করতে প্রস্তুত থাকে তবে বিনা বেতনে পত্রিকার সম্পাদনা করতে আমি সম্মত ছিলাম। সে ক্ষেত্রে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের যেমন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা ছিল ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনেরও তেমনি হবে 'বেঙ্গলী' পত্রিকা। কিন্তু অসুবিধা ছিল এই যে, কাগজ চালিয়ে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। আমাদের এ্যাসোসিয়েশন ছিল নূতন। টাকাপয়সার দিকেও তার অবস্থা তেমন সুবিধাজনক ছিল না। কাজেই এ্যাসোসিয়েশনকে এ কাগজ চালাবার খরচের ধাক্কায় ফেলা সমীচীন বোধ হ'ল না। পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ থেকে প্রমাণ হ'ল যে, এ্যাসোসিয়েশনের এ কাজ উচিতই হয়েছিল। কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই তার নিজস্ব বিশেষ ধরণের কাজ এবং বিভিন্ন প্রকারের কাজ করার সঙ্গেসঙ্গে ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু গ্রাহক ও পাঠকদের মধ্যে বহুল প্রচারিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকার মত একখানা পত্রিকা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। তবে এ যেন অনেক পরের ঘটনারই পূর্ব্বোক্তির চেষ্টা করছি।

১৮৭৯ সালের জানুয়ারীতে আমি যখন 'বেঙ্গলী' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হই তখন তা' ছিল একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ভিন্ন বঙ্গদেশের সমস্ত পত্রিকাই ছিল সাপ্তাহিক। এমন কি, অত্যন্ত প্রভাবশালী পত্রিকাগুলিও ছিল তাই। 'তাজা খবর' জানবার জন্য জনসাধারণের তখন তেমন

আগ্রহ দেখা যেত না। অধিকাংশ ভারতীয় পাঠক তখন সপ্তাহান্তর সংবাদ ও তার উপর মন্তব্য ইত্যাদি পেলে সন্তুষ্ট থাকত। মনে পড়ছে, একবার কোন এক সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, তথা শিক্ষা ও সংস্কৃতির একজন ধারক ও বাহক, আমায় বলেছিলেন যে, বেঙ্গলী (তখন সাপ্তাহিক) পত্রিকাখানি পড়তে তাঁর সপ্তাহ কেটে যায়। এ দৈনিক হলে তিনি যে কি করবেন তা' ভেবেই পাচ্ছিলেন না। তা' থেকেই ধারণা করা যায় ত্রিশ বছর পূর্ব্বে বাঙ্গালীদের মন কি ভাবে কাজ করত। দৈনিক ত' মাত্র সেদিনের ঘটনা। কিন্তু ইতিমধ্যেই পত্রিকাজগতে তা' এমন এক স্থান অধিকার করেছে যে, সেখানে তার সঙ্গে সাপ্তাহিকের প্রতিযোগিতা করা দূরে থাকুক, কেবলমাত্র দৈনিকের অনুষঙ্গ ছাড়া তার আর কোন স্থান নেই।

আমার সাংবাদিক কর্ম্মের প্রাথমিক অবস্থায় আমার পরলোকগত বন্ধু আশুতোষ বিশ্বাসের নিঃস্বার্থ শ্রম আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছিল। ভবানীপুরে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটিস্ ইনিষ্টিট্যুশনে এক সভায় শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে এক বক্তৃতা করতে গিয়ে আমি তাঁকে আবিষ্কার করেছিলাম। সে সভায় তিনিও বক্তৃতা করেছিলেন। তাঁর কথা আমার মনে বেশ রেখাপাত করেছিল। কয়েকটি মাত্র কথার সাহায্যে যথাযথ বিষয়টি তাঁর বাকপটুত্বে যেন হৃদয়ের গভীর প্রদেশ থেকে উৎসারিত হতে লাগল। তা' থেকে প্রকাশ পেয়েছিল লোকটি কি এবং তাঁর মধ্যে কি ছিল। আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমি তাঁকে আমন্ত্রণ জানালাম। সেই প্রথম দর্শনেই আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল একমাত্র নিষ্ঠুর মৃত্যুই তা' বিনষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল। তিনি আমাকে তাঁর গুরু বলতেন। বাস্তবিক পক্ষে তা' কেবল কথার কথা ছিল না, তা' থেকে অনেকখানি বেশীই ছিল। সত্যই তিনি আমার যেন শিষ্যই

হয়ে গিয়েছিলেন। যেরূপ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি আমাকে অনুসরণ করতেন আজকাল সেরূপ কচিৎ দেখা যায়।

প্রতি শনিবার সকালে পত্রিকা প্রকাশ করা হ'ত। প্রুফ দেখা, প্রয়োজন হলে নকল করা, মুদ্রকদের মুদ্রণ সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়া ইত্যাদি কাজ কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে শুক্রবারে বহু রাত্রি পর্য্যন্ত করতে হ'ত। ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্য্যন্ত আমার বন্ধু এবং সহকর্ম্মী আশুতোষ এই ক্লান্তিকর কাজে আমার সঙ্গে ছিলেন। পরে ভবানীপুর থেকে 'গার্ডিয়ান' নাম দিয়ে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ হওয়ার পর তিনি তাতে যোগ দিয়ে তার সহায়তা করতে থাকেন। তিনি এক নিদারুণ দুক্রিয়ার শিকার হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার ঋণের কথা স্বীকার করছি।

আমার বন্ধু ছিলেন আইনজীবী। ব্যবসায়ে উন্নতির সাথে সাথে সাংবাদিকতার প্রতি তাঁর আগ্রহ হ্রাস পেল। এবং তিনি অবশেষে পত্রিকার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কিন্তু আমাদের বন্ধুতা ও ভালবাসা পূর্ব্বের মতই শেষ অবধি চলতে থাকে। যখনই আইন বিষয়ক কোন কারণে তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করতাম, আমি তাঁর কাছে গেলে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই তিনি তা' দিতেন। রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি ছিলেন আমাদেরই দলভুক্ত। বেঙ্গলীর সঙ্গে যুক্ত থাকার সময়ে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের কার্য্যে সহায়তা করবার উদ্দেশ্যে তিনি একা উত্তর ভারত পরিভ্রমণেও গিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের শিকার হয়ে পড়েন। তাঁর অপরাধ ছিল তিনি সরকার পক্ষের উকিল হয়ে 'আলীপুর বোমা' মামলায় সরকারকে সাহায্য করছিলেন। তিনি ফৌজদারী মামলায় ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ। আইন সম্পর্কে তাঁর সূক্ষ্ম জ্ঞান ও নিপুণতা আসামীদের পক্ষে ভয়ের

কারণ হয়ে উঠে। সম্ভবতঃ এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই তাঁকে মারাত্মক ভাবে আক্রমণ করে' হত্যা করা হয়েছিল। একজন সন্ত্রাসবাদী (যাঁর একখানি হাতও ছিল অক্ষম) আলীপুর কোর্টের অভ্যন্তরে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনেই গুলি করে' তাঁকে হত্যা করে। তার পূর্বে তাঁকে সতর্ক করে' বহু চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর জীবন রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। তিনি ছিলেন ভাগ্যবিশ্বাসী। কপালের লেখা খণ্ডন করা মানুষের অসাধ্য ভেবে সরকারের সাহায্য নিতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন।

আশুতোষ ছিলেন সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং আইন বিষয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। নানা ধরণের প্রাচীন ও নবীন মতের অদ্ভুত অদ্ভুত সব ধারণা তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিল। প্রতি রবিবারে কালীবাড়ী গিয়ে ভক্তিভরে পূজা দিতেন, অথচ যারা নব্যপন্থী হয়ে খাওয়াদাওয়ার কোন বাদবিচার করত না তাদের সঙ্গে অম্লান বদনে খাওয়াদাওয়া করতে তাঁর আপত্তি হ'ত না। তাঁর সামনে যদি ভক্ষ্য অভক্ষ্য খাবার মিশিয়ে রাখা হ'ত, তবে তিনি বিনা আপত্তিতে অখাদ্যগুলি খেয়ে নিতেন। এ-ঘটনাগুলির উল্লেখ করে' আমি দেখাবার চেষ্টা করছি যে, যখন রক্ষণশীল শক্তিগুলি বিপরীত শক্তিগুলির সঙ্গে বসবাস করতে বাধ্য হয় তখন হিন্দুসমাজে অনেক ক্ষেত্রে একটা মেনে নেবার মনোভাব প্রকাশ পায় যা' পূর্বে কখনো হ'ত না। নানা প্রকার কঠিন বাধানিষেধ থাকা সত্ত্বেও একটা সহনশীলতার ভাব দ্রুত এগিয়ে চলেছে। অত্যন্ত ধীরে হলেও হিন্দু সমাজ এখন ক্রমশ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টায় অবিরাম গতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

যে ভাবেই হোক, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিজনবর্গের জন্য যৎসামান্য কাজ করবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করছি। তাঁর ছেলেকে আমি নিজে লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার এডওয়ার্ড

বেকারের কাছে নিয়ে গিয়ে তার জন্য একটা সরকারী চাকরীর ব্যবস্থা করে' দিয়ে তাঁর পরিবারের জন্য একটা সমুচিত অর্থাগমের সুযোগ করে দিয়েছিলাম। স্যার এডওয়ার্ড বেকার খুব সহৃদয়তার সঙ্গেই বিষয়টি গ্রহণ করেছিলেন। যখনই কোন ব্যক্তিগত বিষয়ে কারও প্রতি কোন অন্যায়ের বিহিত করার প্রয়োজন হ'ত বা যখনই সরকারের দাক্ষিণ্যকে বিশেষভাবে প্রদর্শন করার আবশ্যক হত, তখনই স্যার এডওয়ার্ড বিশেষ যত্নের সঙ্গে তা' করতেন বলে তাঁর সুনাম ছিল।

আমার বন্ধু বাবু আশুতোষ বিশ্বাস ও আমি পত্রিকাখানার সম্পাদনা করতাম। আমরা তা' থেকে কোন মুনাফা পেতাম না। তবে আমাদের খরচপাতি চলে যেত। ক্ষতি হবার কোন সম্ভাবনা তাতে ছিল না। যে বছর আমি তা' হাতে নিলাম সে বছর থেকে ক্ষতি পড়া বন্ধ হল। মুদ্রাযন্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করতে আমাদের সামান্য যা' ধারদেনা হয়েছিল তা' আমরা পরিশোধ করে দিলাম। সাংবাদিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে' আমরা সমালোচনা করতাম, মন্তব্য করতাম, আমাদের সমর্থক সৃষ্টি করতাম এবং অনেক সময় শত্রুও সৃষ্টি করতাম। ১৮৮৩ সালে বেঙ্গলী-কে জড়িয়ে আদালত অবমাননার এক মামলাও হয়েছিল। তবে তার পূর্বে একটি ঘটনা হয়। সেটি এখানে বলে রাখি। বঙ্গদেশের জনৈক লেফটেন্যান্ট গভর্ণর কার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করে বিদায় নেবেন। তাঁর কোন কোন বন্ধু ও শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি প্রস্তাব করলেন, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য টাউন হলে ব্যবস্থা করা হোক। বঙ্গদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর হিসাবে তিনি খুব কৃতিত্বের সঙ্গেই কাজ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সেই হেইলীবারির অধিবাসী এবং পুরোণো দিনের কর্ম্মচারীদের মত একজন কর্ম্মচারী অভিজাত সম্প্রদায় ও বাঙ্গালী নেতৃবর্গের মধ্যে তাঁর অনেক বন্ধু ছিল। কৃষ্ণদাস

পালকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে খুব সদ্ভাব ছিল। তাঁর সুখ্যাতি করে একথাও বলা যেতে পারে যে, তিনি সামাজিক ব্যাপারে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখতেন না। কোলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস-এর মিঃ বি. এল. গুপ্ত একটি মন্তব্য করেছিলেন যার ফলে ইলবার্ট বিলের সৃষ্টি এবং যা' নিয়ে হয়েছিল অশেষ বাদানুবাদ। আমার মনে হয়, তিনি যদি লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের পদে তখনো বহাল থাকতেন, তিনি সিভিল সার্ভিসকে নিজ আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারতেন এবং সেক্ষেত্রে ইলবার্ট বিলের পরিণতিও অন্যরূপ হ'ত।

এ সমস্ত বাস্তবিকই তাঁর কৃতিত্বের কথা। কিন্তু তাঁর মজ্জায়-মজ্জায় তিনি ছিলেন এক সাজ্ঘাতিক রকমের আমলাতন্ত্রী। সমস্ত প্রগতিশীল অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর ছিল এক গভীর সন্দেহ। 'বেঙ্গল আণ্ডার লেফটেন্যান্ট গভর্ণরস্' পুস্তকে মিঃ বাকল্যাণ্ড বলেছেন যে, লর্ড রিপন তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, কোন তাত্ত্বিক কথা দিয়ে বা অস্পষ্ট প্রবণতা সৃষ্টি করে স্যার এসলি ইডেনকে নড়ান এক প্রকার অসম্ভব ছিল। এ-কথাটি কেবল মোলায়েমভাবে বলা যে, তাঁর কোন আদর্শের বালাই ছিল না। আর প্রশাসনিক হিসাবে কেবল মাত্র দৈনিক কাজ সাঙ্গ করে সন্তুষ্ট থাকার অতিরিক্ত তিনি কিছুই জানতেন না। ভারণাকুলার প্রেস আইনের তিনি এক বিরাট সমর্থক ছিলেন। কোন স্বাধীন অনুষ্ঠান বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি তাঁর কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। প্রতিনিধিমূলক সরকার সম্বন্ধে তার মতবাদ ছিল—নিজের দেশেই এর অবস্থা এক অসুস্থ চারাগাছের মত। ভারতে তা' চেষ্টা করার ত কোন প্রশ্নই উঠে না।

বঙ্গদেশের নব্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা স্বাধীন প্রগতিশীল নূতন ভারতের জন্মলাভের অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁদের কাছে এরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন কোন শাসকই শ্রদ্ধা বা প্রীতি আশা করতে পারেন না। তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুদের বা তাঁদের সুপারিশে অন্যদের উপাধি, বৈশিষ্ট্য, সরকারী চাকরী ইত্যাদি দিয়ে তাঁদের নিকট থেকে প্রীতি অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং তাঁরা যে তাঁকে সম্মান দেখাতে আগ্রহী হবেন তা' স্বাভাবিক। কিন্তু যে জনগণ তাঁর প্রশাসনের মধ্যে তাঁকে সম্মান দেখাবার উপযুক্ত কিছু কখনো দেখেন নি, সেই জনগণের নামে কিছু বলবার অধিকার এ সমস্ত লোকের ছিল না। আমি এই বিষয়টি নিয়েই বেঙ্গলী পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ লিখি। আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছিলাম যে, যদি কোন জনসভা ডাকা হয় তা' হলে সেই সমাবেশকে অন্যায়ভাবে জনসভার রূপ দেওয়ার জন্য প্রতিবাদ করা হবে। তাতে কাজ হ'ল। টাউন হলের সভাকে জনসভা না বলে, তাকে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের সমাবেশ বলেই অভিহিত করা হ'ল। এ নিয়ে কারও আপত্তির কারণও ছিল না, আর কেউ আপত্তিও উঠাল না। বিদায়ী লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের 'বন্ধু ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীলেরা' যেমন ইচ্ছা করতে পারে। তাতে জনসাধারণের বাধা দেবার বা প্রতিবাদ করার কোন অধিকার নেই। এ থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, বঙ্গদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ তখন এক জীবন্ত শক্তি পরিগ্রহ করেছে। ভবিষ্যতে তার সঙ্গেই শক্তির পরীক্ষা হবে। আর এ বিজয় সেদিন ছিল বাস্তবিকই লক্ষণীয়।

অষ্টম অধ্যায়

আদালত অবমাননার মামলা ও কারাবাস

আমার সাংবাদিক জীবনের পরের ঘটনা যা' লেখা উচিত মনে করি তা' হ'ল আমার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা আর তার ফলে আমার দু' মাসের কারাদণ্ড। আমাদের যুগে জনসাধারণের কাজ করতে গিয়ে কারাবাস ভোগের প্রথম সৌভাগ্য আমারই হয়েছিল এবং এজন্য আমি গর্ব্ব অনুভব করি (কারণ তা' আমি সেভাবেই গ্রহণ করেছিলাম)। স্বরাজ্যপন্থীরা আজকাল প্রকৃতপক্ষে এই কারাবাসকেই জনসেবার যোগ্যতার একটি প্রমাণ বলে মনে করেন। যাই হোক, এমন কি, তাঁদের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করলেও আমার এ যোগ্যতা আছে বলে' আমি দাবী করতে পারি এবং এ যোগ্যতা আমি অর্জ্জন করেছি তাঁদের সকলেরই আগে।

অবমাননা মামলার ঘটনাগুলি ছিল এরূপ। ১৮৮৩ সালের ২রা এপ্রিলের বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই নিবন্ধটি প্রকাশ হয়েছিল—

"হাইকোর্টের বিচারপতিগণ এ পর্য্যন্ত জনসমাজের একান্ত শ্রদ্ধাই অর্জ্জন করে এসেছেন। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তাঁরা বহু ক্ষেত্রেই ভুল করেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের কর্ত্তব্য সম্পাদনেও সাঙ্ঘাতিকরূপে নিষ্ফল হয়েছেন। কিন্তু কোন সাধারণ বিচারবুদ্ধির বা সৌকর্য্যের প্রতি অবহেলা কিম্বা কোন বিশেষ আবেগকে এই ভ্রান্তির কারণ বলা চলে না। বর্ত্তমানে কিন্তু আমাদের এখানে এমন একজন বিচারপতি রয়েছেন, যিনি বাস্তবিক পক্ষে যদি জেফ্রে ও স্ক্রগদের যুগের কথাগুলি ভুলেও গিয়ে থাকেন, তবুও তিনি বিচারক হিসাবে তাঁর অনতিদীর্ঘ এই কার্য্যকালের মধ্যেই এমন যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন যা' থেকে অনায়াসে ধারণা করা

যায় যে, তিনি এই উচ্চপদের কত অযোগ্য এবং এদেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারকদের চিরাচরিত ঐতিহ্য রক্ষায় আপন স্বভাব বশতই কি পরিমাণ অনুপযুক্ত। বিভিন্ন সময়ে এ সকল স্তম্ভে আমরা বিচারপতি নরিস-এর বিচারপদ্ধতিসমূহের উল্লেখ করেছি। কিন্তু তার চরম পরিণতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এখন। এবং আমাদের এক সমসাময়িক পত্রিকার স্তম্ভে যেভাবে ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' নামক পত্রিকাখানিই এবিষয়ে আমাদের নজির। ঘটনাগুলি তার মধ্যে নিম্নোক্ত ভাবেই বিবৃত হয়েছে—বিচারপতি নরিস হুগলীতে আগুন জ্বালাতে বদ্ধপরিকর। তাঁর এরূপ জবরদস্তির সর্ব্বশেষ দৃষ্টান্ত হ'ল বিগ্রহ শালগ্রাম শিলাকে সনাক্ত করবার উদ্দেশ্যে আদালতে টেনে আনা। হিন্দু বিগ্রহ কার হেপাজতে থাকবে এ বিষয় নিয়ে অতীতের সুপ্রীম কোর্টে ও বর্ত্তমান হাইকোর্টে অনেক মামলা দায়ের হয়েছে। কিন্তু হিন্দু পরিবারের কোন বাস্তুদেবতার কপালে তাকে আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এরূপ সৌভাগ্য ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি। আমাদের কোলকাতার বিক্রমাদিত্য বা ড্যানিয়েল বিগ্রহের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন যে, ওটি একশত বছরের প্রাচীন হতেই পারে না। কাজেই বিচারপতি মিঃ নরিস কেবলমাত্র আইনজ্ঞ ও চিকিৎসাবিশারদই নন, তিনি আবার হিন্দু বিগ্রহাদি সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞও বটে। তিনি যে কি নন বলা শক্ত। কোলকাতা সহরের গোঁড়া হিন্দুরা তাঁদের বাড়ীর বাস্তুদেবতাদের বিগ্রহগুলিকে আদালতে টেনে নিয়ে যেতে দেখে চুপ করে থাকবেন কি না তার বিচার তারাই করবেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় না যে, সরকারীমহল থেকে এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যাতে এই অদ্ভুতস্বভাববিশিষ্ট দণ্ডমুণ্ডের তরুণ কর্ত্তাকে তাঁর গুরুদায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে।

যে বিচারক মানুষের মনের অবস্থা সম্পর্কে এতই অজ্ঞ ও তাদের চরম বিশ্বাসের প্রতি এতই অশ্রদ্ধাশীল যে, যে পূজার সামগ্রীকে ধর্ম্মীয় অনুশাসন অনুসারে পবিত্র হয়ে একমাত্র ব্রাহ্মণেরাই স্পর্শ করতে পারে, তাকে আদালতে টেনে নিয়ে তা' পরীক্ষা করেন, তাঁর সম্পর্কে আমরা কী ভাবতে পারি? এ সমস্ত কার্য্যকলাপের প্রতি ভারত সরকার কি দৃষ্টি দেবেন? সর্ব্বোচ্চ সরকার চিরদিন মানুষের ধর্ম্মীয় বিশ্বাসকে সযত্নে রক্ষা করেন বলেই ত আমাদের ধারণা।

কিন্তু এস্থলে এমন একজন বিচারপতি রয়েছেন যিনি ন্যায় বিচারের নামে মানুষের মনে এক প্রতিরোধস্পৃহা জাগিয়ে তুলেন এবং নিষ্ঠাবান হিন্দুদের মতে ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে অপবিত্র করতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। আমরা এই নিবন্ধে বর্ণিত ঘটনাবলীর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নেই যে, সরকারীমহল উক্ত বিচারকের আচরণের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।"

উপরোক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধটির ভিত্তি ছিল অধুনালুপ্ত "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন" পত্রিকা। বাবু ভুবনমোহন দাস (মিঃ সি. আর. দাসের পিতা) হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা সলিসিটর ছিলেন। আবার তিনিই ছিলেন ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকাতে প্রকাশিত উক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে তখন কেহ কোন প্রতিবাদ করে নি। বিশেষত তিনি ছিলেন একজন সলিসিটর ও আদালতের কর্ম্মচারী। সুতরাং হাইকোর্ট সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর সমস্ত কিছুই জানা ছিল বলে ধরে নিতে আমার মনে কোন আপত্তি হয় নি। এজন্য তাঁর সম্পাদনায় যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বর্ণিত ঘটনাকে আমি সত্য ঘটনা বলেই মনে করে নিয়েছিলাম। তাঁর পত্রিকার মধ্যে যা' ছিল আমি তারই সারাংশ আমার পত্রিকায় তুলে দিয়ে আমার নিবন্ধটি লিখে মন্তব্য করেছিলাম।

তার কয়েকদিন পরেই আদালত অবমাননার দায়ে আমাকে কেন অভিযুক্ত করা হবে না তার কারণ প্রদর্শন করবার জন্য হাইকোর্ট থেকে এক নির্দ্দেশনামা আমার উপর জারি হ'ল। আর ৫ই মে শুনানীর দিন ধার্য্য ছিল। একে সময় অত্যন্ত অল্প। তার উপর আমার পক্ষ সমর্থন করে' মামলা করবার জন্য কোন ব্যারিষ্টারকেও আমি তখন পাচ্ছিলাম না। মিঃ মনোমোহন ঘোষ তখন অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। অবশেষে মিঃ ডবল্যু. সি. বোনার্জী আমার পক্ষ সমর্থন করতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু তা এই নির্দ্দিষ্ট শর্তে যে, আমি বিচারপতি মিঃ নরিস সম্পর্কে যে কটূক্তি করেছি তজ্জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব। বিচার করে দেখলাম, মানসিক উত্তেজনার বশে অতিরিক্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমি যে জেফ্রে ও স্ক্রগদের সঙ্গে বিচারপতি মিঃ নরিস-এর তুলনা করে অভিযোগমূলক ছত্রটি লিখেছিলাম তা' আমার পক্ষে উচিত হয় নি এবং তা' সমর্থন করার মতও আমার কিছু ছিল না। এ অবস্থায় সত্বর আমি মিঃ বোনার্জীর শর্তটি মেনে নিলাম।

পাঁচই মে পাঁচজন বিচারপতি নিয়ে গঠিত পূর্ণ আদালতে (ফুল-বেঞ্চে) আমার মামলা উঠল। এই বিচারকমণ্ডলীর প্রধান ছিলেন প্রধান বিচারপতি পরলোকগত স্যার রিচার্ড গার্থ। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ছিলেন বিচারপতিগণের অন্যতম। ১৮৮০ সালে আমি কোলকাতা থেকে গিয়ে ব্যারাকপুরে বাস করতে থাকি। এই মামলার সময়েও আমি সেখানেই বাস করছিলাম। মামলার দিন সকালে আমি আমার ব্যারাকপুরের বাসভবন থেকে হাইকোর্টে এলাম। আমার স্ত্রীর নিকট থেকে বিদায় নেবার সময় তাঁকে বলে এলাম যে, সম্ভবত আমার কারাদণ্ড হবে। সেজন্য আমি আমার বিছানাপত্র, বাধ্যতামূলক অবসর যাপনের উপযুক্ত কিছু বই ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত হয়েই চলে এসেছিলাম।

বেলা সাড়ে দশটার মধ্যেই আমি আদালতে হাজির হলাম। আদালত প্রাঙ্গনে আর তার চতুষ্পার্শে অসংখ্য লোকের বিরাট জনতা সমবেত হয়েছে। ভারতীয় ও ইউরোপীয় পুলিশের এক মস্ত দলও সেখানে উপস্থিত রয়েছে। ছাত্ররাও দলে-দলে এসে আদালতে অপেক্ষা করছে। এদের অনেকে পরে সম্রাটের অধীনে বহু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। দণ্ডাদেশ প্রকাশ হওয়ার পর যে বিক্ষোভ প্রদর্শন আরম্ভ হয় এই ছাত্রেরাই তার নেতৃত্ব নেন। সমগ্র বিশ্বের তরুণদের একই রীতি অর্থাৎ পুলিশের প্রতি ঢিল নিক্ষেপ করা ও পাথর ছুঁড়ে জানালা ইত্যাদির কাঁচ ভাঙ্গা। এ দুর্বিনীত যুবকদের মধ্যে একজন ছিলেন আশুতোষ মুখার্জী। পরবর্ত্তীকালে ইনি হাইকোর্টের বিচারপতি ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অপর এক দুর্বিনীত যুবক আইনভঙ্গের অভিযোগে দণ্ডিত হয়ে এক সপ্তাহ কারাবাস ভোগ করেছিলেন। প্রেসিডেন্সী জেলের মধ্যে যেখানে আমাকে রাখা হয়েছিল ঠিক তার বিপরীত দিকে একটি কুঠুরীতে সেই যুবককেও রাখা হয়েছিল। প্রতিদিন সকালের দিকে তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে' আমাকে প্রণাম জানিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। শুনেছি পরে তিনি সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। উপরোক্ত ঘটনার দরুণ তাঁর অথবা সরকারের কোন ক্ষতিই হয় নি। বস্তুত এ ধরণের ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে' তার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আরোপ করে' ও তার মধ্যে যা' নেই তা' দিয়ে তার অর্থ করবার চেষ্টা করেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল করা হয়। এ ধরণের উচ্ছৃঙ্খলতা যদি এখন কোন যুবক করে হয়ত সারা জীবনের জন্যই সে সকল প্রকার সরকারী কাজের অনুপযুক্ত বলেই বিবেচিত হবে। সমান অধিকারের জন্য সংগ্রাম তখন সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। আর সরকারী মনোভাবও ছিল তখন বর্ত্তমানের তুলনায় নরম ও উদার।

সৌভাগ্যবশত পুরোণো দিনের অবস্থায় ফিরে যাবার একটি সম্ভাবনা এখন আবার দেখা যাচ্ছে।

হাইকোর্টের সন্নিকটস্থ রাস্তাগুলি থেকে আদালতের মধ্যে যে ঘরে বিচারকদের বসবার কথা সেখানেই ফিরে আসা যাক। ঘরের মধ্যে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। মেজেতে বা গ্যালারীতেও কোথাও এক বিঘত পরিমাণ স্থান খালি ছিল না। লোকজনদের ঠেলে আমার কৌঁসুলীকে নিয়ে অতি কষ্টে আমাকে অগ্রসর হতে হ'ল। এগারটা বেজে গেছে। বিচারপতিগণ তখনো আসন গ্রহণ করেন নি। তাঁরা সকলেই প্রধান বিচারপতির ঘরে বসে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। কিজন্য এই আলোচনা তা আমরা পরে জেনেছিলাম। আমাকে কি সাজা দেওয়া হবে তাই নিয়ে সেখানে চলছিল গভীর পরামর্শ। বিচারকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ইউরোপীয়। তাঁরা ছিলেন আমাকে কারাদণ্ড দেবার পক্ষপাতী। বিচারপতি মিঃ রমেশচন্দ্র মিত্র জোর দিচ্ছিলেন যে, কেবল অর্থদণ্ড দিলেই যথেষ্ট হবে। শুনেছিলাম তার আগের দিন প্রধান বিচারপতি স্বয়ং তাঁর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে, কথা বলে তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, অধিকাংশ বিচারপতির সঙ্গে একমত হওয়াই বিচারপতি মিঃ মিত্রের পক্ষে সঙ্গত। কিন্তু প্রধান বিচারপতির সে চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছিল। বিচারকদের মিলিত আলোচনাতেও সে সমস্ত পুরাতন যুক্তির অবতারণা হ'ল এবং সে সঙ্গে অপরাপর বিচারকও তাঁদের স্ব-স্ব প্রভাব প্রয়োগ করে' উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বিচারপতি মিঃ মিত্র তাতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। পূর্ব্বে টেইলারের মমলায় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণ পিকক্ রায় দিয়েছিলেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে অর্থদণ্ডই যথেষ্ট। বিচারপতি মিঃ মিত্র সেই নজিরের উপর নির্ভর করে অন্যদের থেকে ভিন্ন মত দিলেন।

অবশেষে বেলা যখন প্রায় সাড়ে এগারটা তখন বিচারপতিগণ এসে আসন গ্রহণ করলেন। প্রধান বিচারপতি স্বয়ং অধিকসংখ্যক বিচারকের পক্ষ থেকে তাঁর রায় পাঠ করলেন এবং নিঃসন্দেহে পরে লেখা এক খণ্ড কাগজে জুড়ে দিলেন যে, তিনি নিজে এবং তাঁর সহকর্ম্মিগণ বিচারপতি মিঃ মিত্রের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। এর পর বিচারপতি মিঃ মিত্র তাঁর ভিন্নমতের পরিপোষক রায় পাঠ করার পর বিচারপতিগণ আসন ছেড়ে উঠে গেলেন। আদালতকক্ষ থেকে জনতাও ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গেল।

বাইরে রাস্তায় যে হাজার-হাজার লোক সমবেত হয়েছিল তাদের মধ্যে ঘৃণা ও উত্তেজনার অন্ত ছিল না। আমার জন্য আদালত ঘরের দরজাতে বন্দীপরিবহন পূর্ব্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু জনতার আচরণ লক্ষ্য করে' বিচারপতিদের জন্য যে স্বতন্ত্র দরজা আছে আমাকে সে পথে নিয়ে এক ব্যক্তির নিজস্ব গাড়ীতে অনেক রাস্তা ঘুরিয়ে প্রেসিডেন্সী জেলে হাজির করা হ'ল। তখন জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন মিঃ ল্যারিমোর। তিনি আমার অপেক্ষাতেই ছিলেন। বেশ সহৃদয় আইরিশ ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে পূর্ব্ব থেকেই আমার বন্ধুত্ব ছিল। কোলকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হিসাবে এক টেবিলে বসে আমরা কাজও করেছি। তিনি তাঁর পদমর্য্যাদার সীমা লঙ্ঘন না করে' আমার সঙ্গে যথাসম্ভব ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন।

আমাকে যখন প্রেসিডেন্সী জেলে নেওয়া হ'ল তখন আমাকে ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত জেলে রাখা হবে, কি, দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত জেলে রাখা হবে সে বিষয়ে কিছুই পরিষ্কার ছিল না। মিঃ ল্যারিমোর তখনো নির্দ্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তবে তার পূর্ব্বেই তিনি আমাকে জানান যে, যদি আমাকে ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত জেলে রাখবার নির্দ্দেশই আসে, তা' হলেও তিনি আমাকে

একখানা পৃথক ঘর দেবেন এবং জেলের বন্দীদের পোষাক পরতেও আমাকে জোর দেবেন না। তবে শীঘ্রই এ সমস্ত সমস্যার অবসান হ'ল। কারণ নির্দ্দেশ এল আমাকে দেওয়ানী মামলার বন্দী বলেই গণ্য করতে হবে। মিঃ ল্যারিমোর আমাকে দেওয়ানী জেলের উপরের তলায় একখানি বেশ আরামদায়ক ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। সে দিন অপরাহ্নে আমার বন্ধু ও কোলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি. এল. গুপ্ত এলেন আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে' আমাকে যথাসম্ভব প্রফুল্ল করে তুলতে।

আমি একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, জেলের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের জেলের নিয়মকানুন শিথিল না করেও আমার মনের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারই করতেন। প্রত্যহ অপরাহ্নে জেল প্রাঙ্গনে বন্দীদের পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে এক সমাবেশ হ'ত। কিন্তু আমাকে কোনদিন নীচে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হতে বলা হ'ত না। আমি বারান্দায় দাঁড়ালেই চলবে বলে আমাকে বলা হয়েছিল। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে কারও বাধা ছিল না। প্রতিদিন প্রচুর লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। আমার চিঠিপত্র-টেলিগ্রাম সবই যথাসময়ে আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হ'ত। সেগুলির সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। মিঃ ল্যারিমোর বলেছিলেন, কেবল একাজের জন্যই নাকি তাঁকে একজন বিশেষ বার্ত্তাবহ নিযুক্ত করতে হয়েছিল। একবার আমার স্ত্রী এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রবার্ট নাইট তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। আমার প্রতি যে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল তাকে ধিক্কার দিয়ে ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় অনেক নিবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল। ন্যায় ও অধিকারের প্রশ্নকে ষ্টেটসম্যান প্রবল ভাবে সমর্থন করেছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজা যখন মিঃ রবার্ট নাইটের

বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রুজু করেছিলেন ভারতীয় জনসাধারণ মিঃ নাইটের কার্য্যের জন্য প্রশংসা প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে এক জনসভা করে এবং তাঁর সাহায্যার্থে অর্থও সংগ্রহ করে। সে সভায় আমিও বক্তৃতা করেছিলাম।

আমার কারাদণ্ডের সংবাদে কেবল কোলকাতা ও আমার প্রদেশেই যে বিষাদের ছায়া পড়েছিল তা' নয়, সারা ভারতেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। যে-দিন আমার কারাদণ্ডের হুকুম হয় কারও বিনা নির্দ্দেশে বা চেষ্টাতেই কোলকাতার ভারতীয় অঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবেই সমস্ত ব্যবসাবাণিজ্য-দোকানপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবং ভারতীয় মাত্রেই তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। ছাত্রেরা শোকদিবস পালন করেছিল। সারা সহরে এত বিরাট ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল যে, কোন হলের মধ্যে এই বৃহৎ জনতার স্থান সঙ্কুলান সম্ভব ছিল না। এজন্য বাজার অঞ্চলের খোলা জায়গাতে তার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। খোলা জায়গাতে সভা করবার প্রচলন তখনই আরম্ভ হয়। এ সমস্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন কেবলমাত্র হাজার দশেক উচ্চবর্গের বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সাধারণ মানুষও তাতে হাজারে-হাজারে যোগ দিয়েছিল। আঘাত দেওয়া হয়েছিল হিন্দুদের অন্তরে। হিন্দু দেবতার বিগ্রহকেই আদালতে টেনে আনা হয়েছিল। তার আইনগত মূল্য যাই থাকুক না কেন, (এবং সাধারণ লোক তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না) নিষ্ঠাবান হিন্দু মাত্রেই ন্যায় ভাবেই হোক বা অন্যায় ভাবেই হোক, মনে করল যে, তাদের বিগ্রহকে অপবিত্র করা হয়েছে। দেশীয় নৈষ্ঠিক লোকদের প্রতি শিক্ষিত সমাজের সহানুভূতি ছিল বটে, তবে তাদের ক্ষোভের আরও একটি কারণ ছিল। বিচারক হিসাবে তাঁর পদের অযোগ্য কর্ম্ম হলেও, দুর্ভাগ্যবশতঃ বহুবিতর্কমূলক ইলবার্ট বিল-এ এক প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন বিচারপতি

মিঃ নরিস। আর তারই ফলে শিক্ষিত সমাজ উত্তেজনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তা ছাড়া তাঁরা মনে করলেন, বিচারপতি মিঃ মিত্রের উল্লেখ-করা টেইলারের মামলার নজির অনুসরণ করে' এ মামলায় অর্থদণ্ড দিলেই যথেষ্ট হ'ত। কিন্তু যে সাজা বাস্তবিক পক্ষে আমাকে দেওয়া হয়েছে তা' এরূপ এক উচ্চ আদালতের ঐতিহ্যের পরিপন্থী এবং তার মধ্যে এক নিকৃষ্ট দলাদলির মনোভাবেরই ইঙ্গিত রয়েছে।

একমাত্র বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা বাদ দিলে, ১৮৮৩ সালে সমগ্র বঙ্গদেশে যেরূপ বিস্তীর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত উত্তেজনার স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল আমি আমার সমস্ত রাজনৈতিক কর্ম্মজীবনে সেরূপ আর কখনো দেখি নি। প্রায় প্রতি সহরেই আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে', হাইকোর্টের আদেশের নিন্দা করে' ও তার প্রতিবাদে জনসভা হয়েছিল। কোন-কোন ক্ষেত্রে এই উত্তেজনার মাত্রা এত অধিক হয়েছিল যে, এমন কি, কোন-কোন সরকারী কর্ম্মচারীও তাতে অংশগ্রহণ করে' নানারূপ দুঃখ বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন কেবলমাত্র সাময়িক ভাবপ্রবণতাতেই পর্য্যবসিত হয়ে থাকে নি। এ প্রদেশের জনজীবনের উপরও তার ছাপ হয়েছিল গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী।

কোন বড় ঘটনা যখন মানুষের মনকে নাড়া দেয় তখন তা' প্রকাশ করবার জন্য সর্ব্বদিকেই সে চেষ্টা করে। তার কণ্ঠের গানে, তার আবেগময় ভাষণে, তার সংবাদপত্রের বিবরণে, মঞ্চে-মঞ্চে অভিভাষণে, এবং তার নূতন-নূতন দুঃসাহসিক ও দুরপনেয় কর্ম্মের ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ পেতে থাকে। ইংলণ্ডের এলিজাবেথের যুগের এরূপ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সেদেশের লোকের মনে কর্ম্মপ্রেরণা জাগিয়েছিল এবং জাতীয় জীবনে বিদ্যুৎ সঞ্চার করেছিল। তার কাব্য, মৌলিক গবেষণা, নূতন-নূতন দেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে নৌ ও বাণিজ্য প্রচেষ্টা, সর্ব্বত্রদিকেই হয়েছিল অগ্রগতি। এ সমস্তের

মধ্যেই ইংলণ্ডের আত্মা রূপপরিগ্রহ করেছিল। অবমাননা মামলার ফলে দেশে যে উত্থান দেখা গিয়েছিল তার মধ্যেও আকারে ছোট হলেও অনুরূপ এক উদ্দীপনার সূত্রপাত পরিলক্ষিত হয়েছিল। সাংবাদিকতার মধ্যেও এক প্রেরণা এল এখান থেকেই। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন 'সুলভ সমাচার' নাম দিয়ে এক পয়সা মূল্যের এক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর পরেও এই স্বল্পমূল্যের সংবাদপত্র পরিচালনার প্রচেষ্টা ধীরে-ধীরে বহুদিন যাবৎ চলতে থাকে। এখন কিন্তু তার মধ্যে এক নূতন শক্তি সঞ্চারিত হ'ল। সংবাদের জন্য লোক যেন পাগল হয়ে উঠল। বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু এক পয়সা দামের 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা প্রকাশ করলেন। তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র। তাঁদের সেই 'বঙ্গবাসী' ও 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা আজ অবধি বঙ্গদেশের সাংবাদিক জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে' রয়েছে।

যেমন একদিকে হাজার-হাজার লোক আমাদের সভাসমিতিতে যোগ দিতে লাগল, তেমনি এসময় থেকে আমাদের দেশীয় ভাষায় স্বল্পমূল্যের পত্রিকাগুলিও সর্ব্বপ্রথম হাজার-হাজার পাঠকের মনে আগ্রহ সঞ্চার করতে লাগল। মানুষের এই ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাসের পরিণতি আরও অধিকভাবে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে প্রকাশ পেতে লাগল। আর তাদের একটির জন্য আমি নিজেই ছিলাম অত্যন্ত আগ্রহী। শিক্ষিত সম্প্রদায় তাকে তাঁদের কর্ম্মতালিকার প্রথমেই স্থান দিয়েছিলেন। এই অবমাননা মামলা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রীতি ও বন্ধুত্বের বন্ধনকে দৃঢ়তর করে ভারতের ঐক্যকে বর্দ্ধিত করতে সাহায্য করল। লাহোর, অমৃতসর, আগ্রা, ফৈজাবাদ, পুণা ও ভারতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে আমার দুর্ভাগ্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য জনসভা অনুষ্ঠিত হ'ল। ১৮৮৪ সালের ১৮ই জুনের "গাপ য়্যাণ্ড গসিপ" পত্রিকায় শেঠজী সোরাবজী ছদ্মনামে জনৈক

খ্যাতনামা লেখক একখানা খোলা চিঠি পাঠিয়ে নিম্নলিখিতভাবে এ-সমস্ত বিক্ষোভের বর্ণনা দিয়েছিলেন—

"গত বছর উত্তর ভারতে আপনার মুক্তির দাবীতে এক জনসভায় আমি এক শ্রদ্ধেয় ও প্রাচীন কাশ্মীরী পণ্ডিতকে দেখিতে পাই। তিনি ইংরেজী ভাষার একটি শব্দও নিজ মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করিতে পারিতেন না। অথচ আমি লক্ষ্য করি তিনি আপনার কারাবাসের সঙ্গে-সঙ্গেই ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। কথা বলিতে-বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। অশ্রুসিক্তলোচনে তিনি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আমাদের প্রিয় ভ্রাতার সঙ্গে তাহারা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে? আমাদের সুরেন্দ্রনাথ এখন কারারুদ্ধ'। প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তর থেকেই এরূপ বেদনাময় আবেগের ভাষা সেদিন নিঃসৃত হইয়াছিল এবং সমগ্র দেশে জাতিধর্ম্মনির্বিবশেষে শোক পালিত হইয়াছিল।"

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের ১৮৮৩ সালের রিপোর্টে পরলোকগত আনন্দমোহন বসু আমার কারাদণ্ডের রাজনৈতিক পরিণতির কথা উল্লেখ করে' বলেছিলেন,—

"মন্দ থেকেও যে ভালর উদ্ভব হতে পারে তার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান ঘটনায় যেভাবে প্রমাণিত হয়েছে এভাবে আর কখনো হয়নি। সমগ্র দেশময় এই তীব্র বিষাদ ও ঘৃণা প্রদর্শন, যা এরূপ অবস্থায় নিতান্তই স্বাভাবিক—পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা পরস্পরের জন্য ভাবতে শিখেছে। পরস্পরের মধ্যে একতার বন্ধন ও ভ্রাতৃত্বের ভাব দ্রুত স্থাপিত হতে চলেছে। আর বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে অন্তত এটুকু সান্ত্বনার কারণ রয়েছে যে, তাঁর দুর্ভাগ্যে ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে এমন এক বিশেষ ঐক্যের আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছে, যেজন্য এতদিন ধরে তিনি নিজেই একান্তভাবে ও সফলতার সঙ্গে চেষ্টা করছিলেন।"

কৃষ্ণনগর থেকে বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কারাদণ্ডকে স্মরণীয় করে' রাখবার উদ্দেশ্যে এক জাতীয়ভাণ্ডার গড়ে তুলবার পরিকল্পনা করেন। তাঁর এই কল্পনাটি বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। কারণ তারপর থেকে জাতীয়উন্নতির উদ্দেশ্যে অন্যান্য আরও একাধিক জাতীয়ভাণ্ডার গড়ে উঠতে থাকে। প্রায় ২০,০০০৲ টাকার মত তখন সংগ্রহ হয়েছিল। যাঁরা এই ভাণ্ডারে চাঁদা দিয়েছিলেন তাঁরা এক সভা করে' এই টাকাটি রাজনৈতিক কাজের জন্য ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। টাকার অঙ্কটি বিশেষ বড় না হলেও তাতে আমাদের কাজের অনেক সহায়তা হয়েছিল। কারণ এভাবে আমাদের হাতে যে এক স্থায়ী অর্থভাণ্ডার আসে তাকে কেন্দ্র করে অপরাপর দিক থেকেও অর্থ সংগ্রহের সুযোগ হয়। রাজনৈতিক কর্ম্মীদের বুঝতে আর বাকী থাকে না যে, সংগ্রাম করার প্রয়োজন হলে শক্তির অভাব কোনদিন হবে না। বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পর "স্থায়ী ব্যবস্থা" (সেটেলড্ ফ্যাক্ট) শুনতে শুনতে কান তখন ঝালাপালা। এই ব্যবস্থাকে যখন বানচাল করবার চেষ্টা হচ্ছিল তখন এই আন্দোলনের প্রতি দেশের ধনী সম্প্রদায়ের সহানুভূতি থাকা সত্বেও সরকারী আচরণের ফলে তাকে কোনরূপ অর্থ সাহায্য দিতে বা খোলাখুলি ভাবে আন্দোলন সমর্থন করে' সরকারের বিরক্তিভাজন হতে তাঁদের সাহস হচ্ছিল না। এ পরিস্থিতিতে উক্ত জাতীয়ভাণ্ডারের অর্থ আমাদের বিশেষ উপকারেই এসেছিল।

আমাদের পুরাতন বন্ধু ও সহকর্ম্মী বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' এখানে আমার কিছু বলা কর্ত্তব্য। বহু বৎসর যাবৎ কৃষ্ণনগরের জনজীবনে তাঁর এক বিশেষ স্থান ছিল। সেই প্রাচীন নগরের বহু রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থক এবং কখনো কখনো প্রবর্ত্তকও ছিলেন তিনি।

জাতীয় দলের পক্ষে তাঁর মৃত্যু এক অপূরনীয় ক্ষতি। তাঁর মত সাহসী, উদমশীল ও প্রভাবশালী ব্যক্তি অদূর ভবিষ্যতে আর পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। মফস্বল সহরে বাস করে' কোন জনহিতব্রতী ব্যক্তির পক্ষে স্থানীয় ও সীমিত অঞ্চলের বাইরে খ্যাতি ও সুনাম অর্জ্জন করার দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু বঙ্গদেশের জাতি গঠনের ইতিহাস থেকে যদি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অনাথবন্ধু গুহ, আনন্দচরণ রায়, কিশোরী মোহন চৌধুরী প্রভৃতি দেশপ্রেমিকদের নাম বাদ দেওয়া যায় তা' হ'লে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ হবে। হয়ত তাঁদের প্রত্যেকের খ্যাতির পরিমাণ সমান নয়। তবুও তাঁরা প্রত্যেকেই যে অশেষ অভাব অসুবিধা ও অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন একথা বিস্মৃত হওয়া যায় না। তাঁরা তাঁদের সমকালীনদের উপর যে কর্ত্তব্যের গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁদের সহকর্মীদের পক্ষে অন্তত যথোপযুক্তরূপে তা' স্বীকার করা একান্ত কর্তব্য।

১৮৮৩ সালের ৫ই মে আমার কারাজীবন আরম্ভ হয় এবং ৪ঠা জুলাই আমি মুক্তি পাই। জগতের ইতিহাসে এদিনটি স্মরণীয়। কারণ এদিনটি ছিল আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। আমার বন্ধুরাও তার যথাযোগ্য সুযোগ নিতে বিরত হন নি। 'ধর্ম্মের রক্ষক' হতে গিয়েই আমাকে এত কষ্ট বরণ করতে হয়েছিল। একথা কারও অজানা ছিল না যে, গোঁড়া হিন্দুদের রীতি নীতি আমি বিশেষ পছন্দ করতাম না। আমি নিজে ছিলাম প্রগতিবাদীআদর্শে আস্থাশীল। আমার সমাজ জীবনের সঙ্গে সে আদর্শেরই ছিল সামঞ্জস্য। সে জন্য আমাদের দেশের গোঁড়া ব্যক্তিদের ধর্ম্ম বিশ্বাসকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার মত মতিগতিশীল লোকের পক্ষে দুঃখ বরণ করে নেওয়া অনেকের নিকট অসাধারণ বলেই বোধ হয়েছিল। এই আবেগ

তখন সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোন প্রবণতার উচ্ছ্বাস যখন জনসাধারণের মনকে ভাসিয়ে নিতে আরম্ভ করে, তখন আর কোন বাধাই তা' মানে না। তার স্রোত নিজের পরিধি ছেড়ে বহু সংকীর্ণ পথে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবল বেগে ধেয়ে যায়। ইলবার্ট বিল সম্পর্কিত কলহে জর্জ্জরিত শিক্ষিত সমাজ এমনিতেই ছিল উত্তেজিত ও অস্থির। এখন আবার আমার জনহিতকর কার্য্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের মন সরকারী আচরণের প্রতি ঘৃণায় ভরে গেল। দুঃখে ও বিষাদে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা অভিভূত হলেন। তাঁদের মনে হ'ল আমার প্রতি অবিরত যে অন্যায় করা হয়েছে আমার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ছিল তার চরম পরিণতি। বন্ধুবর মিঃ বি. এল. গুপ্ত তখন কোলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট। আমার সাজা হবার সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি আদালতের কাজ-কর্ম্ম বন্ধ করে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য প্রেসিডেন্সী জেলেই ছুটে চলে গিয়েছিলেন। এরূপ একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর পক্ষে এরূপ খোলাখুলি ভাবে আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা ও পরোক্ষভাবে দেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের রায়কে অবজ্ঞা করার বিষয় নিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে নানা প্রকার আলোচনা চলতে লাগল। আধা-সরকারী বলে' খ্যাত এক নামকরা পত্রিকা এ বিষয়টির প্রতি সবার দৃষ্টিও আকর্ষণ করল। কিন্তু এ সমস্ত তুচ্ছ বিষয়ে আমার বন্ধুবর কিছুমাত্র দৃষ্টি দিলেন না। বিশ্বাসে অটল থেকে ও জীবনের সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে তিনি তাঁর সরকারী কর্মপথে নিজেকে টেনে নিতে নিতে একদিন বৃটিশ-ভারতের এক হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি ও তৎপর দেশীয় এক রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদও অলংকৃত করেছিলেন।

কারাগারে আমাকে একজন প্রথম শ্রেণীর অপকর্ম্মা বলেই গণ্য করা হ'ত। আমার ইচ্ছানুযায়ী লিখতে পড়তে আমাকে বাধা

দেওয়া হত না। 'বেঙ্গলী' পত্রিকার জন্য আমি লেখাও চালিয়ে গেলাম। আমার নামে যে সমস্ত তার বা চিঠি ইত্যাদি আসত সে সমস্ত পরীক্ষা না করেই জেলের ভিতরে আসতে দেওয়া হ'ত এবং না খুলেই আমার নিকট বিলি হ'ত। কতজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারবে সে সম্পর্কে কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। আমাকে কেউ কোন ফল উপহার দিলে (তখন ছিল আমের দিন) বা অন্য কোন খাবার পাঠালে, বিনা বাধায় তা আমার নিকট আসতে দেওয়া হ'ত। এই বন্দী অবস্থাতেও আমার কষ্ট যথাসাধ্য লাঘব করতে জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট নিজে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। বন্দীদের উপস্থিতির পর্য্যবেক্ষণ শেষ হলে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত। তারপর আর কোন লোককে আসতে দেওয়া হত না। দেনার দায়ে যাঁরা কারাবরণ করতেন সে সমস্ত বন্দীর সঙ্গে বাক্যালাপে আমি সন্ধ্যা কাটিয়ে দিতাম। আমার প্রমোদের জন্য তাঁরা গানবাজনার ব্যবস্থা করতেও উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু অনুসন্ধান করে' যখন জানতে পারলাম যে, তা' জেলের নিয়ম কানুনের বিরোধী হবে, তখন তা' প্রত্যাখ্যান করলাম। আমার এই বন্দী জীবনটি আমি এক প্রকার উপভোগই করেছিলাম; তবে একটু ক্লান্তিকরও ছিল। অনেক বছর যাবৎ আমি বিশ্রামের সময় পাই নি। কাজেই এই নাতিদীর্ঘ বিরাম আমার পক্ষে বেশ আরাম দায়কই হয়েছিল। জেল থেকে বাইরে এসে দেখি আমার ওজন অনেক বেড়ে গিয়েছে।

৪ঠা জুলাই বেশ সকালেই আমাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হ'ল। তার আগের দিন চব্বিশ পরগণা জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টিভেনস্ জেলের মধ্যে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ইনি পরে কিছুকাল বঙ্গদেশের অস্থায়ী লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর হিসাবে কাজ

করেছিলেন। বিস্ময়করভাবে তাঁর হঠাৎ এসে দেখা করার কারণ অনতিবিলম্বেই বোঝা গেল। আমি ছিলাম ব্যারাকপুরস্থ মনিরাম পুরের বাসিন্দা। এ অঞ্চলটি ছিল তাঁরই এলাকাভুক্ত। আমি বাড়ী ফিরে গেলে সেখানে হর্ষ প্রদর্শন হবে বলে তিনি আশংকা করছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল আমি যেন তা রোধ করবার ব্যবস্থা করি। আমি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হলাম না। আমার বন্ধু ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। তাঁরা কি করবেন স্থির করেছেন তা' আমি তাঁকে জানালাম এবং তিনি তাতে বাধা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি তাঁকে বললাম, সেখানে কোন বাজনা বাজানো হবে না, রাস্তায় কোন শোভাযাত্রা হবে না, রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছে আমার বন্ধু হরকিষণ সরকারের বাড়ীতে একটি সভা করে' সকলে আমাকে কেবল অভ্যর্থনা জানাবে। এটি জনসাধারণের গতায়াতের স্থান নয়। এটি তাঁর নিজস্ব বাসভবন। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, ইংরেজ ভদ্রলোকের বাড়ীমাত্রই তাঁর নিজস্ব দুর্গ বলে বিবেচিত হয়। বৃটিশের প্রজা হিসাবে আমাদেরও সে অধিকার রয়েছে। এ অবস্থায় আমার বন্ধুদের প্রস্তাবকে নিরুৎসাহ করার মত আমি কোন কারণ দেখি না। মিঃ ষ্টিভেনস এবিষয় নিয়ে আর বিশেষ কিছু বললেন না। যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন তিনি ব্যারাকপুর ষ্টেশনে উপস্থিত থাকবেন এবং দেখবেন যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবেই সব কেটে যায়। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটু বিদ্রূপের সুরেই বললাম, ষ্টেশনে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে জিলার সর্ব্বপ্রধান রাজকর্ম্মচারীর উপস্থিতিকে আমি আমার সৌভাগ্য বলেই মনে করব। ৪ঠা জুলাই সন্ধ্যায় আমি যখন ব্যারাকপুরে ফিরে গেলাম তিনিও পূর্ব্বব্যবস্থা অনুসারে রেলওয়ে ষ্টেশনে আমার অপেক্ষায় ছিলেন। একজন বাঙ্গালী সহকারী পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট ষ্টেশন থেকে আমার

বাড়ী পর্যন্ত প্রায় তিন মাইল রাস্তা একখানা ভিন্ন গাড়ীতে করে' আমার অনুসরণ করেছিলেন।

পরে জানতে পেরেছিলাম সেদিন কোন বিপদ হতে পারে এরূপ আশংকা করে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের সেনাদলকে সমস্ত দিন ধরে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। সামরিক কর্ম্মচারীদের অনেকেই ছিলেন ভারতীয়। এবং কেউ কেউ আবার আমারই মত গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। পরে তাঁরা এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সরকারী নির্দ্দেশ পাবার পর আমার মামলার বিষয়ে তাঁদের ঔৎসুক্য জন্মে এবং আরও বিশদভাবে জানবার জন্য তাঁরা অধিকতর আগ্রহী হয়েছিলেন। আমলাতন্ত্রীরা মাঝে মাঝে ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত ও সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তারই ফলে তাঁরা জনসাধারণের এই হর্ষ প্রদর্শনকে বাধা দিতে চেষ্টা করছিলেন। উপযুক্ত বুদ্ধির অভাব বশতঃ তাঁরা যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তারই ফলে যে-শ্রেণীর লোকেরা সচরাচর তাদের নিজস্ব জগতের বাইরে কি ঘটছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে তাদের মধ্যেও আমার কারাবাসের কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমার কারাবাসের মেয়াদ শেষ হলে আমাকে যখন মুক্তি দেওয়া হবে তখন আমার সম্মানে হর্ষ প্রদর্শন হতে পারে বলেই সরকারী মহলের উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। এবং তা' রোধ করবার জন্য তাঁরা একটি ক্ষুদ্র পরিকল্পনাও স্থির করে' রেখেছিলেন। সাধারণত ভোর ছ'টার সময়েই বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। অন্তত ১৮৮৩ সালে তাই হত। আমার ক্ষেত্রে কিন্তু সে নিয়মের একটু ব্যতিক্রম করা হয়েছিল। সেদিন ভোর চারটার সময় কারারক্ষক এসে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলেন। তারপর একখানা ভাড়াটে গাড়ীতে করে' আমাকে বাইরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যখন ছয়টা বাজল তখন সেই কারারক্ষক আমাকে বেঙ্গলী পত্রিকা

অফিসে নিয়ে ছেড়ে দিলেন। এসবের উদ্দেশ্য ছিল সবরকম প্রদর্শনকে এড়িয়ে চলা। কিন্তু এ নীতি বাস্তবিক পক্ষে উটপাখীরই নীতির অনুরূপ। তার ফলে একটি প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে প্রদর্শন দু' জায়গায় হয়েছিল। আমাকে মুক্তি দেওয়া দেখবার জন্য যে জনতা প্রেসিডেন্সী জেলের চারদিকে ভোরে ভোরে একত্র হয়েছিল তারা সারা রাস্তা হেঁটে এসে আবার বেঙ্গলী অফিসে ভীড় করল। কারারক্ষীদের চালাকীর ফলে তাদের উৎসাহ বেড়ে গিয়ে, একবার তারা হর্ষপ্রদর্শন করল জেলের সামনে, আর একবার বেঙ্গলী অফিসের কাছে। বাস্তবিক পক্ষে যারা নিজেদের সর্ব্বজ্ঞ বলে' মনে করে' সময়ের অপ্রতিরোধ্য ও ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিগুলির দিকে চোখ মেলে তাকাতে অনিচ্ছুক হয় তাদের মাথায় বুদ্ধি যদিও বা কখনো আসে তবে তা' আসে অনেক অনেক বিলম্বে।



নবম অধ্যায়

রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ (১৮৮৩-১৮৮৫)

পূর্ব্বেই বলেছি, আমার বাধ্যতামূলক অবসরকাল আমি বিশেষ ভাবেই উপভোগ করেছিলাম। কারণ তা' দিয়েছিল আমাকে পূর্ণ বিশ্রাম। কারামুক্তি হওয়ার পর দেখলাম আমার সামনে প্রচুর কাজ এসে গিয়েছে। একটি জাতীয়ভাণ্ডার গড়ে তুলবার জন্য আমি আন্দোলন আরম্ভ করলাম। ১৮৮৩ সালের ১৭ই জুলাই এক বিরাট সভা করা হ'ল। দশ হাজারেরও বেশী লোক তাতে যোগ দিল। সেখানে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল ভারতের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য ভারতে ও ইংলণ্ডে বৈধভাবে আন্দোলন চালাতে হবে এবং তজ্জন্য একটি জাতীয়ভাণ্ডার সৃষ্টি করে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। অবমাননার মামলা এবং ভারতের ঐক্য ও সংহতির জন্য আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান আন্দোলন আমাদের আশ্বাসকে আমাদের সম্মুখে আরও বিস্তৃততর করে উপস্থিত করল। আমরা অন্যান্য প্রদেশ গুলিকে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। সিভিল সার্ভিস আন্দোলন থেকে ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এক মৌলিক একত্ববোধ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। অবমাননার মামলা তাকে অধিকতর শক্তিশালী করেছিল। এখন আমরা আমাদের প্রদেশের বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলাম। একটা ঐক্যবদ্ধ ভারতের নৈতিকসমর্থন ও সক্রিয় সহযোগেরদ্বারা আরও অধিক শক্তি ও সামর্থ্যের জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। কোলকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স হ'ল। সারা ভারতের প্রতিনিধিদিগকে সেখানে আমন্ত্রণ করা হ'ল। তা থেকে যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস জন্ম নিল তাকে বরণ করবার উপযুক্ত এক নৈতিক পরিবর্ত্তন মানুষের মনে তৎপূর্ব্বেই এসেছিল।

ইলবার্ট বিল নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলেও ভারতীয়দের মধ্যে একতাবদ্ধ হবার আগ্রহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হতে থাকে। য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় তাদের নিজেদের জন্য ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন গঠন করে' দেশের বিভিন্ন অংশে তার শাখা প্রতিষ্ঠা করল। তারা নিজেদের স্বার্থ বলতে যা' বুঝত সেজন্য এবং তাদের বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করল। তাদের সহায় সম্বল প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি তাদের উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলল। সমগ্র ভারতের শিক্ষিত সমাজ উৎগ্রীব হয়ে লক্ষ্য করল তাদের সেই সংগ্রাম। তারা দেখল তাদের সামনেই ইলবার্ট বিল ও তৎসম্পর্কিত ঘটনা পরম্পরা। এত দেখবার পরেও নিজেদিগকে সংগঠন করা ও একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন সম্বন্ধে তাদের আর কি সন্দেহ থাকতে পারে। শিক্ষিত সমাজের মন তখন যেন অপমানে জর্জ্জরিত। তবে সামগ্রিক ভাবে বিবেচনা করে দেখলে তা' সুফলই প্রসব করেছিল। যে সমস্ত শক্তি তখন কংগ্রেস আন্দোলনের জন্ম দেবার জন্যই কাজ করছিল, এসমস্ত পরিস্থিতি তাদেরও ক্ষমতা বর্দ্ধিত করতে লাগল। যেমন আগে বলেছি, বছর ঘুরে যাবার পূর্ব্বেই প্রথম ন্যাশন্যাল কনফারেন্স কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হল। এর সংগঠনে আমার অংশও নিতান্ত নগণ্য ছিল না। শিক্ষিত ভারতে এটিই ছিল ইলবার্ট বিল আন্দোলনের জবাব—তাদের তূর্য নিনাদ। ডিসেম্বরের ২৮শে তারিখ থেকে ৩০শে পর্য্যন্ত তিন দিন সেই কনফারেন্স চলেছিল।

আজ অবধি যে সমস্ত বিষয় কংগ্রেসে অনবরত আলোচিত হয় সেদিনও সেগুলিই আলোচিত হয়েছিল। প্রতিনিধিমূলক পরিষদ, স্বায়ত্ত শাসন, সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা, ফৌজদারী প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশাসনিক কার্যাবলী থেকে বিচারবিভাগীয় কার্য্যাবলীর পৃথকীকরণ এবং সর্বশেষ সরকারী চাকরীতে আমাদের দেশীয়

লোকদিগকে অধিক সংখ্যায় ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে নিয়োগ করার প্রশ্ন ইত্যাদি বিষয় সেদিন আলোচিত হয়েছিল। প্রাচ্যদেশ সমূহের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু মিঃ উইল ব্রিডব্লাণ্ট তখন ভারতে পরিভ্রমণ করছিলেন। তিনিও এই কনফারেন্স-এ উপস্থিত ছিলেন। রিপনের সময়ের ভারত সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

"তারপর বেলা বারটার সময় আমি ন্যাশন্যাল কনফারেন্স-এর প্রথম সভাতে গেলাম। বাস্তবিকই সময়টি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রায় সমস্ত প্রধান নগর থেকেই প্রতিনিধিগণ এসে গিয়েছিলেন। মিঃ বোস (আনন্দ মোহন বসু) তাঁর উদ্বোধন-ভাষণে বলেছিলেন, এটি হ'ল ন্যাশন্যাল পার্ল্যামেণ্ট গঠনের পথে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। শিল্পশিক্ষার উদ্দেশ্যে ছেলেদের ফরাসী দেশে পাঠাবার এক পরিকল্পনা নিয়েই আলোচনাটি আরম্ভ হ'ল। কিন্তু এ সভার আসল মূর্ত্তি প্রকাশ পেল যখন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী কভেন্যাণ্টেড সিভিল সার্ভিসকে আক্রমণ করে বক্তৃতা সুরু করলেন। আমি সারা জীবনে যত বক্তৃতা শুনেছি তাদের তুলনায় তাঁর বক্তৃতা আমার কাছে অত্যন্ত চমৎকার বলে মনে হয়েছিল। এবং যে বিষয়বস্তুর উপর বক্তৃতা হচ্ছিল সে সম্পর্কেও আমার মতের সঙ্গে তাঁর মতের মিল ছিল। অন্য বক্তৃতাগুলি সেরূপ চমকপ্রদ ছিল না বটে, তবে তাদের ক্ষমতাও মন্দ ছিল না। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বক্তৃতা যথেষ্ট কৌতুকের উদ্রেক করলে শ্রোতারা খুব হর্ষধ্বনি করতে থাকেন। আমাকেও তখন কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু আমার পরিভ্রমণ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত খোলাখুলি ভাবে কিছু বলব না বলে মনস্থ করাতে আমি সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারি নি। ঠিক করেছিলাম বম্বেতে গিয়েই আমি আমার মনে যা আছে পরিষ্কার করে বলব। কনফারেন্সে আমিই একমাত্র ইউরোপীয় উপস্থিত ছিলাম। এরূপ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময় আমি যে উপস্থিত থাকতে

পেরেছিলাম, সে জন্য আমি আনন্দিত। পূর্বে থেকে যদি বক্তাদের সম্পর্কে ঠিক মত ব্যবস্থা করা যেত তা হলে সভার কার্য্যাবলী আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারত। তবে মোটামুটি হিসাবে বিচার করলে সব কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল বলা চলে। ব্যানার্জী এবং বোস দুজনেই খুব উঁচুদরের বক্তা। সভাটি হয়েছিল এলবার্ট হলের উপরের তলায়। প্রায় একশত লোক উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তৃতা আরম্ভ হবার আগে গীটার জাতীয় একখানি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সুন্দর দরাজ গলায় একখানা জাতীয় স্তোত্র গান করা হয়েছিল।

১৮৮৪ সালে আমি আর একবার উত্তর ভারত পরিভ্রমণে গেলাম। কলেজের কাজের দরুণ একমাত্র গরমের লম্বা ছুটি ভিন্ন আমার অন্য কোন অবসর ছিল না। মে মাসের মাঝামাঝি আমি কোলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পাঞ্জাব আর উত্তর ভারতের গরম আমার রেল ভ্রমণের কষ্ট আরও বাড়িয়ে দিল। আমার এক অন্তরঙ্গসুহৃদ বাবু গোবিন্দচরণ দাস আমার সঙ্গে ছিলেন। দুঃখের বিষয়, এখন তিনি আর ইহ জগতে নেই। তিনি হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। রিপণ্ কলেজে স্কুলের শিক্ষন-বিভাগের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

আমরা লাহোর, অমৃতসর, মুলতান, রাওলপিণ্ডি, আম্বালা, দিল্লী, আগ্রা, আলীগড়, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এলাহাবাদ, বারানসী, বাঁকীপুর প্রভৃতি সহরে ভ্রমণ করলাম। মুলতানের অত্যধিক উত্তাপের কথা মনে হলে এখনো আমার ভয় হয়। আমরা কাজ আরম্ভ করেছিলাম খুব হাঁকডাক করে'। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও তাদের লোকজনের মধ্যে একতা ও মিলনের পথ প্রসস্ত করা এবং বঙ্গদেশের লোকজনের সঙ্গে উত্তরের সমরপ্রিয় জাতিগুলির প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা। তখনকার দিনে

আমাদিগকে কেহ আমলই দিত না। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যেত যে, যাদের ভিতর থেকে সেনাবিভাগের জন্য কোনদিন একজন সৈনিকও পাওয়া যায় না, যাদের সঙ্গে উত্তরের বলিষ্ঠ ও সাহসী জাতিগুলির সঙ্গে বিশেষ কোন সংশ্রবই নেই, সেই লোকেরাই গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চল থেকে রাজনৈতিক দাবীর বড় বড় চীৎকার তুলে। আমরা এই নিছক অলীক ধারণাটি মানুষের মন থেকে দূর করবার জন্য চেষ্টা করছিলাম। আজ কংগ্রেস সৃষ্টির ফলে ও বহুদিন যাবৎ একতাবদ্ধ ভাবে দেশহিতকর প্রচেষ্টা চালানোর ফলে ভারতের জনজীবনে যে সংহতির ভাব দেখা দিয়েছে তারপর ওসমস্ত অন্তঃসার শূন্য কথায় আর কেউ বিশ্বাস করে না।

যা' নিয়ে দশ বছর পূর্বে আমরা চিৎকার করে' ভারতকে একতাবদ্ধ করেছিলাম এখনো তাই চলল। তখনো সিভিল সার্ভিস নিয়ে সারা ভারতের দাবী পূর্ণ হয় নি। একটা বিধিবদ্ধ সিভিল সাভিসের ব্যবস্থা করে' সামান্য সুবিধা দেবার চেষ্টা যদিও বা হয়ে থাকে তবুও নির্ব্বিচারে সকলের সঙ্গে পরীক্ষা দেবার বয়সের উচ্চতম সীমা তখনো বর্দ্ধিত করা হয় নি। এখন আবার এলাহাবাদ ও কানপুর থেকে রাওলপিণ্ডি ও মুলতান পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের সমস্ত বড় বড় সহরে জনসভা করে সেই একই দাবী সরকারের নিকট উপস্থাপিত করা হ'ল। একই সঙ্গে দেশবাসীর কাছে আবেদন করা হ'ল, তাঁরা যেন বঙ্গদেশের জাতীয়ভাণ্ডারের অনুকরণে রাজনৈতিক কাজকর্ম্মের বিস্তারের জন্য একটি জাতীয়ভাণ্ডার গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। আমাদের আন্দোলন সফল হ'তে বিশেষ বিলম্ব হ'ল না। অল্পকালের মধ্যেই সরকারী উত্তর পাওয়া গেল। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়সের উর্দ্ধতন সীমা বর্দ্ধিত করবার সুপারিশ করে' ভারত সরকার এক সর্বসম্মত জরুরী বার্ত্তা পাঠালেন সেক্রেটারী অব ষ্টেটের কাছে। পরের বৎসরেই প্রথমত একটি

পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হ'ল। এবং পরে তারই সুপারিশের ফলে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়সের সীমা বর্ত্তমান স্তরে উন্নীত হ'ল।

১৮৮৪ সালে লর্ড রিপন ভারত থেকে বিদায় নিলেন। সে সময় তাঁর প্রতি জনসাধারণ যেরূপ প্রীতি প্রদর্শন করেছিলেন ভারতের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। যে সমস্ত য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কর্ম্মচারী বরাবর জনসাধারণের নিকট থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতেন, তাঁরা এখন বুঝতে পারলেন যে, ভারতে এমন এক জাতীয়আন্দোলন জন্ম নিয়েছে যার সম্বন্ধে তাঁদের কিছুমাত্র ধারণা ছিল না। ভারতের অর্থমন্ত্রী স্যার অকল্যাণ্ড কোলভিন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "বাস্তবিক যদি তা হয়ে থাকে, তা' হলে তার অর্থ কি ?" ভাবাবেগে ঐ নাম দিয়ে তিনি একখানি পুস্তিকাই প্রচার করে ফেললেন। সকলেই এ পুস্তিকা পড়তে লাগল। আর তার ফলে বেশ কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কোলকাতা থেকে বোম্বাই পর্য্যন্ত নগরের পর নগরে যে-যে পথ দিয়ে ভাইসরয় গেলেন সে-সে পথে অসংখ্য জনসাধারণ পাগলের মত তাঁকে বিদায় দিতে-দিতে দেখিয়েছিলেন তাঁদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও গভীর প্রীতি। আমলাতন্ত্রীদের নিকট এছিল ধারণার অতীত। এবার যেন তাদের চোখ ফুটল। এই সামগ্রিক আন্দোলনকে উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত করবার জন্য শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ থেকেও শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছিল। স্যার অকল্যাণ্ড কোলভিন বললেন, "উপত্যকার শুকনো হাড়গুলো যেন সব জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।"

এই অভূতপূর্ব্ব প্রীতি প্রদর্শনের গাঢ়তা লক্ষ্য করবার মত চোখ যাদের ছিল, তারাই তার মধ্যে দেখেছিল এক একতাবদ্ধ জাতীয় জীবনের সূচনা। ভারতের জনগণের মধ্যে সহযোগিতার ও নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার। তাদের ভবিষ্যত ক্রমবিকাশে এটিই যে গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করবে তাও বুঝতে তাদের বাকী ছিল না।

লর্ড রিপন যে খুব বেশী কিছু করেছিলেন তা' নয়। তবে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, আদর্শ উচ্চ, নীতি সৎ। আর জাতিগত অযোগ্যতাকে তিনি করতেন ঘৃণা। ভারতের লোকের কাছে এগুলিই ছিল সহজবোধ্য। আর একারণেই তারা প্রাণ ঢেলে এমন একজন ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল। ইংরেজ নিস্প্রাণ আমলাতন্ত্রী পরিবেশের মধ্যে থেকেও বুঝতে পেরেছিল, ইংলণ্ড ভারতে কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে অভিলাষী। এবং তা' বুঝে ভালমন্দ বিবৃতি পাঠিয়ে তাকে সার্থকও করে তুলতে চেষ্টা করেছিল। কোলকাতাতেও আমরা তার উপযুক্ত এক বিরাট আয়োজন করেছিলাম এবং আমি নিজেও তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। বাস্তবিকপক্ষে তার আগের বছরও আমরা এক অনুরূপ ব্যবস্থা করেছিলাম। তবে তা' ছিল অনেকটা ঘরোয়া ব্যাপার। সন্ধ্যাবেলায় বেলগাছিয়া বাগানবাড়ীতে এক ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল। উচ্চ-নীচ সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাতে উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়া দেখেছিল, যে-ভাইসরয়কে তারা নিন্দা করছিল সেই ভাইসরয় জনসাধারণের অন্তর থেকে এমন শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করেছিলেন যে তা' অন্য কোন ভাইসরয় কোনদিন পারেন নি।

লর্ড রিপনের পর লর্ড ডাফরিণ ভাইসরয় হয়ে এলেন। তাঁকে আমি বিলাতে থাকতেই জানতাম। সিভিল সার্ভিস কমিশন আমাকে বাদ দেবার পর আমি যখন নানা গোলযোগে পড়ি তখন তিনি অনুগ্রহ করে' আমায় ডেকে পাঠিয়ে আমার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে এবং স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর বললেন যে, তিনি সে সময়কার সেক্রেটারী-অব-ষ্টেট-ডিউক অব-আর্গিলের কাছে আমার বিষয়ে বলবেন। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কোলকাতায় আসার পর

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে মানপত্র দিল। এই মানপত্রে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সংস্কার করে' তার পুনর্গঠনের আশু প্রয়োজনের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল। মানপত্রের খসড়া আমিই করেছিলাম। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের এক বছর আগে ১৮৮৪ সালের ২৪শে ডিসেম্বর এই মানপত্রখানি প্রদান করা হয়েছিল। মানপত্রের যে ছত্রে এ বিষয়টির উল্লেখ ছিল তা' এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক স্বায়ত্তশাসনরূপ বরদানের উল্লেখ করার পর তা'তে বলা হয়েছিল—

"এ সঙ্গে একথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, জনমত অবিলম্বে যে-সমস্ত সংস্কারের দাবী পূরণের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল প্রাদেশিক আইন পরিষদ পুনর্গঠন ছিল তার মধ্যে একটি। এতবড় একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার স্থান বা সুযোগ এটি নয়। তবে নির্বিঘ্নে একথা বলা যায় যে, বর্ত্তমানে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি যে ভাবে গঠিত তাতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে' কোন কৈফিয়ত তলব করা যায় না। অর্থসম্পর্কিত বিষয়াদির উপর কর্তৃত্বের কোন ব্যবস্থা তাতে নেই। অধিক সংখ্যক সদস্য সরকারী কর্ম্মচারী। বেসরকারী সদস্যেরা সম্পূর্ণভাবে সরকারীমহল কর্ত্তৃক মনোনীত হয়ে নিযুক্ত হওয়ার ফলে তাহারা সাফল্যের সঙ্গে জনমত প্রকাশে অক্ষম এবং দক্ষতার সঙ্গে কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করতে হলে তাদের পক্ষে যে পরিমাণ জনসাধারণের আস্থাভাজন হওয়া প্রয়োজন তা' কখনই তাহারা অর্জ্জন করতে পারে না। এমন কি নিকটবর্ত্তী ক্রাউনকলোনী সিংহলের লেজিস্লেটিভ কাউনসিলও অপেক্ষাকৃত ভাবে অধিকতর জনমতমূলক।

কাউনসিলের সংস্কার ও প্রসারতার প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ সমস্ত বিরাট সংস্কার কার্য্যের প্রবর্ত্তন যে সমস্ত চেষ্টার ফলে হয়েছিল তাদেরও কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত দেওয়া যাক। মহারাণীর জুবিলী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৭ সালে। ভারতে ও সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই বিশেষ

সমারোহে তা' পালিত হয়েছিল। সে সময় কোলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ হ্যরিসন (পরে স্যার হেনরী)। তাঁর উপরেই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ভার পড়ে। মফস্বলের বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে যে সমস্ত আমন্ত্রিত প্রতিনিধি আসবেন তাঁদের তত্ত্বাবধান করতে ও ময়দানে উৎসব পালনের ব্যবস্থায় তাঁকে সহায়তা করতে তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন।

আমি এখানে মুহূর্তের জন্য আমার সেই পরলোকগত বন্ধুর আত্মার স্মৃতির উদ্দেশে আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করব। তাঁর মত এরূপ একজন দক্ষ ও সহানুভূতিসম্পন্ন ইংরেজকর্ম্মচারী তৎপূর্ব্বে আমি দেখি নি। স্যার হেনরী হ্যারিসন ও স্যার হেনরী কটন এ দুজনের স্মৃতি আমার মনে চির জাগ্রত হয়ে রয়েছে। তাঁদের রাজনৈতিকমতবাদে উভয়ে ছিলেন অভিন্ন। দুজনেরই বোধশক্তি ছিল অত্যন্ত উচ্চস্তরের। স্যার হেনরী হ্যারিসন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়ম টার্ণার বলেছিলেন, অর্থোপার্জ্জনের পথ বেছে নিতে স্যার হেনরী হ্যারিসন ভুল করেছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়ার পরিবর্তে যদি বিলাতে আইনব্যবসায়ে যোগ দিতেন, তা' হ'লে তিনি এটর্নি জেনারেলও হতে পারতেন। বিতর্কের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রুপার্ট-এর মত। ভাষার উপর তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। চমৎকার ও মনোরম। বিতর্কে এরূপ কৃতিত্বসম্পন্ন লোক আমার চোখে কমই পড়েছে। আমি যতদূর জানি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে এরূপ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় হয় নি। শুনেছি কলেজে পাঠাবস্থায় তিনি ছিলেন অকস্ফোর্ড ইউনিয়নের সভাপতি। কর্পোরেশনের স্থায়ী সভাপতি হিসাবে এবং তার মিটিং ইত্যাদির সভাপতি হিসাবে, তাঁর বক্তব্যের পর বলার কিছু থাকত না। তাঁর মতের বিরুদ্ধে ভোট পাওয়া ছিল কষ্টসাধ্য। এজন্য আমরা বুদ্ধি করে' নিয়মাবলী পরিবর্তন করে' কোন

প্রস্তাবের প্রস্তাবককেই শেষ কথা বলবার জন্য আমরা ক্ষমতা দিতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এ প্রস্তাবেও তখনকার নিয়ম অনুসারে শেষ কথা বলার ক্ষমতা ছিল তাঁর। ফলে আমরাই পরাজিত হই। তাঁর আধিপত্য পূর্ব্ববৎ অপ্রতিদ্বন্দ্বীই রয়ে গেল। তবে এই আধিপত্য সত্ত্বেও তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগে ছিলেন অত্যন্ত সহৃদয়তাপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভাবে তিনি তাঁর সহকর্ম্মীদের নিকট থেকে সমর্থনই লাভ করতেন।

কোলকাতা কর্পোরেশন একবার এক দলাদলির শিকার হয়ে বিপর্য্যস্ত হতে লাগল। হাইকোর্টের এক বিচারপতি স্বাস্থ্যবিষয়ে তা' নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন। এ অবস্থায় স্যার হেনরী নির্ভীক ভাবে কর্পোরেশনের পক্ষ সমর্থন করে যেরূপ সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন এবং পরিণামের জন্য ভীত না হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন তা' দেখে কি বন্ধু কি শত্রু প্রত্যেকেই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। ইলবার্ট বিল নিয়ে যখন তুমুল ঝড় উঠেছিল, সেই অন্ধকার দিনগুলিতে আবহাওয়া ছিল মারাত্মক। জাতিবৈষম্যের পুঞ্জীভূত বিষ তখন আকাশচুম্বী। তখনো স্যার হেনরী হ্যারিসন ও মিঃ কটন তাঁদের কিড ষ্ট্রীটের বাড়ীতে এক সান্ধ্যভোজনের আয়োজন করে' বহু নেতৃস্থানীয় ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করেন। ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বৈষম্যের ভাব দূর করবার জন্য অনুপ্রাণিত করে মিঃ কটন এক বক্তৃতাও করেছিলেন। ১৮৮৫ সালে পাণ্ডে-ঘটনার পর আমরা যখন বাঙ্গালীদিগকেও স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করি, স্যার হেনরী হ্যারিসন আমাদের দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে' (যদিও তিনি জানতেন যে, সরকার ছিল তাঁর বিরোধী) একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। এবং শিক্ষিত সমাজের ন্যায়সংগত আশাআকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন।

শিক্ষিত ভারতীয়দের সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন—

"শিক্ষিত ব্যক্তিরাই এখন ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি, পথ-প্রদর্শক, শিক্ষাদাতা ও সংবাদ সরবরাহকারী। সামান্য মাত্র চিন্তা করলেই দেখা যাবে এই সমাজ,—যাদের হাতে রয়েছে তাদের সমস্ত বিদ্যালয়, সংবাদপত্র ও আদালত-কাছারী—তাদের সমস্ত সরকারী অফিসগুলিকে যেভাবে শিক্ষা দেবে আগামী দিনের ভারত নিঃসন্দেহে সে-অনুসারেই ভাববে ও কাজ করবে। তারাই হ'বে ভারতের রব, ভারতের মস্তিষ্ক। ভারতের জনগণ হবে তাদের বাহু আর তারা প্রতিফলিত করবে তাদেরই শিক্ষা। সুতরাং এই তরুণ ভারতের সঙ্গে ব্যবহার করবার সময় আমরা যদি মনে করি যে, আমরা সমাজের এক অতি অকিঞ্চিৎকর অংশের সঙ্গেই রাজনৈতিক (প্রকৃত পক্ষে সামরিক) কাজকর্মে লিপ্ত রয়েছি, তা' হবে এক সাংঘাতিক ভুল। আজ যে সমস্ত ধারণা মাত্র দু'লক্ষ লোকের মনকে তোলপাড় করছে কাল হয়ত কোটি-কোটি লোকের মনে তা' ঝড় তুলবে। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভুল হবে যদি আমরা মনে করি যে, আমাদের সমস্ত কাজকর্ম্ম শিক্ষিত দেশীয়দের নিয়েই আরম্ভ আর তাদের নিয়েই শেষ।"

১৮৮৬ সালে স্বদেশে ফিরে গিয়েও স্যার হেনরী হ্যারিসন 'কোয়ার্টারলি রিভিউ'-তেও ঠিক এভাবেই নিবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দেশীয় শিক্ষিতদের উপর, তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার উপর দলননীতি চালিয়ে যান আর দেখুন যে, তাদের দিয়ে আপনারাই এক সুদৃঢ় সরকারবিরোধী দুর্গ নির্ম্মাণ করে' দিচ্ছেন। তার পরিবর্তে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন, দেখবেন তারাই হয়েছে সরকারের পরম হিতৈষী।

এই ছিলেন স্যার হেনরী হ্যারিসন। একজন খাঁটি ইংরেজ। গর্ব্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, তাঁর বন্ধুত্ব অর্জ্জনের সৌভাগ্য আমার

হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুই আমাদের সেই বন্ধুত্বকে নির্মম ভাবে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

মহারাণীর জুবিলীতে মফস্বল অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটির আমন্ত্রিত প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধান করবার দায়িত্ব যখন স্যার হেনরী হ্যারিসন আমার উপর চাপিয়ে দিলেন আমি স্থির করলাম আমিও এই পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করতে পশ্চাৎপদ হব না। আমি মনে করলাম সে সময় আমাদের কাছে সব সমস্যার মধ্যে যা' বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই প্রতিনিধিমূলক লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সংস্কার ও পুনর্গঠনের সমস্যাকে সবার সম্মুখে উপস্থিত করবার এটিই হ'ল সুবর্ণ সুযোগ। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে এক-একখানি অভিনন্দন পাঠ করবার কথা ছিল। এদের প্রত্যেকটির মধ্যে যাতে কাউনসিলের সংস্কার ও প্রসারকল্পে একটি আবেদন থাকে আমি তার ব্যবস্থা করলাম। মফস্বলের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে আমি এবিষয়ে এক সার্কুলার পাঠিয়ে দিলাম এবং তাদের নিকট থেকে খুব আন্তরিকতাপূর্ণ উত্তরও পেলাম। অভিনন্দন পত্রগুলি প্রায় একই রকমের হয়েছিল। তাদের একটি থেকে নিয়ে একটি ছত্র উদ্ধৃত করে দিলাম—

"ভূতপূর্ব্ব ভাইসরয়'এর অনুপ্রেরণার ফলে দেশের সর্বত্র স্বায়ত্ত শাসন নীতি প্রবর্তিত হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে এ নীতি এত সফল হয়েছে যে, প্রত্যেকেরই ধারণা এ নীতিকে স্থানীয় অপরাপর প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করা যেতে পারে। এবং জুবিলীর এই শুভমুহূর্তে আমরা আশা করি, যেই ইংলিশ সভ্যতার প্রতি পদক্ষেপেই প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়েছে, এবং যা' ইংরেজ শাসনের এক সুমহান কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিরাজিত, মহামাননীয়া মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর গৌরবময় মঙ্গলকামী রাজত্বে অন্তত আংশিকরূপে হলেও সেরূপ

প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের জন্ম লাভের সূচনা দেখবার সৌভাগ্য থেকে ভারতের অধিবাসীরা বঞ্চিত হবে না।”

লর্ড ডাফরিনের কাছ থেকে তার এক যথাযোগ্য উত্তর পাওয়া গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, “এক পুরুষ পূর্বে মহান রাজনীতিবিদ লর্ড হ্যালিফ্যাকস অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা এদেশে দান করেছিলেন, ভারতে অবস্থানকালে যদি তা' অধিকতর প্রসারিত করে অধিকতর বিস্তৃত ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে—যে সমস্ত ভারতীয় ভদ্রমহোদয় তাঁদের প্রভাব, তাঁদের অর্জিত গুণাবলী ও তাঁদের দেশবাসীর মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি করার দরুণ আমাদের আইন সভা সমূহের আনুষঙ্গিক বলে' পরিগণিত হয়েছেন,—তাঁদের উপর ন্যস্ত করবার মত সুযোগ আমার আসে তবে তাতে আমি পরম প্রীতি ও আনন্দ লাভ করব।”

মিঃ জর্জ ইউল আমার পার্শ্বেই বসেছিলেন। তিনি পরে এলাহাবাদে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “পাঁচ বছরের মধ্যেই দেখবেন সংস্কার আরম্ভ হয়ে গেছে।” কথাগুলি ছিল বাস্তবিকই এক ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার কথার মত। কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছিল ১৮৮৭ সালে। আর শাসনসংস্কার এসেছিল তার ঠিক পাঁচ বছর পরে ১৮৯২ সালে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে লর্ড ডাফরিণ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠনে প্রথমাবধি উৎসাহ দিয়েছিলেন, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তিনি তাঁর কার্য্যভার পরিত্যাগ করবার পূর্ব মুহূর্তে ভারতের শিক্ষিত সমাজকে নিতান্ত নগণ্য এক সংখ্যালঘু দল বলে অভিহিত করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে কোলকাতার সেণ্টএনগু জ-ডিনারে বসে যখন তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নিন্দা করছিলেন তখন তিনি কাউনসিলের সংস্কারের সুপারিশ করে' এক জরুরীবার্তা রচনা করছিলেন। রাজনীতির পন্থা বাস্তবিকই অতি অদ্ভূত। তা সত্ত্বেও যে ভাইসরয় লেজিসলেটিভ

কাউনসিলকে জনমতের ভিত্তিতে পুনর্গঠনের পরিকল্পনার জন্য সর্বপ্রথম সুপারিশ করেছিলেন, তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করে' আমরা তা' ভুলে যেতে পারি। ১৮৯২ সালের পার্ল্যামেণ্টারী ষ্ট্যাট্যুটের ভিত্তি ছিল তাঁরই এই গোপন জরুরী বার্তা। ১৮৮৯ সালের মার্চ্চ মাসে বেঙ্গলী পত্রিকাতে আমি তা' সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেছিলাম।

এখানে আমি বলতে পারি যে, লর্ড ডাফরিণ লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সংস্কার সম্পর্কে জরুরী বার্ত্তা দাখিল করবার পূর্ব্বে তিনি স্যার হেনরী হ্যারিসন, মিঃ কটন প্রভৃতি কয়েকজন লোকের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। লাটভবনে আমারও আমন্ত্রণ হয়েছিল এবং বড়লাট সাহেবের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে' আমার আলোচনাও হয়েছিল। নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে কাউনসিল পুনর্গঠনের জন্য আমি তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলাম। তা' ছাড়া প্রশ্ন উত্থাপন করে কৈফিয়ৎ দাবী করতে ও আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ন্ত্রণ বিষয়ের ব্যবস্থা রাখতেও আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম। বেশ খোলাখুলি ও বন্ধু ভাবেই আমাদের কথাবার্ত্তা হ'ল। তারপর তিনি আমাকে তাঁর একান্ত সচিব স্যার ডোনালড ম্যাকেনজির ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে সৌজন্য সহকারে বললেন, "মিঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তোমার নিকট থেকে যা' জানতে চান, তাঁকে তা' বলে দাও।" আমাদের মধ্যে যে সব বাক্যালাপ হয়েছিল আমি সমস্তই স্যার হেনরী হ্যারিসনকে জানালাম। আমি দেখলাম তার পূর্ব্বেই তাঁর সঙ্গে ভাইসরয়-এর দেখা হয়েছে এবং এবিষয়ে আলোচনাও হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, "সুরেন্দ্রনাথ, একটি কাউনসিল গঠিত হবে এবং তুমি হবে তার একজন সদস্য"। সেই ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছে। সৎ ও সত্যের কথা কোনদিন নিষ্ফল হয় না।

যে বছরের ঘটনা আমি বর্ণনা করছি, তা' আমার পক্ষে ছিল অত্যন্ত কঠোর ও ক্লান্তিদায়ক পরিশ্রমের বছর। 'আউটষ্টিল সিসটেম' বলে

যে একটি নীতি আছে, সে বছরে হুগলী জিলায় কর আদায়ের জন্ম তার প্রবর্ত্তন করা হ'ল। তার ফলে দেশীয় মদের মূল্য অর্দ্ধেক হ্রাস করে মগু বিক্রয় অত্যন্ত সহজ করা হ'ল। মূল্য হ্রাস হওয়ার ফলে মগুপানও বৃদ্ধি পেতে থাকে। গ্রামাঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে মগুপান-অভ্যাস দ্রুত বিস্তার লাভ করল। হুগলী জিলার ঠিক বিপরীত দিকেই আমার বাস। নদীর ধারে এক সুরার দোকান। উহা এত নিকটে যে, সেখান থেকে ঢিল ছুঁড়লেই যেন আমাদের বাড়ীতে এসে পড়ে। সুরা পানের ফলে যে নৈতিক অবনতি ও সর্ব্বনাশ ঘটে তার অনেক কাহিনী আমি শুনেছিলাম। এখন দূরবর্ত্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে-সমস্ত সংবাদ আসতে লাগল তাতে মগুপান প্রসারের কথা আরও পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হ'তে লাগল। তবুও এসমস্ত সংবাদে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। আমি নিজে হরিপাল-এ গিয়ে মদের দোকান পরিদর্শন করলাম। সেখানে যে দৃশ্য আমার চোখে পড়ল তা' আমি জীবনে কোনদিন ভুলতে পারব না। আমি দেখলাম জন ছয়েক মেয়ে ও পুরুষ সুরাপানে উন্মত্ত হয়ে ঘরের মেজেতে পড়ে আছে। অন্য একটি দলে প্রায় ডজন খানিক মেয়ে ও পুরুষ, প্রায় সকলেই নিম্নশ্রেণীর, উন্মত্ততার বিভিন্ন অবস্থায় আমাকে ঘিরে হুল্লোড় করে' নাচতে আরম্ভ করল। আমার ভয় হ'ল হয়ত তারা আমাকে মারধরও করতে পারে। খুব সতর্কতার সঙ্গে আমি ধীরে-ধীরে দোকান থেকে বার হয়ে এলাম এবং স্থির করলাম এ-সমস্ত বন্ধ করবার জন্য আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব।

ভারাক্রান্ত মনে আমি বাড়ী ফিরলাম। আমার মনে হ'ল এ সমস্ত সস্তা দামের সুরাপানের সর্ব্বনাশা ফল থেকে মানুষকে বাঁচাতে হলে এক অবিরাম সুসংগঠিত চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। দু' ভাবে এ কাজ করতে হবে। সুরাপান বর্জন করবার জন্য সবার কাছে আমাদের আবেদন করতে হবে এবং 'আউটষ্টিল সিসটেম' বন্ধ করবার জন্য

সরকারের কাছে আবেদন জানাতে হবে। লোকের কাছে আবেদন করাকেই আমরা অগ্রাধিকার দিলাম এবং তাকেই আমাদের কার্য্যতালিকার প্রথমে স্থান দিলাম। আমাদের মনে হয়েছিল, আমাদের অভিমত যখন সুসংগঠিত তখন আমাদের আবেদনও হবে দুর্নিবার। আমরা এপথেই কাজ আরম্ভ করলাম এবং তার যা' ফল হল তা' থেকে প্রমাণ হয়েছিল যে, আমাদের কার্য্যতালিকা বাস্তবিকই উত্তম হয়েছিল। পরে যখনই আমরা এভাবে চিন্তা ক'রে কাজ করতে সচেষ্ট হয়েছি তখনই আমাদের এই অভিজ্ঞতা পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

হুগলী জিলায় ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি জনসভা করে' আমরা আমাদের অভিযান আরম্ভ করলাম। সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের নিয়েই এই সভাগুলি হ'ত। খোলা ময়দানে হাজার হাজার লোক, এমন কি, বৃষ্টির মধ্যেও এসমস্ত সভায় যোগ দিত। এসকল সভায় বক্তৃতার ভাষা হ'ত অত্যন্ত সহজ ও চলতি। তাতে কোনরূপ অলঙ্কার বা সাহিত্যের কষ্টকল্পিত শব্দ বা গন্ধ পর্য্যন্ত থাকত না। পূর্ব্বে আমি কখনো জনসভায় বাংলায় বক্তৃতা করতে অভ্যস্ত ছিলাম না। কিন্তু একটু প্রস্তুত হয়ে দেখলাম এই অনভ্যস্ত পথও আমার পক্ষে সুগম হয়ে উঠল। পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমায় যখন অসংখ্য সভায় বক্তৃতা করতে হয়েছে তখন আমার এই মূল্যবান শিক্ষা আমার অনেক সহায়তা করেছে। আমাদের এসমস্ত সভার সঙ্গে থাকত সংকীর্ত্তনের দল। উপযুক্ত কীর্ত্তন রচনা করে খোল করতাল নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে তারা গ্রামের পর গ্রাম পরিক্রমা করত। তাতে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গেল। বহু দূরবর্ত্তী গ্রামাঞ্চল থেকেও কাতারে কাতারে লোক এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগল, এবং আমাদের সভাসমিতিতে এসে আমাদের বক্তৃতা শুনতে লাগল। এসমস্ত ব্যাপারে সঙ্গীত তখন বেশ বড় রকমের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে আমরা অন্তত এটুকু সংগ্রহ করেছিলাম।

আর তখন থেকে বাংলাদেশের সমস্ত জনপ্রিয় ও রাজনৈতিক প্রচার কার্য্যে সংকীর্ত্তনকে এক গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলাম এবং তা'তে প্রচুর লাভবান হয়েছিলাম। আমাদের দলের বাবু বরদাপ্রসন্ন রায়ের কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত মধুর। তিনিই গান রচনা করে', তাতে সুর দিয়ে অতি সুমিষ্ট কণ্ঠে গান করতেন। তাঁর গান তখন লোককে পাগল করে' তুলত। তবে একথা ভুললে চলবে না যে, আমাদের সঙ্গে যাঁরাই এসমস্ত কাজে জড়িত থাকতেন, তাঁরা কোনরূপ পারিশ্রমিকই নিতেন না। এ ছিল সম্পূর্ণরূপে সখের শ্রম। সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস ধরে' বহু ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেও তাঁরা এই নিয়েই মগ্ন থাকতেন।

এ সকল মহাপ্রাণদের স্মৃতিরক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের। সকলের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্ববিষয়ে অত্যধিক অগ্রণী। তখন ছিল তাঁর তরুণ বয়স। কিন্তু পরিণত বয়সে যখন সাংসারিক শোকতাপে জর্জ্জরিত তখনো তাঁর এই অসাধারণ উৎসাহ ও উদ্যম সমভাবেই তিনি রক্ষা করেছিলেন। তাঁর সমকালীনদের মধ্যে তিনি ছিলেন এক অশেষগুণসম্পন্ন ও অতি নিঃস্বার্থ ব্যক্তি। আমাদের উত্তরপুরুষেরা যদি কোন খাঁটি, মহৎ ও নির্ম্মল চরিত্রের মানুষের স্মৃতিকে অমর করে রাখতে ইচ্ছুক হন তা' হলে তাঁরা এই অনন্য সাধারণ ব্যক্তিটির কথা ভুলতে পারবেন না। তিনি স্বভাবতই ছিলেন একান্ত ধার্ম্মিক প্রকৃতিব। রাজনীতিকে তিনি তাঁর ধর্ম্মেরই অংশ বলে' গণ্য করতেন। তাঁর প্রত্যেক জনহিতকর কার্য্যক্ষেত্রেই মনে হত পুরাতন দিনের পিউরিট্যানদের কথা। সংসারের প্রতি উদাসীন, বিশ্বাসে অটল, পার্থিব সুখে বীতশ্রদ্ধ এবং যা' কিছু মিথ্যা বা যা' শুধুমাত্র জাহির করবার প্রচেষ্টা সে সবের প্রতি নির্ম্মম ভাবে ঘৃণা প্রকাশ ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু প্রাচীন পিউরিট্যানদের সঙ্গে তাঁর

পার্থক্যও ছিল। তিনি ছিলেন মধুর শান্তস্বভাবাপন্ন যা' তাঁর চরিত্রকে আরও মধুময় করে দিয়েছিল। যে-কোন শুভ কাজেই তাঁর মন থেকে সাড়া পাওয়া যেত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কৃষ্ণকুমার মিত্রের মত অবিচলিত বন্ধু খুব বেশী ছিল না। তিনি ছিলেন বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধী। অকৃত্রিম দেশভক্তির জন্য তাঁকে নির্ব্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছিল সর্ব্বাধিক নির্ম্মম, কারণ তিনি ছিলেন সর্ব্বদাই বৈধ উপায়ের সমর্থক এবং বিপ্লবপন্থার ঘোর বিরোধী। ১৯০৯ সালে আমার সঙ্গে ইণ্ডিয়া অফিসে যখন লর্ড মর্লে'র দেখা হয় তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, কৃষ্ণকুমার মিত্রের নির্ব্বাসন হয়েছিল এক মস্ত বড় ভুল। আমি শুনেছি, এখন সরকারী মহলও একথা স্বীকার করেন। এ-ঘটনা থেকে বোঝা যায় একতরফা ভাবে একমাত্র পুলিসের রিপোর্টে'র উপরই নির্ভর করে, অপর পক্ষকে তার স্বপক্ষে কিছু বলবার পর্য্যন্ত সুযোগ না দিয়ে তার বিরুদ্ধে কিছু করতে যাওয়া কি বিপজ্জনক। পরে যে বিষয়ে আরও বিস্তৃতভাবে বলার প্রয়োজন হবে', হয়ত কথা প্রসঙ্গে আমি তা'তেই এসে পড়েছি।

যাক, এবার আমি আবার সেই জনসভার কথায় এবং যে সমস্ত বন্ধু আমার সঙ্গে কাজ করতেন তাঁদের কথায় ফিরে যাই। বাবু কালীশঙ্কর সুকুল ছিলেন অপর এক কর্ম্মী। তিনি ছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র এবং তাঁর বৎসরের কবডেন স্কলার। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন না। তিনি ছিলেন উত্তর প্রদেশের কানপুর অঞ্চলের লোক। তবে বাংলার জলবায়ুর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। যে কোন বাঙ্গালীর মত বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারতেন। তিনি একজন বাঙ্গালী মহিলার পাণি গ্রহণও করেছিলেন এবং বলতে গেলে বাঙ্গালীই হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যেরূপ সহজভাবে এবং প্রায় মাতৃভাষার মতই বাংলাভাষায় কথা বলা আয়ত্ত করেছিলেন তার তুলনায় তাঁর মাতৃভাষা হিন্দীকে বোধ হয় সেরূপ আয়ত্ত করতে

পারেন নি। কানপুরে এক জনসভায় হিন্দীভাষায় বক্তৃতা করে' আসার পর তিনি আমাকে বলেছিলেন, তিনি নাকি অনেক ব্যাকরণগত ভুল করেছিলেন। ১৮৭৬ সালে ভারতের ঐক্য বিষয়ে এক জনসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। একদল ছাত্রশ্রোতার ভিতর থেকে দাঁড়িয়ে তিনিও বক্তৃতা করলেন। একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা, কিন্তু শ্রোতাদের মনে দাগ কেটে দিল। বুঝে নিলাম যুবকটির মধ্যে পদার্থ রয়েছে। এবং আমি ঠিকই বুঝেছিলাম। এই পরিচয় ক্রমশ আমাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আমাদের "আউটষ্টিল" আন্দোলনে তিনি অংশ গ্রহণ করলেন। সিভিল সার্ভিস আন্দোলন সম্পর্কে আমি যখন একবার বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর ভারতে যাই কালীশঙ্কর বাবুও আমার সঙ্গে ছিলেন। পরে ব্যবসার প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে একান্ত ভাবে কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু তবুও শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বন্ধুত্ব কোনদিন শিথিল হয় নি।

বাবু বরদাপ্রসন্ন রায় ছিলেন বরিশালের অধিবাসী। ব্যক্তিগত কারণে জনহিতকর কর্ম্মক্ষেত্র থেকে শীঘ্রই তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, অর্থের অভাবে তাঁর মত একজন কর্ম্মীকে আমরা স্থায়ীভাবে রাখতে পারি নি। হুগলী জিলাতে আমরা অনেকবার সভা করেছিলাম। তখন আমাদের পেছনে-পেছনে ঘুরে আমাদের কাজকর্ম্মে বাধা দেবার জন্য গোয়েন্দা পুলিশের ব্যবস্থা ছিল না। আমরা যখন একই সঙ্গে সরকারের স্বার্থে ও জনসাধারণের স্বার্থে এই শুভ কাজে নিবিষ্ট ছিলাম তখন গোপনে কে কোথায় আমাদের উপর নজর রেখে সব লক্ষ্য করছে সে ভয় আমাদের ছিল না। বোধ হয় বিশেষ কোন কারণ না থাকলে আজকাল পুলিশের উপস্থিতিজনিত উপদ্রবের কোন কারণ থাকে না।

"আউটষ্টিল সিসটেম" রহিত করবার জন্য সরকারের কাছে

আবেদন করে' আমরা সভাসমিতিতে বলে যেতে লাগলাম। আমাদের আবেদন সফল হয়েছিল। কারণ তার পশ্চাতে ছিল জনগণের সমর্থন। এবং সৌভাগ্যবশত আমরা মিঃ ডবল্যু. এস. কেইনের নেতৃত্বাধীন টেম্পারেন্স এ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকেও সহানুভূতি পেয়েছিলাম। তিনি একবার ভারত পরিভ্রমণে এসে দেখা করে বলেন, "প্রারম্ভিক পরিশ্রমের কাজটি আপনি সম্পূর্ণ করেছেন। আর একটি ধাক্কা দিলেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। তাতে আমরা আপনাকে সাহায্য করব। এই বলে তিনি পা' খানি এগিয়ে দিলেন, যেন তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে তিনি তখনই প্রস্তুত। আমাদের আবেদনের প্রত্যুত্তরে সরকার হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়েষ্টম্যাকটকে হুগলী জিলায় 'আউটষ্টিল' প্রথা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য নিয়োগ করলেন। তিনি আলোচনা সভা করলেন, সাক্ষী প্রমাণ নিলেন। কোন কোন সভাতে আমি নিজে উপস্থিত থেকে অনুসন্ধান কার্য্যে সহায়তা করতাম। এই অনুসন্ধানের ফলে সেই কুপ্রথা বিলুপ্ত হয়। এবং হুগলী জিলার দরিদ্রশ্রেণী এই ভয়ঙ্কর অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়।

সেই থেকে বহু বৎসর কেটে গেছে। কিন্তু এখনো আমি সে সমস্ত দিনের প্রচেষ্টাগুলিকে মনে করে' পরম আনন্দ উপভোগ করি। একথা সত্য যে, সেদিনের কাজগুলি ছিল কঠিন কঠোর। পথহীন প্রান্তরে হেঁটে চলেছি। ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত অঞ্চলে বাস করেছি। অনভ্যস্ত আহার্য্যে ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছি। একদিন সন্ধ্যায় খেতে বসেছি। দেখি আমাকে যে তরকারি পরিবেশন করা হয়েছে তার মধ্যে বেশ বড় আকারের একটি তেঁতুল বিছে। অবশ্য মরা। ক্ষুধার জ্বালায় বিছেটি ফেলে দিয়ে তরকারিটা খেয়ে নিলাম। তা' বলে যে আমার কোন ক্ষতি হয়েছিল বা রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছিল এমন কথা বলতে পারি না। কাজ করতে গেলে এরকম সাধারণ অভাব অসুবিধা এক আধটুকু হয়েই থাকে। আর এসব গল্প বললে বন্ধুরা

বেশ আমোদ পান এবং আনন্দ উপভোগ করেন। এসব সত্বেও এসকল কর্ম্মের ভিতর দিয়ে আমি অনেক শিক্ষালাভ করেছিলাম। আমি এতে গ্রামাঞ্চলে চাষীদের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গী ও সহানুভূতিকে আরও ব্যাপক করতে সমর্থ হয়েছিলাম। আমার পক্ষে এই শিক্ষাই ছিল একান্ত প্রয়োজন।

———

দশম অধ্যায়

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

১৮৮৩ সালে যে প্রথম ন্যাশন্যাল কনফারেন্স হয়েছিল তা' পূর্ব্বেই বলেছি। ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা দ্বিতীয়বার ন্যাশন্যাল কনফারেন্স-এর ব্যবস্থা করলাম। এও হ'ল ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী কনফারেন্সেরই মত এবং সেই ভাবধারারই অনুকরণে। কিন্তু ইতিমধ্যে তার আদর্শ অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। এই কনফারেন্সের অহ্বায়ক ছিল কোলকাতার তিনটি নাম করা সমিতি, যথা, জমিদারশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষক বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন এবং সেণ্ট্র্যাল মহমেডান এ্যাসোসিয়েশন, যার সম্পাদক ছিলেন মিঃ (বর্ত্তমানে রাইট্ অনারেবল মিঃ) আমীর আলী।

১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরের ২৫, ২৬ ও ২৭শে এই তিন দিন ধরে' কনফারেন্স চলল। উত্তর ভারতের মীরাট, বারাণসী, এলাহাবাদ প্রভৃতি বহু সহর থেকে প্রতিনিধিরা এই কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন। বোম্বাই থেকে ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সে প্রদেশের ভারতীয় সদস্য অনারেবল মিঃ বিশ্বনারায়ণ মেণ্ডেলিক এই কনফারেন্স-এ প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন। লেজিসলেটিভ কাউনসিলসমূহের সত্বর সংস্কারের সুপারিশ করে কনফারেন্স-এ প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। এবং এ সম্পর্কে একটি সন্তোষজনক নিষ্পত্তির জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে তা' বিচার করবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হ'ল।

কোলকাতায় আমরা যখন ন্যাশন্যাল কনফারেন্স-এর অধিবেশন

করছি সে সময় ঠিক তারই অনুকরণে তারই কার্য্যতালিকা মত কার্য্যধারা গ্রহণ করে' বোম্বাইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসল। যুগপৎ দুটি অধিবেশনেরই ব্যবস্থা হয়েছিল। সম্পূর্ণ পৃথক ভাবেই দুটির সমস্ত প্রাথমিক ব্যবস্থা করা হ'ল। কনফারেন্স বা কংগ্রেস কোন পক্ষই স্ব স্ব অধিবেশনের আগের দিন পর্য্যন্ত পরস্পারের কাজকর্ম্ম সম্পর্কে কোন কিছুই জানত না। বোম্বাই কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ ডবল্যু. সি. বোনার্জী সেখানে অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি বললাম, এত দেরীতে আর কনফারেন্স বন্ধ করে দেওয়া চলে না। তার সংগঠনে আমার যথেষ্ট অংশ ছিল। কাজেই বোম্বাইতে অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য কোলকাতা ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ১৮৮৫ থেকে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যতগুলি অধিবেশন হয়েছিল কেবল মাত্র এই অধিবেশন আর করাচী অধিবেশন ভিন্ন অন্য সমস্তগুলিতেই আমি উপস্থিত ছিলাম। ১৯১৭ সালের পর নরমপন্থীদল কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে। তার কারণ আমি পরে বর্ণনা করব।

সম্ভবত আমরা যখন কোলকাতায় ন্যাশন্যাল কনফারেন্স-এর অধিবেশনের ব্যবস্থাদি করছিলাম তখন আমাদের কয়েকজন বন্ধু একই উদ্দেশ্য নিয়ে মিঃ এলেন হিউম-এর নেতৃত্বে মাদ্রাজে মিলিত হন। বোম্বাই থেকে মিঃ কাশীনাথ ত্র্যম্বক টেলাং এক পত্রে ১৮৮৩ সালে ন্যাশন্যাল কনফারেন্স'এর যে প্রথম অধিবেশন হয়েছিল তার কিছু তথ্যাদি তাঁর নিকট পাঠাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। দুটি কনফারেন্সই প্রায় একই সময়ে মিলিত হয়ে একই রকম মতামত আলোচনা করে' প্রায় একই প্রকার আশা-অভিযোগ প্রকাশ করল। যার অধিবেশন কোলকাতায় হ'ল তাকে বলা হ'ল "ন্যাশন্যাল কনফারেন্স।" এবং বোম্বাইতে যার অধিবেশন হ'ল তার নাম হ'ল

"ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস" (ভারতীয় জাতীয় মহাসভা)। তারপর থেকে আমাদের সঙ্গে যাঁরা কাজ করছিলেন সকলেই কংগ্রেসে যোগ দিয়ে মনেপ্রাণে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগলেন।

বঙ্গদেশে আমরা কংগ্রেসের অনুকরণে অথচ অধিকতর ব্যাপক ভাবে কেবলমাত্র এ প্রদেশেরই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আর একটি আন্দোলন আরম্ভ করলাম। ১৮৮৮ সালে আমরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স আহ্বান করলাম। জাতীয় কংগ্রেস ছিল একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। কাজেই কোন বিশেষ প্রদেশের সমস্যা নিয়ে কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, যদি না, তা' ব্যাপকভাবে সমগ্র ভারতের জাতীয় সমস্যার আকার ধারণ করে। কিন্তু তখন প্রাদেশিক সমস্যাবলীরও অন্ত ছিল না। অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সে সম্পর্কেও জনমত প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এমন কি, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিষয়ক সমস্যাগুলিও এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হ'ত। এজন্য প্রাদেশিক প্রতিনিধিদেরও কনফারেন্স ইত্যাদিতে মিলিত হয়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করার ও সেজন্য ব্যবস্থাদি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এ সব কারণেই প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স আহ্বান করার সিদ্ধান্ত হ'ল।

অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও বঙ্গদেশের দৃষ্টান্ত অনুসৃত হয়েছে। বর্ত্তমানে প্রাদেশিক কনফারেন্সগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং ভারতের প্রায় প্রতি অঞ্চলেই তাদের দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত কোন কোন ক্ষেত্রে তা আরও অগ্রসর হয়েছে। ফলে ভারতের অনেক অঞ্চলে জিলা কনফারেন্সও অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ ভাবে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেই তারা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বঙ্গদেশে প্রাদেশিক কনফারেন্স এখন এক বিরাট আকার ধারণ করেছে। কোন কোন সময় তার সদস্যসংখ্যা কংগ্রেসের অপেক্ষাও অধিক। অনেক সময় তাদের অধিবেশন শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই

নানাপ্রকার সামাজিক কনফারেন্সের অধিবেশন বসে। আর সেখানে বিভিন্ন সমসাময়িক উত্তেজনাপূর্ণ সমস্যাদির আলোচনা ও প্রাণবন্ত বিতর্কাদি চলতে থাকে। বঙ্গদেশের সামাজিক সমস্যাগুলি এখন আর মৃত নয় অথবা কেবল পুঁথিগত আলোচনার বিষয়মাত্র নয়। শিক্ষিত সমাজ এখন বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে সে সমস্ত নিয়ে আলোচনা করতে আরম্ভ করেছে। আমি নিজে একাধিকবার এরূপ প্রাদেশিক সামাজিক কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেছি। এ সমস্ত আলোচনা কিরূপ যথার্থ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে আমি স্বয়ং তা' বলতে পারি। তুটি সমস্যার ক্ষেত্রে মানুষের উৎসাহের অন্ত নেই। একটি হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রশ্ন, অপরটি হিন্দু বালিকাদের বিবাহের বয়সের সীমা বর্দ্ধিত করার প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্নটির সম্পর্কে দ্বিমত বিশেষ দেখা যায় না। কনফারেন্সে তার বিরুদ্ধ মত ক্বচিৎ শোনা যায়।

হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের প্রশ্নের ক্ষেত্রে অবস্থা কিন্তু অন্য প্রকার। আমার ধারণা, এ বিষয়ের উপর জনমত যে পরিমাণ অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন বা উচিত ছিল সে পরিমাণ হয় নি। যে কুপ্রথা বহু হিন্দু বিধবার জীবন ধ্বংশ করেছে, বহু হিন্দু গৃহ অন্ধকারে আবৃত করে দিয়েছে, তার অবসান ঘটাবার জন্য প্রয়োজন আর একজন বিদ্যাসাগরের। আমার মনে পড়ছে কুমিল্লায় ১৯১৪ সালে এক সামাজিক কনফারেন্স-এর অনুষ্ঠান হয়েছিল। প্রায় তিন হাজার লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ সম্পর্কে খুব উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা ও বিতর্ক হ'ল। অবশেষে যখন ভোট নেওয়া হ'ল তখন পুনর্বিবাহের সমর্থকসংখ্যা দেখা গেল জনা ছয়েকের অধিক নয়। যারা সংস্কারের পক্ষে ভোটও দিয়েছিল, আমার মনে হয়, প্রস্তাব যদি গৃহীতও হ'ত, তা' হলে তাকে কার্য্যে পরিণত করার সাহস তাদের হ'ত না। যা' বলা হয় আর যা' করা হয় এ তুয়ের মধ্যে

এখনো বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। তবে ন্যায়ের পক্ষেই জনমত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ন্যায়ের পক্ষেই যে দিন জনমতের নৈতিক পরিবর্ত্তন হবে, সেদিন এই বাধ্যতামূলক বৈধব্যের অবসান ঘটাতে হিন্দু সমাজের বিলম্ব হবে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় এখন বুঝতে শিখেছে যে, এই চলিত প্রথা সভ্যজগতের সর্ব্বত্রই পরিত্যক্ত হয়েছে এবং এই কুপ্রথাই অবলাদের প্রতি এই ভয়ঙ্কর অন্যায় অপরাধের জন্য দায়ী। হয়ত এই পরিবর্ত্তন আসা পর্য্যন্ত আমরা বেঁচে থাকব না। তবে অবস্থা যে ক্রমশ তার সন্নিকটবর্ত্তী হয়ে আসছে তার পূর্ব্বলক্ষণের আর অভাব নেই। এমন কি, স্যার আশুতোষ মুখার্জীর ন্যায় একজন নিষ্ঠাবান ও সমাজে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিও যখন নিজ কন্যার পুনবিবাহ দিয়ে এই সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধপক্ষকে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেন নি, তখন এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল হতে আর যে বিশেষ দেরী নেই সে সম্বন্ধে আমি ধ্রুব নিশ্চিত।

আমি দুএক বার "বেঙ্গলী" পত্রিকাতে ব্রাহ্মণ-বিধবা পাত্রীর পুনবিবাহের উদ্দেশ্যে পাত্রের সন্ধানে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি। এবং তাতে যেরূপ সাড়া পেয়েছি তা' দেখে বিস্মিত হয়েছি। আমার কোন-কোন নিষ্ঠাবান বন্ধুকে সেই উত্তরগুলি দেখিয়েছি। সে সমস্ত দেখে তাঁরা আমার চেয়েও অধিক আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছেন। একটি ক্ষেত্রে আমি দেড়শ'-এর অধিক আবেদন পত্র পেয়েছিলাম। তার মধ্যে কেহ-কেহ ছিলেন উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিতবংশীয় এবং তাদের উপাধি থেকে বুঝা গিয়েছিল কি প্রকার গোঁড়া পরিবার থেকে সে সমস্ত পাত্রেরা বিবাহে উদ্যোগী হয়েছিল। সমাজের অভ্যন্তরে আমাদের অজ্ঞাতে ও অগোচরে এক বিরাট শক্তি অবিরাম নীরবে কাজ করে চলেছে। আপন ইচ্ছানুসারে যথা সময়ে তা' তার যথা নির্দ্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করবে। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বজ্রযোগিনী যতই চিৎকার করুক, অভিশাপ দিক, সমাজচ্যুত করবার ভয় দেখাক বা তাদের তূণ থেকে

শাস্ত্রবাক্যের যত ব্রহ্মাস্ত্রই নিক্ষেপ করুক, তবুও অগ্রগতির বিজয়যাত্রা অক্ষয় হয়েই থাকবে। এমন একদিন আসবে যখন আমাদের বংশধরেরা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করবে তাদের শ্রদ্ধেয় নেতৃবর্গের কাঁধে এমন কোন্ ভূত চেপে বসেছিল যার প্রভাবে তাঁরা তাঁদের স্ত্রীজাতির উপর এত অন্যায় এত নিষ্ঠুর এক কুপ্রথা স্থায়ীভাবে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে অজানা হতে পারে। কিন্তু অতীতের পৃষ্ঠাগুলি আমাদের সম্মুখে খোলাই পড়ে রয়েছে। অতীত আমাদের ডেকে বলছে, রঘুনন্দন যখন হিন্দু আইনের ও স্মৃতি শাস্ত্রের অসাধারণ ব্যাখ্যা নিয়ে পাতার পর পাতা পুঁথি উলটিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক সে সময়েই ন্যায়নিষ্ঠার মহাপবিত্র আসনে বসে' বঙ্গদেশের তথা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলের উদ্দেশে হেঁকে বলছিলেন, মানুষে-মানুষে, স্ত্রীপুরুষে, হিন্দু-মুসলমানে, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে কোন ভেদ নেই। এবং তিনিই স্ত্রীজাতিকেও এই বাধ্যতামূলক বৈধব্য থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। যে সমস্ত সংস্কৃতচর্চ্চার পবিত্র পীঠস্থানে তত্ত্বজ্ঞান অন্বেষণের পরিবেশ মানুষকে করে ধ্যানমগ্ন, তাদের চিত্তকে করে ভবিষ্যৎসুখের উজ্জ্বল স্বপ্নে বিভোর, সে সব স্থানে আগামীকাল সময়ের আবর্ত্তচক্রে হিন্দু বিধবা রমণীদের মুক্তিদাতা আর এক চৈতন্যদেবের যে আবির্ভাব হবে না, এ কথা কে বলতে পারে?

আমি বোধ হয় আগামী দিনে কি হবে তারই বিবরণ দিতে আরম্ভ করেছি। বস্তুত আমি যা' বলছিলাম তার সঙ্গে এ সবের সংযোগ এত বেশী যে, বর্ত্তমান থেকে ভবিষ্যতের মধ্যে চলে যাওয়াটা নিতান্তই স্বাভাবিক। ১৮৮৬ সালে প্রথমবারের মত কোলকাতায় ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল। তাতে জনসাধারণের উৎসাহের অন্ত ছিল না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত প্রতিনিধি এসেছিলেন সমস্ত দল যুক্তভাবে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান।

আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকলে ছিলাম ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন গোষ্ঠিভুক্ত এবং প্রত্যেকেই কংগ্রেসের সদস্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁরা ছিলেন জমিদার শ্রেণীর স্বার্থের ধারক ও বাহক বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও যাঁদিগকে সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবের পৃষ্ঠপোষক বলা যায়, তাঁরাও মনপ্রাণ দিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লাগলেন। কংগ্রেসের কোন কাজে এসমস্ত শ্রদ্ধা ও এত উৎসাহ তাঁরা তার পূর্ব্বে বা পরে কোনদিন প্রদর্শন করেন নি। রাজনীতি অপেক্ষা পাণ্ডিত্যের জন্যই অধিক খ্যাতিসম্পন্ন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন। বঙ্গীয় জমিদারবর্গের বিজ্ঞ পরামর্শদাতা উনাশী বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ বাবু জয়কৃষ্ণ মুখার্জী কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্য মিঃ দাদাভাই নওরোজীর নাম নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করলেন। সুতরাং এ কংগ্রেস ছিল সম্পূর্ণভাবে বৃদ্ধদেরই কংগ্রেস। তবুও একটি কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যুবা-বৃদ্ধ, জমিদার-মধ্যবিত্ত, বস্তুত ভারতীয় সমস্ত সম্প্রদায় কংগ্রেস মঞ্চে একতাবদ্ধ ভাবে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল।

বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের রাজনৈতিক দলের মধ্যে ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, রাজা দিগম্বর মিত্র এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন তাঁদের নেতা। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন দলের সাহিত্য প্রতিভা। দিগম্বর মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল তখন পরলোকে। দলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব পড়েছে রাজা রাজেন্দ্রলালের উপর। বয়সে নিতান্ত ছোট হলেও আমি এই উজ্জ্বল ক্ষুদ্র দলটির প্রত্যেক সদস্যেরই বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলাম। আমি ভালভাবেই যেমন তাঁদের সকলকে জানতাম তেমনি জানতাম কার কি দোষ বা কি গুণ। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট বক্তা ও সুলেখক। প্রধানত পণ্ডিত ব্যক্তি ও

সাহিত্যিক হলেও জনসাধারণের সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাঁর অসামান্য জ্ঞান ছিল। সে যুগের জননেতাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে তাঁর স্থান ছিল সর্ব্বাগ্রে। আমি বহুবার তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। অত্যন্ত সোজা ভাবে কথা বলার ঢং-এ এবং রসিয়ে-রসিয়ে তিনি বক্তৃতা করতেন। শেষ জীবনে তিনি কাণে ভাল শুনতে পেতেন না। কর্পোরেশনের সভায় তিনি বসতেন কৃষ্ণদাস পালের পাশে। বিতর্কের সময় কৃষ্ণদাস পাল তাঁকে আলোচ্য বিষয়ের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্য লিখে দিতেন আর তিনি তদনুসারে বক্তৃতা করে' আলোচনায় যোগ দিতেন। সর্ব্বসাধারণের সমস্যাদিতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর উৎসাহ অব্যাহত ছিল। এবং প্রত্যেকেই তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরাতন সংগ্রামীদের বিগত দিনের লোক বলে অবজ্ঞা করে ঠেলে ফেলে দেবার নিয়ম তখনো আরম্ভ হয় নি। অতীতের মহৎ কাজের জন্য ঐতিহ্যপূর্ণ শ্রদ্ধার ভাব জনসাধারণের অন্তরে তখনো ছিল বদ্ধমূল। যে পর্য্যন্ত আমাদের প্রার্থিত বস্তু পাওয়া যায় নি সে পর্য্যন্ত কোলকাতার কংগ্রেসে ও পরবর্ত্তী সমস্ত কংগ্রেস অধিবেশনে কাউনসিল সংস্কার ও প্রসারের জন্য আমি অনবরত প্রস্তাব উত্থাপন করে চলেছিলাম। আমি ছিলাম তার সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িত। এছাড়া আমি অন্য কিছুর কথা যেন ভাবতেই পারতাম না। আপনারা তাকে আমার দুর্ব্বলতাই বলুন কি সবলতাই বলুন, (আশা করি আমার এই দুর্ব্বলতা স্বীকার করবার জন্য আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন) সমস্ত জীবন একটি মাত্র প্রবল আদর্শ ঘুরে-ঘুরে আমাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তা' হ'ল সিভিল সার্ভিসের প্রশ্ন বা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্ন, বা কাউনসিল প্রসারের প্রশ্ন, বা স্বদেশী, যার সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ রহিতের প্রশ্নটিও জড়িত ছিল। আমার সমগ্র চিন্তার পরিধি ছিল তাতেই পরিপূর্ণ। তা' আমার উৎসাহকে উদ্দীপিত করত, আমার আত্মাকে নিবিষ্ট করে রাখত। তখনকার মত আমি আমার

সেই আদর্শ নিয়েই বেঁচেছিলাম। তার অতিরিক্ত যে সমস্ত ক্ষেত্রে আমি আন্দোলনে যোগ দিতাম তা' কেবল যন্ত্র চালিতের মত। আমি নিজেও বিশ্বাস করেছি এবং সহজেই অন্যদেরও বিশ্বাস করাতে সমর্থ হয়েছি যে, অমূল্য প্রাপ্তব্য যদি কিছু থাকে তা' ঐ একটি মাত্র। উদ্দীপিত হয়ে উঠতে আমার কিছু সময় লাগত। কিন্তু একবার কাজ আরম্ভ হয়ে গেলে আমি সমস্ত আলোচনার বাইরে চলে যেতাম। বাইরের কোন প্রভাব আর আমার উপর কাজ করতে পারত না। নিজের পরিবেশ নিজেই সৃষ্টি করে' আমি তখন আমার জগতে বাস করতাম। কাজেই বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে বিরোধীতা করা নিয়ে যখন মত বৈষম্য দেখা দিল, যা' স্থির হয়ে গেছে তার অন্যথা হতে পারে না বলে যখন বঙ্গদেশের অধিবাসীদের কাণ ঝালাপালা করা হতে লাগল এবং সকলেই যখন এই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মনে করেছিল, আমিই তখন তা' মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলাম। অন্যেরা যাকে অত্যন্ত সহজ সরল বলে গ্রহণ করেছিল, তার প্রতি আমি না দিয়েছিলাম কাণ, না চোখ। ক্ষীণ বিশ্বাসের দৃষ্টিতে যা' অন্যদের কাছে মনে হয়েছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব আমি বিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে তারই স্বরূপ দেখতে পেয়েছিলাম।

আমার এই আত্মবিশ্লেষণ থেকে এবার আমি ১৮৮৭ সালের যে সব ঘটনায় অংশ গ্রহণ করে ছিলাম সে সবের কথা বলি। এ বছরটি ছিল মহারাণীর জুবিলীর বছর। ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী কোলকাতাতেও খুব জাকজমকের সঙ্গে উৎসব অনুষ্ঠিত হল। ইতিপূর্ব্বে এবিষয় আমি এই স্মরণিকার মধ্যে উল্লেখ করেছি। আমরা, যারা ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে স্বায়ত্ত শাসনের ক্রমবিকাশের জন্য কাজ করছিলাম এখন আমাদের আন্দোলনে অধিকতর শক্তি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে এসমস্ত উৎসবের পূর্ণ সুযোগ নিলাম। আমরা দাবী করতে পারি যে, আমাদের সে চেষ্টা বৃথা যায় নি। কারণ, ভাইসরয়

লর্ড ডাফরিণের কাছ থেকে লেজিসলেটিভ কাউনসিল সংস্কারের ও তার প্রসারের সম্পর্কে আমরা এক ঘোষণা পেয়েছিলাম।

এ বছর কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল মাদ্রাজে। বৃটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর কাছ থেকে একখানি জাহাজ ভাড়া করে' কোলকাতা থেকে বহু প্রতিনিধি মাদ্রাজে গিয়েছিলাম। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও রাজা কিশোরী লাল গোসাঁই। ইনি পরে বঙ্গদেশের একজিকিউটিভ কাউনসিলের প্রথম সদস্যের পদ পেয়েছিলেন। সমুদ্রযাত্রাটি আমরা রীতিমত উপভোগ করেছিলাম। কাজ এবং আনন্দলাভ এক সঙ্গেই হয়েছিল। এতগুলি লোকের একত্র দিনের পর দিন বসে কেবল কংগ্রেস, তার ভবিষ্যৎ ও দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা আমাদের এই শিশুপ্রায় আন্দোলনে আরও শক্তি সঞ্চার করেছিল। সেই যুগ-প্রতিনিধিরা সেই জাহাজে মিলিত হয়ে ইতিহাসের পিল্‌গ্রীমস্ ফাদারদের মত এক পরম সম্ভাবনাময় কার্য্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। আজ তাঁদের প্রায় সকলেই পরলোকে। তবু তাঁরা যে-প্রেরণা যুগিয়ে ছিলেন তা' অক্ষয় হয়ে রয়েছে। যদিও উৎসাহের প্রথম উচ্ছ্বাস আজ আর দেখা যায় না (এবং অনেকের নিকট মনে হতে পারে কংগ্রেস এখন এক অজানা সমুদ্রে ভেসে চলেছে) তবুও মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস এখনো এতটুকু ম্লান হয় নি। যতদিন ভারত একটি স্বায়ত্ত শাসিত সমাজে পরিণত হয়ে তার অভীষ্ট সিদ্ধি করতে সক্ষম না হ'বে ততদিন কংগ্রেস যে তার কাজ চালিয়ে যাবে এবিষয়ে তারা সুনিশ্চিত।

মাদ্রাজে এসে যখন উপস্থিত হলাম আমাদের সঙ্গে এত অন্তরঙ্গ ভাবে ব্যবহার করা হল যে, তার স্মৃতি আজও আমাদের মন থেকে মুছে যায় নি। এবং তা' কংগ্রেসের সমস্ত অভ্যর্থনা সমিতির ঐতিহ্য হয়ে রয়েছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভদ্রভাবে কাজ-কর্ম্মে লিপ্ত যুবকেরা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক। দিনরাত হাসিমুখে স্বেচ্ছায় তারা আমাদের

সেবা যত্ন করতে লাগল। অনেকের সঙ্গে বন্ধুতা হল যা' সারা জীবনে কিছু মাত্র হ্রাস হয় নি। বীররাঘবাচারীয়ার, জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, রঙ্গ নাইডু, আনন্দ চারলু এবং আরও অসংখ্য লোক আমাদের বঙ্গদেশীয় বন্ধুদের মতই প্রিয় হয়ে উঠলেন। সমগ্র আন্দোলনের মধ্যে কংগ্রেসের সামাজিক দিকটাও কম আকর্ষক ছিল না। সর্বসাধারণের জন্য এমন একটি মঞ্চ পাওয়া গেল, যেখানে বিভিন্ন মতামতের ভারতীয় নেতৃবর্গ এক সঙ্গে মিলিত হয়ে আপন-আপন অভিমত ব্যক্ত করে' সমস্ত ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাতে ও বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবধারা প্রসার করতে পারেন।

মাদ্রাজে আমার সঙ্গে যতজনের বন্ধুতা হয়েছিল তার মধ্যে এক জনের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিজয়নগরের মহারাজার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। মাদ্রাজের তদানীন্তন গভর্ণর স্যার মাউন্ট ষ্টুয়ার্ট যথার্থতঃ তাঁর নাম দিয়েছিলেন "মনোরম রাজকুমার।"

আমাদের প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাগুলি আজও এমন পরিষ্কার মনে আছে যে, মনে হয় যেন মাত্র গতকালই তা ঘটেছে। আমি লেজিসলেটিভ কাউনসিল সংস্কার সম্পর্কে বক্তৃতা শেষ করে শিবির থেকে তখন বাইরে আসছি। তিনি আমার দিকে এগিয়ে এসে বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে আমার করমর্দ্দন করলেন। আমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাসূচক কয়েকটি বাক্য বিনিময় করলাম। এই ছিল আমাদের বন্ধুতার সূচনা। আর সেই বন্ধুতার পরিসমাপ্তি হল ১৮৯৭ সালে যে দিন তিনি অকালে ইহলোক ত্যাগ করলেন। তিনি কোলকাতাতে প্রায়ই আসতেন। তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আমার প্রচুর সুযোগ হ'ত। তাঁর সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে, এরূপ প্রাণবন্ত সহৃদয় ব্যক্তি আমি কমই দেখেছি। আমাদের অন্যান্য প্রায় সমস্ত রাজন্যের ন্যায় তিনি যে কেবল ভদ্রতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন তা' নয়। তিনি তার

চেয়েও কিছু বেশী ছিলেন। তাঁর প্রচুর সঙ্গতি সর্ব্বদাই তাঁর দয়ালু স্বভাবের পরিপোষক ছিল। ভূকৈলাসের রাজারা এবং তিনি ছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে বন্ধু। তাঁরা আর্থিক অসুবিধায় পড়লেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য করলেন। এক ইংরেজ ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের দিকেও তিনি অনুরূপ ভাবে তাঁর সহায়তার হাত এগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের মধ্যে কোন জাতি, বর্ণ বা ধর্ম্মের বিচার ছিল না। যে কোন জনআন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন সদয় পৃষ্ঠপোষক,—তা' মাদ্রাজে, কি বঙ্গদেশে, কি উত্তর প্রদেশে, সে বিচার কোন দিন তিনি করতেন না। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের জন্য বাড়ী নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ সাহায্যের অনুরোধ নিয়ে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। আমি কি পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছি এবং আমার আরও কত টাকার প্রয়োজন তা' তিনি জানতে চাইলেন। আমি সর্ব্বসাকুল্যে হাজার বিশেক টাকার হিসাব দিলাম। তাঁকে আরও বললাম যে, আমি হাজার পাঁচেক টাকার চাঁদার প্রতিশ্রুতি পেয়েছি তার মধ্যে মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী দিয়েছেন দু'হাজার টাকা। তাঁর স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতার সঙ্গে তিনি বললেন, "সুরেনবাবু, এর ওর তার কাছে গিয়ে সময় নষ্ট করে' আপনার কি লাভ? সে সময়টা আপনি বরং অন্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মে ক্ষেপন করতে পারেন। আমিই আপনাকে অবশিষ্ট পনর হাজার টাকা দেব।" মুখের কথাই ছিল তাঁর খৎ-এর সমান। এই রাজকীয় দানের দ্বারাই আমরা ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের জন্য একখানা আবাসও পেলাম, নামও পেলাম। এ্যাসোসিয়েশনের হলে তাঁর একখানি তৈলচিত্র রাখবার জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি তাঁর একখানি ছোট আকারের ছবি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

তাঁর সদয় মনের দৃষ্টান্তের অপর এক ঘটনার বিবরণ দেওয়া যাক। ১৮৮৯ সালে রাজপুত্র য়্যালবার্ট ভিক্টর এলেন কোলকাতা ভ্রমণে।

সে উপলক্ষে যে অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল তা' কি করে ব্যয় করা হবে তা' নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল। নগরের ধনী সম্প্রদায়ের একটি শক্তিশালী দল ছিল। তাঁদের অভিপ্রায় ছিল আমোদপ্রমোদ, তামাসা ইত্যাদি কাজের দ্বারাই উৎসব করা হবে। আমরা ছিলাম তাঁর এই ভ্রমণকে একখানা কুষ্ঠাশ্রম নির্ম্মাণ করিয়ে তদ্দ্বারা স্থায়ী ভাবে স্মরণীয় করে' রাখবার পক্ষে। টাউন হলের সভায় আমি এ মত প্রকাশ করে এক সংশোধন প্রস্তাব করলাম। আমার প্রস্তাব গৃহীত হল। কিন্তু সরকারী মহল ও তাঁদের বন্ধুবর্গ এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হলেন। একজন মহারাজা সভা থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা হতেই বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! এই হলো আপনার কাজ। আপনি লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরকেও অপমান করলেন, সভাটিও ভাঙ্গলেন।" লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার ষ্টুয়ার্ট বেইলী কিন্তু অপমাণিতও মনে করলেন না, আর সেরূপ কিছু ভাবলেনও না। কারণ এই রাজকীয় ভ্রমণ চিরস্মরণীয় হয়ে থাক এরূপ একটা আগ্রহকেই তিনি উৎসাহ দিতে লাগলেন। যাই হোক, সরকারী মহলের রোষের গুরুত্ব বুঝতে আমার দেরী লাগল না। এই স্থায়ী স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজপুত্র এলবার্ট ভিকটরের নিকট এক প্রতিনিধি মণ্ডলী প্রেরণের প্রস্তাব হল। তার মধ্যে একজন সদস্য হিসাবে আমার নামও রাখার প্রস্তাব করা হল। কিন্তু সরকারী মহলের হাতেই এসব ব্যবস্থার ভার ছিল। তাঁরা আমার নামটি বাদ দিয়ে দিলেন। আমি আরও জানতে পারলাম, এক সময় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের একজন সদস্য মনোনীত করে' আমার নাম ভারত সরকারের কাছে পাঠান হয়েছিল। তার পরেই ঘটল এই এলবার্ট ভিকটর মেমোরিয়্যাল সভার ঘটনা। আর তার ফলে সেই সদস্যতালিকা থেকেও আমার নাম বাদ পড়ে গেল।

ইউরোপীয় বণিক সভার কর্ত্তৃপক্ষের সমর্থনে ও সরকারী

পৃষ্ঠপোষকতায় যে সভায় এ প্রদেশের লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর সভাপতিত্ব করেছিলেন, সেখানে যে স্থায়ী স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তা' ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনমতেরই জয়। এবং তা এতই লক্ষণীয় ছিল যে, তাতে ভুল হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে ভোটের ব্যাপারে যাঁরা নেতৃত্ব নিয়েছিলেন তাঁরা পূর্ণভাবেই সরকারী ও অর্দ্ধসরকারী মহলের রোষ অর্জ্জন করেছিলেন। ভোট ত হল। কিন্তু প্রশ্ন উঠল, এই স্থায়ী স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে আসবে? অর্থ যাঁদের ছিল তাঁরা একটি পয়সাও দিতে রাজী হলেন না। এ অবস্থায় বিজয়নগরের মহারাজাই আমাদের উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন। এই সৌধ নির্ম্মাণেয় জন্য সর্ব্ব প্রথমে তিনি দশ হাজার টাকা দান করতে উদ্যত হলেন। সভা ভঙ্গ হতে না হতেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টাকাটি দেবেন বলে' আমাকে লিখে জানালেন। আমরা মোট পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে কুষ্ঠাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিলাম। আর তদনুযায়ী রাজকুমার এলবার্ট ভিকটরের নাম অনুসারে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হল। তার পরিচালক সমিতিতে আমাকে একজন সদস্য করা হয়েছিল। বহু বৎসর পরে আমি যখন অবসর গ্রহণ করি তখন আমি বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে আমার স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য মনোনীত করি। কুষ্ঠাশ্রমটির জন্য বর্ত্তমান স্থানটি নির্ব্বাচনেও আমার বিশেষ হাত ছিল।

ব্যক্তিগত ভাবে মহারাজা ও আমার মধ্যে যদিও বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, তবুও রাজনৈতিক ব্যাপারে আমরা যে সব সময় উভয়ে এক মন্দিরে পূজা দিতাম একথা বলা যায় না। কোন কোন সময় পরস্পরের মত-পার্থক্য থাকলেও আমাদের আপত্তি হত না। একবার আমাদের মত-পার্থক্য বেশ এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। মহারাজা আর বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার চার্লস ইলিয়ট ছিলেন অতিশয় অন্তরঙ্গ বন্ধু। স্যার চার্লস ইলিয়ট চাকরী থেকে অবসর

গ্রহণ করবেন। মহারাজা প্রস্তাব দিলেন জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁর সম্মানার্থে একটি স্মারণিক নির্ম্মিত হোক। মহারাজার ইচ্ছা ছিল আমিও এ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকি। একটু কূটবুদ্ধিও প্রয়োগ করে' বললেন, এর জন্য যে স্মৃতিভাণ্ডার গড়ে তোলা হবে তার একটি উদ্দেশ্য হবে রিপন কলেজে একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করবার জন্য বৃত্তি দান করা। (যে রূপ হৃষ্টতার সঙ্গে তা' বললেন তার মধ্যে কিছুটা তীক্ষ্ণ বিচার শক্তিরও প্রমাণ ছিল।) যদিও তাঁর প্রস্তাবে আমার কিছুটা প্রলুব্ধ হবার মত কারণ ছিল, তবুও তার সঙ্গে যুক্ত হতে আমি সরাসরি অস্বীকার করলাম। আমি বললাম, "মহারাজা, জুরী সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তির ফলে স্যার চার্লস ইলিয়ট তাঁর নাম ডুবিয়েছেন। এরকম একজন শাসককে জনসাধারণ সম্মান দেখাতে পারে না। আর আমার পক্ষে এ ধরণের কোন ব্যাপারে যোগ দেওয়া হবে রাজনৈতিক আত্ম-হত্যার সামিল।" আমার পক্ষে বিষয়টি সেখানেই শেষ হল। সে সম্পর্কে আমি আর কিছুই শুনি নি। কিন্তু এই মত-পার্থক্য আমাদের প্রীতির সম্বন্ধকে কোনদিন অণুমাত্রও হ্রাস করে নি বা আমাদের বন্ধুত্বের প্রগাঢ়তাকে কিঞ্চিন্মাত্রও তরল করে দেয় নি।

১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল সেখানে অস্ত্র আইন সম্পর্কে যেরূপ এক প্রাণবন্ত আলোচনা হয়েছিল তজ্জন্য তার সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। বর্ত্তমানের যে অস্ত্র আইন তার সঙ্গে সেই আলোচনার কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে। অস্ত্র আইন প্রত্যাহার করবার সুপারিশ করে সেই অধিবেশনে, একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। লর্ড রিপনের প্রশাসন সময়ে আরম্‌স য়্যাক্ট ও ভারণাকুলার প্রেস য়্যাক্ট নামে ছুটি আইন পাশ হয়েছিল। লর্ড লিটনের প্রশাসনের এক বৈশিষ্টই ছিল এদেশের লোকের প্রতি তাঁর অবিশ্বাস। এবং উক্ত ছুটি আইন ছিল সেই নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে

জড়িত। তাঁর পরে তাঁর স্থলে যখন লর্ড রিপন নিযুক্ত হন, তখন তিনি এই কুনীতি অপসারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। পূর্বেই বলেছি, মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন তাঁর মিডলোথিয়ান নির্ব্বাচন অভিযানের সময় দৃঢ় ভাবে এই কুনীতির নিন্দা করেছিলেন। সাধারণ নির্ব্বাচনের পর তিনি যখন ক্ষমতায় আসেন তখন ভারণাকুলার প্রেস আইনটি প্রত্যাহার করা হ'ল। কিন্তু অস্ত্র আইন পূর্বের মতই রয়ে গেল। অবস্থাটি হ'ল অত্যন্ত বিরক্তিকর। এই আইনের দরুণ সর্ব্বদাই দেখা যেত এক অসন্তোষের ভাব। এবং কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে বারবার তা' প্রকাশ পেত। পরলোকগত ডক্টর ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র ছিলেন একজন খ্যাতনামা আইনজীবী। অকাল মৃত্যু এসে তাঁকে যদি ছিনিয়ে না নিত, তা' হলে সম্ভবত তিনি কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদেও নিযুক্ত হতেন। মাদ্রাজের কংগ্রেস অধিবেশনে ত্রৈলোক্যনাথ এক সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন। তিনি অস্ত্র আইনটি প্রত্যাহার করবার সুপারিশ করলেন না। তিনি এবিষয়ে প্রশাসনিক উদারতার পরামর্শ দিলেন। তিনি সুপারিশ করেছিলেন, যদি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তির জন্য প্রশংসাপত্র দেন, তা' হ'লে যেন তাকে অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করবারও ক্ষমতা দেওয়া হয়। আলোচনা খুব উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল। তা'তে আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমি সংশোধনী প্রস্তাবটির বিরোধিতা করি। প্রথম প্রস্তাবটিই অবশেষে গৃহীত হয়ে ছিল। তবে তাতে একটি শর্ত আরোপ করা হ'ল। বলা হ'ল লিখিত ভাবে কারণ দেখিয়ে সরকার ইচ্ছা করলে যে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষকে অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করতে নিষেধ করতে পারবেন। অস্ত্র আইন সম্পর্কে কংগ্রেসী মনোভাবের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন কংগ্রেস আর অস্ত্র আইনের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার দাবী করে না। কংগ্রেস চায়, আইনটি এমন ভাবে পরিবর্তন করা হোক, যাতে জাতিগত

বৈষম্যের দরুণ কোন লোকের অযোগ্য বিবেচিত হবার কারণ তার মধ্যে স্থান না পায়। লর্ড চেমস্‌ফোর্ড যখন ভাইসরয় হয়ে আসেন তখন তিনি এই নীতিটিকে সমর্থন জানালেন এবং কার্য্যত তাকেই রূপ দেওয়া হ'ল।

১৮৮৭ সালের মাদ্রাজ অধিবেশন ছিল কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন। কংগ্রেসের নিয়মাবলী প্রস্তুত তখনো সম্পূর্ণ হয় নি। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে এবং তার উপর নির্ভর করেই ক্রমশ কংগ্রেসের রীতিনীতি, কার্য্যপ্রণালী ইত্যাদির উদ্ভব হচ্ছিল। সংগঠনের এই প্রাথমিক অবস্থায় এক অতি সূক্ষ্ম ও অসুবিধাজনক প্রশ্নের উদ্ভব হ'ল। বঙ্গদেশের তাহিরপুরের রাজা শেখরেশ্বর রায় গো-বধ বন্ধ করবার জন্য এক প্রস্তাব করবেন বলে' এক বিজ্ঞপ্তি পাঠালেন। যেখানে হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে মিলিত ভাবে সভা করছে, সেখানে যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় এরূপ একটি প্রস্তাব সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আর সে সময়ের ত কথাই নেই। স্যার সৈয়দ আমেদের নেতৃত্বে মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেস থেকে তখন দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। পেট্রিয়টিক এ্যাসোসিয়েশন নামে এক সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা তখন প্রত্যক্ষ ভাবে জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন। যাঁরা আমাদের সমালোচনা করতেন তাঁরা জাতীয় মহাসভাকে হিন্দুদের কংগ্রেস বলেই মনে করতেন। আর বিরোধী পত্রিকাগুলি এভাবেই তা' প্রচার করত। আমরা এই মহান দেশের কাজে আমাদের দেশের মুসলমান জনসাধারণের সহযোগিতার জন্যও যথা সম্ভব চেষ্টা করছিলাম। অনেক সময় আমরা মুসলমান প্রতিনিধিদের ভাড়া দিয়ে দিতাম এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও করে' দিতাম।

এই পরিস্থিতিতে উপরোক্ত প্রস্তাব আমাদের অসুবিধা আরও বাড়িয়ে দিল। এ অবস্থায় কি করা যায়? কারও প্রতি যেন অবিচার না হয় এরূপ একটি সমাধান স্থির করা হ'ল। সমস্ত দলই

তা' মেনে নিল। তখন থেকে তাহাই কংগ্রেসের নীতি বলে সমর্থন পেয়ে আসছে। আমরা স্থির করলাম, যদি কোন বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ জড়িত কোন বিষয় নিয়ে কোন প্রস্তাব আসে তা' হলে সেই জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা যদি তাতে আপত্তি করে, সে ক্ষেত্রে তারা যদি সংখ্যালঘুও হয় তথাপি কংগ্রেসে সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। অনুরূপ আর একটি ঘটনা হয়েছিল কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে। পাঞ্জাব জমি হস্তান্তর আইন (ল্যাণ্ড এলিয়েনেশন অ্যাকট) সম্পর্কেই প্রশ্নটি উঠেছিল এবং উপরোক্ত নীতি প্রয়োগ করে সে সমস্যার সমাধান হয়েছিল।

১৮৮৮ সালে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার এলাহাবাদে যে সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন হয়েছিল তা' আমার পরিষ্কার মনে আছে। সে সব ছিল কংগ্রেসের প্রথমের দিক। যে যায়গাতে এরূপ কোন সংহতি প্রদর্শন তার পূর্ব্বে কেউ দেখে নি এই অধিবেশনে তাদের উৎসাহ ও উত্তেজনার অবধি ছিল না। কয়েকটি ঘটনার ফলে এই উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়। কোন মহৎ উদ্দেশ্যের প্রথম অবস্থায় তার উৎসাহ ও উদ্দীপনার মুখে বাধা তাকে যেরূপ সাহায্য করে অন্য কোন কিছু সেরূপ করে না। ১৮৮৪ সালে লর্ড রিপনের ইংলণ্ড প্রত্যাগমনের প্রাক্কালে স্যার অকল্যাণ্ড কোলভিন ভারতে এক নব জীবনের সূচনাকে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু এখন ভীষণ ভাবে কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে লাগলেন। তবে ওরূপ জীবন থেকে তার বেশী আশাও করা যায় না। তিনি ছিলেন লর্ড ডাফরিণেরই শিষ্য। লর্ড ডাফরিণ ভাইসরয়-এর পদ ত্যাগ করার ঠিক পূর্ব্বে কংগ্রেস ও কংগ্রেসের কর্ম্মধারার নিন্দা করেছিলেন। এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উল্লেখ করে বলেছিলেন, ওরা এক "নগণ্য সংখ্যালঘু দল"। সরকারী মহল তারই রেশ টেনে চলছিলেন। কংগ্রেসের চতুর্দ্দিকে সমবেত হবার আবেদন জানিয়ে মিঃ হিউম যে আবেগপূর্ণ আবেদন জানিয়েছিলেন তাতে উত্তর প্রদেশের

লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর রুষ্ট হলেন। তিনি তার বিরুদ্ধে কেবল লেখনী ধরেই ক্ষান্ত হলেন না। এলাহাবাদে যাতে কংগ্রেসের অধিবেশন না বসতে পারে সে উদ্দেশ্যে বহু অসুবিধারও সৃষ্টি করতে লাগলেন। উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস আন্দোলনের নেতা ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পণ্ডিত অযোধ্যানাথ ছিলেন একাই একশ,—একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন আইনজীবী, উদ্দীপ্ত দেশপ্রেমিক আর শক্তিমান সাংগঠনিক। সমস্ত অসুবিধাকে তিনি ঠেলে ফেলে দিলেন এবং ১৮৮৮ সালের এলাহাবাদ কংগ্রেস অধিবেশন এক হিসেবে এক কঠোর আমলাতন্ত্রী বিরোধিতার বিরুদ্ধে জনমতেরই জয় চিহ্ন হয়ে রইল।

সরকারী মহলের বিশ্বস্ত বন্ধু বারাণসীর রাজা শিবপ্রসাদ একজন প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেসে প্রবেশ করলেন। তিনি যে কংগ্রেসে যোগ দিলেন সেটিই আশ্চর্য্য। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল এক কূটনৈতিক চাল। তিনি যে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন তাতেই শীঘ্র তাঁর উদ্দেশ্য প্রকট হয়ে পড়ল। তিনি এসেছিলেন আশীর্ব্বাদ করতে নয়, অভিশাপ দিতে। তিনি মিঃ ইয়ার্ডলি নর্টনের নিকট থেকে বেশ ভদ্র ভাবেই উপযুক্ত প্রত্যুত্তর পেয়েছিলেন।

কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মিঃ জর্জ্জ ইউল। তিনিই ছিলেন সর্ব্বপ্রথম অ-ভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি। তিনি ছিলেন একজন কোলকাতার বণিক এবং বিরাট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এনড্রু ইউল অ্যাণ্ড কোম্পানীর প্রধান। কোলকাতার বণিকদের মধ্যে এরূপ উদার ও প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন এবং ভারতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি বাস্তবিক সহানুভূতিশীল ব্যক্তি কমই দেখেছি। তিনি ছিলেন একজন সুচতুর স্কচম্যান। যখন কিছু দেখতেন একেবারে গভীরে প্রবেশ করে যেতেন। প্রয়োজন বোধ করলে নিজের মত তাঁর স্বদেশীয়দের ন্যায় কাঠখোট্টা ভাবে প্রকাশ করতেও দ্বিধা করতেন না। তিনি বরাবরই কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের সমর্থক ছিলেন

এবং ১৮৯০ সালে যখন কংগ্রেস প্রতিনিধিমণ্ডলী ইংলণ্ডে যান তখন তাঁদের বিশেষ ভাবে সাহায্যও করেছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণের পর, লণ্ডনে বৃটিশ কমিটি নামে কংগ্রেসের যে এক সংস্থা ছিল, তার সদস্য হয়েছিলেন। সেই কমিটির কাজকর্মে তাঁর উৎসাহের কথা আমার বেশ মনে আছে। তাঁর অকাল মৃত্যুতে ইংলণ্ডে প্রচারকার্য্যে কংগ্রেসের বিশেষ ক্ষতি হয়েছিল। এবং তাঁর কংগ্রেসী বন্ধুবর্গ বিশেষ রূপে শোকাভিভূত হয়েছিলেন।

কংগ্রেস আন্দোলনে ১৮৮৯ সাল ছিল এক বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। এ বছরেই মিঃ ব্রেডলহ ভারতে ভ্রমণে এসে কংগ্রেসের কাজ-কর্ম্মে এক নূতন শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। পরের বছরেই তিনি লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সংস্কার ও প্রসার কল্পে হাউস অব কমনস-এ প্রস্তাব আনেন। যখন বোম্বাইতে ছিলেন তখন তিনি খ্যাতি সম্পন্ন ভারতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। এবং তাঁর প্রস্তাবের মধ্যে শিক্ষিত সমাজের সমস্ত মতামতও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এই কংগ্রেসে কেবলমাত্র প্রস্তাব উত্থাপন করা ছাড়া আমায় আরও একটু কাজ করতে হয়েছিল। অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আবেদনের দায়িত্বটিও আমার উপর পড়েছিল। আমি আবেদন জানালাম। বিশেষ ফলও তাতে পাওয়া গেল। সেই বিরাট জনসমাবেশের উপর দিয়ে বয়ে গেল এক অসাধারণ উৎসাহের ঢেউ। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে চৌষট্টি হাজার টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল এবং তার মধ্যে বিশ হাজার টাকা সেখানেই সংগ্রহ হল। কোন গণআন্দোলনে এরূপ ঘটনার তুলনা পাওয়া যায় না। যে সমস্ত মহিলা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা তাঁদের ঘড়ী, এমন কি, অলঙ্কার পর্য্যন্ত দান করেছিলেন। আমার রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতির মধ্যে সে দিনের ঘটনা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে অক্ষয় করে' রেখে দেব। অনুরূপ আবেদন করবার আমার আরও ছুবার প্রয়োজন হয়েছিল। প্রথমে ১৮৯২ সালে

এলাহাবাদে, এবং পরে ১৯০৯ সালে লাহোরে। এই শেষের বার আমি দক্ষিণ আফ্রিকার বৃটিশ ভারতীয়দের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছিলাম। কিন্তু এদের কোনটিতে বোম্বাইয়ের মত মুক্ত হস্তে কেউ দান করে নি। মিঃ ব্রেডলহ নিজে সেই অর্থ সংগ্রহের দৃশ্যটি দেখেছিলেন। বাস্তবিক স্বদেশপ্রেমী লোকের উন্নতির জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে যে শ্রম স্বীকার করছিলেন লোকের দান করার দৃশ্য দেখে তাতে তিনি প্রচুর উদ্দীপনা লাভ করেছিলেন।

———

একাদশ অধ্যায়

ইংলণ্ডে কংগ্রেস প্রতিনিধিমণ্ডলী

বোম্বাই কংগ্রেসে যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল, বৃটিশ জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসের মত ব্যক্ত করার জন্য কংগ্রেস যে সমস্ত রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য অবিরাম আবেদন করছিল তার প্রতি বৃটিশ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিমণ্ডলী নিযুক্ত করে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা। এবং তদনুসারে এক প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠিতও হয়েছিল। এখানে "রাজনৈতিক সংস্কার"-এর অর্থ কাউনসিল প্রসার করে এবং তার পুনর্গঠন করে প্রতিনিধিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করা। বাস্তবিক পক্ষে কংগ্রেসের কার্য্য তালিকায় সর্বদা এটিরই স্থান ছিল। বোম্বাইয়ের অধিবেশনে কাউনসিলকে যেরূপে পুনর্গঠিত করা উচিত তার একটি সংক্ষিপ্ত ও মোটামুটি খসড়ার পরিকল্পনা প্রস্তুত করে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই খসড়া অনুসারে একটি বিল তৈয়ার করে পার্ল্যামেণ্টে উপস্থিত করবার জন্য মিঃ ব্রেডলহকে অনুরোধ করা হ'ল। প্রতিনিধি-মণ্ডলীর সদস্যদের নামও স্থির হয়ে গেল। তাঁদের মধ্যে মিঃ হিউম, স্যার ফিরোজ শা মেটা, মিঃ মনোমোহন ঘোষ, মিঃ ডবল্যু. সি. ব্যানার্জী, মিঃ শরিফউদ্দিন, মিঃ ইয়ার্ডলি নর্টন, মিঃ আর. এন. মুধোলকার এবং আমার নাম ছিল।

স্থির হয়েছিল, প্রত্যেক সদস্যকেই তার নিজের খরচ বহন করতে হবে। শুনেছিলাম, এমন কি, ইংলণ্ডেও এ ব্যবস্থাটিকে অস্বাভাবিক বলেই গণ্য করা হবে। কিন্তু আমরা তবুও ইতস্ততঃ করলাম না। প্রতিনিধিমণ্ডলীর সদস্যদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আমার কোনই ধারণা ছিল না। তবে আমার অবস্থা একেবারেই সন্তোষজনক ছিল না।

সর্বসাকুল্যে আমার সম্বল ছিল তের হাজার টাকার গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি এবং তাও আমার স্ত্রীর নামে বিনিয়োগ করা। হিসাব করে দেখা গেল প্রত্যেক সদস্যের জন্য ব্যয় হবে চার হাজার টাকা। অর্থাৎ আমি যতটুকু টাকা জমাতে পেরেছিলাম তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আমাকে খরচ করতে হবে। তাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ ছিল না। এবং আমার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিনীর স্মৃতির প্রতি ঋণ স্বীকার করে একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, তিনি স্বেচ্ছায় সে টাকা এনে যে উদ্দেশ্যে তা' চাওয়া হয়েছিল তজ্জন্য ব্যয় করতে সম্মতি দিয়েছিলেন। আমাদের নিজস্ব সম্বল ভিন্ন অন্য কোনদিক থেকে একটি পয়সাও আমরা খরচের জন্য সংগ্রহ করি নি। বাড়ী থেকে যাত্রা করবার মুহূর্ত্ত থেকে ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমাদের ভাড়ার টাকা, হোটেলের খরচা ইত্যাদি সবই আমরা নিজেরাই বহন করেছিলাম। এবং প্রত্যেক সদস্যের পক্ষে এটি ছিল সত্য। এটিই ছিল কংগ্রেস পক্ষ থেকে ইংলণ্ডে প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণের সর্বপ্রথম ঘটনা। এবং তার মহান উদ্দেশ্য ছিল শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনের জন্য চাপ দিয়ে অবশেষে ভারতে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

প্রতিনিধিমণ্ডলী সৃষ্টির ফলে মানুষের মনে তখন বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। এবং জনগণের আশীর্ব্বাদ সঙ্গে নিয়ে তা' আপন কর্ত্তব্য সম্পাদনে যাত্রা করল। ১৮৯০ সালের মার্চ্চ মাসে আমরা ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করে এপ্রিলের প্রথমের দিকে লণ্ডনে উপস্থিত হলাম। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার বৃটিশ কমিটি আমাদের সভাসমিতির আয়োজন করতে লাগল। আমাদের প্রথম সভা হ'ল মিঃ দাদাভাই নওরোজীর নির্ব্বাচনকেন্দ্র ক্লার্কেনওয়েল রোডে। স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ সভায় সভাপতিত্ব করলেন। সেদিন সভার প্রথমে কি হয়েছিল, শেষে কি হয়েছিল সবই বেশ মনে আছে। মিঃ জর্জ্জ ইউলের অতিথি হিসাবে আমরা

ন্যাশন্যাল লিবার‍্যাল ক্লাব-এ আহার শেষ করে ক্লার্কেনওয়েল-এ গেলাম। যে ধরণের সভায় আমি অভ্যস্থ ছিলাম সে ধরণের সাধারণ ভারতীয় সভাসমিতির অনুকরণেই সভার ব্যবস্থা হয়েছিল। একটি মঞ্চের উপর বক্তাগণ এবং স্থানীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি বসেছিলেন এবং তার সম্মুখে হলঘরে সমস্ত শ্রোতা বসেছিলেন।

মিঃ এইচ. ই. এ. কটন-এর সঙ্গে এ সভায় আমার দেখা হয়। তাঁর পিতা স্যার হেনরী কটন তাঁকে পাঠিয়েছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে তাঁর পিতার শুভেচ্ছা জানাতে। এ সমস্ত শ্রোতার মধ্যে বক্তৃতা করতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। সেজন্য আমার যেন সামান্য স্নায়বিক দুর্ব্বলতা দেখা দিল। সভায় যাবার সময় মিঃ জর্জ্জ ইউল আমায় বলে দিয়েছিলেন যে, ভারতীয় শ্রোতা আর ইংরেজ শ্রোতাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। দীর্ঘ বক্তৃতা বা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নীরস বর্ণনা উভয়েরই অপছন্দ। উভয়েরই সহজাত প্রবৃত্তি হল অন্তরের আবেগের কাছে আবেদন করতে পারলে উভয়েই মুগ্ধ। তা' খুঁজে বার করে' তদনুসারে কাজ করবার দায়িত্ব বক্তার নিজের। সেটা আবিষ্কার করতে আমার দেরী লাগল না। বাস্তবিক পক্ষে ইংরেজী সাহিত্য ও তাদের ইতিহাসের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকার ফলে আমার বক্তৃতার ধরণ কিরূপ হওয়া উচিত তা' নির্ণয় করা আমার পক্ষে সহজই হয়েছিল। এবং সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে আমার চেষ্টা সফলই হয়েছিল। কৃষ্ণবর্ণের লোকেরা যখন ইংরেজী ভাষায় কথা বলে ইংরেজেরা তা'তে ভীত হয় না। হয়ত প্রথমে একটু হতবুদ্ধি হয় বা কৌতুকবোধ করে। কিন্তু তার পরেই বক্তার কথার সঙ্গে তার মর্ম্ম তা'রা বুঝতে আরম্ভ করে। এবং এমন কি, হয়ত প্রশংসা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। বক্তা নিজের কাজে যদি দক্ষ হয় তা' হ'লে সে তার প্রতি শ্রোতাদের সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে এবং যদি শ্রোতারা

বক্তার অভিযোগের জন্য আংশিক ভাবেও দায়ী হয় তা' হলে তারা তার প্রতিকারেরও চেষ্টা করে। একবার ম্যানচেষ্টারে এক বণিক সভায় আমি যখন আমার বক্তৃতা শেষ করলাম, একজন ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "ভারতের বিষয় এখন আমাকে যেরূপ গভীরভাবে বিচলিত করেছে আর কখনো সেরূপ করে নি"। ইংলণ্ডে আমাদের কাজ করবার জন্য এক বিরাট ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। এবং তাতে প্রচুর সুযোগ রয়েছে যার যথাযত সদ্ব্যবহার আমরা করতে সক্ষম হই নি। বহুবার আমাদের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর আবার আসবার জন্য শ্রোতারা এসে আমাদের অনুরোধ করেছেন। মিঃ অগাষ্টাইন হানি ইংলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে ও ওয়েলস্-এ আমাদের জনসভাগুলির ব্যবস্থা করতেন। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার বৃটিশ কমিটির নিকট সভাগুলির রিপোর্ট দিতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন,—

"সমস্ত সভাতেই শ্রোতারা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, মিঃ ব্যানার্জী আবার যেন ফিরে আসেন। এবং আমি আপনাদের জানাতে পারি যে, তিনি উপস্থিত থাকলে এই আন্দোলনের পক্ষে অনেক সুবিধা হবে। কারণ, যে সমস্ত সহর তিনি একবার পরিভ্রমণ করেছেন সে সব সহরের সভায় আবার বিস্তর জনসমাগম হবে। আমি মিঃ ব্যানার্জীকেও বলেছি। মিঃ হিউমকেও বলেছি। এবং আপনাদের কমিটিকেও এবিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে পরামর্শ দিচ্ছি। আমি যা বলেছি তার সমর্থনে আপনাদিগকে স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছা করি যে, কারডিফ-এর সভা শেষ হওয়া মাত্রই দক্ষিণ ওয়েলস্-এর লিবার‍্যাল ফেডারেশনের সম্পাদক মিঃ আর. এন. হল তাঁর ফেডারেশনের পক্ষ থেকে মিঃ ব্যানার্জীকে এক বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মিঃ ব্যানার্জী ভারতে ফিরে যাবার পূর্ব্বে যেন আর একবার কারডিফ-এ গিয়ে এক সভায় বক্তৃতা

করেন। সে সভা কারডিফ-এর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হলে অনুষ্ঠিত হবে এবং সেখানে দক্ষিণ ওয়েলস্-এর নির্ব্বাচনকেন্দ্রগুলির প্রতিনিধিগণও উপস্থিত থাকবেন। ভারতের দাবীর বিষয়ে শুনবার জন্য সে সভায় হাজার হাজার লোক উপস্থিত থাকবেন। প্লাইমাউথ-এ গেলেও যে অনুরূপ অবস্থা হবে সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।

এই প্রতিনিধিমণ্ডলীর উদ্দেশ্য সে বার যেরূপ সফল হয়েছিল কংগ্রেসের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। তা' সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা ও আমাদের সহায় সম্বলের সাহায্যে ১৮৯০ সালের প্রতিনিধিমণ্ডলীর অনুরূপ আর কোন প্রতিনিধিমণ্ডলী পুনরায় প্রেরণ কখনো সম্ভব হয় নি। ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স ও স্কটল্যাণ্ডের অনেক বৃহৎ নগরে আমরা জনসভায় বক্তৃতা করেছিলাম। সর্ব্বশেষে আমাদের প্রতিনিধিমণ্ডলী যথাযোগ্য ভাবে মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' তার কার্য্য সমাপ্ত করল। সাক্ষাতের ফলে আমাদের ধারণা হয়েছিল, কাউনসিলের প্রসার সম্পর্কে লর্ড ক্রসের বিল যখন দ্বিতীয় বার পড়া হবে তখন মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন কিছু বলবেন এবং নির্ব্বাচন নীতি সমর্থন করবেন। কারণ, বিল যখন দ্বিতীয়বার পড়া হয়েছিল তখন তাঁর পরামর্শ ছিল, ভারতকে যা' দেওয়া হবে তা' হ'ল ভারতের জনসাধারণের প্রকৃত ও প্রাণবন্ত প্রতিনিধিত্ব। প্রকৃত নির্ব্বাচন বলতে যা' বোঝায় তা' দেওয়া হল না। তবে এতে সে পথে কিছু অগ্রগতি বাস্তবিকই হয়েছিল। ১৮৯২ সালের ষ্ট্যাট্যুট অনুসারে যে সমস্ত সরকারী রেগুলেশন প্রস্তুত করা হয়েছিল, তাতে ব্যবস্থা ছিল যে, সরকারকর্তৃক সমর্থনসাপেক্ষ ভাবে মিউনিসিপ্যালিটি ও জিলা-বোর্ড গুলি লোক্যাল কাউনসিলে সদস্য পাঠাতে পারবে। এবং প্রাদেশিক কাউনসিল সমূহের বে-সরকারী সদস্যগণ ইম্পিরিয়্যাল

লেজিসলেটিভ কাউনসিলে সদস্য পাঠাতে পারবেন। তা' ছাড়া সারা বৎসরের ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের আলোচনা ও প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকারও দেওয়া হ'ল। প্রতিনিধিমূলক-সরকার গঠনের দাবী আদায়ের এই ছিল প্রথম সফল পদক্ষেপ। এবং তা প্রধানত কংগ্রেস ও কংগ্রেস প্রতিনিধিমণ্ডলীর চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছিল। ১৯০৯ সালের ষ্ট্যাট্যুট-এর সাহায্যে ১৮৯২ সালের আইনকে অধিক উদারনৈতিক করা হ'ল। তবে প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠনের ভিত্তি পূর্ব্বের আইনবলেই সুদৃঢ় ও যথাযথ ভাবে রচিত হয়েছিল।

এ পর্য্যন্ত আমি প্রতিনিধিমণ্ডলীর সদস্যদের সম্পর্কে কিছুই বলি নি। আমার এই মাননীয় সহকর্ম্মিগণ আমাদের কাজে যে একাগ্রতার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তা' নিতান্ত অল্প লোকেরই জানা আছে। সেজন্য এ সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার জন্মদাতা মিঃ হিউম আমাদের এই অভিযানে অবিরত আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি ছিলেন সিভিল সার্ভিসের অন্তর্গত। এজন্য সমস্ত জীবন টেবিলে বসে কাজ করতেই অভ্যস্ত ছিলেন। জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করবার সুযোগ তাঁর কমই হয়েছিল। কিন্তু ইংলণ্ডে তিনি যখন আমাদের সভায় বক্তৃতা করতেন তখন দেখেছি সেদিকেও তাঁর কৃতিত্ব কম ছিল না। তিনি বার্মিংহামের এক সভায় একজন কংগ্রেসের কার্য্যাবলীর সমালোচককে এক জবাব দিয়ে যে ভাবে পর্য্যুদস্ত করেছিলেন আমি আজও তা' ভুলতে পারি নি। সেই সমালোচক পরামর্শ দিতে চেষ্টা করেছিলেন যে, ভারতে রাজনৈতিক সংস্কারের পূর্ব্বে সমাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন, এবং যে পর্য্যন্ত সেই সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের কাজ শেষ না হয় সে পর্য্যন্ত রাজনৈতিক সংস্কার স্থগিত থাকা প্রয়োজন। মিঃ হিউম

তারই প্রত্যুত্তর দিয়ে সেই সমালোচককে নিরুত্তর করেছিলেন। এক মহান পিতা মিঃ জোসেফ হিউমের পুত্র ছিলেন তিনি। তাঁর সহযোগিতা পেয়ে আমরা সকলেই খুব উৎসাহিত বোধ করছিলাম।

মিঃ মুধোলকার এসে যোগ দিয়েছিলেন আমরা কাজ আরম্ভ করার পরে। কিন্তু একবার এসেই তিনি মন প্রাণ দিয়ে কাজ করতে লাগলেন। ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান, সরল ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করবার ক্ষমতা, উদ্দেশ্যের প্রতি একাগ্রতা ইত্যাদি গুণাবলী বৃটিশ জনসাধারণকে অভিভূত করত। মিঃ সৈয়দ আলী ইমাম, পরে যিনি স্যার আলী ইমাম নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হন, আমাদের সঙ্গে প্লাইমাউথে ছিলেন। সে সময় তিনি সবেমাত্র আইন ব্যবসা করবার জন্য যোগ্যতা অর্জ্জন করেছেন। তখন থেকেই তাঁর স্বচ্ছ এবং সর্ব্বপ্রকার প্রভাবমুক্ত যুক্তিবাদ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। এর ফলে বহু পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে তিনি কংগ্রেসে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। মিঃ দাদাভাই নওরোজী ও স্যার উইলিয়ম ওয়েডার বার্ণ অনেক সময় আমাদের সহায়তা করতেন। প্রতিনিধিমণ্ডলীর অপর এক সদস্য ছিলেন মিঃ ইয়ার্ডলি নর্টন। যদিও আমাদের সঙ্গে তিনি অনেক দেরীতে যোগ দিয়েছিলেন, তবুও তিনি আমাদের অনেক সাহায্য করেছিলেন। অকস্‌ফোর্ডের এক বিতর্কসভায় তিনি একটি কংগ্রেস প্রস্তাব এনেছিলেন। প্রস্তাবটি ছিল এরূপ,—"হাউস অব কমন্‌স্‌-এর সম্মুখে যে বিল উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার মধ্যে নির্ব্বাচন নীতিকে স্বীকার করিয়া লইবার ব্যবস্থা না থাকায় এই সভা বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।"

এই বিতর্কসভা বাস্তবিকই স্মরণযোগ্য হয়েছিল। অকস্‌ফোর্ড ইউনিয়ন ছিল রক্ষণশীল দলের এক শক্তিকেন্দ্র। মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন

এখানেই বিতার্কিক হিসাবে প্রথম খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁর কর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থায় তাঁর শিক্ষালাভের এই কেন্দ্রের প্রভাবেই তিনি "অনমনীয় টোরীদলের উদীয়মান আশারূপে" প্রসিদ্ধি লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। মিঃ হিউম, মিঃ নর্টন ও আমি যখন বিতর্কের জন্য ইউনিয়নের ঘরে প্রবেশ করি, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল রক্ষণশীল দলের যুবকদের এই সমাবেশে আমাদের প্রস্তাব নিশ্চিতই অগ্রাহ্য হবে। প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক ও কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিট্যুটের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ উইলসনের সঙ্গে সেখানে দেখা হল। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ আমার জানা ছিল। আমি বুঝেছিলাম যে, তিনি প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই ভোট দেবেন। এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম যে, আমার ধারণা ঠিকই হয়েছিল।

আমরা সফলতার আশা ত্যাগ করেই তর্কযুদ্ধ আরম্ভ করলাম। তবে সংকল্প করে নিয়েছিলাম অত্যন্ত খারাপ পরিস্থিতি হলেও যতদূর সম্ভব চেষ্টা করে দেখব। মিঃ নর্টন খুব জোরাল বক্তৃতা দিয়ে প্রস্তাবটি উপস্থিত করলেন। বিপক্ষ দলের নায়ক ছিলেন লর্ড হিয়ুগ সিসিল। তাঁর বক্তব্যের উত্তর দেবার ভার পড়ল আমার উপর। তিনি যে কি বলবেন তা আমি আগে থেকে বেশ ঠিক ভাবেই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম। কাজেই তাঁর ব্যক্তব্যের উত্তর দেবার জন্য সমস্ত তথ্যাদি নিয়েই প্রস্তুত ছিলাম। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের অনগ্রসরতাই ছিল তাঁর তূণের মধ্যে তীক্ষ্ণতম শর। আমার উত্তরে আমি বললাম, ১৮২১ সালে ইংলণ্ডে স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৮,৪৬৭ এবং তখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬,৫০,০০০ মাত্র। ১৮৮১ সালের আগে পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ভারতের স্কুল ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার পর্যায়ে পৌঁছতে সমর্থ হয় নি। আর তা সত্ত্বেও ১৮৮১ সালে ইংলণ্ডে পার্ল্যামেণ্টরী ব্যবস্থা পূর্ণভাবে প্রচলিত হয়ে রয়েছে।

ভারতে আমরা ত তার চেয়ে অনেক কম দাবী করছি। এসব তথ্যের কোনই উত্তর ছিল না। আর্চ্চ বিশপ অব ইয়র্ক-এর যুবক পুত্র মিঃ মেক্‌ঘী ছিলেন একজন চমৎকার বক্তা। যাকে বলা যায় "বাপের বেটা"। তিনি এক আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে আমাদের সমর্থন করলেন। আর সেই বক্তৃতায় আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। যখন অবশেষে ভোট নেওয়া হল, দেখা গেল আমাদের পক্ষই অধিকাংশ ভোট পেয়েছে। ফলে আমাদের প্রস্তাবই গ্রাহ্য হয়েছে বলে ঘোষিত হল। এই ভোট যে কংগ্রেস প্রতিনিধিমণ্ডলীর এক স্মরণীয় সাফল্যের নিদর্শন তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এ ঘটনা প্রমাণ করেছিল যে, কংগ্রেসের শাসন সংস্কার দাবীর পরিসর এরই যুক্তিসিদ্ধ ছিল যে, বৃটিশ জনসাধারণের নিতান্ত রক্ষণশীল অংশের কাছেও তা' গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল।

আমার অকস্‌ফোর্ড ইউনিয়নের বক্তৃতার একটি অংশ নিয়ে মিঃ নর্টন প্রায়ই আমাকে ঠাট্টা করতেন। অথচ আবার সহৃদয়তার সঙ্গে সমর্থনও করতেন। এখানে তাই উদ্ধৃত করে দিলাম—

"এই বিতর্কের মধ্যে বলা হয়েছে, ইংরেজরা ভারতে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে ভারতীয়েরা ছিল বিভিন্ন অসভ্য বা অর্দ্ধ-অসভ্য জাতির একটি সমষ্টি। বোধ হয় এই ভাষা দিয়েই তা' ব্যক্ত করা হয়েছিল। এই সভাকক্ষকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তাঁরা—অর্থাৎ ভারতের হিন্দু জাতিরা, যে জাতির একজন বলে আমি নিজেকে গর্ব্বিত মনে করি, (উচ্চ হর্ষধ্বনি)—এক অতি প্রাচীন ও মহান জাতি থেকে সমুদ্ভূত। যে যুগে ইউরোপের বর্ত্তমান অধিকাংশ আলোক প্রাপ্ত জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা বনেজঙ্গলে

বিচরণ করত, সেই যুগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নগর স্থাপন করেছিলেন, নীতি বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেছিলেন, ধর্ম্মচর্চ্চা করেছিলেন এবং সর্ব্বোপরি এক মহান ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন যা, আজ অবধি সভ্য জগতের বিস্ময়ের বস্তু হয়ে রয়েছে। (বিপুল হর্ষধ্বনি)। আপনারা মাত্র কয়েক পা এগিয়ে বোডলিয়ান পুস্তকালয়ে প্রবেশ করলেই দেখতে পাবেন, সেখানে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের, ভারতীয় সংস্কৃতির, ভারতীয় নীতিবিজ্ঞানের প্রচুর ঐতিহাসিক নথিপত্র রয়েছে। সুতরাং আমার মতে উপরোক্ত উক্তি নিতান্ত অবান্তর ও অযৌক্তিক (হর্ষধ্বনি)। আমরা প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থার জন্য যে সমস্ত দাবী উপস্থিত করেছি তাঁর সম্পর্কে প্রতিকূল ধারণা সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্য নিয়েই যদি উপরোক্ত উক্তি সমূহ করা হয়ে থাকে, তা হলে সে চেষ্টা হয়েছে নিতান্তই নিরর্থক। কারণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা ছিল আর্য্য-সংস্কৃতির এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। এবং আমরা সেই আর্য্যদেরই বংশধর (হর্ষধ্বনি)। বিপরীত পক্ষের মাননীয় নায়ক কিছু কিছু উদ্ধৃতিকে স্যার হেনরী মেইন-এর নামের সঙ্গে যুক্ত করে উল্লেখের চেষ্টা করেছেন। প্রামাণ্য হিসাবে স্যার হেনরী মেইন আমার নমস্য। ভারতীয় বিষয়ে সেই পণ্ডিত প্রবরের অভিমত আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু কি বলেছেন তিনি ভারতের বিষয়ে? তিনি বলেছেন, "ভারতের প্রাচীন নথিপত্রের মধ্যেই বাস্তবিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সর্বপ্রথম উদাহরণ পাওয়া যায়। মান্ধাতার আমল থেকেই তাদের গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থা চলে আসছে। (হর্ষধ্বনি)। আমরা যখন সম্পূর্ণ বা অন্ততপক্ষে আংশিকরূপে হলেও প্রতিনিধি-মূলক ব্যবস্থা প্রচলনের দাবী করছি, তখন আমরা কেবল মাত্র সে বস্তুই চাইছি—যার সঙ্গে রয়েছে ভারতবাসীর মতিগতি ও

প্রতিভা, ভারতের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং ভারতে বৃটিশ শাসনের চিরকালীন সঙ্গতি"।

আমার বক্তৃতার উপসংহারে আমি বললাম—

"প্রতিনিধিমূলক সমাজ ব্যবস্থা এক অতি পবিত্র সম্পদ। বিধাতা ইংরেজ জনগণের উপর এ সম্পদ রক্ষা করবার ও নির্ব্বিচারে প্রচার করবার দায়িত্ব দিয়েছেন। তাকে কোন ব্যক্তি বা সমাজের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখবার দায়িত্ব দেন নি। ইংলণ্ড প্রতিনিধিমূলক সমাজ ব্যবস্থার আগার। এই দেশকে কেন্দ্র করে এই সমাজ ব্যবস্থা পৃথিবীর দূর দূর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং এজন্য এদেশকে জগতের স্বাধীন জাতিগুলির শ্রদ্ধেয়া জননী বলে অভিহিত করা হয়। ভারতীয়েরাও সেই জননীর সন্তানসন্ততি। তারা যখন তাদের জন্য বৃটিশ নাগরিকতা ও বৃটিশ প্রজাদের অধিকারের স্বীকৃতির দাবী করে তখন তারা তাদের সেই জন্মগত অধিকারটুকুই দাবী করে মাত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যখন ইংরেজ জনগণের কাছে এজন্য আবেদন করি, তাদের এক মাত্র উত্তর হবে—এক সহানুভূতি সূচক উত্তর এবং অবিলম্বে তা' প্রদানের আগ্রহ। এ সভাকক্ষে আমি আবেদন করছি ন্যায় বিচারের জন্য, বৃটিশ সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে তার ভিত্তি সুগঠিত করার উপযোগী স্বাধীনতার জন্য। আমি নিঃসন্দেহ যে, এই সভাগৃহে এবং ইংরেজ জনসাধারণের নিকটে এ সমস্ত কথার, এ সমস্ত অলঙ্ঘনীয় বক্তব্যের, যদি কোন গুরুত্ব থাকে, যদি কোন অর্থ থাকে, যদি কোন মর্ম্মার্থ বোধ হয়ে থাকে, তা' হলে আপনারা এক মত হয়ে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দান করে প্রমাণ করুণ যে, যে চিরন্তন ন্যায় ও স্বাধীনতা সমস্ত দল, বিশ্বাস বা জাতি নির্ব্বিশেষে ইংরেজ জাতির অন্তরের গভীরে চিরখোদিত হয়ে রয়েছে তা' লাভ

করবার জন্য আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি আপনাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এবং ভারতের প্রশাসন নীতির মধ্যে সে সমস্ত যে থাকা একান্ত কর্ত্তব্য সে কথা আপনারা সমর্থন করুন। (উচ্চৈঃস্বরে দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি)।

১৮৯০ সালের ৬ই জুলাই আমি বোম্বাইতে ফিরে এলাম। আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সেদিন সন্ধ্যায় প্রেমজী কাওসজী ইনিষ্টিট্যুটে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এলাহাবাদ ও কোলকাতাতেও অনুরূপ সভা হয়েছিল। আর আমি সর্ব্বত্রই আমার সকল কথার যে সার তারই পুনরুক্তি করতে লাগলাম। আমি জোর দিয়ে বললাম যে, যে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে তা' চালিয়ে যেতে হবে। এবং মাঝে-মাঝে ইংলণ্ডে প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণ করা বিশেষ প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশতঃ নানা কারণে তা' আর সম্ভব হয়ে উঠে নি। সে যুগের কংগ্রেস নেতাদের মনে এ ইচ্ছা বরাবরই ছিল। কিন্তু তা' কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নি।

বাড়ী ফিরে এসে আমি দেখলাম রিপন কলেজের ব্যাপারে আমি গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন। আমি যখন বাইরে ছিলাম তখন এই কলেজটি ধ্বংস করবার জন্য সমস্ত প্রকার আয়োজন চলছিল। দেখা গেল, জনৈক ছাত্র রিপন কলেজ থেকে বি. এল. পরীক্ষা পাশ করে গেছে। কিন্তু সে যখন কলেজে অনুপস্থিত ছিল কলেজ রোল-এ তাকে উপস্থিত বলে দেখান হয়েছিল। অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ হ'ল। এবং সিণ্ডিকেটের এক প্রস্তাব অনুসারে কলেজের আইন বিভাগের স্বীকৃতিও এক বছরের জন্য তুলে নেওয়া হ'ল। কোন কলেজের পক্ষে এরূপ হওয়া অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। স্বীকৃতি তুলে নেবার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হ'লে

কলেজের আর্থিক অবস্থা হ'ত অত্যন্ত শোচনীয়। কারণ তখন বেসরকারী কলেজের কলা বিভাগগুলি আইন বিভাগের উদ্বৃত্ত থেকে বিশেষভাবে লাভবান হ'ত। কলেজের অবস্থা বাস্তবিক দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। ইংলণ্ডে থাকতে ভাল কাজ করেছি বলে মনে যা কিছু আনন্দ ছিল অনতিবিলম্বে তা' অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমার বন্ধুগণ আমার সম্মানে প্রীতিভোজ, প্রমোদ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে' পরস্পরের সঙ্গে যখন প্রায় প্রতিযোগিতা চালাচ্ছিল, তখন আমার অন্তরে কেবল একটি মাত্র কথাই তোলপাড় করছিল, "উপস্থিত বিনাশের হাত থেকে কলেজকে কি ভাবে রক্ষা করা যাবে।" আমার জীবনের রক্ত দিয়ে আমি তাকে গড়ে তুলেছি। দক্ষতা ও সফলতার জন্য এই প্রতিষ্ঠান প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু এখন তা' পড়েছে এক সাঙঘাতিক বিপদের মুখে।

কলেজের স্বীকৃতি রহিত করবার নির্দ্দেশ কার্য্যকরী করবার জন্য তখন ভারতসরকারের সমর্থন নিতে হ'ত। একমাত্র সেখানেই আমাদের কিঞ্চিৎ আশা ছিল। যা' হয়েছে এরূপ ঘটনা ভবিষ্যতে আর যাতে না হতে পারে সে সম্পর্কে যথাসাধ্য দায়িত্ব নিতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম। এবং এরূপ এক প্রস্তাব নিয়ে আমরা ভারতসরকারের কাছে উপস্থিত হলাম। বিষয়টি তখন পুনর্বিবেচনার জন্য সিনেটে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। আমাদের দায়িত্ব নেওয়াটি সিনেট সমর্থন করল। এবং আমরাও একান্তভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে লাগলাম। শেষ পর্য্যন্ত এভাবেই সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির পরিসমাপ্তি ঘটল। রিপন কলেজকে আংশিকভাবে পুনর্গঠন করে নেওয়া হ'ল এবং তার ফলে এ কলেজ থেকে দেশের অনেক উপকার হতে লাগল।

এই বিপদের সময় কলেজটিকে যাঁরা সহায়তা করেছিলেন

তাঁদের সম্পর্কে কিছু না বলে এ বিষয়টির বর্ণনা শেষ করা যায় না। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় পরলোকগত স্যার তারকনাথ পালিতের। ১৮৬৮ সাল থেকেই ছিলাম আমরা অন্তরঙ্গ। তিনি আমার বাবাকে জানতেন এবং তাঁর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করতেন। বিলেতে থাকতেই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং তখন আমাদের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। আজ তিনি স্বর্গে। তাঁর মত সহানুভূতিশীল মানুষ আমি বেশী দেখিনি। কোন বিষয়ে পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারে তাঁর মনোভাব ছিল সব সময়েই অবিচল। তাঁর চরিত্রবল ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। কোন মতামত প্রকাশ করতে হ'লে বেশ জোর দিয়ে ও স্পষ্টভাবেই তা' করতেন। অন্যেরা কি মনে করতে পারে সেদিকে তিনি দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করতেন না। তিনি যেমন বন্ধুদের প্রতি ছিলেন সদয় তেমনি যাঁর কাছ থেকে যা' প্রাপ্য তা' আদায় করতেও ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। প্রচলিত রীতিনীতি রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় আমাদের আনন্দ ব্যাহত হয়। তিনি এরূপ প্রচলিত রীতি থেকে থাকতেন সম্পূর্ণ বিমুক্ত। সমস্ত জীবন তিনি স্বদেশের যে কোন হিতকামী আন্দোলনের ছিলেন পরম সহায়। দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি রাজকীয়ভাবে তাঁর সমস্ত সম্পদ যেরূপ অকাতরে দান করেছিলেন তা' থেকেই তাঁর দেশবাসীরপ্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের চরম পরিচয় পাওয়া যায়। সহৃদয়তা ও বিশেষ উৎসাহের সহিত তিনি রিপন কলেজের বিষয়টি হাতে নিলেন। এবং তাঁরই চেষ্টার ফলে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র নিজেই এ সম্পর্কে উৎসাহ দেখাতে লাগলেন।

স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের সহায়তা ও সহযোগিতা হয়েছিল আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। তার পরেই আমি তাঁর সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ হতে থাকি। এবং আমি যতই তাঁর পরিচয় পেতে

লাগলাম ততই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেতে লাগল। তার মত দৃঢ়মনোভাবাপন্ন, সৎ এবং অসাধারণ সহজবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি আমাদের মধ্যে বিরল। তিনি কেবল যে একজন প্রসিদ্ধ বিচারপতিই ছিলেন তা' নয়। তিনি মানুষ হিসাবেও ছিলেন অত্যন্ত মহৎ।

আমাদের উপরোক্ত সঙ্কট মুহূর্ত্তে আমার আর এক বন্ধু আমাদের বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। তিনি হলেন মনোমোহন ঘোষ। তাঁর সম্পর্কেও আমার দুএকটা কথা বলা দরকার। তাঁর সুবিখ্যাত ভ্রাতার অনন্যসাধারণ গুণাবলী তাঁর মধ্যে পাওয়া যেত না বটে, কিন্তু মনুষ্যত্ব বলে যে গুণটি আছে তা' তাঁর মধ্যে হয়েছিল বিশেষরূপে পরিস্ফুট। আইনজ্ঞ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। কিন্তু সমাজসেবী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল ততোধিক। প্রয়োজন সময়ে তিনি ছিলেন সকলেরই বন্ধু। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে বহু নিরপরাধ ব্যক্তিকে মুক্তি লাভে সহায়তা করেছিলেন ও মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন। একবার একটি গল্প শুনেছিলাম যা' আজ অবধি আমি ভুলতে পারি নি। যে বন্ধুর নিকট থেকে গল্পটি শুনেছিলাম তিনি একবার মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। মনোমোহন ঘোষ সে সময় বাড়ীতে ছিলেন না। তবে তাঁর অফিস ঘরে একজন বৃদ্ধ লোক তখন বসে ছিলেন। আমার বন্ধু বসে-বসে তাঁর সঙ্গেই বাক্যালাপ করতে লাগলেন। সেই বৃদ্ধ লোকটি বললেন, তিনি এক খুনের দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন এবং মিঃ মনোমোহন ঘোষের চেষ্টাতেই তিনি ফাঁসীর হাত থেকে রক্ষা পান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু দেবার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এবং মিঃ মনোমোহন ঘোষ তাঁর নিকট থেকে কিছু দাবীও করেন নি। বছরের পর বছর এসে তিনি তাঁর

য়্যাডভোকেটের কাছে তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যেতেন। মিঃ মনোমোহন ঘোষের মৃত্যুর পর সেই বৃদ্ধ লোকটি এসে যখন দুঃসংবাদটি পান তখন গভীর শোকে অভিভূত হয়ে তিনি শিশুর মত রোদন করতে লাগলেন এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁকে শান্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

মক্কেলের কাজ করে' বা তার জীবন রক্ষা করে' মক্কেলের হৃদয়জয়রূপ অমূল্য সম্পদ দাবী করতে পারে এরূপ আইনজীবী আজ কোথায় পাওয়া যাবে? আমার মনে আছে এরূপ অনেক মামলায় বিনা পারিশ্রমিকে এবং তা' কখনো পাবার আশা ছাড়াই যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে মিঃ মনোমোহন ঘোষ কাজ করতেন। এবং তারই ফলে নিতান্ত ব্যবসাদারী মনোভাবাপন্ন আইনজ্ঞের স্তর থেকে তিনি অনেক ঊর্দ্ধে উঠতে পেরেছিলেন। যদিও তাঁর অনেক বন্ধু আইন ব্যবসা করে' প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেছিলেন, তবুও কৃতী আইনজ্ঞ হিসাবে তাঁর উপার্জ্জনও মন্দ ছিল না। কিন্তু তদপেক্ষা অধিক যা', তিনি অর্জ্জন করেছিলেন তা' হল তিনি যে সমস্ত অসহায় দরিদ্রলোক বা অসৎপ্রকৃতির পুলিশেরশীকার স্বরূপ ব্যক্তিদের জন্য পরিশ্রম করতেন তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার মত অমূল্য সম্পদ।

ফৌজদারী মামলার আসামীদিগকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে তিনি যখন তাদের পক্ষ সমর্থন করতেন, তখন তিনি তাঁর এক নিজস্ব কর্ম্মপদ্ধতি অনুসারেই কাজ করতেন। তিনি জানতেন সংবাদপত্র হল তখন ব্যক্তিস্বাধীনতার এক মস্ত বড় ভরসা। যখনই তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারী মামলায় আসামী পক্ষে নিযুক্ত হতেন, আদালতের কার্য্যাবলী যাতে সংবাদপত্রে প্রকাশ হতে পারে সে অভিপ্রায়ে সর্ব্বদাই পত্রিকার কোন সংবাদদাতাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এভাবে তিনি মফস্বলের দুষ্টপ্রকৃতির ম্যাজিষ্ট্রেটদের

সাজ্বাতিক ভয়ের কারণ হয়ে পড়েন। এসমস্ত বিচারবিভাগীয় কর্ম্মচারীদের খামখেয়ালী হ্রাস হওয়ার বিষয়ে তাঁর যে এক সুচিন্তিত ভূমিকা ছিল তাহা স্বীকার করাই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন। ফৌজদারী আইনজ্ঞ হিসাবে তাঁর অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফৌজদারী বিচারকার্য্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে হলে প্রশাসনিককার্য্য ও বিচারকার্য্য পৃথক করা আশু প্রয়োজন। যখন তখন তিনি এই সংস্কার কার্য্যের জন্য প্রচার চালাতেন। প্রধানত তাঁরই চেষ্টার ফলে এ বিষয়টি ক্রমে ব্যবহারিক রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়। বিচার বিভাগের এই সংস্কারের জন্য তাঁর যে অনির্ব্বাণ উৎসাহ ছিল তাঁর মর্ম্মন্তুদ অকাল মৃত্যুতে তা' অধিকতর পবিত্রতা লাভ করেছে।

যে-সমস্ত ঘটনার ফলে মিঃ মনোমোহন ঘোষ সাজ্বাতিক সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছিলেন এখানে সে সমূহের পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। কৃষ্ণনগরে ছিল তাঁর দেশের-বাড়ী। বহু অর্থ ব্যয় করে তিনি তার সংস্কার করে এবং তাকে নানা ভাবে সজ্জিত করে, তাকে প্রায় একখানি প্রাসাদে পরিণত করেছিলেন। তিনি সেদিন দেশের বাড়ীতে ছিলেন। মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হয়ে তাঁর একমাত্র পুত্র মাদ্রাজে বাস করত। ছেলেকে দেখবার জন্য সেদিন সকালে মাদ্রাজ যাবার পথে কোলকাতা যাবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সে সময় একখানা ইংরেজী পত্রিকায় বিচারবিভাগীয় কাজ এবং প্রশাসনিক কাজ পরস্পর থেকে পৃথক করা সম্পর্কে স্যার চার্লস ইলিয়টের একখানা নিবন্ধ সবেমাত্র প্রকাশ হয়েছে। মিঃ মনোমোহন ঘোষ সেদিন সমস্ত সকাল বেলাটা তা' নিয়ে এক উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনায় কাটিয়ে দিলেন। পূর্ব্ব থেকেই এ বিষয়ে তিনি গভীর ভাবে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর মনে হ'ল স্যার চার্লস ইলিয়টের সমালোচনায়

সম্পূর্ণ ও সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব। এ বিষয়টি তাঁর মনে এমন এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে' তাঁকে এমন ভাবে উত্তেজিত করে তুলল যে, মনের এই অবস্থা নিয়ে যখন তিনি স্নান করছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হন এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ সংবাদে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। এরূপ একজন ভাল খাঁটি স্বদেশপ্রেমীকে হারিয়ে তাঁরা শোকে অভিভূত হলেন। ১৮৯৬ সালের অক্টোবর থেকে অনেক বৎসর গত হয়েছে। কিন্তু এখনো তাঁর দেশবাসীদের কোন জন সমাবেশে যখন মিঃ মনোমোহন ঘোষের নাম উচ্চারিত হয় তাঁরা আবেগে অধীর হন।

রিপন কলেজ সম্পর্কিত বিবাদের সম্পর্কে বলতে গেলে আমার আরও দুজন বন্ধুর নিকট আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। তাঁরা হলেন, স্যার হেনরী হ্যারিসন ও স্যার হেনরী কটন। আমি স্যার হেনরী কটনকে প্রায় চল্লিশ বছরের অধিককাল ধরে' জানি। আর স্যার হেনরী হ্যারিসনকে প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি কোলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হলেন তখন থেকে। আমি নিজেও ছিলাম কর্পোরেশনের একজন সদস্য। আজকাল যদিও কিছু পরিমাণ উন্নতি হয়েছে, তবুও আমাদের দেশবাসীদের সঙ্গে সরকারের ইংরেজ কর্ম্মচারীদের সম্পর্ক নিতান্তই একটা নিয়মরক্ষা মাত্র। কিন্তু স্যার হেনরী কটন ও স্যার হেনরী হ্যারিসন সম্পর্কে আমার এক গভীর শ্রদ্ধার ভাব ও উচ্চ ধারণা ছিল। আমার প্রতি তাঁদের ব্যবহার ছিল পরম বন্ধুর মত। রিপন কলেজকে রক্ষার জন্য তাঁরা নিরলস প্রয়াস চালিয়েছিলেন। এবং প্রধানত তাঁদেরই চেষ্টার ফলে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার কুমার পেথেরাম এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে স্বীকৃত হন। সে যুগের সিনেটের সভায় চীফ্ জাষ্টিসের উপস্থিতি ও সমর্থনের অর্থ ছিল অনেক

কিছু। সিনেটের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁরা বেশীর ভাগই আমরা যে দায়িত্ব নেব বলে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তা' গ্রহণ করে' অস্থায়ী ভাবে কলেজের স্বীকৃতি যে বন্ধ করা হয়েছিল তা' রহিত করে দেবার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন।

রিপন কলেজের সেই সংকট সময়ে আমি মানসিক যন্ত্রণা ও উত্তেজনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করছিলাম। তার উপর ১৮৯০ সালের ডিসেম্বরের কংগ্রেসের কোলকাতা অধিবেশনের জন্য আমি অত্যন্ত পরিশ্রমও করেছিলাম। এ সমস্তের ফলে আমি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হই। পরলোকগত মিঃ জানকীনাথ ঘোষালের সহধর্ম্মিনী সুলেখিকা শ্রীমতী সরলা ঘোষাল আমাকে সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ীতে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি নিমন্ত্রণে যাবার জন্য আমার গাড়ী প্রস্তুত করতে নির্দ্দেশ দিলাম। কি যে আসছে তার জন্য আমি তখন একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি রওনা হব এমন সময় আমি জ্বর-জ্বর অনুভব করতে লাগলাম। স্থানীয় একজন ডাক্তারকে ডেকে আনা হ'ল। আমার নাড়ি পরীক্ষা করে তিনি বললেন, আমার জ্বর হয়েছে। আধঘণ্টা খাণিকের মধ্যে আমার স্বাসকষ্ট হতে লাগল। বন্ধুবর ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়কে ডেকে পাঠান হ'ল। তিনি এসে পরীক্ষা করে' বললেন আমার গুরুতর ব্রংকাইটিস হয়েছে। তিনি আমাকে শুয়ে পড়তে নির্দ্দেশ দিলেন। আমার সহকর্ম্মিগণ সকলেই কংগ্রেস অধিবেশনকে সফল করবার জন্য তখন অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। আর আমি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় এক মাসের উপর অসহায় ভাবে শয্যায় পড়ে রইলাম। একদিকে শারীরিক কষ্ট ও দুর্বলতা, অপর দিকে যে কাজের মধ্যে ছিল আমার সকল আনন্দের উৎস তা' থেকে এ ভাবে

বঞ্চিত হওয়ায় তিক্ত নিরাশা। তারা টাউন হলে সভা করল। আমি যেতে পারলাম না। কংগ্রেস কর্ম্মিগণ তাঁদের আরও এক সহকর্ম্মীর অনুপস্থিতি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। তিনি মিঃ ডবল্যু. সি. বোনার্জী। তিনি ছিলেন রিউমেটিক জ্বরে শয্যাগত।

কংগ্রেসের একটি সভায় উপস্থিত থেকে বক্তৃতা করবার মত আমি কিছুটা আরোগ্য লাভ করলাম। কিন্তু সভাপতি মহাশয় আমার বক্তৃতার সময়সীমা নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে আদেশ দিলেন আমার বক্তৃতা যেন দশবার লাইনের অধিক না হয়। আমি পরলোকগত ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়ের সতর্ক ও সযত্ন চেষ্টার ফলেই এ যাত্রা আরোগ্য হয়ে উঠলাম। ১৮৬৮ সাল থেকেই আমি তাঁকে জানতাম। সে সময় তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করবার উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গেই বিলেত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর যাবার পথে তখন এক অসুবিধা দেখা দিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভাষায় যাঁকে 'আমাদের বিদেশগামীদের বেসরকারী রক্ষক' বলে' বলা হ'ত, সেই মনোমোহন ঘোষ তাঁকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন। বললেন, তাঁর দাদার অজ্ঞাতে ও বিনা অনুমতিতে তিনি ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়কে বিলেত যেতে সাহায্য করতে পারবেন না। দেবেন্দ্রনাথের দাদা রায় যদুনাথ রায়বাহাদুর ছিলেন কৃষ্ণনগরের জনমতের নায়ক। তিনি দেবেন্দ্রনাথের বিলাত যাওয়ায় আপত্তি করলেন। সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে গোঁড়ামী তখন প্রবল। এই গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিছু করবার সাহস তাঁর হ'ল না। বন্ধুবর কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে সরকারী চাকরীতে উচ্চপদে আরোহণ করেছিলেন। সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর তিনি কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করে'

চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিশেষ সুনাম ও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি চিকিৎসক হিসাবে ছিলেন যেমন দক্ষ, মানুষ হিসাবে ছিলেন তেমন অতুলনীয়। নিজে ছিলেন হাঁপানি ও বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত। তা' সত্ত্বেও তাঁর আশাবাদী মনোভাব বা প্রফুল্লতা কখনো তার দ্বারা ব্যাহত হতে পারে নি। তাঁর দুটি উজ্জ্বল চোখ থেকে সর্ব্বদা যে আশা ও বিশ্বাসের ভাব বিচ্ছুরিত হ'ত তা' তাঁর অসংখ্য রোগীর মনে অবিরত শান্তি দান করত। ১৯০৯ সালে যখন তিনি নিতান্ত অপরিণত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন তাঁর বন্ধুবর্গ ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান সকলে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকই মাত্র ছিলেন না। তিনি একজন সক্রিয় শিক্ষাবিদও ছিলেন। এবং সিনেটের সদস্য হিসাবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষভাবে সেবা করে' গেছেন।

———

দ্বাদশ অধ্যায়

আইনসভা সংশ্লিষ্ট আমাদের কাজকর্ম

১৮৯২ সালে পার্ল্যামেণ্টরী ষ্ট্যাট্যুট অনুসারে আইনসভাসমূহকে পুনর্গঠিত ও প্রসারিত করা হ'ল। আর ১৮৯৩ সালে এই পুনর্গঠিত কাউনসিল সমূহের সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন বসল। ভারত সরকার এই ষ্ট্যাট্যুট অনুসারে রেগুলেশন প্রস্তুত করলেন। পরে ১৯০৯ সালের ষ্ট্যাট্যুট-এর বলে কাউনসিলগুলিকে আরও উদার করে প্রসারিত করা হ'ল। কিন্তু এই ষ্ট্যাট্যুট অনুযায়ী যে সমস্ত রেগুলেশন তৈরী হয়েছিল তাদের তুলনায় পূর্ব্ববর্ত্তী রেগুলেশনগুলি হয়েছিল অধিকতর উদার। নির্বাচনের নীতি নিশ্চিতরূপে স্বীকার করে এবং বেসরকারী সদস্যদের ক্ষমতা অধিকতর বৃদ্ধি করে দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতাও সরকার গ্রহণ করলেন। যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী কোন কারণে পদচ্যুত হয়েছে এবং যারা ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১১০ ধারা অনুসারে সদ্ব্যবহার করবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে, তারা নির্বাচনে প্রার্থী হবার অযোগ্য বলে নির্দিষ্ট হ'ল। এছাড়া সরকার একটি সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করল। তাতে বলা হ'ল যদি গভর্ণর অথবা গভর্ণর জেনারেল কখনো মনে করেন যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের নির্বাচন জনস্বার্থের বিরোধী হবে, তা' হ'লে সে ব্যক্তিও নির্বাচন প্রার্থী হবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। বাস্তবিক পক্ষে ১৮৯৩ সালে এসমস্ত ক্ষমতা সংরক্ষিত রাখবার কিছুমাত্র প্রয়োজনই ছিল না। কারণ কোন নির্বাচনকেন্দ্র থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিকে গ্রহণ করা বা না করার বিষয়ে সরকারেরই ছিল চূড়ান্ত ক্ষমতা।

লক্ষ্য করা যায়, সরকারের একটি চিরাচরিত প্রথাই হ'ল, যখনই জনমতের চাপে তাঁরা কোথাও কোন সুযোগসুবিধা দিয়ে

থাকেন সঙ্গে-সঙ্গেই আবার সংরক্ষণ নীতির প্রাচীর তুলে তাকে ঘিরে রাখেন। এই সতর্কতার মনোবৃত্তির ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ করে বসেন। পুরোণো আমলে যখন কাউনসিলের পুনর্গঠন হয়নি সরকারী সদস্যদের ইচ্ছানুযায়ী ভোটদান বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণ স্বাধীনতা ছিল। বঙ্গদেশের আইনসভার ইতিহাসে এরূপ নজীর পাওয়া যায়। সেবার ১৮৭৬ সালের কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন প্রণয়ন বিষয়ে বিতর্ক চলছিল। কাউনসিলের প্রেসিডেণ্ট তখন স্বয়ং বঙ্গদেশের লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর। কাউনসিলের অধিকাংশ সদস্য ছিলেন সরকারী কর্ম্মচারী। কর্পোরেশনের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য যাতে নির্বাচনের ভিতর দিয়ে আসতে পারে লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর এরূপ একটি প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু যখন ভোট নেওয়া হয় দেখা গেল কাউনসিলের ধ্বনিভোটে তিনি পরাজিত হয়েছেন। ১৮৯৩ সালে যখন কাউনসিল পুনর্গঠিত হয় তখনো সেই স্বাধীনতার কিংয়দংশ অবশিষ্ট ছিল। পরলোকগত বন্ধু মিঃ আর. সি. দত্ত'র কথা মনে পড়ে। তখন তিনি বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার। কিছুকাল তিনি লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্য ছিলেন। তিনি ও প্রধান সচিব মিঃ কটন উভয়েই সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু সে-সব দিন আর নেই। বর্ত্তমান নীতি হ'ল প্রেসিডেণ্ট যদি সরকারী কর্ম্মচারীদের সে স্বাধীনতা না দেন, তা' হ'লে সরকারী সদস্যেরা সরকারের পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য। আমার যতদূর মনে পড়ে কেবলমাত্র একবার সেরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। সেবার আমি ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সম্মুখে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্যের পদ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলাম। তখন প্রত্যেক সরকারী সদস্যকেই তাদের নিজ-নিজ ইচ্ছানুসারে বক্তৃতা করবার

ও ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, তারাও সে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল।

১৯০৯ সালের ষ্ট্যাট্যুট অনুসারে যে রেগুলেশন প্রস্তুত করা হয়েছিল তার তুলনায় ১৮৯২ সালের ষ্ট্যাট্যুট অনুযায়ী রেগুলেশন গুলিকে অধিকতর শ্রেয় মনে করবার আরও এক কারণ ছিল। কোন শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধিমূলক বা বণিকদের স্বার্থের প্রতিনিধিমূলক কোন বিশেষ ধরণের কোন নির্বাচক মণ্ডলীর ব্যবস্থা তার মধ্যে ছিল না। নির্বাচন কেন্দ্রগুলি ছিল গ্রামীন স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি। মধ্যবিত্তেরাও তাদের যথাযোগ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'ত না। কিন্তু ১৯১০ সালে যে অদ্ভুত ধরণের রেগুলেশন রচিত হ'ল তার ফলে মধ্যবিত্তরা তাদের এসমস্ত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হ'ল। ১৮৯২ সালের রেগুলেশনে কোন পৃথক বা বিশেষ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা না থাকলেও তাতে কোন শ্রেণীর লোকেরই স্বার্থ ব্যাহত হত না। নাটোরের মহারাজা ও তাহারিপুরের রাজা ছিলেন জমিদারশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধি। নবাব সিরাজুল ইসলাম্ ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। কাউনসিলে আসতে তাঁদের কারও কোন অসুবিধা হয়নি। একথা সত্য যে, নির্ব্বাচনের জন্য রাজামহারাজাদের আংশিকভাবে মধ্যবিত্তদের উপর নির্ভর করতে হত। এবং মুসলমান নির্ব্বাচন প্রার্থীদেরও হিন্দু জনসাধারণের উপর নির্ভর করতে হ'ত। কিন্তু যতদূর জানি বঙ্গদেশে এজন্য কেউ কোনদিন কোন ক্ষোভ প্রকাশ করেনি। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মাত্র সেদিনের। বঙ্গভঙ্গের ফলে এ সমস্যার সৃষ্টি যদি নাও হয়ে থাকে, তবুও তাতে যে শক্তি সঞ্চার করেছে তা' সুনিশ্চিত। এমন কি, যদিও আজ শ্রেণীগত প্রতিনিধিত্বের নীতি সরকারের সমর্থন লাভ করেছে, তবুও বাস্তবিক পক্ষে জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কোন স্বার্থের

সংঘাত নেই। বর্দ্ধমানের মহারাজার ন্যায় জমিদারশ্রেণীর স্বার্থের একজন বিশিষ্ট রক্ষক আপনাকে শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই একজন বলে' বলতে এবং তাদের জনহিতকর কাজকর্মে আপনাকে যুক্ত করতে আনন্দ অনুভব করেন। যে মধ্যবিত্ত সমাজ কাউনসিলের সংস্কারের জন্য চিৎকার করে-করে সে দাবী আদায় করেছে শ্রেণীমূলক প্রতিনিধিত্বের নীতি হ'ল তাদের উপর ভদ্রভাবে প্রতিশোধ নেবার আমলাতন্ত্রী ব্যবস্থা। ১৮৯২ সালের আইন অনুসারে মধ্যবিত্তেরা নির্বাচনক্ষেত্রে যে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল এই নূতন নীতি গ্রহণের ফলে তা' বহুলাংশে হ্রাস পেল। এবং ১৯০৯ সালের রেগুলেশনের উদ্দেশ্যই ছিল, যাদের চেষ্টায় এই নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়েছিল বাস্তবিক পক্ষে তাদেরই অবজ্ঞা করে' পশ্চাতে ঠেলে ফেলে রাখা।

১৮৯২ সালে যখন কাউনসিল পুনর্গঠিত হল, তখন কোন আইনগত বাধা না থাকায় কোলকাতা কর্পোরেশনের একজন সদস্য হিসাবে আমি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে সদস্যপদের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াই। বাবু কালীনাথ মিত্র ও বাবু জয়গোবিন্দ লাহা ছিলেন অপর দুই প্রার্থী। বাবু কালীনাথ মিত্র ছিলেন করদাতাদের প্রতিনিধিদের অগ্রগণ্য ও কর্পোরেশনের বিরোধীদলের অবিসম্বাদিত নেতা। যে কোলকাতা বিল পরে ১৮৮৮ সালের মিউনিসিপ্যাল য়্যাক্ট হয়, তা' তখন ছিল আলোচনা সাপেক্ষ। এজন্য সরকার করদাতাদের স্বার্থ পরিপোষণের জন্য তাঁকে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্য মনোনীত করল। এবং তিনিও সে সময় বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে তাঁর কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। ১৮৭৬ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি কর্পোরেশনের সদস্য হিসাবে কাজ করেছিলেন। তারপর তিনি এবং আরও সাতাশ জন একত্র কর্পোরেশনের সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

কর্পোরেশনে সদস্য থাকার সময় তিনি তাঁর কার্য্যে উত্তম, দক্ষতা, সততা ও একাগ্রতার জন্য বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। কর্পোরেশনের সদস্য হিসাবে বাবু জয়গোবিন্দ লাহার নাম সেরূপ ছিল না। তবে কর্পোরেশনের কাজে বাস্তবিক উৎসাহ দেখাতেন, সুশৃঙ্খল কর্মপ্রণালী অনুসরণ করতেন এবং শান্তভাবে কার্য্য সম্পাদন কর্ম্ম প্রণালী অনুসরণ করতেন এবং শান্তভাবে কার্য্য সম্পাদন করতেন বলে' তাঁর সহকর্ম্মিগণ তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। আমরা ছিলাম পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির ডোরে আবদ্ধ এবং সেভাব নিয়েই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলাম। কোন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বা ক্রোধ অথবা দ্বেষের বশবর্ত্তী হয়ে কিছু করে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নষ্ট হ'তে আমরা দিইনি। এবং তার কোন অপ্রীতিকর স্মৃতিও আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখবার কারণ হয়নি। নির্ব্বাচন সাঙ্গ হবার পর আমরা পরস্পরের সঙ্গে পুনরায় পূর্বের মতই বন্ধুভাবে ব্যবহার করে যতদিন পর্য্যন্ত কর্পোরেশনে ছিলাম পরস্পরের সহায়তা করে' একযোগে কাজ করতে থাকি।

সেদিন থেকে আজকের কি পরিবর্ত্তন—জনসেবার কাজে কি অবনতি! মিথ্যা ভাষণ ও দ্বেষ হয়েছে বর্ত্তমান যুগের অস্ত্র, আক্রমণের জন্য। আত্মরক্ষার জন্যও বটে। যাঁরা আপনাদিগকে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের অবতার বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁদের দেশবাসীকে স্বরাজ-এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তাঁরা এ সকল অস্ত্রেরই প্রয়োগ করেন। হিন্দু ধর্ম্মের পুঁথিপত্রেই এই স্বরাজ শব্দের প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এবং সেখানে 'স্বরাজ' শব্দ আত্ম-সংযম শব্দেরই সমার্থক। বর্ত্তমানে একশ্রেণীর লোক এ শব্দকে যেরূপে ব্যবহার করে থাকে তার ফলে তার অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জঘন্য ও হীনতম প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণের স্বাধীনতা। যার আরম্ভেই এই, তার পরিণতি সহজেই অনুমেয়।

নির্বাচনে সর্বাধিক ভোটে জয় লাভ করে' কোলকাতা কর্পোরেশন থেকে আমি প্রথম পুনর্গঠিত লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্য হলাম। আমিই জয়ী হবার কি যে কারণ ছিল আমার পক্ষে বলা শক্ত কেন না কর্পোরেশনের সদস্য হিসাবে বাবু কালীনাথ মিত্রের প্রতিষ্ঠা ছিল অনেক বেশী। হয়ত কাউনসিলের সংস্কার ও পুনর্গঠনে আমি যে অংশ গ্রহণ করেছিলাম এবং জনহিতকর কাজ-কর্ম্মের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আমার যে উৎসাহ ছিল তা' দেখেই ভোটদাতাগণ আমাকেই নির্বাচিত করেছিলেন। তবে যে কাউনসিলকে পুনর্গঠিত করবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম সেখানে আমার জন্মস্থল কোলকাতা মহানগরীর কর্পোরেশনের সদস্যদের ভিতর থেকে সর্বপ্রথম নির্বাচিত হয়ে যেতে পারাতে আমি বিশেষ গর্ব অনুভব করলাম। এখন থেকে আমি আইনপরিষদ সম্পর্কিত কাজ কর্মে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। কতটুকু কি করতে পেরেছিলাম বলতে পারি না। ভালই হোক আর মন্দই হোক সে সবে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের নথিপত্রের মধ্যেই পাওয়া যাবে। তবে আমি বলতে পারি যে, কাজ করবার যতটুকু সুযোগ আমার সামনে ছিল তার সদ্ব্যবহার করতে আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি।

বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে আমার প্রথম বারের কার্য্যকাল যখন শেষ হয়ে গেল, কর্পোরেশন পুনরায় আমাকে তার সদস্য নির্বাচন করে পাঠাল। তৃতীয় এবং চতুর্থ বারে আমি বঙ্গদেশের প্রেসিডেন্সী বিভাগের মধ্য দিয়েই সদস্য হয়ে কাউনসিলে গেলাম। তৃতীয় বারের ক্ষেত্রে আমি সমর্থন পেলাম সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি থেকে। এবং চতুর্থবারে সহায়তা পাই জিলা বোর্ডগুলি থেকে। ফলে, ১৮৯৩ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে আট বছর আমি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের

সদস্য ছিলাম। বঙ্গদেশের পুনর্গঠিত লেজিসলেটিভ কাউনসিলের ইতিহাসে কোন ব্যক্তির এতদিন পর্য্যন্ত অবিরাম সদস্য থাকবার নজীর আর দ্বিতীয় নেই।

১৮৯৭ সালে প্রেসিডেন্সী বিভাগের জিলা বোর্ডগুলি যখন আমাকে নির্বাচিত করে' তখন ওয়েলবি কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমি ছিলাম ইংলণ্ডে। প্রধানত আমার পরলোকগত শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু আশুতোষ বিশ্বাসের চেষ্টার ফলেই আমি সেবার নির্বাচনে জয়লাভ করি। আমার সেই অকৃত্রিম বন্ধুর মৃত্যুতে আমি ও আমার অপরাপর বন্ধুরা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলাম।

১৮৯৯ সালে আমার জন্য একটি নির্বাচন কেন্দ্র অন্বেষণের জন্য সরকারই হস্তক্ষেপ করে। ১৮৯৩ সালের রেগুলেশনে নির্বাচিত সদস্যদের জন্য আসন সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। এজন্য নির্বাচনী কেন্দ্রগুলির মধ্যে একবার জিলাবোর্ডগুলি, পরের বার মিউনিসিপ্যালিটিগুলি পর্য্যায়ক্রমে লেজিসলেটিভ কাউনসিলের জন্য সদস্য নির্বাচন করে পাঠাত। ১৮৯৭ সালে আমার জন্য কোন নির্বাচন কেন্দ্র পাওয়া যাচ্ছিল না। অথচ সেবারেই কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল আলোচিত হবে বলে স্থির হয়ে রয়েছিল। এই বিলকে পরিবর্ত্তন করে আরও উদার করবার জন্য আমি বিশেষ জোর দিচ্ছিলাম। এজন্য সরকার পক্ষ ও জনসাধারণ উভয়েই মনে করেছিলন যে, এ অবস্থায় কাউনসিলে আমার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার জন উডবার্ণও একই মত প্রকাশ করলেন। উপরোক্ত রেগুলেশনে নির্বাচনের পর্য্যায় পদ্ধতির ব্যতিক্রম করবার তাঁর এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল। পর্য্যায় অনুসারে সেবার ঢাকাবিভাগ থেকেই কাউনসিলে সদস্য আসবার পালা। এ পরিস্থিতিতে ১৮৯৭ সালে লেফটেন্যান্ট গভর্ণর তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে

প্রেসিডেন্সী বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি থেকে সদস্য নির্বাচন করতে নির্দ্দেশ দিলেন। আমি নির্বাচন প্রার্থী হলাম। কেউ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াল না। ফলে সর্বসম্মতিক্রমে আমিই নির্বাচিত হলাম।

লেজিসলেটিভ কাউনসিলে আমি সদস্য থাকা কালে যে দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল য়্যাক্ট সংশোধন এবং অপরটি কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল য়্যাক্টটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ আইনটির পুনর্ব্বার বিচার। সংস্কার করে' কাউনসিল যখন পুনর্গঠিত হয় তখন প্রথমোক্ত বিষয়টি তার সামনে অমীমাংসিত অবস্থাতেই ছিল। দ্বিতীয় বিষয়টি ১৮৯৭ সালেই উপস্থিত করা হয়েছিল। এদের দুটিই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও দেশের মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। আর সেগুলির কাজকর্ম্মের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। ১৮৮৫ সাল থেকে আমি মফস্বলের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির চেয়ারম্যান ছিলাম। এবং ১৮৭৬ সালে যখন নির্ব্বাচন প্রথার প্রবর্ত্তন হয় তখন থেকে আমি ছিলাম কোলকাতা কর্পোরেশনের একজন সদস্য। আমার এই অভিজ্ঞতার ফলে এ সমস্ত বিষয় নিয়ে পরিষদে আলোচনা করতে আমার পক্ষে বিশেষ সুবিধে হয়েছিল। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল বিল সংশোধনের কাজটি করেছিলেন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার চারল্‌স্ ইলিয়ট নিজে। ১৮৯৩ সাল থেকে চাকরী হতে তাঁর অবসর গ্রহণের সময় পর্য্যন্ত আমি তাঁর খুব নিকট সংস্পর্শে ছিলাম। ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আন্তরিক। তার ফলে তাঁকে মানুষ হিসাবে ও একজন প্রশাসনিক হিসাবে জানবার আমার প্রচুর সুযোগ হয়েছিল। তিনি এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশ থেকে।

এজন্য বঙ্গদেশের লোকজনের চালচলন সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু তাঁর কার্য্যোদ্যম ছিল অসাধারণ। সমস্ত বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নজর দেওয়া একজন জিলা কলেকটরের পক্ষে একটি বড় গুণ বটে, কিন্তু কোন প্রদেশের উচ্চতম প্রশাসনিকের পক্ষেও এই গুণ কোন-কোন সময় অযথা বলেই বোধ হত। সর্ব বিষয়ে অতিরিক্ত গভীরে যাওয়ার ফলে কোন কোন নীতি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। বঙ্গদেশ সম্পর্কে তাঁর বিশেষ জ্ঞান না থাকায় তিনি সুবিবেচকের ন্যায় মিঃ হেনরী কটনকে প্রধান সচিবের পদে নিয়োগ করেন।

জনসাধারণের নিকট থেকে মিঃ কটন যে পরিমাণ ভক্তি ও ও বিশ্বাস অর্জ্জন করেছিলেন, বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের অপর কারও পক্ষে সেরূপ সম্ভব হয় নি। তাঁকে প্রধান সচিবের পদে নিযুক্ত করা সকলের নিকট এক শুভ সূচনা বলে বোধ হল। কিন্তু অবশেষে এই আশা যে দুরাশায় পরিণত হয়েছিল সে জন্য মিঃ কটন দায়ী ছিলেন না। কারণ, তাঁকে এমন একজন প্রশাসনিকের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়েছিল, যিনি ছিলেন একজন পুরোদস্তুর আমলাতন্ত্রী। সিভিল সার্ভিসের উপর স্যার চারল্‌স্ ইলিয়ট-এর ছিল অগাধ বিশ্বাস। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, সিভিল সার্ভিসের সাহায্যে দেশ শাসন মানব প্রতিভার এক অপূর্ব্ব আবিষ্কার। এবং তাঁরই অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে তাঁর সমস্ত রকম ব্যবস্থা অবলম্বনের মধ্যে মনে হত তাঁর অন্তরে বরাবর এই ধারণা ছিল যে, কোন মানুষকেই তার নিজের কাজ নিজেকে করতে দিয়ে বিশ্বাস করা চলে না। কোন সমাজগত সুযোগ সুবিধার বিষয়ে অথবা সরকারী চাকুরীর ব্যাপারে তিনি ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। কিন্তু সিভিল সার্ভিসের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অটল। তিনি

ধরে নিয়েছিলেন যে, প্রশাসনিক কার্য্যে তারাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল কর্মচারী। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল বিল ও জুরী নোটিফিকেশন রূপ তাঁর শাসনের দুটি গুরুতর ব্যবস্থার মূলেও কাজ করছিল জনগণ ও জনপ্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর অবিশ্বাস।

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, ১৮৯২ সালের ষ্ট্যাট্যুট অনুসারে কাউনসিল যখন পুনর্গঠিত হয়েছিল তখন বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল য়্যাকট-এর একটি সংশোধন প্রস্তাব সরকারের বিচারাধীন ছিল। এই ব্যবস্থাটি ছিল আসলে প্রতিক্রিয়াশীল। মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি সরকারী অবিশ্বাসের ফলেই হয়েছিল তার উৎপত্তি। একবার যদি মিউনিসিপ্যালিটিকে তার চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হয়, তা' হ'লে সে সময়ের আইন অনুসারে তা' বাতিল করা সম্ভব ছিল না। যে সংশোধনী বিলটি আনা হল, তার উদ্দেশ্য ছিল মিউনিসিপ্যালিটিকে তার এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার জন্য সরকারের হাতে উপযুক্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা। তা' ছাড়া সেই মিউনিসিপ্যাল আইনে বলা ছিল যে, কমিশনারদের সমর্থন ব্যতীত কোন মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাকে বিভক্ত করা যাবে না। এ সম্পর্কে ওদের দেওয়া হয়েছিল চূড়ান্ত ক্ষমতা। সংশোধনী প্রস্তাবে সেই ব্যবস্থাটিরও বিলোপ সাধন করে এ সকল বিষয়েও সরকারকেই চূড়ান্ত বিচারের ক্ষমতা অর্পনের প্রস্তাব করা হ'ল।

কাউনসিলের বাইরে বসে আমি এসমস্ত ব্যবস্থার নিন্দা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। সংবাদপত্রে এসব সংশোধনের প্রতিবাদ করলাম। জনসভা করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলাম এবং কাউনসিলের অনেক সদস্যের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখাও করলাম। কিন্তু সবই নিষ্ফল হ'ল। অবশেষে আমার মনে হ'ল, বিলেতে এ বিষয়ে একটা আবেদন করা যাক। মিঃ এলেন হিউম-এর নিকট আমি

এক দীর্ঘ চিঠি লিখলাম। সমস্ত কারণ দেখিয়ে আমি তাঁকে লর্ড রিপনের সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করলাম। লর্ড রিপন তখন ক্যাবিনেটের মেম্বার। মিঃ হিউম আমার পত্রখানা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উত্তরে লর্ড রিপন জানালেন, ক্যাবিনেটের প্রত্যেক সদস্যই নিজ-নিজ বিভাগের প্রধান। তবে আমার চিঠিখানি তিনি ভারত সচিব লর্ড কিমবারলির নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারপর এ বিষয়ে আমি তার কিছুই শুনি নি। তবে যা ছিল অভিপেত তা' লাভ হয়েছিল। এক সকালে স্যার চারল্‌স্ ইলিয়ট কাউনসিলে এসে দিনের কাজ আরম্ভ করবার পুর্বে জানালেন যে, তিনি বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল বিলের বিষয়ে ভারত সচিবের নিকট থেকে এক বার্ত্তা পেয়েছেন এবং তা' বিবেচনা করে তিনি ভারত সচিবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন। তিনি এবং ভারত সচিব উভয়েই স্থির করেছেন যে, যে সমস্ত বিষয়ে আপত্তি তোলা হয়েছে সে সব বিষয় পরিত্যক্ত হবে। সব ভাল তার শেষ ভাল যার। আমি কাউনসিলে বসে এ সমস্ত শুনছিলাম। আর তখন আমার মনের অবস্থা যে কি তা সহজেই অনুমেয়। কূটচালে স্থানীয় সরকারকে আমাদের মত গ্রহণ করাতে পারাটা সকলেই খুব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করল। লেফটেন্যান্ট গভর্ণর বাস্তবিকই ভারত সচিবের নিকট থেকে কোন কড়া নির্দ্দেশ পেয়েছিলেন, না, তিনি নিজের বিবেচনাতেই একই মতে এসেছিলেন, তা নিয়ে আমি আর অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করিনি। তখনকার মত মফস্বলের স্বায়ত্তসাশনের স্বার্থকে রক্ষা করা গেল।

আমি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে সদস্য থাকতে থাকতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে জড়িত অপর যে এক প্রস্তাব আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হয়েছিল, তা ম্যাকেঞ্জী বিল নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে আমি কিছু পরবর্ত্তী ঘটনাকেই আগে বর্ণনার

চেষ্টা করছি। এ বিলের সৃষ্টি সম্বন্ধে এত বলা হয়েছে যে, আমি তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। স্যার চার্লস্ ইলিয়টের পর স্যার আলেকজেণ্ডার ম্যাকেঞ্জী লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর হলেন। তিনিই উক্ত প্রস্তাবিত আইনের প্রণেতা ছিলেন। আর লর্ড কার্জ্জন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে আরও পরিবর্দ্ধন করেন। একদিন গৃহসচিব হিসাবে তাঁরই স্বাক্ষর যুক্ত হয়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন রূপ জনহিতকর প্রস্তাবটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি যখন লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর তখন আবার তাঁরই হাত দিয়ে বৃটিশ ভারতের রাজধানীর স্বায়ত্তশাসনের উপর এক মারাত্মক অস্ত্রাঘাতের আয়োজন করা হ'ল। একেই বলে ভাগ্যের বিড়ম্বনা। খুব সম্ভব "স্বরাষ্ট্র সচিব" হিসাবে স্যার অ্যালেকজেণ্ডার ম্যাকেঞ্জী কেবলমাত্র তাঁর উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের নির্দ্দেশ পালন করেছিলেন। কিন্তু লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর হয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব নীতি নির্দ্ধারণ করেছিলেন। যাঁরা সিভিল সার্ভ্যাণ্ট হিসাবে বেশ সফলতা অর্জ্জন করেন সচরাচর কোন বিষয় সম্পর্কে তাঁদের কোন দৃঢ়মত থাকে না। আর যদি থাকেও তবে তিনি তাঁর চাকরীতে উন্নতির পথে কোনরূপ বাধা যাতে সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। স্যার রিচার্ড টেম্পল ছিলেন কোলকাতার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের এক যথার্থ বন্ধু। কোলকাতা কর্পোরেশনের গঠনবিধির মধ্যে যে নির্ব্বাচনিক প্রথাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তজ্জন্য তাঁর নিকটেই আমরা ঋণী। কিন্তু ইংলণ্ডে হাউস-অব-কমনস্-এ তিনি বসতেন টোরীদলের সঙ্গে। এবং তখন তাঁর অতীত উদার নীতির কথা সহজেই ভুলে গেলেন। বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে এক সময় ছিলেন স্যার এস্‌লী ইডেন। প্রতিনিধিমূলক সংস্থাকে তিনি উপহাস করে বলতেন, সে সব হ'ল সে জাতেরই চারাগাছ যেগুলো যে জমিতে জন্মায় সে জমিতেও বড় হয় না। স্যার অ্যালেকজেণ্ডার ম্যাকেঞ্জী ছিলেন সেই

স্যার এসলী ইডেনেরই সহকারী ও মন্ত্রশিষ্য। পামার ব্রিজের পাম্পিং ষ্টেশনের উদ্বোধন করতে গিয়ে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, কোলকাতা কর্পোরেশন হ'ল একটি বচনের অস্ত্রভাণ্ডার আর কার্য্যে বিলম্ব ঘটাবার অস্ত্রাগার। কমিশনারেরা সেখানে অনর্গল কথাই বলেন। তিনি চান তাঁদের বচনের মাত্রা সংযত করে কার্য্যকরী শক্তিকে বৃদ্ধি করতে। মিউনিসিপ্যাল কার্য্যকরী ক্ষমতাকে নিরপেক্ষ করতে হবে। তাকে আর কর্পোরেশনের ক্ষমতার অধীন করে রাখা হবে না। তিনিও হবেন তারই সমপর্য্যায়ের একজন কর্ত্তা এবং কর্পোরেশনের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব খর্ব করে দেওয়া হবে। কমিশনারেরা যত ইচ্ছা কথা বলুন, তবে স্ব স্ব গণ্ডীর ভিতরেই তা' করতে হবে। আর চেয়ারম্যান স্বাধীনভাবে নিজ ইচ্ছানুসারে কাজ করতে পারবে। তাঁর কাজের জন্য কর্পোরেশনের কাছে কোন কৈফিয়ত দিতে তিনি বাধ্য থাকবেন না। একটি জেনারাল্যাল কমিটি ও আর একটি সমপর্য্যায়ের ও নিরপেক্ষ কর্ত্তার পদ সৃষ্টি করে' কর্পোরেশনের ক্ষমতা আরও হ্রাস করা হবে। করদাতাদের প্রতিনিধি সংখ্যার যে আধিক্য পূর্বে ছিল তার কোন পরিবর্ত্তন করা হ'ল না। এ বিষয়টি লর্ড কার্জ্জনকে দিয়ে সম্পাদন করবার জন্যই যেন অবশিষ্ট রয়ে গেল। সিলেকট কমিটি থেকে পাশ হয়ে যাবার পর লর্ড কার্জ্জনের নির্দ্দেশে কর্পোরেশনের নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা হ্রাস করে মনোনীত সদস্যের সংখ্যার সমান করা হ'ল। কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট আগে থেকেই সরকারী কর্মচারীদের ভিতর থেকেই নিযুক্ত হতেন। ফলে কর্পোরেশনের সরকারী অংশেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থায়ীরূপ নিল। আর সঙ্গে-সঙ্গে কর্পোরেশনও সম্পূর্ণভাবে একটি সরকারী দপ্তরে পরিণত হ'ল।

লর্ড কার্জ্জনের প্রশাসনের এই স্বেচ্ছাচারী কার্য্যের প্রতিবাদস্বরূপ সমস্ত শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসহ কর্পোরেশনের আটাশ জন

কমিশনার পদত্যাগ করলেন। লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরও পদত্যাগের ভীতি প্রদর্শন করলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রয়ে গেলেন। ১৮৯৭ সালে আইনটি উত্থাপন করা হ'ল এবং ১৮৯৯ সালে তা' পাশ হবার পর ১৯০০ সালের ১লা এপ্রিল দেশের অন্যতম আইন বলে গণ্য হ'ল।

আমি সিলেকট কমিটির একজন সদস্য ছিলাম। তিনমাস ধরে দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করে' আমরা আমাদের রিপোর্ট দাখিল করলাম। প্রায় একপক্ষকাল প্রত্যহ বসে কাউনসিলে সেই রিপোর্ট ও যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল সে সব নিয়ে আলোচনা হ'ল। এসব দিনে কাউনসিল বেলা ১১টা থেকে একটানা বিকাল ৬টা পর্য্যন্ত বসত। আহারের জন্য মাঝখানে কেবল কিছুক্ষণের জন্য ছুটি থাকত। অনেক বছর যাবৎ আমি কাউনসিলের সদস্য ছিলাম। কিন্তু এরূপ পরিশ্রম আমরা আর কোনদিন করিনি। কাজ করতে করতে অনেক সময় আমার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার দিনগুলির কথা স্মরণ হ'ত। কোন কোনদিন রাত্রি একটা পর্য্যন্ত বসে আমি পরদিনের কাউনসিলের কাজের জন্য প্রস্তুত হতাম। সকাল ১১টাতেই ত' আবার কাউনসিল বসবে। এ কাজ এবং তার উত্তেজনা যখন সমাপ্ত হ'ল আমার শরীরে তার এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। আমার জ্বর, মস্তিষ্কপ্রদাহ, চৈতন্যলোপ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিল। ফলে আমি শয্যা নিলাম। এরূপ সাংঘাতিক শারীরিক অসুস্থতায় আমি জীবনে কমই ভুগেছি। ২৭শে সেপ্টেম্বর কাউনসিলে বিতর্ক শেষ হ'ল এবং বিলটি পাশ হয়ে গেল। এ দিনটি ছিল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিবস। সেদিন আমি যখন কাউনসিলে যাবার জন্য সিঁড়ি বেয়ে উঠছি সে সময় সেই মৃত্যুদিবস পালন উপলক্ষে এক সভায় যোগ দেবার জন্য এক ব্যক্তি আমার হাতে

একখানি নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে গেলেন। তা' পেয়ে বিষাদে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। এবং বিলটির শেষবারের মত বিরোধিতা করে আমি বললাম :

"আজ সকালে আমি যখন এই কাউনসিলে আসছিলাম, তখন আমার হাতে একখানি চিঠি এল। আমাকে তা' স্মরণ করিয়ে দিল যে, আজ রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিবস। বোধহয় এটি যথার্থই ঠিক ও মানান সই হয়েছে। কারণ যে দিনটিতে এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙালীর মৃত্যু দিবস পালিত হচ্ছে সে দিনটিতেই যে নগরে তিনি বাস করতেন, যে নগরকে তিনি ভাল বাসতেন, সে নগরের স্বায়ত্তশাসনের বিলোপসাধন হচ্ছে। আর এজন্যই হয়ত আমাদের উত্তরপুরুষদের নিকট এদিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে"।

এ বিষয়টি শেষ করবার পূর্ব্বে, সিভিল সার্ভিসের একজন বিশিষ্ট মেম্বার মিঃ ই. এন. বেকার (পরে স্যার এডওয়ার্ড বেকার) সম্পর্কে কিছু বলা আমার কর্ত্তব্য। এই বিলের ভার ছিল তাঁরই উপর। ১৮৯০ সালে তিনি যখন ২৪-পরগণা জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন থেকেই তাঁকে আমি জানতাম। আমি তখন ছিলাম উত্তরব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। আমাদের মধ্যে কিছুটা মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছিল। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। আর আধঘণ্টার মধ্যেই আমাদের সব মনোমালিন্য দূর হয়ে গেল। এরূপে তখন আমাদের দুজনের মধ্যে যে পরিচয় হয়েছিল ক্রমশ তা' ঘনিষ্ট বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এবং পরে যদিও বা কখনো কখনো কোন কোন বিষয় নিয়ে আমাদের মতের অমিল হয়েছে তথাপি আমাদের বন্ধুত্ব চিরদিনই অটুটই ছিল। আমরা একে অন্যকে যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতাম। একথা ঠিক যে, তিনি একজন যথার্থ আমলা তান্ত্রিক ছিলেন।

তবু তিনি ছিলেন একজন উদার, সহানুভূতিশীল, সদয় ও আবেগপূর্ণ ইংরেজ। জুরী নোটিফিকেশনের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। ভাইসরয়-এর একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্য হিসাবে সংস্কার আন্দোলনের তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা এবং তাই সর্বশেষে মিণ্টো মর্লে রিফরম রূপে প্রকাশ পায়। তিনি অনেক বৎসর কোলকাতা কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন। মিউনিসিপ্যাল আইন ও তার কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর সহানুভূতি ছিল আমাদের পক্ষে। এবং বিলটি একেবারেই তার মনঃপূত ছিল না। কিন্তু নির্দ্দেশ মেনে কাজ করে চাকরী চালিয়ে যাওয়া ভিন্ন তাঁর উপায় ছিল না। প্রথমে যখন বিলটি উত্থাপন করা হয়েছিল তখন মিউনিসিপ্যাল সেক্রেটারী স্যার হার্বর্ট রিজলীই তা' উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তিনি ভারত সরকারের "স্বরাষ্ট্রসচিব"-এর পদে নিযুক্ত হবার পর মিঃ বেকারের উপরই বিলের দায়িত্ব পড়ে। তিনি অবিরতই ছিলেন ন্যায়ভাবাপন্ন। তিনি যেরূপ নির্দ্দেশ পাচ্ছিলেন তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে' বিরোধী পক্ষকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতেও সচেষ্ট ছিলেন। তবে নির্দ্দিষ্ট সীমার বাইরে যাবার তাঁর ক্ষমতা ছিল না।

কাউনসিলে আমি আমার সর্বশেষ বক্তৃতা করবার পূর্বে তিনি আমার কাছে এসে আমাকে বললেন, সুরেন্দ্রনাথ সব কিছু শেষ করে' দেবেন না। অর্থাৎ আমি যেন এমন কিছু না বলে বসি যার অর্থ হবে যে, নূতন আইন অনুসারে কর্পোরেশন যখন পুনর্গঠিত হবে তখন তার সঙ্গে বা তার কোন কাজে আমি কোন সম্পর্কই রাখব না। আমি বললাম, "তা' কিছুতেই সম্ভব নয়"। আর ১৮৯৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যে দিন আটাশজন কমিশনার পদত্যাগ করেছিলেন, সেদিন থেকে আমি কর্পোরেশনের বাইরেই রয়েছি। নরেন্দ্রনাথ সেন ও নলিন বিহারী সরকার-এর মত

ব্যক্তিগণ যাতে আমি বিষয়টিকে পুনর্ব্বিবেচনা করে আমার মত পরিবর্ত্তন করি সেজন্য দু একবার বিশেষ চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু আমি আমার সঙ্কল্প পারবর্ত্তন করি নি। এবং ভাগ্য বিড়ম্বনার ফলে সেই ম্যাকেঞ্জী আইন পুনরায় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করে' সংশোধন করে' কর্পোরেশনের আইনকে গণতন্ত্রমূলক করবার ভারও আমার উপর ন্যস্ত হল।

১৮৯৩ সালে এমন এক ঘটনা ঘটেছিল যা' আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রকৃতই স্মরণযোগ্য। সে বছর ২রা জুন মিঃ হাবার্ট ইংলণ্ডে ও ভারতে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা যুগপৎ নেওয়ার সুপারিশ করে হাউস-অব-কমনস-এ এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। মিঃ দাদাভাই নওরোজী তখন পার্ল্যামেণ্টের সদস্য ছিলেন। তিনি প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন এবং প্রস্তাবটি পাশ হয়ে গেল। প্রস্তাবটি গ্রাহ্য হওয়ায় এদেশের সরকারী জগতে যেন এক বিস্ফোরণ হ'ল। অবিলম্বে ইণ্ডিয়া অফিস তা' মেনে নিতে অস্বীকার করল। সে সময় ভারত সচিব ছিলেন স্যার হেনরী ফাউলার। ইনি সেই লোক যিনি এক সময় পার্ল্যামেণ্টে বলেছিলেন যে, পার্ল্যামেণ্টের প্রত্যেক সদস্যই ভারতের জনসদস্য এবং যাঁর কথায় এদেশে প্রত্যেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে, সকলের কাজের অর্থ হল কারও কাজই নয়। তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন, এ ভোট হঠাৎ হয়েছে। এতে হাউস-অব-কমনস-এর অভিপ্রায় বা সুচিন্তিত মত প্রকাশ করে না। আর সরকারও এ মানতে বাধ্য নয়। কিন্তু ভোট হয়ে গিয়েছে। কাজেই তাকে এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ভারত সচিব বিষয়টি ভারতের কর্ত্তৃপক্ষের মতামতের জন্য অপেক্ষা করবার মনস্থ করলেন। ভারত সরকারের ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের মতামত চেয়ে পাঠালেন। মত যে কি হবে সে বিষয়ে কারও জানতে বাকী ছিল না। একমাত্র

মাদ্রাজ সরকার ব্যতীত প্রাদেশিক অন্য সমস্ত সরকার ভোটের ফলের বিরোধিতা করল। উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য মাদ্রাজ কেবল এবারেই যে খ্যাতি অর্জন করল তা' নয়। লর্ড লিটনের আমলে যখন ভারণাকুলার প্রেস আইন পাশ হয়েছিল তখনও ডিউক-অব-বার্মিংহামের অধীন মাদ্রাজ সরকার ওরূপ ব্যবস্থা অলম্বনে আপত্তি করেছিল। তার ফলে মাদ্রাজ প্রেসিডিন্সিতে সে আইন কখনো প্রয়োগ করা হয় নি।

ভোটের ফল সম্পর্কে মতামতের বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল, বঙ্গদেশে তখন স্যার য়্যাণ্টনি ম্যাকডোন্যাল অস্থায়ীভাবে লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত। স্যার চারলস্ ইলিয়ট সে সময় ছয় মাসের জন্য ছুটিতে ছিলেন। স্যার এ্যাণ্টনি ম্যাকডোন্যাল আমাকে ডেকে পাঠালেন। "বেলভেডিয়ার-এ" তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হ'ল। সেই আলোচনার সারাংশটি আমি এখানে যথাসম্ভব উদ্ধৃত করছি। লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছিল তাকে কথোপকথনের মত করে' লিখলেই বোধহয় বিষয়টি সহজে বোধগম্য হবে।

লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর :—মিঃ ব্যানার্জী, যুগপৎ পরীক্ষার জন্য আপনি এত উৎসুক কেন বলুন ত ?

মিঃ ব্যানার্জী :—তার কারণ, মনোনয়নে আর আমাদের কোন আস্থা নেই। তাছাড়া আমাদের মনে হয়, একমাত্র যুগপৎ পরীক্ষা গ্রহণের দ্বারা ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে আমরা আমাদের ন্যায়সংগত অংশের চাকরী পাব আর তাতে মহারাণীর ঘোষণায় যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তাও রক্ষা করা হবে।

লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর :—কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশন যে সুপারিশ করেছে তদনুসারে প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে তপশীলভুক্ত অনেকগুলি চাকরীর সুযোগই ত আপনার দেশীয় লোকদের জন্য করে দেওয়া হয়েছে। আর আপনারা বিলেতে গিয়েও পরীক্ষায় বসতে পারেন।

মিঃ ব্যানার্জী :—আমি আপনাকে আবার বলছি সরকারী মনোনয়ন আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারবে না, আর আমরাও তাতে সন্তুষ্ট হব না। ১৮৭০ সালের যে ষ্ট্যাট্যুট আছে তাতে বলা হয়েছিল, মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়দিগকে সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত করা হবে এবং সে উদ্দেশ্যে নিয়মাবলী রচিত হবে। অথচ সে সব নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে করতে ছ'বছর কেটে গেল। এমন কি, তারপরও আপনারা সে আইনকে কার্য্যকরী করেছেন শামুকের গতিতে।

লেফটেন্যাট গভর্ণর: কিন্তু কি বিলেতে কি এখানে আপনাদের শক্তি অনেক বেড়েছে। ভারতের জনমতকে আপনারা সংগঠিত করেছেন। আর আপনাদের স্বার্থ দেখাবার জন্য লণ্ডনে ত আপনাদের বৃটিশ কমিটিই রয়েছে।

মিঃ ব্যানার্জী :—তাতে কি? এত সত্বেও ত দেখছি ভারতের মতামত এতই দুর্ব্বল যে, তা সরকারের কাণেই যায় না। আমাদের অধিকার নির্ভর করে আমাদের ধৈর্য্যের উপর। আর আপনাদের বিশেষ সুবিধা—সে ত আপনাদের করুণা, আপনাদের অনুগ্রহ।

আমাদের এই বাক্যালাপ হয়েছিল ১৮৯৩ সালে। পরে ১৯০৯ সালে আমি যখন লণ্ডনে যাই এবং লর্ড ম্যাকডোন্যালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তখন আমার মনে হ'ল তিনি কিয়ৎ পরিমাণে তাঁর মত পরিবর্ত্তন করেছেন এবং যুগপৎ পরীক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতী হয়েছেন। অবশ্য এই পার্থক্যটি এসেছিল কার্জ্জন-উইলী হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পরে। তখন তাঁর ধারণা হয়েছিল এই যে, ভারতীয় ছাত্রদিগকে ক্রমাগত ইংলণ্ডে আসতে দেওয়াটা উচিত হবে না। আইন ব্যবসার জন্য 'বার-এ কল' হওয়ার পরীক্ষা এবং ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা এ দুটিই ভারতে ও ইংলণ্ডে যুগপৎ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারতীয় জাতীয় মহাসভা, ১৮৯৪—১৮৯৬

১৮৯৪ সালে মাদ্রাজে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস) অধিবেশন বসল। বঙ্গদেশ থেকে সমস্ত প্রতিনিধি একসঙ্গে একখানি জাহাজ ভাড়া করে' যাত্রা করলাম। জাহাজে করে' সকলের একসঙ্গে যাওয়াটি বিশেষ সুফলপ্রসূ হয়েছিল। কারণ সমস্ত প্রতিনিধি বেশ কিছুদিন একসঙ্গে থাকবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এসে সবারই একই প্রকার জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারার সহায়তা হওয়া ছাড়াও নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন জনহিতকর প্রশ্নাদির আলোচনার অনেক সুবিধাও হয়েছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে এভাবে অগ্রসর হ'লে বহুক্ষেত্রে কোন উত্তেজনার সৃষ্টি না করেও অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়।

জাহাজে থাকতে আমরা আমাদের প্রাদেশিক কনফারেন্সগুলির অধিবেশন করার সম্পর্কে খুব এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে এলাম। প্রাদেশিক কনফারেন্সগুলি বস্তুত কংগ্রেসেরই উপাঙ্গস্বরূপ। এরূপ এক কনফারেন্স-এ সভাপতিত্ব করবার সময় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল বলেছিলেন, যেমন শাখানদীসমূহ প্রধান নদীর মধ্যে প্রবাহিত হ'য়ে তার জলধারাকে স্ফীত করে তোলে, তেমনি এই কনফারেন্সগুলি কংগ্রেস আন্দোলনকে উচ্ছ্বসিত করে। এ যাবৎ আমাদের প্রাদেশিক কনফারেন্স-এর অধিবেশন হ'ত কোলকাতায়, কিন্তু তার গতি ছিল মন্থর। আর তার আয়তন বা শক্তিও বৃদ্ধি হ'তে দেখা যায় নি। আমরা এ অবস্থার একথা পরিবর্তন করতে মনস্থ করলাম। আমরা সঙ্কল্প করলাম প্রাদেশিক কনফারেন্সগুলি এক এক বছর মফস্বল সহরগুলির এক এক সহরে করাই উচিত হবে। আমরা স্থির করলাম

কংগ্রেসের ন্যায় এগুলিকেও ইতস্তত চলমান করা দরকার। বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধি হিসাবে জাহাজে ছিলেন। ১৮৯৫ সালের কনফারেন্স-এর অধিবেশন বহরমপুরে করবার জন্য তিনি আহ্বান জানালেন। এই পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে সেই আন্দোলনে এক নূতন উৎসাহের সঞ্চার হ'ল। আর ১৮৯৫ সালে প্রথম মফস্বল সহরের যে অধিবেশন বহরমপুরে বসেছিল তা বাস্তবিকই অত্যন্ত সফল হয়েছিল। তারপর থেকে এ ব্যবস্থার পুনর্ঘটন ক্রমাগত অধিক সাফল্যের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে করা হয়েছে। এই স্মৃতিচারণের প্রথমদিকে বলেছি সংখ্যা ও উৎসাহের দিক থেকে এই কনফারেন্স সমূহ বিরাট কংগ্রেস সমাবেশগুলিরই প্রকৃতি প্রতিফলিত করে।

পার্ল্যামেন্টের একজন আইরিশ সদস্য মিঃ ওয়েব ১৮৯৪ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সম্ভবত কংগ্রেসে তাঁর সভাপতিত্ব করাতে মিঃ ডবল্যু. সি. ব্যানার্জীর সম্মতি ছিল না। অনেকের ন্যায় তাঁরও অভিমত ছিল, বিশেষ কোন কারণ ভিন্ন ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে একজন ভারতীয়েরই সভাপতি হওয়া উচিত।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে আমি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলাম। কংগ্রেসে দুটি বিষয় নিয়েই লেগে থাকা ছিল আমার নিয়ম এবং এগুলির মধ্যেই ছিল আমার সবচেয়ে বেশী উৎসাহ। যেমন, উচ্চস্তরের সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে আমাদের দেশবাসীগণকে ব্যাপকভাবে নিয়োগ এবং প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা। আমার মনে হত ভারতের সমস্ত সমস্যার মূলে ছিল এগুলি। আর তাদের সন্তোষজনক সমাধান হলেই অন্য সমস্যাগুলিরও সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের যদি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হ'ত, আর্থিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হ'ত, নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী আমাদের প্রতিনিধির সাহায্যে আমাদের লোকদ্বারা প্রশাসন কার্য্য পরিচালনের

ক্ষমতা দেওয়া হ'ত, তবেই বাস্তবিক অর্থে আমাদের স্বায়ত্তশাসন লাভ হ'ত। সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের শক্তি সামর্থ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সুযোগসুবিধার অধিকারী হয়ে জগতের উন্নত জাতিসমূহের মধ্যে আমাদের ন্যায়সঙ্গত আসন লাভ করতে সমর্থ হতাম। নিজেদের জন্য শক্তি সঞ্চয় করাই আমাদের চরম উদ্দেশ্য নয়। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমাদের উপর যে কর্ম্মভার অর্পণ করেছেন, সেই মহান কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্যই আমাদের শক্তির প্রয়োজন।

মাদ্রাজে আমাকে এক ছাত্রসভায় বক্তৃতা করতে অনুরোধ করা হ'লে আমি সানন্দে তাতে সম্মত হলাম। বক্তৃতার বিষয় ছিল, "রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বা তা' নিয়ে আলোচনা করা কি ছাত্রদের পক্ষে উচিত ?" সমসাময়িক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিষয়টি নিয়ে খুব এক প্রাণবন্ত আলোচনা হয়েছিল। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও মিঃ খাপার্দেও তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁরা দুজনেই আমার বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর পরবর্ত্তী বক্তৃতাগুলি বিবেচনা করলে আমার বিরোধিতা করা মিঃ খাপার্দের পক্ষে অদ্ভুত বলেই মনে হয়। আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করে স্পষ্টভাবে বলেছিলাম, ছাত্রেরা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা ত' করবেই, উপযুক্ত ও সংযত নেতৃত্বের অধীনে থেকে রাজনীতিতে অংশও গ্রহণ করতে পারে। আমি চিরদিন এ মত পোষণ করেছি এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে। যখন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এবং প্রতিষ্ঠাবান জনসেবকেরাও আমার এ মতকে সাঙঘাতিকভাবে আক্রমণ করেছেন তখনো আমি সামান্য মাত্রও বিচলিত হইনি। আমি গর্ব্ব ও আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, যাঁরা এক সময় অন্য সুরে গাইতেন তাঁরাও এখন আমার মতই অনুসরণ করছেন। কোলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিট্যুট আরম্ভ হওয়ার পর সেখানে যোগ দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা

হয়েছিল। প্রথম বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে যে সভা হয়, সে সভার প্রথম প্রস্তাবটি রিপোর্ট গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে উত্থাপন করবার জন্য ইনিষ্টিট্যুটের সম্পাদক মিঃ উইলসন আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি তা' করতে প্রস্তুত। তবে কেবল এই শর্তে যে, ছাত্রদিগকে এই ইনিষ্টিট্যুটের মধ্যে রাজনীতি আলোচনা করতে দেওয়া হবে। বিষয়টি স্যার চারল্‌স ইলিয়টের সামনে উপস্থিত করা হ'লে তিনি তা' নিষেধ করেন। ফলে আমি ইনিষ্টিট্যুটে যোগও দিইনি, আর সেই প্রস্তাবও উত্থাপন করতে যাই নি। বাস্তবিক পক্ষে ইনিষ্টিট্যুটে কোন রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনা করতে দেওয়া হয় না। তবে মিঃ লায়ন ও মিঃ কুমিং-এর ন্যায় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণ এই ইনিষ্টিট্যুটের মঞ্চ থেকে ভারতীয় প্রশাসন স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন।

রাজনৈতিক প্রশ্নাদির আলোচনা থেকে ছাত্রগণকে বঞ্চিত করার অযৌক্তিকতা ক্রমশ অনুভূত হচ্ছে। ভাল অথবা মন্দ যে প্রকারই হোক ছাত্রেরা রাজনীতি করবেই। যদি তাদের ভাল রাজনীতি শিক্ষা না দিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনাদি করে সে পথে যেতে তাদের প্রলুব্ধ করা হয়, তবে ছাত্রসমাজের নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তাদের নিকট থেকে উদ্দেশ্যহীন অসংযম ও উৎশৃঙ্খলতা ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যাবে না বলেই ধরে নিতে হবে। অকস্‌ফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজের ইউনিয়ণগুলিতে রাজনৈতিক প্রশ্নাদি নিষিদ্ধ করা হয়নি। আলোচনা করবার জন্য দেশের রাজনৈতিক নেতাদিগকে আমন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। ভারত ইংলণ্ড নয়। কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ছাত্র-মনের কোন তারতম্য হয় না। জ্ঞানের সুনিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যকর আলোচনা পাশ্চাত্যদেশের ন্যায় প্রাচ্যদেশেও ফলপ্রসূ হতে বাধ্য।

একদিকে যেমন আমি এরূপ অভিমত পোষণ করি, অপরদিকে

তেমনি তরুণেরা যখন তাদের মতের বিরুদ্ধ মতের প্রতি ক্ষমার অযোগ্য অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে, অসংযম ও উৎশৃঙ্খলতা প্রদর্শন করে, তখন আমি তার নিন্দা করি। অনাদিকাল থেকে হিন্দুজাতি সহিষ্ণুতায় দৃঢ়বিশ্বাসী। আর শৃঙ্খলাই ছাত্রজীবনের গূঢ়সত্তা। হিন্দু ছাত্রসমাজের পক্ষে এই সুপ্রাচীন প্রথা ও বদ্ধমূল চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হওয়া আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে সাঙঘাতিক রূপে ভীতিকর। আমাদের বাড়ীতে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে নিয়মানুবর্ত্তিতার বন্ধন বহুল পরিমাণে শিথিল হয়ে গিয়েছে এবং তার পরিবর্ত্তে উৎশৃঙ্খলতাই ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি আশা করি এটি একটি স্বল্পস্থায়ী সাময়িক অবস্থা মাত্র এবং যে সকল উত্তেজনার ফলে এ অবস্থা দেখা দিয়েছে, তাদের প্রশমনের সাথে-সাথে এ অবস্থারও বিলুপ্তি ঘটবে।

বৃটিশ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর "রেওয়া" জাহাজে আমরা মাদ্রাজ থেকে বাড়ী ফিরে এলাম। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের বন্ধুবর মিঃ বি. এল. গুপ্ত, মিঃ ঘোষ ও মিস্ মূলার আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। মিস্ মূলার একজন ভারতীয় ছাত্রকে পোষ্য নিয়েছিলেন। 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদও আমাদের দলের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু জাহাজের ইউরোপীয় যাত্রীদের মধ্যে তাসের খেলা ও ভোজবাজি দেখিয়ে প্রমোদ করতেন। বহুগুণে গুণী বিশারদ এবিদ্যাতেও ছিলেন পারদর্শী। তাঁর স্বভাব ছিল অতিশয় অমায়িক। তাঁর বাংলা লেখা ছিল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। তা ছাড়া তিনি সুন্দর কবিতা লিখতেন এবং মনোরম করুণরসাত্মক সঙ্গীত রচনা করতে পারতেন। আমাদের স্বদেশী সভাগুলিতে যখন তাঁর গান গাওয়া হ'ত তখন শ্রোতাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। কাব্যবিশারদ ও তাঁর রচনাদি নিয়ে আমি পরে আরও বিশদভাবে আলোচনা করব। কংগ্রেস সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য আমার সহযাত্রীগণ আমাকে

বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন। আমার ভারতীয় বন্ধুগণও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমি আনন্দের সঙ্গে তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করলাম। একটি সেলুনে বসে' প্রায় আধঘণ্টা কাল আমি বক্তৃতা করলাম। যাত্রীদের ভীড় জমে গেল। জাহাজের ক্যাপটেন হেনসাড´ সভাপতিত্ব করলেন। ইংরেজ ছাড়াও জাহাজে বহু অন্যান্য যাত্রী ছিলেন। উপসংহারে তাঁদের কাছে এক আন্তরিক আবেদন জানিয়ে আমি বলেছিলাম,—

"এখানে যাঁরা ইংরেজ ন'ন তাঁদের কাছেও আমি আবেদন জানাচ্ছি। যে কার্য্যে আমরা ব্যাপৃত রয়েছি, আমি বিশ্বাস করি সে কার্য্যে তাঁরাও আপনাদের সহায়ক হবেন। কারণ, সভ্য জগতের মানবের সঙ্গে তাঁরাও কি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ন'ন? আমি দাবী করতে পারি যে, কংগ্রেসের কাজ কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তার উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক এবং আরও গভীর। মানবের মুক্তি, মানব সভ্যতার অগ্রগতিই তার কাম্য। গঙ্গাতীরবর্ত্তী এই মহান জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংবাদে সমগ্র বিশ্ব উল্লসিত হয়ে তাকে সানন্দে সাদরে অভ্যর্থনা করবে।"

১৮৯৫ সালে আমি প্রথম বারের মত ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হলাম। পশ্চিমী প্রেসিডেন্সীর এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিককেন্দ্র দাক্ষিণাত্যের রাজধানী পুণা সহরে সেবার কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। নভেম্বর মাসের প্রথমের দিকে মিঃ মহাদেও গোবিন্দ রাণাডে আমাকে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব অর্পণ করে একখানি তারবার্ত্তা পাঠালেন। আমি ধন্যবাদের সঙ্গে তাঁর দান গ্রহণ করে সেদিনই উত্তর পাঠালাম। এ সম্মানের জন্য তখন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া বা সমর্থন লাভের জন্য দরজায়-দরজায় ঘুরে বেড়াবার প্রচলন ছিল না। অভ্যর্থনা সমিতি সভাপতি নির্ব্বাচিত করত এবং অন্যেরা তাই নির্ব্বিবাদে মেনে নিত।

যতদূর স্মরণ হয়, ১৯০৬ সালেই সর্বপ্রথম এই সভাপতিত্বের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। আর তার চরম পরিণতি দেখা দেয় পরের বৎসরে সুরাট কংগ্রেসে। তখন কংগ্রেসের মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার ভাব দেখা দিল। বঙ্গদেশ বিভক্ত হবার পর বৈধউপায়ে সংগ্রামের আপাত নিষ্ফলতা নিয়ে ঠিক ঐ একই সময়েই কংগ্রেসের মধ্যেও সাঙঘাতিক মতভেদ দেখা দিয়েছিল।

পশ্চিমী প্রেসিডেন্সীতে সমস্ত গণআন্দোলনের পেছনে শক্তি যোগাতেন মিঃ রাণাডে। তিনি ছিলেন একজন সরকারী কর্ম্মচারী, সরকারের প্রতি অনুরক্ত। তাঁর অনুরাগের মধ্যে কোন খাদ ছিল না। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা ছিল না বা ঐ অনুরাগ কোন আকস্মিক প্রবণতা প্রসূত ছিল না। সরকারের প্রতি তাঁর অনুরাগের মূলে ছিল জনসাধারণের পশ্চমী প্রেসিডেন্সীতে জনসাধারণের সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের তিনি ছিলেন বন্ধু, গুরু এবং পথপ্রদর্শক। ধর্ম্মনৈতিক বা সমাজনৈতিক যে কোন প্রকার গণআন্দোলনেই তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছাপ পরিলক্ষিত হ'ত। আমার জনসেবামূলক কর্মজীবনের প্রারম্ভেই আমি তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলাম। সিভিল সাভিসের প্রশ্ন নিয়ে আমি ১৮৭৭ সালে যখন পুণায় গিয়েছিলাম তখন আমি তাঁর অতিথি হয়েছিলাম। তাঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতা, তাঁর আন্তরিক দেশপ্রেম, তাঁর গৃহের সরল ও অনাড়ম্বর পরিবেশ, তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের মাধুর্য্য ও মহত্ব দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

সভাপতিত্ব গ্রহণ করার পর আমি সভাপতির অভিভাষণ প্রস্তুতির কাজ আরম্ভ করলাম। এ ছিল এক বিরাট কাজ। দুবার আমি কংগ্রেসের সভাপতি হবার সম্মানলাভ করি। দুবারেই অভিভাষণ প্রস্তুতির কাজটি আমার নিকট অত্যন্ত কঠিনবোধ হয়েছিল। আমাকে কলেজে অধ্যাপনার কাজ করতে হ'ত।

'বেঙ্গলী' পত্রিকাখানি পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল আমার এবং কোলকাতা কর্পোরেশনের সদস্য হিসাবে মিউনিসিপ্যাল কাজও দেখা শুনা করতে হ'ত। এ পরিস্থিতিতে আমি একটি সহজ পন্থা অবলম্বন করলাম। প্রতিদিন বেলা দুটো নাগাদ আমি ব্যারাকপুরে আমার বাড়ী চলে যেতাম এবং আমার ভাষণ লিখতে আরম্ভ করতাম। আমার কাজে বাধা দিয়ে আমার কর্ম্মতালিকা থেকে আমাকে বিচ্যুত করতে আমি কোন ব্যক্তিকেই সুযোগ দিতাম না। কোন ব্যক্তি এলে আমি সোজাসুজি "না" বলে দিতাম। কেবল একবার তার ব্যতিক্রম হয়েছিল। আমার মনে পড়ে একদিন যখন আমি এ কাজে ব্যস্ত ছিলাম বন্ধুবর আশুতোষ বিশ্বাস আমার ব্যারাকপুরের বাড়ীতে এলেন। জনৈক ভদ্রলোক কোলকাতা কর্পোরেশনের ভাইসচেয়ারম্যান পদের জন্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, আশুতোষ এসেছিলেন তাঁর হয়ে আমার নিকট ভোট প্রার্থনা করতে। আশুতোষ বিশ্বাসকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। বললাম, আমি দশ মিনিট মাত্র সময় তা'কে দিতে পারি। অবশ্য পাঁচ মিনিটের বেশী সময় তাঁর লাগল না।

দিনের পর দিন দৈনিক দুঘণ্টা করে' একলা আমার ঘরে বসে আমি এ কাজে নিবিষ্ট থাকতাম। আমার ছেলের অসুখের দরুণ আমার সহধর্ম্মিনী থাকতেন তখন এলাহাবাদে। আমার বক্তৃতা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলল। বোধহয় এত দীর্ঘ বক্তৃতা কংগ্রেসের কম সভাপতিই দিয়েছেন। দুঘণ্টা ধরে বক্তৃতা প্রস্তুত করার পর আমি প্রত্যহ নিয়ম মত নদীর ধারে স্বাস্থ্য ভ্রমণে যেতাম। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ভ্রমণ করতাম এবং সে সময় আমার বক্তৃতার লেখা অংশগুলি পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করে, পুনরুক্তি করে মনে মনে সংশোধন করে' নিতাম। আর বাড়ী ফিরে আমার খসড়াতে তদনুযায়ী সংশোধন করে রাখতাম। আমি অবিরাম যথাসাধ্য একাগ্রচিত্ত হয়ে

ছয় সপ্তাহ ধরে' এ কাজ করে চললাম। যখন বক্তৃতা দিতে গেলাম তখন কেবল মাত্র দীর্ঘরাশি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভিন্ন সমস্ত বক্তৃতাটিই কোন কাগজ পত্র না দেখে একটানা মুখস্থ বলে গেলাম। আমি চার ঘণ্টার উপর বক্তৃতা করেছিলাম। এবং আমার মনে হয় আমার পাঁচ হাজারের অধিক শ্রোতাকে অক্লান্তভাবে তন্ময় করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয় কোন্ যাদুবলে আমি কোন কাগজ-পত্রের সাহায্য না নিয়েই এত দীর্ঘ বক্তৃতা করতে সক্ষম হতাম। এমন কি, আমার মনে যে সমস্ত উদ্ধৃতির কথা উদয় হয় তা' পর্য্যন্ত অবিকল বলে যেতে পারতাম। এর কি গোপন রহস্য বা মন্ত্র তা' প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বক্তা নিজেও তা' জানে না। অনেকটাই নির্ভর করে তার বাক্য রচনা ও তার গঠন ভঙ্গীর উপর। রচনা ভঙ্গী ও গঠন প্রণালী যদি স্বাভাবিক যৌক্তিক ও পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা'তে মনে রাখার পক্ষে অনেক পরিমাণে সুবিধা হয়। বাক্যের মধ্যে যদি ছন্দ থাকে তার তাল স্মৃতিতে বসে যায়। মনে দাগ কাটে। লর্ড সেলিসবেরি বলতেন, তিনি যখন তাঁর বক্তৃতা প্রস্তুত করতেন তখন তাঁর সব চেয়ে সুন্দর সুন্দর কথাগুলি আপনা থেকেই তাঁর মনের মধ্যে এসে তাঁকে উদ্দীপিত করে তুলত। আমার মনে হয়, যাঁরাই জনসমাবেশে ভাষণ দেন তাঁদের সকলের ক্ষেত্রেই কথাগুলি সমভাবে প্রযোজ্য। মোটের উপর প্রস্তুতটাই হল আসল এবং বাস্তবিক পক্ষে এটিরই বিশেষ প্রয়োজন। কারলাইল সত্যই বলেছেন, পরিশ্রম করবার মত অসীম ক্ষমতাই বাস্তবিক প্রতিভা। জন ব্রাইট বলতেন, যত্নের সঙ্গে যে-বক্তৃতা প্রস্তুত করা হয় না সে বক্তৃতা শ্রবন করা অনর্থক। এই বাগ্মীপ্রবর যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রস্তুত করতে ব্যাপৃত থাকতেন, তিনি ক্যাবিনেট মিটিংএও উপস্থিত হতেন না। এই

অবিরাম প্রস্তুতির ফলেই বিনা প্রস্তুতিতেও অনেক সময় বিতর্ক ইত্যাদিতে অংশ নেওয়া সহজ হয়। শব্দসম্ভার আয়ত্ত করা, সামর্থ্যকে অবিলম্বে প্রয়োগ করা, এক কথায় একজন সফল বিতার্কিক হ'তে হলে যে সকল গুণ থাকার একান্ত প্রয়োজন, প্রস্তুতির অভ্যাস থেকেই সে সব অর্জ্জন করা যায়। কৃতী বিতার্কিক মাত্রেই সফল বাগ্মী নয়। বুদ্ধির প্রখরতা অপেক্ষা নীতিগত যোগ্যতাই বাগ্মীর বৈশিষ্ট্য। মহৎ চিন্তাধারার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা যে আবেগ ও প্রবণতা সৃষ্টি করে থাকেন, তার মধ্যেই থাকে তাঁদের বক্তৃতার মোহিনী-শক্তি ও বিশিষ্টতা।

যে নিজের দেশকে মন প্রাণ দিয়ে ভাল বাসে না তার পক্ষে বাগ্মী হবার আশা না করাই উচিত। যে ব্যক্তি বাগ্মী হ'তে অভিলাষী তার পক্ষে তার দেশই মুখ্য, অন্য সবই গৌণ। দেশ-প্রেমের পবিত্র হোমানলে যে ব্যক্তি দীক্ষিত হয় নি, সে যত বড় বুদ্ধিসম্পন্ন হোক না কেন, বাগ্মী হবার যোগ্যতা তার নেই। প্রখর বুদ্ধি থাকলে সচ্ছন্দ বিতার্কিক হওয়া যেতে পারে, নিজের বক্তব্যটি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা আয়ত্ত হতে পারে, আকর্ষণীয় বক্তা হওয়া যেতে পারে, শ্রোতাদিগকে সে হাসাতে পারে, খুশী করতে পারে, এমন কি, প্রয়োজন হ'লে শিক্ষাও দিতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মের প্রবণতা বা দেশ প্রেমের গভীরতা যার নেই মানুষের মন টলাবার মত, তাদের মধ্যে আবেগ সৃষ্টি করবার মত, উচ্চ আদর্শের অনুরক্ত হয়ে সচ্চীদানন্দের উপাসনা করবার আকুলতা সৃষ্টি করাবার মত ক্ষমতা তার পক্ষে অর্জ্জন কোন দিনই সম্ভব নয়। সুতরাং নৈতিক সম্বলই বাগ্মীর প্রধান সম্পদ। দেশের বা ভগবানের সেবায় যাঁরা আত্মনিবেদন করেছেন, যাঁরা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচারকার্য্য চালিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন, যাঁরা আদর্শকে সফল করবার উদ্দেশ্যে কার্য্য করেছেন, ত্যাগ এবং

কষ্ট স্বীকার করেছেন, মানব-সমাজের সে সকল মহাপুরুষের অবিরাম সংসর্গ বাগ্মীদের পক্ষে যেরূপ সহায়ক হয় অন্য কিছু সেরূপ হয় না।

জনসাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা করবার কৌশল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বহু বছর পূর্ব্বে তরুণদের এক সভায় আমি বলেছিলাম, "দেবতাদের নিঃশ্বাসে পবিত্রকরা সুউচ্চ পরিবেশে তোমাদের বাস করতে হবে। বার্ক, ম্যাজিনী, যিশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ, চৈতন্য, রামমোহন রায়, কেশব-চন্দ্র সেন প্রভৃতি মহাপুরুষকে করতে হবে তোমাদের নিত্য সহচর। সুললিত বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের ধ্বনির সঙ্গে তোমাদের আত্মার সংযোগ সাধন করতে হবে।" যা' সত্য, যা' সর্ব্বোৎকৃষ্ট, একজন বাগ্মির নৈতিক চরিত্র গঠনে তা' একান্ত প্রয়োজন। যে পরিমানেই হোক না কেন, তাকে তা' পেতেই হবে। আর একবার যদি তা' পাওয়া যায়, তখন শব্দরাশি হৃদয়ের উৎস থেকে কলকল করে বেরিয়ে আসবে। তার বুদ্ধিগত সম্বলের গুরুত্ব থাকলেও তার প্রয়োজন অপ্রধান—নৈতিক সম্বলই প্রধান।

বুদ্ধিগত যোগ্যতার মধ্যে একমাত্র একাগ্রতার ক্ষমতাকেই আমি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। এই ক্ষমতাটি গ্ল্যাডষ্টোনের কাছে প্রচুর পরিমানে ছিল। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তার প্রয়োজন আছে। যে বাগ্মী সর্ব্বক্ষণ আপন চিন্তাধারার মধ্যে বাস করে' তাকে হৃদয়গ্রাহী করে' উপস্থিত করবার উপযুক্ত করে' সজ্জিত করতে পারে তার কাছে একাগ্রতা বিশেষভাবেই মূল্যবান। সারা জীবন আমি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এ বিষয়টি অভ্যাস করেছি এবং আমার সকল কাজেই তা' থেকে যথেষ্ট উপকারও পেয়েছি। আমার বয়স যখন এগার বছর তখন আমি একবার আমাদের পৈতৃক বাড়ী ব্যারাকপুরের নিকটস্থ মনিরামপুর থেকে নৌকা যোগে কোলকাতায় আসছিলাম। আমার বাবা, দাদা, আমার খুড়তুত ভাই স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ব্যানার্জী, ব্যারিষ্টার এট-ল,

এবং আরও দু' একজন লোক সেই নৌকাতে ছিলেন। সকলেই খুব হৈ-চৈ করে গল্পগুজব করছিলেন। আমার ক্লাসের জন্য আমার পড়া প্রস্তুত করা প্রয়োজন ছিল। বার ছত্রের একখানা কবিতা মুখস্থ করতে হবে। অন্যেরা কি বলছে সে দিকে মনোযোগ না দিয়ে আমি নৌকার এক কোণায় গিয়ে বসলাম এবং যতক্ষণে আমরা কোলকাতা পৌঁছালাম ততক্ষণে আমি কবিতাটিও কণ্ঠস্থ করে ফেললাম। অভ্যাসে সমস্ত কর্ম্মশক্তিই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আজকাল আমি যখন কাজ করি তখন আমি তার মধ্যে ডুবে যাই। নেহাৎ আমার সঙ্গে এসে কথা না বললে কোথায় কি হচ্ছে আমি তা' জানতেই পারি না।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করি, যা কেবল মাত্র আমি আর আমার পরিবারের জন কয়েক ব্যক্তি ছাড়া আর কারও জানা নেই। মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার মৃত্যুর পর, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু কর্পোরেশনের তখনকার চেয়ারম্যান মিঃ গ্রিয়ারের মাধ্যমে লর্ড কার্জ্জন টাউন হলে এক স্মৃতিসভায় অংশ গ্রহণ করবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। ভাইসরয় স্বয়ং সে সভায় সভাপতি হবেন। আমার প্রস্তাব আমাকেই নির্ব্বাচন করতে অনুমতি দিলেন। আমি যতগুলি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেছি তাদের অন্যতম এই বক্তৃতাটি প্রস্তুত করতে আমার প্রায় দেড় ঘণ্টা লেগেছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় আমি ষোল ফুট লম্বা বার ফুট চওড়া একখানা ঘরের এক কোনে একখানি টেবিল নিয়ে বসলাম, ঘরের অন্যদিকে আমার ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে ঘর তোলপাড় করতে লাগল। কিন্তু তাদের হট্টগোলে আমার কাজের কোন অসুবিধা হল না। তাদের হৈ চৈ আমার কানেই গেল না। আমার বক্তৃতা প্রস্তুতির কাজ যখন শেষ হল, আমিও গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম।

আমি কলেজে আমার ছাত্রদিগকে ইংরেজী পড়াতাম। আমার এই অধ্যাপনার কাজ আমার প্রকাশ্য বক্তৃতার পক্ষে বিশেষ সহায়ক ছিল।

বার্ক, ফ্রাউড, লর্ড মর্লে ও অন্যদের লেখা ও বক্তৃতা প্রভৃতি আমার পড়াবার বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ভাবে আমি সর্ব্বক্ষণ ইংরেজী ভাষার বিশারদদের সংসর্গ থেকে তাঁদের শব্দ সম্ভার, তাঁদের চিন্তাধারা ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেতাম। এবং বলতে পারি যে, সকলের চেয়ে এডমাণ্ড বার্ক-এর নিকটেই আমি এ বিষয়ে অধিক ঋণী। কারণ, সমাজ ও সরকার সম্পর্কিত বিষয়ে আমার মতামত প্রধানত তাঁরই রাজনৈতিক দর্শনের ছাঁচে তৈরী হয়েছে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি আশ্চর্যজনক কাজ করেছিল বার্ক-এর লেখাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান নিষিদ্ধ করে দিয়ে। অবশ্য এই নিষেধ এখন আংশিক ভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে। বোধ হয় কারও কারও মনে এই ধারণা ছিল যে, বার্ক বিদ্রোহাত্মক উপদেশাবলী শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় একজন কৌশুলী স্পষ্ট ভাবে বার্কের "রিফ্লেকশন অন দি ফ্রেঞ্চ রিভল্যুশন" পুস্তকের উল্লেখ সে ভাবেই করেছিলেন। তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে, বাস্তবিক পক্ষে গ্রন্থখানি সমস্ত প্রকার বিদ্রোহের বিরুদ্ধে এক অতিশয় শক্তিশালী ও সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মাত্র।

পুণা কংগ্রেসে যাবার পথে আমি একদিনের জন্য এলাহাবাদে আমার জামাতা কর্ণেল মুখার্জীর বাড়ীতে কাটিয়ে গেলাম। তার উপর তখন এক ইণ্ডিয়ান রেজিমেণ্টের চিকিৎসার ভার ছিল। "এ ডাইং রেশ" (একটি ক্ষীয়মান জাতি) নামক এক গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবেও সে এখন বেশ খ্যাতি লাভ করেছে। কংগ্রেসের পুণা অধিবেশনের জন্য আমি যে সভাপতির ভাষণ প্রস্তুত করেছিলাম তার উপসংহারটুকু আমি তাকে শুনিয়ে দিলাম। সে শুনে বলল, "এ বক্তৃতা ত আজ বিশ বছর ধরে তৈরী হচ্ছে"। শুনে আমার মনে হয়েছিল কথাটির মধ্যে এক চালাকী ছিল। আর সব ক্ষেত্রেই ত এই একই কথা বলা চলে। কারণ তার অর্থ ছিল, বক্তৃতাটি প্রস্তুত

করতে আমি প্রকৃতপক্ষে যা সময় নিয়েছিলাম, আমার এই আয়াসসাধ্য বক্তব্যের মধ্যে তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণকালের প্রস্তুতি ও বিষয়বস্তু ছিল। পূর্ব্বপ্রস্তুতি ভিন্ন কেবল হাতের কাছে যা' পাওয়া যায় তাই নিয়ে কোন বড় কাজ করা সম্ভব নয়। প্রকৃতির রাজ্যে বা শিল্পের কার্য্যে সোজা রাস্তা বলে কিছু নেই। পূর্ব্বপ্রস্তুতি ব্যতীত যাঁদের প্রকাশ্য বক্তৃতায় সুনাম অর্জ্জন করতে দেখা যায়, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তাঁরাও অনুরূপ কোন কর্ম্মক্ষেত্রে অবিরাম কঠোর—পরিশ্রম করেন এবং তার মধ্যেই থাকে তার মূল। সেই বাগ্মীর মনের প্রকোষ্ঠে থাকে আদর্শ চিন্তারাশি ও মনোরম শব্দরাজির এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। প্রয়োজনমত তা থেকে তিনি সে সমস্ত টেনে নিয়ে সুচারু ভাবে ইচ্ছামত বাক্য রচনা করেন। সারিবদ্ধভাবে একে একে তারা বেরিয়ে আসে। আর তিনি পছন্দমত তাদের নির্ব্বাচিত করে বা পরিবর্ত্তন করে তাঁর বাণী দিয়ে থাকেন। প্রকৃতি এবং যে সমস্ত ধারণা তাঁর অন্তরে পূর্ব্ব হতেই গেঁথে রয়েছে সে সমূহ, তাঁকে জগতের অমরবৃন্দের পরিবেশে নিয়ে যায়। তাদের নিঃশ্বাসে পূত আলোবাতাসে বিচরণ করতে তারা তাঁকে সহায়তা করে। বুদ্ধিপ্রসূত শিক্ষা ও সামর্থ্য অপেক্ষা নৈতিক শিক্ষা ও সম্পদে অধিক বলীয়ান হন তিনি। তাঁর প্রেরণা আসে অন্তর থেকে। বুদ্ধি তারই অনুসরণ করে। কারলাইল বলেছেন, সমস্ত মহৎ চিন্তা অন্তর থেকেই উৎসারিত হয় এবং মনের ভিতর দিয়েই তা' মস্তিষ্ককে পরিচালিত করে। একজন বাগ্মীর ক্ষেত্রে একথা আরও বিশেষরূপে সত্য। কারণ, এক্ষেত্রে হয় অন্তরের সঙ্গে অন্তরের পরিচয়। ভাবকেন্দ্রের বন্যা শ্রোতাদের প্রতি প্রবাহিত হয়ে তাদের নিমজ্জিত করে দেয়। আবেগের উদ্দীপনায় দীপ্ত যুক্তিই ত বাস্তবিক বাগ্মিতা। আত্মার দেদীপ্যমান আলোকে উজ্জল হয়ে তা' কখনো হয় মনুষ্যত্ব, কখনো দেশপ্রেম। শব্দরাশিই এক্ষেত্রে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত প্রজ্বলিত হয়, তারাই দীপ্ত হয়ে ওঠে,

তারাই স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে, আর কেবলমাত্র তারাই আত্মাকে উদ্দীপিত করে তুলতে সমর্থ হয়। এবং অন্তর সেই স্বর্গীয় অনল নিয়েই রসনাকে স্পর্শ করে।

পুণাতে আমার ভাষণ উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। স্যার হারবার্ট রিজলী ছিলেন একজন সুলেখক। তিনি নিজেই তারযোগে আমায় জানিয়েছিলেন যে, আমার বক্তৃতার নিখুঁত সম্পাদনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। পুণা ও অন্যান্য স্থানে আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছিল কোলকাতাতেও তা' এক গভীর রেখাপাত করেছিল। একজন স্কুলের শিক্ষক, যে কেবল লোককে উত্তেজিতই করতে জানে, সে যে এক ভিন্ন প্রদেশে গিয়ে এরূপ সম্মান লাভ করবে তা' সরকারী মহলের উচ্চস্তরের দেবতাদিগকেও যেন চঞ্চল করে তুলল। যেরূপ হৃদ্যতাপূর্ণ অভ্যর্থনা আমি পেয়েছিলাম তাতে আমি নিজেও অত্যধিক অভিভূত হয়েছিলাম। আমার অভিভাষণ সাঙ্গ করবার পর কংগ্রেসের অধিবেশন প্রাঙ্গনে যে বিপুল হর্ষধ্বনি উঠেছিল সে দৃশ্য কখনো ভুলবার নয়। কংগ্রেসের কার্য্যাবলীর সম্পর্কে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। অধিবেশন শেষে আমাকে যে বক্তৃতা দিতে হবে তাও আমি প্রস্তুত করে ফেললাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, সর্ব্বত্রই যেন এক আশাতীত উৎসাহের বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে চলেছে। এরূপ এক উদ্দীপনাময় পরিস্থিতির জন্য, এমন কি, আমি নিজেও প্রস্তুত ছিলাম না। অবস্থার উৎসাহের প্রাণচাঞ্চল্য ও মর্ম্ম অনুভব করতে আমার বিলম্ব হল না। আমি অধিবেশনের জন্য যে সমস্ত বক্তৃতা প্রস্তুত করেছিলাম তা' রেখেদিলাম। আবেগের যে ভাববন্যায় অগণন শ্রোতা তখন দোলায়মান আমি নিজেও মনেপ্রাণে তার মধ্যেই ডুবে গেলাম। সেই আনন্দস্রোতের তরঙ্গ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। এখন বক্তা শ্রোতাদের মনে উৎসাহ সঞ্চার করার পরিবর্ত্তে শ্রোতারাই যেন বক্তার অন্তরে নূতন উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করতে

লাগলেন। তাঁদের ও আমার মধ্যে যেন বাস্তবিকই কোন বর্ণনাতীত তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়ে গেল। আমি সে অবস্থার মধ্যে বিনা প্রস্তুতিতেই একটি বক্তৃতা দিয়ে কার্য্য সাঙ্গ করলাম। আমি আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের মধ্য থেকে তরুণের দল মঞ্চের দিকে পাগলের মত ছুটে এসে আমার পদধূলি নিতে লাগল। মুহূর্ত্তের জন্য আমি একবার অতীতের গৌরবময় দিনগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। আমার মনে হ'তে লাগল, যে-উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এসমস্ত তরুণের পূর্ব্বপুরুষেরা বর্ত্তমানকালের বিরাট হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের সেই প্রতিভা যেন আমার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করল। আমার সে দিনের স্মৃতি আমি কোন কালেই বিস্মৃত হ'তে পারব না। এছিল আমার জীবনের এক অত্যন্ত গৌরবময় দিন।

আমি এলাহাবাদে একবার নেমে পুণা থেকে কোলকাতা ফিরে এলাম। এলাহাবাদে আমার ছেলে গুরুতররূপে অসুস্থ ছিল। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে আমার বন্ধুগণ শিয়ালদহ ষ্টেশনে হর্ষ প্রদর্শনের এক বিরাট আয়োজন করেছিল। আমি হুগলীতে গাড়ী পরিবর্ত্তন করে নৈহাটী হয়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনে এলাম। সেখানে এত ভীড় হয়েছিল যে, রাজা বাহাদুর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন এবং আমি অতি কষ্টে আমার গাড়ীতে উঠে বসতে পেরেছিলাম।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ ছিলেন আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমার বাবা ও বিনয়কৃষ্ণের বাবা মহারাজা কমলকৃষ্ণ ছিলেন সহপাঠী। তারই ফলে আমার ও তাদের পরিবারের মধ্যে এক প্রকার উত্তরাধিকার সূত্রেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিনয়কৃষ্ণ নিজে ও তাঁর ভ্রাতা মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ ছিলেন এক হিসাবে আমার রাজনৈতিক শিষ্য। প্রথম থেকেই তাঁরা ভারত সভায় যোগ দিয়ে তার কাজকর্ম্মে উৎসাহ দিতে ও আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন এবং এভাবে রাজনৈতিক কাজের

প্রতি তাঁদের আসক্তি জন্মে। মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ তাঁর বন্ধুদের মনে অনেক আশার সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু নিতান্ত অল্প বয়সে মারা যান। তাঁর বন্ধুগণ ও অন্য যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁরা সকলেই তাঁর মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল দেশের পক্ষেও এক বড় রকমের ক্ষতি; রাজা বিনয়কৃষ্ণও মাত্র কিছুদিনের ব্যবধানে তাঁর ভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। ১৮৯৭ সালের মিউনিসিপ্যাল বিল নিয়ে যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে তিনি এক প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (একাদেমী অব বেঙ্গলী লিটারেচার) তিনিই স্থাপন করেছিলেন। দাতব্য সমিতি (বেনেভোলেণ্ট সোসাইটি) বলে যে সর্ব্বজনহিতকর প্রতিষ্ঠান রয়েছে তারও স্থাপয়িত্বা ছিলেন তিনি। আমার প্রতি সর্ব্বক্ষণ তিনি ছিলেন সদয় ও স্নেহপরায়ণ। দৈনিক বেঙ্গলী নামক পত্রিকা প্রকাশে তিনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন। রিপণ কলেজের জন্য অর্থ সংগ্রহের সময় আমি তাঁর সহায়তা পেয়েছিলাম। যখনই আমার কোন প্রকারের সাহায্যের প্রয়োজন হত তিনি এগিয়ে আসতেন। সমাজে তাঁর যে স্থান ও প্রতিষ্ঠা ছিল তার ফলে সরকারের বিরোধিতা করার পক্ষে তাঁর কিছুটা অসুবিধা ছিল। সেটুকু বাদ দিলে বাঙ্গালী সমাজের পক্ষে তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। যৌবনে তাঁর মৃত্যু ছিল আমার পক্ষে ও যে-সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন তাদের পক্ষে এক সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি।

ভারতীয় জাতীয় মহাসভার ১৮৯৬ সালের অধিবেশন কোলকাতাতে হবে বলে স্থির হয়েছিল। এজন্য আমাদের সম্মুখে ছিল বিরাট কাজের বোঝা। একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হল। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র হলেন তার সভাপতি। এরূপ একজন খ্যাতিমান বিচারপতির সহযোগিতা পাওয়ার মূল্য তখন কম নয়। অবশ্য সে সময় তিনি অবসর নিয়েছিলেন। কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য তাঁকে বিশেষ

অনুরোধ করবার বা জোর করে রাজী করাবার প্রয়োজন হল না। তিনি স্পষ্ট ভাবেই আমাদের প্রতি সহানুভূতি জানালেন। যদিও, বিচারপতি রাণাডে যেভাবে করেছিলেন সেভাবে, বিচারপতির পদে আসীন থাকা কালে তিনি কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে কখনো ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হতে পারেন নি অথবা তার কোন সভাসমিতিতে কোন অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র একটি আকর্ষণীয় ভাষণ দিয়েছিলেন। সংক্ষিপ্তভাবে তাঁকে কিছু তথ্যাদি দিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। আমি সানন্দে তা' দিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর ভাষণটি ছিল তাঁর নিজস্ব। তার প্রতি ছত্রে ছিল তাঁর মতামত ও ব্যক্তিত্বের ছাপ। তাঁর ভাষণে তিনি এক বিশেষ মূল্যবান কথা বলেছিলেন। এবং তাঁর নিকট থেকে আসার ফলে তার মূল্য অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, শিক্ষিত সমাজই দেশের বিবেক ও মস্তিষ্ককে প্রতিফলিত করে। নিরক্ষর জনগণের অন্তরের কথা একমাত্র তারাই প্রকাশ করতে পারে। এবং তাদের স্বার্থরক্ষা করাও কেবল মাত্র তাদের দ্বারাই সম্ভব। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র আরও বলেন, যদি কেউ এরূপ মনে না করে, তার অর্থ হবে একথা স্বীকার করা যে, জনসাধারণের কি প্রয়োজন সে কথা তাদের দেশের একজন শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিদেশীয় প্রশাসনিক সরকারী কর্ম্মচারী অধিক জানেন। তৎপর তিনি বলেন, একথা এক চিরকালীন সত্য যে, "যারা চিন্তাশীল ব্যক্তি তারাই যারা শ্রম করে তাদের শাসন করবে"। তিনি প্রশ্ন করেন, "এই দুর্ভাগা দেশেই কি সে রীতি বিপরীত হয়ে গেছে"? এ দাবী আজ কার্য্যতঃ গ্রাহ্য হয়েছে। সুতরাং তাকে সমর্থন করা হবে কথার অপব্যয় মাত্র। কিন্তু সে যুগে বিষয়টি এত সহজ ছিল না। এ নিয়ে তখন অনেক মতবিরোধ ছিল। এ কারণেই স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের ন্যায় একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি দ্বারা জোরের সঙ্গে একথা ব্যক্ত করার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল এবং

তাতে উপকারও হয়েছিল। কেন না একথা কারও অবিদিত ছিল না যে, এমন কি জনস্বার্থ রক্ষার জন্যও তার মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না।

আজ কাল যে অসুবিধা হয় তা' কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। ভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকে নিজস্ব মতের প্রতি আগ্রহের আতিশয্যে নিজের মতকে দেশের মত এবং নিজের কণ্ঠস্বরকেই জনগণের কম্বুনিনাদ বলে ভুল করে থাকেন। যখনই তাঁরা দেশের জন্য কথা বলেন মনে হয়, তখন কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁরা নিজের জন্য ব্যতীত অন্য কারও জন্য বলেন না।

১৮৯৬ সালে কংগ্রেস আন্দোলনের মধ্যে আরও একটু উন্নতি লক্ষ্য করা গেল। কোন ঘটনা উপস্থিত হবার পূর্ব্বেই তার ছায়া দেখা যায়। অনতিকালের মধ্যে যে স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বিরাট এক শিল্প বিপ্লব আত্মপ্রকাশের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কংগ্রেসের নূতন এক পথচ্যুতি জানাল তারই আগমন বার্ত্তা। আর মিঃ জে. চৌধুরীর দূরদৃষ্টি ও সাংগঠনিক শক্তির কাছে কংগ্রেস সেজন্য ঋণী। মিঃ জে. চৌধুরীকে বঙ্গদেশের শিল্প আন্দোলনের অগ্রদূত বলা যায়। তিনি প্রস্তাব দিলেন কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় একটি শিল্প প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হোক। আমি তাঁর প্রস্তাবটি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলাম। প্রস্তাবটি কিঞ্চিৎ বিলম্বে আসা সত্ত্বেও আমরা তাকে কার্য্যে রূপায়িত করার সঙ্কল্প করলাম। এবং আমাদের যথাশক্তি সামর্থ্য সহায়তা দিয়ে তা' করতে লাগলাম। সরকারের কাছে এজন্য সাহায্যের আবেদন করলাম। প্রদর্শনী উদ্বোধন করবার জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার জন উডবারণ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলাম। আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে, এটি কেবল একটি শিল্প আন্দোলন ভিন্ন আর কিছু নয়। য়্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ উডরফ-এর মত একজন ইংরেজও এক্ষেত্রে যোগ

দিয়েছেন। এবং তিনি যদি প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন তা' হলে তাতে সরকারের দিক থেকেও একটি নৈতিক সমর্থন পাওয়া যাবে। কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি সরকার তখন এতই বিরূপ ছিলেন যে, স্যার জন উডবারণ আমার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেন না। তিনি বললেন, "মিঃ ব্যানার্জী, আপনার প্রদর্শনী বাস্তবিক পক্ষে কংগ্রেসের একটি অঙ্গ। রাজনৈতিক তীব্রতা তার মধ্যে প্রচুর। আমি বিশেষ দুঃখিত যে, আমি আপনাদের প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করতে অক্ষম।" কুচবিহারের মহারাজাই একটি সুন্দর বক্তৃতা দিয়ে উদ্বোধন কার্য্যটি সম্পন্ন করলেন।

তার দশ বছর পরে যখন কোলকাতায় আবার কংগ্রেস অধিবেশন হয়েছিল. তার অঙ্গ হিসাবে সে বার আরও বৃহৎভাবে এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড মিণ্টো সেবার প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন। ১৮৯৬ থেকে ১৯০৬ সাল এই দশ বছরের মধ্যে কংগ্রেসেরপ্রতি সরকারী কর্ম্মচারীদের মনোভাবের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছিল। ১৮৮৮ সালের আন্দোলনের প্রতি কিরূপ খোলা-খুলি ভাবে সরকার পক্ষ বিরোধিতা করেছিলেন আমরা তা লক্ষ্য করেছি। ১৮৯০ সালে কোলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে সরকারী কর্ম্মচারীদের নিষেধ করে বঙ্গীয় সরকার এক আদেশ জারী করেছিলেন। এমন কি, পরিদর্শক হিসাবেও যাতে তাঁরা যোগ না দেন সেজন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের কাছে আবেদন করবার পর তাঁদের নির্দ্দেশক্রমে বঙ্গীয় সরকার উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করেছিলেন। ১৮৯১ সালে কংগ্রেস অধিবেশন নাগপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সে সময় মধ্যপ্রদেশের চিফ. কমিশনার স্যার য়্যাণ্টনি ম্যাকডোন্যালের নিকট থেকে কংগ্রেসের প্রতি তাঁর মনোভাবের বিষয়ে জানতে চাইলেন।

স্যার য়্যান্টনি ম্যাকডোনাল ছিলেন একজন পুরোদস্তুর সরকারী কর্মচারী, কিন্তু তবুও তাঁর মধ্যে উদার মনোভাবের অভাব ছিল না। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "মশাই, কেউ যদি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেয় আমি তাকে দোষও দেব না, আর তার প্রশংসাও করতে যাব না।"

১৮৯৯ সালে যখন কংগ্রেস অধিবেশন হ'ল, সেই একই স্যার য়্যান্টনি ম্যাকডোনাল এক ভিন্ন প্রকার মনোভাব অবলম্বন করলেন। তখন তিনি যুক্ত প্রদেশের লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের পদে সমাসীন। প্লেগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন হিসাবে তিনি লক্ষ্ণৌ বা তার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কংগ্রেসের অধিবেশন হবার ব্যাপারে আপত্তি করলেন। সহর থেকে প্রায় সাত আট মাইল দূরে এক ইক্ষু ও ধান্য ক্ষেত্রের মধ্যে অধিবেশনের স্থান নির্দিষ্ট হ'ল। আর দিনের বেলায় মাছি ও রাত্রিকালে বন্য শুকরের উৎপাতে কংগ্রেসে উপস্থিত প্রতিনিধিদের দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। যে সমস্ত লোক লক্ষ্ণৌ শহর দেখতে গেলেন তাঁদের কোন আপত্তি করা হ'ল না বা তাঁদের জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থাও করা হ'ল না। গতানুগতিক সতর্কতা অবলম্বন করে তাঁদের সেখানে যাতায়াতে বা থাকা খাওয়াতে কোন বাধাও হল না। কেবল কোন এক অজ্ঞাত কারণে প্লেগ পর্য্যুদস্ত অঞ্চল থেকে কংগ্রেসে যে সমস্ত প্রতিনিধি এসেছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রেই সে ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করা হল। আমাদের ধারণা নীতিগত ও শারীরিক নিরাপত্তার জন্যই হয়ত তাঁদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা করে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে' রাখা হয়েছিল। আমি ছিলাম ব্যারাকপুরের অধিবাসী। সেখানে প্লেগের কোন চিহ্ন ছিল না। কিন্তু প্রতিনিধিদের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়জন অনেক ছিলেন। সে সমস্ত সহকর্ম্মী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সকলের থেকে পৃথক ভাবে থাকতে আমার ইচ্ছা হল না। আমিও তাঁদের মধ্যেই থেকে তাঁদের সমস্ত অভাব অসুবিধার ভাগ নেবার সঙ্কল্প করলাম।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ জ্বরে শয্যাগত হলেন। কালীচরণ ব্যানার্জী মহাশয়ের শরীর খারাপ হয়ে পড়ল। অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। একত্র একই শিবিরে থেকে এরূপ খারাপ পরিস্থিতির মধ্যেও যতটুকু ভাল থাকা যায়, সকলে তার চেষ্টা করতে লাগলাম।

এখন আর সে দিন বা অবস্থা নেই। নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই এখন লোকে জিজ্ঞাসা করে, সরকারী মতি-গতির এ পরিবর্ত্তন কি করে হল? কংগ্রেস ত তার কর্ম্মসূচীর কোন ব্যতিক্রম করে নি। সাম্প্রতিক কালে যে-পর্য্যন্ত কংগ্রেস অসহযোগ নীতি গ্রহণ না করেছে সে—পর্যন্ত কংগ্রেসের নীতি বা আদর্শের কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। কংগ্রেসের ভাষা বা চিন্তার মধ্যে কোন দিন কোন অধৈর্য্য পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় নি। আত্মসংযম ও মর্য্যাদা জ্ঞানের জন্য কংগ্রেসের তখন যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। যেমন ১৮৮৮ সালে সরকারী সমালোচকেরা সাঙ্ঘাতিক ভাবে কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছিল, তেমনি ১৯০৬ সালে ভাইসরয় প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটন করে কংগ্রেসকে সম্মানিত করেছিলেন। সর্ব্বদা কংগ্রেস ছিল জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। এবং তাদেরই প্রতিনিধিদের সাহায্যে শান্ত ভাবে ও মর্য্যাদার সঙ্গে তখন জনগণের অন্তরের অভিলাষকে উচ্চকণ্ঠে কংগ্রেস প্রচার করেছে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করছি, তা' হলে এমন কি ছিল' যার ফলে সরকারী মনোভাবে এই পরিবর্ত্তন এসেছিল? আমি অণুমাত্র ইতঃস্তত না করে একথা বলতে পারি যে, এরূপ হবার অন্যান্য কারণ ছাড়াও, লর্ড মর্লে'র দৃষ্টিভঙ্গী এবং নবভারতের দক্ষতাই সরকারী আবহাওয়াকে পরিষ্কার করে সরকারী মন থেকে সমস্ত ভুল ধারণাগুলি অপসারণে সহায়তা করেছিল। শৃঙ্খলাবোধ এবং উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মনেপ্রাণে আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবার মনোভাবের জন্য সিভিল সার্ভিসের

সুনাম আছে। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ একবার যদি কোন নির্দ্দেশ দেয় বা কোন নীতি রচনা করে কিম্বা স্পষ্ট ভাবে কোন বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করে, নিম্নতন কর্ম্মচারীরা বিনা দ্বিধাতে তা' মেনে নেয়। মন মেজাজে প্রায় অর্দ্ধসামরিক এই যে সিভিলসার্ভিস যন্ত্র, তার কার্য্যদক্ষতাও তার এই গুণের উপরেই নির্ভরশীল। সম্ভবত তার যে দুর্ব্বলতা তাও এর মধ্যেই নিহিত। ১৯০৬ সালে পার্ল্যামেণ্টে ভারতের আয়ব্যয় সম্পর্কিত বিতর্কের সময় হাউস-অব-কমনস-এর মধ্যে আপন আসন থেকে লর্ড মর্লে বলেছিলেন :

"তারপর সেখানে কংগ্রেস রয়েছে। তা' যা' চায়, আমি বলছি না যে, সে বিষয়ে আমি তার সঙ্গে একমত। কিন্তু মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, কংগ্রেসের মূলে যা' রয়েছে বলে আমার ধারণা, ভারত সরকারকে শান্ত ও স্থির ভাবে যাঁরা বিচার করেন, তাঁদের ভয় পাবার কি আছে আমি বুঝতে অক্ষম। কোন ব্যক্তিকে যদি অসন্তুষ্ট বা অখুসী দেখি সঙ্গে সঙ্গেই আমি ধরে নেব না যে, তার মধ্যে অনুরাগ বলে আর কিছু থাকবে না। যে-সকল ব্যক্তির অনুরাগ আমার বা আপনাদের অপেক্ষা কিছুমাত্র কম ছিল না, তাদেরই অসন্তোষের দ্বারাই আমাদের যত সংস্কার, যত পরিবর্ত্তন সব এসেছে।" ঠিক একই ভঙ্গীতে এবং সম্ভবত অধিকতর জোর দিয়েই তিনি কংগ্রেসের মাধ্যমে প্রকাশিত ভারতের নূতন উৎসাহ উদ্দীপনার কথাও বলেছিলেন। যে বক্তৃতা থেকে আমি উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশটি দিয়েছি, সে বক্তৃতার মধ্যেই লর্ড মর্লে বলেছিলেন, "কি সৈনিক, কি সাংবাদিক, কি ভ্রমণকারী, প্রত্যেকেই আমাদের বলে যে, ভারতে এক নূতন উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। তাই ত হবে। আপনারা কি করে অন্যরূপ আশা করতে পারেন? বছরের পর বছর আপনারা সে দেশের লোককে পাশ্চাত্য ভাবধারা পাশ্চাত্য সাহিত্যাদি শিক্ষা দিচ্ছেন। পরস্পরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের ব্যবস্থা করে

দিয়েছেন। আপনারা কি করে ভাবতে পারেন যে, যখন তাদের শিক্ষা ছিল না, যখন দেশের এক প্রান্তের সঙ্গে অন্য প্রান্তের যোগাযোগ ছিল কষ্টকর ও অতি সামান্য, তখন ভারত যে অবস্থায় ছিল এখনও সেরূপই থাকবে? কিরূপে চিন্তা করতে পারেন যে, পূর্ব্বে যেভাবে চলত আজও সেভাবেই চলবে? আমরা যদি অকপটে ও সুবিবেচকের ন্যায় এই নূতন উদ্যমশীলতার মুখোমুখি হ'তে ভীত হই, তা' হ'লে পুরুষানুক্রমে ও বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত ব্যক্তি উদারপন্থী দলের নেতৃত্ব করে গেছেন তাঁদের প্রতি এবং পার্ল্যামেন্টের ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে আমরা অপরাধী হব।"

ভারত সম্পর্কিত উচ্চতম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এরূপ যে সমস্ত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তৎসহ ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান জনমত ও কংগ্রেস নেতৃবর্গের অবিচল সংযম একত্রে ভারতের সরকারী মনমানসে যে তার গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। লর্ড হার্ডিঞ্জের সমগ্র প্রশাসন এই পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গীকে অধিকতর স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং শক্তিশালী করেছিল। কংগ্রেসের যে প্রতিনিধিমণ্ডলীকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জন অগ্রাহ্য করেছিলেন, ১৯১১ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ তাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। আর ১৯১৪ সালে লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড স্বয়ং মাদ্রাজের কংগ্রেস অধিবেশন পরিদর্শন করতেও কুণ্ঠিত হলেন না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

মেঘাবৃত দুটি বৎসর

ওয়েলবি কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল ভারতের ব্যয় সম্পর্কিত বিষয়াদির অনুসন্ধান এবং ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে রাজস্ব সংক্রান্ত সম্পর্কের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে। এ কমিশনের প্রধান ছিলেন লর্ড ওয়েলবি। আর সদস্যদের মধ্যে ছিলেন স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবারন, মিঃ ডবল্যু. এস. কেইন এবং মিঃ দাদাভাই নওরোজী। ১৮৯৭ সালে সেই কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমি আমন্ত্রণপত্র পেলাম। বঙ্গদেশ থেকে একজন ভারতীয়সাক্ষী হিসাবেই আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। ভারতের অপরাপর সাক্ষীগণ ছিলেন বোম্বাই থেকে মিঃ গোখলে ও স্যার দিনশা ওয়াচ্চা এবং মাদ্রাজ থেকে মিঃ জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার। (পরিশিষ্ট—'খ' দ্রষ্টব্য)।

আমি আমন্ত্রণ রক্ষা করার সঙ্কল্প করে সাক্ষ্য দেবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলাম। এ কাজে আমি তখন যে সব সহায়তা পেয়েছিলাম তজ্জন্য আমি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট ও তৎকালীন অর্থনৈতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী পরলোকগত স্যার হারবার্ট রিজলীর স্মৃতির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। স্যার অ্যালেকজেণ্ডার ম্যাকেঞ্জী তখন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর। রাজস্ব বিষয় নিয়ে আমাকে যেরূপ সাঙ্ঘাতিক ভাবে জেরা করা হবে তাতে আমি কতদূর টিকতে পারব সে নিয়ে স্যার অ্যালেকজেণ্ডার-এর বোধ হয় যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব স্থির করলাম। আমার মনে হয় আমি মন্দ করি নি। প্রাদেশিক রাজস্ব, প্রাদেশিক কণ্ট্রাক্ট ইত্যাদি বিষয় বিশদ ভাবে জেনে নিয়ে ও পড়াশুনা করে আমি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে নিলাম। আমার এই যত্ন ও পরিশ্রমে লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্য হিসাবেও আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছিলাম।

মে মাসের প্রথম দিকে লণ্ডনে উপস্থিত হয়ে দেখি অপরাপর বন্ধুদের জেরা শেষ হয়ে গিয়েছে। যে-বিষয়ে আমার জেরা হবে সে সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করে কমিশনের সামনে দাখিল করতে হবে। স্মারকলিপি প্রস্তুত করতে প্রায় পনর দিন সময় লাগল। কাজটি ছিল অতিশয় কঠিন ও ক্লান্তিকর। সকাল দশটায় প্রাতরাশ শেষ করে আমি কাজ নিয়ে বসতাম। উঠতাম অপরাহ্ণে পাঁচটায়। মাঝে আমার ঘরে বসে আহার করবার জন্য কিছুক্ষণের মত কাজের বিরতি থাকত। আমার ও ভারতীয় অন্য সাক্ষীদের স্মারক লিপিগুলি ভারতীয় জাতীয় মহাসভার বৃটিশ কমিটি মুদ্রিত করিয়ে কংগ্রেসের "ব্লু বুক্" হিসাবে এক পৃথক গ্রন্থ সঙ্কলন করেছে।

এ ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মিঃ দাদাভাই নওরোজী স্বয়ং কমিশনের একজন সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কমিশনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং তাঁকে জেরাও করা হয়েছিল।

সারাদিন ধরে আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল। সকাল এগারটায় আরম্ভ করে' প্রায় বিকাল চারটা পর্য্যন্ত চলেছিল। মাঝে আহারের জন্য সামান্য বিরতি ছিল। ইণ্ডিয়া কাউনসিল ও কমিশনের সদস্য স্যার লুইস পাইল্ জেরা করতে লাগলেন। ভারতের উচ্চতর অফিস সমূহে ব্যাপক ভাবে ভারতীয়দের নিয়োগ সম্পর্কে আমি যে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম তার উপরেই সাঙ্ঘাতিক জেরা করা হ'ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্ট পড়েছেন ?" উত্তর দিলাম, "খুব ভাল ভাবেই"। বোধ হয় তিনিই এবার অসুবিধায় পড়লেন। শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর পদগুলি থেকে আমার দেশীয়দের যে এক প্রকার সম্পূর্ণ ভাবেই বাদ দেওয়া হয়েছে আমি সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে প্রতিবাদ করলাম। আমার যখন সাক্ষ্য ও জেরা হচ্ছিল তখন মিঃ গোখলে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "চমৎকার সাক্ষ্য দিয়েছেন"।

আমার সাক্ষ্য দেওয়া শেষ হওয়া মাত্রই আমি এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলাম। সেখানে স্যার চারলস্ ইলিয়টের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি হৃদ্যতার সঙ্গে আমার সাথে করমর্দ্দন করে আমাকে সান্ধ্য ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। আমাদের দুজনের মধ্যে বিস্তর মতভেদ ছিল। তা' সত্বেও ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত আমাদের প্রীতির সম্পর্ক অটুট ছিল। ইম্পিরিয়্যাল প্রেস কনফারেনস্-এর সদস্য হিসাবে ১৯০৯ সালে আমি যখন বিলেত যাই তখন এক পত্রযোগে স্যার চারলস্ ইলিয়ট সন্ত্রাসবাদী অপরাধীদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করতে ও তাদের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করতে আমাকে অনুরোধ করেন। এবং তার বিনিময়ে আমাকে তাঁর আতিথ্য গ্রহণের সম্মান দেবার প্রস্তাব জানান। আমি তাঁর এই অদ্ভুত পত্রখানি আমার একাধিক বন্ধুকে ও স্যার হেনরী কটনকে দেখিয়েছিলাম। আমি পত্রখানি অগ্রাহ্য করলাম এবং তার কোন উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করলাম না। কিন্তু যখন আমি সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিলাম তখন এ মেঘ জমে নি। তখন আমরা ছিলাম অত্যন্ত বন্ধু ভাবাপন্ন এবং পরস্পরকে দেখে আনন্দিতই হয়েছিলাম।

এ সময় কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলটি লেজিসলেটিভ কাউনসিলের বিচারাধীন ছিল। এ বিষয় নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। স্যার চারলস্ ইলিয়ট স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনকে প্রীতির চোখে দেখতেন না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম ইংলণ্ডের মুক্ত বাতাসে এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্পর্শে আসার দরুণ তাঁর মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে। তিনি লণ্ডন স্কুলে বোর্ডের একজন সদস্য ছিলেন। আমায় বললেন, "ইংলণ্ডে এসে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান কি ভাবে কাজ করে দেখে আমি আপনাদের কর্পোরেশন সম্বন্ধে আজকাল যত চিন্তা করি আর কখনো সেরূপ করি নি।" কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল-এ যে সমস্ত মারাত্মক পরিবর্ত্তনের

প্রস্তাব করা হয়েছিল তাতে তাঁর সমর্থন ছিল না। তাঁর আগ্রহ ছিল এবং ক্ষমতা থাকলে তিনি নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করতেন।

আমার সাক্ষ্য দেওয়া শেষ হওয়ার পর ভারতে ফিরবার আগে আমার হাতে বিশেষ সময় ছিল না। যতটুকু ছিল আমি ভারতের সমস্যাবলী নিয়ে জনসভায় বক্তৃতা করে তা' কাটিয়ে দিলাম। স্যার হেনরী ফাউলারের নির্ব্বাচনকেন্দ্র স্যাণ্ডারল্যাণ্ড-এ আমাদের সভা খুবই সফল হয়েছিল। মিঃ দাদাভাই নওরোজী সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

ভারতের বিষয় নিয়ে স্যার হেনরী ফাউলারের সঙ্গে আমার খুব উৎসাহব্যঞ্জক আলোচনা হয়েছিল। সরকারী চাকরীতে আমাদের দেশীয় লোকদের নিয়োগ করার বিষয় নিয়েই কথা চলতে লাগল। তিনি সে সময় চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন। অকপট ভাবে আমাকে বললেন, "রাজনৈতিক কারণ বশতঃ যুগপৎ পরীক্ষা হওয়ার বিষয়ে আমাদের আপত্তি আছে।" আমি বললাম, "ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে আপনাদের ইতঃস্তত করবার কারণ হয়ত আমি বুঝতে পারি কিন্তু যেগুলি নিম্নমানের সিভিল সার্ভিস তাদের ক্ষেত্রে যুগপৎ পরীক্ষা গ্রহণে আপনাদের আপত্তির কারণ কি থাকতে পারে? সে ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে না।" এতে তাঁর কোন জবাব ছিল না। আমি সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলাম, "স্যার হেনরী, আপনি আবার যখন সেক্রেটারী অব এষ্টেট হবেন, তখন আবার এ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করবার অনুরোধ নিয়ে আমাদের প্রতিনিধিরা আসবেন। তাঁদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবেন"। তারপর হাসতে হাসতে দুজনেই পরস্পর থেকে বিদায় নিলাম।

আমার মনে হল অবশেষে সরকারী মনের গভীরে প্রবেশ করে বুঝতে পারলাম যুগপৎ পরীক্ষা নিতে এত আপত্তি কেন। একজন অকপট সত্যবাদী ইংরেজের মতই স্যার হেনরী ফাউলার অফিসের

সমস্ত গাম্ভীর্য্যমুক্ত হয়ে মন খুলে আমার সঙ্গে কথা বললেন। এই যে বলা হয় সিভিল সার্ভিসে কিছু সংখ্যক ইংরেজ না রাখলে ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রকৃতিই বদল হয়ে যাবে (যেন ভারতের লোকদিগকে পাশ্চাত্য প্রশাসনিক নীতিতে শাসনকার্য্য চালাবার জন্য শিক্ষিত করা অসম্ভব) এ সমস্ত কথা সবই অলীক আড়ম্বর মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে আসল উদ্দেশ্যকে গোপন করবার জন্য এ সমস্ত ছলনা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের দেশবাসীকে ব্যাপকভাবে সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত না করবার যে রীতি এতকাল ধরে' চলে আসছে তার প্রকৃত কারণ প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সাধন নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন।

১২ই জুন বোম্বাইতে ফিরে এসে শুনতে পেলাম বঙ্গদেশে এক সাঙ্ঘাতিক ভূকম্পনের ফলে অনেক প্রাণহানি ঘটেছে এবং ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে। ভূমিকম্প বিশেষভাবে উত্তর বঙ্গেই অত্যন্ত মারাত্মক হয়েছে। ভূমিকম্পের সময় নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেনসের অধিবেশন চলছিল। তাও বন্ধ করে দিতে হয়েছে। আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য অনেকে হাওড়াতে অপেক্ষা করছিলেন। আমি হাওড়া না এসে শ্রীরামপুরেই নেমে গেলাম। ভূমিকম্প সম্পর্কে খবরাদি শুনে আমি আমাদের পরিবারস্থ লোকজনের সংবাদের জন্য ব্যগ্র হয়েছিলাম। বিলম্ব না করে নদী পার হয়ে শ্রীরামপুর থেকে নদীর অপর পারে আমার ব্যারাকপুরের বাড়ীতে গেলাম। যখন ভূমিকম্প হয়েছিল তখন মহরমের সময় ছিল। আমার ছেয়েমেয়েরা মহরমের তামাসা দেখতে গিয়েছিল। তারা ছিল খোলা জায়গাতে। কম্পনের ধাক্কাতে গাড়ী ঘোড়া পাক খেয়ে পড়ল। আমার স্ত্রী ঘরে একা ছিলেন। তিনি ছুটে বাগানে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের ঘরে ফাটল ধরেছিল। তবে গুরুতর ক্ষতি থেকে রেহাই পেয়েছিল।

বাড়ী ফিরে জানতে পারলাম আমি যখন অনুপস্থিত ছিলাম তখন আমাকে প্রেসিডেন্সী বিভাগের জিলাবোর্ড সমূহ লেজিসলেটিভ

কাউনসিলের সদস্য নির্ব্বাচন করেছে। সে সময় কাউনসিলের নির্ব্বাচনে এত উত্তেজনা দেখা যেত না। ব্যক্তিগত ভাবে ভোট প্রার্থনার সুযোগও বিশেষ ছিল না। জিলাবোর্ড আর মিউনিসিপ্যালিটিগুলি প্রথমে প্রতিনিধিমণ্ডলী নির্ব্বাচন করত। এবং এই প্রতিনিধি মণ্ডলীই ভোট দিয়ে নির্ব্বাচন প্রার্থীদের ভিতর থেকে কাউনসিলের সদস্য নির্ব্বাচন করত। সেরা এবং সৎ লোক দেখেই প্রতিনিধিমণ্ডলী নির্ব্বাচিত হত। তার ফলে ভোটের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে জোর দেওয়া, প্রভাবিত করা বা কোন দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করার কোন প্রশ্ন তখন উঠত না।

১৮৯৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল অমরাবতীতে। অমরাবতী ছিল বিদর্ভের রাজধানী এবং আমার পূর্বোক্ত পরলোকগত বন্ধুবর মিঃ মুধোলকার-এর প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। তাঁর ন্যায় অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ দেশসেবী সহজে দেখা যায় না। প্রচুর কর্ম্মদক্ষতা ও সহজবুদ্ধির সঙ্গে তাঁর চরিত্রের নম্রতা ও অমায়িকতা মিলে তাঁকে এক অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত করেছিল। তাঁর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণের জন্য তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এবং 'বেঙ্গল' পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক টি. পি. মিত্র নামে খ্যাত তারাপ্রসন্ন মিত্র প্রমুখ বন্ধুবর্গ ছিলেন। আমার এ সমস্ত একান্ত অনুরক্ত বন্ধুগণ আমার এত প্রীতিপূর্ণ যত্ন নিচ্ছিলেন যে, তাঁদের ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রতিনিধিদের জন্য যে বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁদের সকলের সঙ্গে সেখানে আমি সুখেই ছিলাম। মিঃ সঙ্করণ নায়ারকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের জন্য প্রস্তাব করতে আমাকে অনুরোধ করা হ'ল। তারপর থেকে এ কাজটি আমাকে প্রায়ই করতে হত। আমি বললাম, আমরা এক সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে এসে দাঁড়িয়েছি। এ সময়ে মিঃ সঙ্করণ নায়ারের মত একজন লোকের পরামর্শ ও নেতৃত্বের আমাদের বিশেষ

প্রয়োজন। তখন তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের য়্যাভভোকেট হিসাবে আইনজ্ঞ সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। পরে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ভাইসরয়-এর একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্য হয়েছিলেন। তাঁর সভাপতির অভিভাষণ অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাবাপন্ন ও পৌরুষব্যঞ্জক এবং তাঁর যোগ্যই হয়েছিল। সে সময় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিল তাতে এরূপ এক অভিভাষণের বিশেষ প্রয়োজনও হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "ইংরাজী ভাষায় গোলামী করতে কোন লোককে রাজী করান সম্ভব নয়।" তাঁর মতে মানুষের অবনতি, দুর্গতি, জাতি ধর্ম্মমূলক সংঘর্ষ ইত্যাদির হাত থেকে নিস্তারের প্রকৃত উপায় হ'ল স্বাধীন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি। এবং তজ্জন্য তিনি এক শক্তিশালী আবেদন জানিয়েছিলেন।

পুণার নাথুভাইদের নির্ব্বাসন বিষয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন করবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছিল। নাথুভাইরা ছিলেন দাক্ষিণাত্যের সর্দ্দার। যে সমস্ত ঘটনার ফলে পশ্চিম ভারতে বৃটিশ শক্তি স্থাপিত হয়েছিল তাতে নাথুভাইদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এবং তাঁরা নিজেরাও ছিলেন বিদ্বান ও মহারাষ্ট্রের রাজধানীতে নেতৃস্থানীয়। কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে আমি যখন পুণায় গিয়েছিলাম তখন তাঁরা আমাকে বিশেষ সম্মান দেখিয়েছিলেন। আর আমি এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ তাঁদের আতিথেয়তা লাভ করেছিলাম। যদিও তখন কংগ্রেস আন্দোলনের মাথার উপর সরকারী সন্দেহের কালমেঘ ছিল ঘনায়মান, তবুও নির্ভয়ে এবং খোলাখুলি ভাবেই নাথুভাইয়েরা কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। প্লেগ, বলপ্রয়োগে পৃথকীকরণ, বাধ্যতামূলক গৃহে অবস্থান প্রভৃতি ঘটনার ফলে পুণার নাগরিকদের মনে এক উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। মিঃ গোখলে তখন বিলাতে ছিলেন।

তিনি সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে তা' প্রকাশ করে দেন। তখন থেকেই তাঁর দুর্গতি আরম্ভ হয়। সাংসারিক বিষয়ে বাইরের লোকের হস্তক্ষেপ এবং গৃহের পবিত্রতাকে বিনষ্ট করবার চেষ্টা আমাদের দেশের লোকেরা সহ্য করতে পারে না। সে সময় উত্তেজনার মাত্রা এমন চরমে পৌঁছেছিল যে, লেফটেন্যাণ্ট অয়ার্ষ্ট ও প্লেগ কমিটির প্রেসিডেণ্ট মিঃ রেণ্ড দুর্ভাগ্য বশত নিহত হলেন। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান জনমত প্রচার করে তাদের মধ্যে চরমপন্থী লোকেরও অভাব হয় না। তার ফলে স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা দেবার জন্য, নির্ব্বাসিত করবার জন্য ও অপরাপর চিরাচরিত নিস্পেসনের জন্য ব্যবস্থার আয়োজন করা হল।

স্থানীয় নাগরিকগণের নেতা হিসাবে নাথুভ্রাতারা সরকারের হস্তক্ষেপের জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে আবেদন করলেন। তার অনতি কাল পরেই এক অতি পুরাতন ও অপ্রচলিত রেগুলেশন (১৮১৮ সালের বেঙ্গল রেগুলেশনের ৩নং রেগুলেশনের অনুরূপ ১৮২৭ সালের বোম্বাই রেগুলেশনের ২৫ নং রেগুলেশন) প্রয়োগ করে তাঁদের নির্ব্বাসিত করে' তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিল। তাঁদের দেশবাসীর জন্য তাঁরা যে সমস্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন এ কি তারই পুরস্কার, না, কি মানুষের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য এও এক আমলাতন্ত্রী ফন্দি? যে-টিই হোক, এ ছিল অত্যন্ত অনর্থক ও নিতান্ত অনাবশ্যক। এডমাণ্ড বার্ক-এর ভাষায় বলা যায়, "এ ছিল মানুষের অমূল্য ধৈর্য্যের অপব্যয় মাত্র"। কারণ অনতিকাল পূর্ব্বেই মিঃ রেণ্ড ও লেফটেন্যাণ্ট অয়ার্ষ্ট-এর হত্যাকারীদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। তাদের বিচার হয়ে, দণ্ডাদেশ হয়ে, তাদের ফাঁসী পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেসের অধিবেশনের পাঁচমাস আগে থেকেই তাঁরা অন্তরীণ ছিলেন।

কংগ্রেসে আমাকে একটি প্রস্তাব উত্থাপনের ভার দেওয়া হয়েছিল। আমাকে নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল যে, যদিও কংগ্রেসের মতে কোন কোন পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষে বিশেষ জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রয়োজন হতে পারে, তবুও দেশে যখন শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া থাকে তখন কোন রেগুলেশনে উক্ত কোন বিশেষ জরুরী ক্ষমতার ব্যবহার নিন্দার যোগ্য—এই মর্ম্মে যেন প্রস্তাবটি করা হয়। কংগ্রেস সে-বার আরও সুপারিশ করেছিল যে, কোন প্রদেশ বা অঞ্চলে যদি কখনো জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগের উপযুক্ত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সরকার যেন বিজ্ঞপ্তির সাহায্যে জনসাধারণকে জানিয়ে দেন যে, তাঁরা প্রয়োজন বোধে রেগুলেশনে নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করবার সঙ্কল্প করেছেন। এবং একথাও বলা হয়েছিল যে, বিনা বিচারে কোন ব্যক্তিকেই কোনক্রমে তিন মাস কালের অধিক সময় অন্তরীণ করে রাখা চলবে না।

লর্ড মিণ্টোর প্রশাসনের সময় যথেচ্ছভাবে রেগুলেশনের ব্যবহার হতে লাগল। পাঞ্জাব থেকে লালা লজপত রায় এবং সর্দ্দার অজিত সিং নির্ব্বাসিত হলেন। বঙ্গদেশে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত, বাবু শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী এবং আরও অনেকের ভাগ্যে একই অবস্থা ঘটল। আমার প্রদেশের ইতিহাসের এই বিষাদময় ও হতাশাব্যঞ্জক অধ্যায় সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করব। এ সবের ফলে ১৯০৭ এবং ১৯০৮ সালে রেগুলেশনেউক্ত নির্ব্বাসন সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে সর্ব্বত্র ব্যাপক আলোচনা চলতে লাগল। জনসাধারণের কাছে যে-শাসকের কোন দায়িত্ব নেই, কোন নিকৃষ্ট আইন তার হাতে তুলে দিয়ে তার হাত যদি শক্ত করে দেওয়া হয়, তবে তার অপপ্রয়োগ এতই অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে যে, অবশেষে মানুষের মনে সাঙ্ঘাতিক অসন্তোষ দেখা দেয়। উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে যখন গভীর

ও অধিকস্থায়ী প্রতিবিধানের প্রয়োজন হয়, তখন জরুরী ক্ষমতা ইত্যাদির ব্যবহার পরিস্থির প্রতিষেধক হিসাবে সহজ ও সোজা ব্যবস্থা হলেও, তাতে যে পরিনাণ গরল উৎপন্ন হয় বহু বৎসরেও তা' নিঃশেষ হয় না।

১৮৯৮ সালের প্রথমাবধি দেশের রাজনৈতিক দিগন্তে ব্যাপক বিক্ষোভ, অশান্তি, দলননীতির ঘনঘটা দেখা দিল। দেশের উপর পড়ল প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। প্লেগরোগ নিবারণের জন্য পুণা সহরে যে সমস্ত নির্ম্মম ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'ল তাতে জনসাধারণের মনে উত্তেজনা প্রবলতর হয়ে উঠল। তারপরেই একের পর এক এল দুজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর হত্যাকাণ্ড, নাথুভ্রাতাদের নির্ব্বাসন ও পশ্চিমী প্রদেশে গোপন ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ।

এরূপ নানাবিধ অশান্তিকারী শক্তির ফলে ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া যখন ভারী হয়ে ছিল ঠিক সেই সময়েই ভাইসরয়-এর পদ গ্রহণ করে লর্ড কার্জ্জন ভারতে এলেন। ভারতে আমরা জানতাম পার্ল্যামেন্টের তিনি একজন সুদক্ষ সদস্য এবং তিনি যে রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সে দলের একজন ভাবী নেতা বলে। সম্পূর্ণ নির্ভর না করলেও তাঁর নিকট থেকে আমরা অনেক আশা করেছিলাম। এবং সেরূপ মনোভাব নিয়েই আমরা তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতে লাগলাম। ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বরে মাদ্রাজে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল তখন তিনিও ভাইসরয়-এর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর যে সমস্ত গুণের খবর আমাদের নিকট এসেছিল সে সমস্ত তিনি ভারতের প্রশাসন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন এই আশা নিয়ে অধিবেশনে আমরা তাঁকে প্রশংসাও করেছিলাম। তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপনের দায়িত্বও আমাকেই দেওয়া হয়েছিল। আর সেই প্রস্তাবের মধ্যে আমরা বলেছিলাম যে, যে-অবিচল বিশ্বাস ও উন্নতিকামী নীতি বৃটিশ শাসনকে সর্ব্বাধিক ঐতিহ্যমণ্ডিত করেছে,

আমরা বিশ্বাস করি ও আশা করি যে, মহামান্য ভাইসরয়-এর কার্য্যকালেও সে নীতি পালিত হবে।

আমার প্রস্তাবের সমর্থনে, ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হবার পর লর্ড কার্জ্জন যে সমস্ত বক্তৃতাদি করেছিলেন তা' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছিলাম। এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, আমি ভারতকে, ভারতবাসীদিগকে, ভারতের ইতিহাসকে ভারতের শাসনপ্রণালীকে এবং ভারতের সভ্যতা ও জীবনধারার জটিলতাকে ভালবাসি। প্রায় একই সময়ে তাঁর অপর এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, ভারতের ভাইসরয়-এর পক্ষে অপরিহার্য্য গুণ হ'ল, "সাহস ও সহানুভূতি"। সাহসের তাঁর কিছুমাত্র অভাব ছিল না। জনমতকে অগ্রাহ্য করবার এবং যে সমাজের শাসনকার্য্য তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল তাদের আদর্শকে পদদলিত করে আপন ব্যক্তিগত আদর্শকে তার বহু উর্দ্ধে স্থাপন করবার সাহস তাঁর ছিল। কিন্তু সহানুভূতি তাঁর ছিল না বললেই চলে। আর ভারতবাসীদিগকে তিনি এমনই ভালবাসতেন যে, তা ত তারা বুঝতেই পারত না, বরং তাতে তাদের ক্রোধেরই সঞ্চার হত। তা ছাড়া যে সমস্ত বিহ্বলতা ও অসুবিধায় বহুকাল যাবৎ সরকার ভুগছে তাদের জন্য পথ আরও পরিষ্কার হয়ে যেত।

সভাপতি কংগ্রেসের বার্ত্তা লর্ড কার্জ্জনের নিকট পাঠিয়ে দিলে তিনি সভাপতি ও কংগ্রেসকে সেই অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ জানালেন।

১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতসভা লর্ড কার্জ্জনকে একখানি অভিনন্দন পত্র দিল। সভার সম্পাদক হিসাবে সভার প্রতিনিধিমণ্ডলীকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে অভিনন্দন পত্রখানি আমিই পাঠ করেছিলাম। সেদিন সেখানে একটি ঘটনা হয়েছিল যা' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা ভাইসরয়-এর দরবারকক্ষে একত্র হয়ে তখন তাঁর আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছি। তাঁর

আগমনের কয়েক মিনিট আগে সেখানে সব ব্যবস্থা ঠিকমত করা হয়েছে কি না দেখবার জন্য তাঁর এক সহায়ক কর্ম্মচারী (এইড ড্যা-কাং) কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন আমাদের প্রতিনিধিমণ্ডলীর দুজন সদস্যের পায়ে ভারতীয় পাম্পসু। তিনি তাঁদের নির্দ্দেশ দিলেন হয় তাঁরা জুতো খুলে খালি পায়ে থাকুন অথবা সেই প্রতিনিধিদের দল ছেড়ে যেন চলে যান। তাঁরা শেষের পথটিই বেছে নিলেন। ঘটনাটির ফলে খুব এক দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হল। দলের আরও দুএকজন চলে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাতে দেশীয় সরকারের প্রধানের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ হতে পারে এবং যাদের প্রতিনিধি হয়ে আমরা সেখানে গিয়েছিলাম ভবিষ্যতে তাদের স্বার্থের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে ভেবে তাঁদের তা থেকে বিরত করান হল।

ব্যক্তিগতভাবে আমি কেবল দুবারই ভারতে লর্ড কার্জ্জনের সংস্পর্শে এসেছিলাম। তাঁর নির্দ্দেশে আমি কোনদিন তাঁর নিকট যাই নি। তাঁর নীতি ও তাঁর সরকারী ব্যবস্থাদি কখনো আমাকে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে বা তাঁর সঙ্গে জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহিত করেনি। প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে যখন গিয়েছিলাম আমিই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। ভাইসরয়-এর পরিবেশ ও জাঁকজমকভাব দেখে এবং তাঁর মর্য্যাদাযোগ্য রাজকীয় ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শ্রুতিমধুর স্বরে উত্তর দেওয়ার ধরন দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। লর্ড রিপণের সময় এরূপ ছিল না। ক্রমশ আমাদের সমস্ত সুখ লোপ পেতে লাগল। কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কে ভারত সরকার যে আদেশ জারি করেছিলেন তার ফলে গভীর নৈরাশ্য সৃষ্টি হ'ল এবং ভবিষ্যতের জন্য উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পেতে লাগল।

লর্ড কার্জ্জনের সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল মহারাণী

ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি উদ্দেশে অনুষ্ঠিত টাউন হলের এক জনসভায়। তাতে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। আমার ঠিক পাশেই বসেছিলেন বিশপ ওয়েলডন। আমার বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর তিনি আমার করমর্দ্দন করে বলেছিলেন, "চমৎকার হয়েছে"। ভাইসরয়-এর একান্ত সচিব স্যার ওয়ালটার লরেন্স সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও আমাকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন, "আশা করি আমাদের প্রায়ই দেখা হবে।" বাস্তবিকপক্ষে তার পর আমাদের আর কোনদিন দেখা হয় নি।

১৮৯৮ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসের কথা শেষ করবার পূর্ব্বে মিঃ আনন্দমোহন বসুর সভাপতির ভাষণ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। ভাষণটি ছিল গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং কংগ্রেস মঞ্চ থেকে যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ বাগ্মিতার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে তাদের অন্যতম। বাগ্মীপ্রবরের কণ্ঠস্বর হয়ত সময়োপযোগী হতে পারে নি, তবুও প্রত্যেক কথার পশ্চাতে যে ঐকান্তিক প্রেরণা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাতে সে ত্রুটি বিলীন হয়ে গিয়েছিল। সে সঙ্গে যখন মনে করা যায় যে সে সময় মিঃ বোসের শরীর অত্যন্ত খারাপ ছিল তখন তাঁর সেই কর্ম্মশক্তি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

সহজাত বুদ্ধি ও নৈতিক বলে মিঃ আনন্দমোহন বোস যেরূপ বলীয়ান ছিলেন, শারীরিক বলে সেরূপ শক্ত সমর্থ ছিলেন না। দুঃখের সঙ্গে জানাতে হয় যে, যে-স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নকে আমি জনসেবীদের পক্ষে এক বিশেষ কর্ত্তব্য বলে মনে করি আনন্দমোহনের সেদিকে বিশেষ দৃষ্টিও ছিল না। এরূপ ব্যক্তিদের জীবন দেশের এক অমূল্য সম্পদ। সুদীর্ঘ জীবন পেলে তাঁদের বিচারবুদ্ধি পরিণত হয়, তাঁদের কথার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, তাঁদের ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এবং পবিত্রময় হয়ে উঠে। আর এভাবেই তাঁরা হন অমূল্য জাতীয় সম্পদ। কিন্তু আমাদের দেশ ও সমাজসেবীগণ একথাগুলি প্রায়ই ভুলে যান।

আর তারই ফলে তাঁদের অকালমৃত্যুর জন্য আমরা শোক করতে বাধ্য হই।

রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক ইত্যাদি বহুমুখী জনহিতকর কাজে মিঃ বোস ডুবে থাকতেন। শরীরের প্রতি কোনই যত্ন নিতেন না। এজন্য তাঁকে প্রায়ই ভুগতে হত। ১৮৯৮ সালে তিনি বিলেত গেলেন। সেপ্টেম্বরে ফিরে এলেন। টাউন হলে জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হল। অভ্যর্থনা সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করে আমি একটি বক্তৃতা করলাম। উপযুক্ত একটি উত্তর দেবার জন্য তিনি আসন ছেড়ে উঠলেন। কিন্তু দুএকটি মাত্র কথা বলবার পরই ভেঙ্গে পড়লেন তাঁর আসনের উপর। সভা ভেঙ্গে গেল। যখন তাঁর শরীরের এই দুর্ব্বল অবস্থা, মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতি সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাল। তাঁর হিতৈষী বন্ধুগণ ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। চিকিৎসকেরা আপত্তি করলেন। কিন্তু তাঁর কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁকে সম্পূর্ণ অধিকার করে বসল। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেই অভিভাষণ দিয়েছিলেন যার কথা আমি পূর্ব্বেই বলেছি।

তাঁর জীবন ছিল মহৎ। তার চেয়েও মহৎ ছিল দেশের সেবায় তাঁর রোমাঞ্চকর তন্ময়তা ও পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এবিষয়ে পরে আমি পুনরায় উল্লেখ করব।

পঞ্চদশ অধ্যায়

স্বীকৃতির জন্য সংগ্রাম

১৮৯৮ সালের জানুয়ারীতে আমার শিমুল তলার বাড়ী নির্ম্মাণের কাজ শেষ হ'ল। আমি আমার বার্ষিক অবকাশ নিতে আরম্ভ করলাম। কিছুকাল যাবৎ বছরে ছুবার করে আমি বিশ্রাম নিতে লাগলাম। আমার মত বয়সে ভারতের খুব কম লোকেই কার্য্যক্ষম থাকে। তবু আমি যে এখনো স্বাস্থ্য রক্ষা করে শক্ত সমর্থ থাকতে পেরেছি, মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেবার দরুণই তা সম্ভব হয়েছে। শিমুলতলা বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। হাওড়া থেকে কর্ড লাইনে গেলে ২১৭ মাইল। ১৮৯৪ সালে আমার পুত্র যখন কেবল আট মাসের শিশু, তখন অসুস্থ হয়ে পড়ে। শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রায়বাহাদুর কেদারনাথ চাটার্জী হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য তাকে শিমুলতলা নিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী তাকে নিয়ে আমি ও পরিবারের সকলেই শিমুলতলায় আসি।

সে সময় সেখানে একটি মাত্র ঘর ছিল। বাবু শরৎচন্দ্র মিত্র ছিলেন তার মালিক। তিনি অনুগ্রহ করে তাতে আমাদের থাকতে দেন। আমার ভাই তখন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছিল। সেও ছিল আমাদের সঙ্গে। যথোপযুক্ত স্থানের অভাব বশতই আমাদের এলাহবাদ চলে যেতে হয়। শিমুল তলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও মনোরম জলবায়ু আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তখন থেকে আমি কিছু জমি কিনে বাড়ী করে প্রতিবছর কিছুদিন এসে এখানে থেকে আমার অবসর যাপনের ও হাওয়া পরিবর্ত্তনের সঙ্কল্প করি।

ইংলণ্ডে থাকতে একটা বিষয় আমাকে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছিল, তা' হল প্রতি বছর গরমের দিনে সে দেশীয়দের

সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী কোন এক সহরে বা ইউরোপের কোন দেশে ভ্রমণের জন্ত যাওয়া। এবং আমার সেই তরুণ বয়সেই ১৮৬৮ সালে আমি ইংরেজদের জীবনধারায় এই বৈশিষ্টটি লক্ষ্য করে' এবং আমাদের দেশের লোকের জীবনে তার অভাবের জন্ত অনুযোগ করে' বাবার কাছে পত্র দিয়েছিলাম। মধুপুর তখনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে নি। দুর্গা পূজার ছুটি সকলে বাড়ীতে থেকেই কাটিয়ে দিত। পূজার আনন্দ উৎসবে মেতে উঠত। কিন্তু এই ছুটিতে বিশ্রাম ও হাওয়া বদলের সুবর্ণ সুযোগটিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করত। মধুপুর, বৈগুনাথ ও কোন কোন সময় দার্জিলিং-এ হাওয়া পরিবর্ত্তনে বাবার রীতি তার পরেই ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। শিমুলতলাকে এভাবে মধ্যবিত্তদের উপযোগী করে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে ও জনপ্রিয় করে' তুলতে পেরে আমি বেশ সন্তোষ ও গর্ব্ব অনুভব করতাম।

পরলোকগত বাবু হেমচন্দ্র রায় ছিলেন আমার বন্ধু। তাঁর অকাল বিয়োগে যেমন তাঁর পরিবারের তেমনি জাতীয় দলের পক্ষে এক বিরাট ক্ষতি হয়েছিল। আমরা সকলেই সেজন্ত বিশেষ মর্ম্মাহত হয়েছিলাম। তাঁরই চেষ্টার ফলে শৈলশ্রেণীর উপর এক টুকরা জমি যোগাড় করতে পেরেছিলাম। বাড়ী নির্ম্মাণের পক্ষে এ ছিল শিমুলতলার এক অতিশয় উৎকৃষ্ট স্থান। আমার এই জমিটি ছিল বৈগুনাথের তদানীন্তন ব্যবসারত উকিল স্বর্গীয় বাবু বিহারীলাল চাটার্জী মহাশয়ের জমির একটি অংশ। সেই শৈলসারিতে তাঁর যত জমি ছিল বিহারীবাবু টুকরো টুকরো করে সমস্তই তাঁর বন্ধুগণের মধ্যে বিলি বিক্রয় করে' দিয়েছিলেন। এভাবে স্তার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী, স্বর্গীয় বাবু পুলিনবিহারী সরকার এবং আরও অনেকে জমি পান। জমি পাওয়ার অনতিকাল পরেই কালক্ষেপ না করে'

আমি বাড়ী নির্ম্মাণ করতে আরম্ভ করলাম এবং ১৮৯৮ সালে নির্ম্মাণ শেষ হয়ে তা' আমাদের বাসোপযোগী হ'ল।

শিমুলতলায় আমার বাড়ীটিই প্রথম নির্ম্মিত হয়েছিল। তার পর থেকে গত বিশ বছরে স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে এ স্থানটি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। লর্ড সিংহ, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী ও আরও অনেকে এখানে বাড়ী নির্ম্মাণ করেছেন এবং কখনো কখনো বাস করেন। স্থানটি অনেককেই স্বাস্থ্য ও জীবন দান করেছে। প্রসিদ্ধ কণ্ট্র্যাকটার ও কোলকাতার কায়স্থ সমাজের নেতা স্বর্গীয় ভবনাথ সেন মৃত্যুর কবলে পড়েও প্রতি বৎসর ছয় মাস করে' এখানে বাস করে' মৃত্যুকে বহুদিন পর্য্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন।

আমি সকল সময়েই শিমুলতলায় গিয়ে সময় কাটাবার আশা ও আকুলতা নিয়ে থাকতাম। এবং হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য সেখানে গিয়ে বিশেষ উপকার পেতাম। এখানে বসে যে কেবল প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি দেখে ও অতীতের ঘটনাবলী রোমন্থন করে আমি অলস ভাবে দিন কাটাতাম তা' নয়। এখানে বসেই আমি আমার ১৯০২ সালের আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ রচনা করেছিলাম। বর্ত্তমান স্মরণিকার তিন ভাগের এক ভাগ আমি এখানে বসেই লিখেছি। এখানে অতিথি অভ্যাগতের উৎপাত ছিল না, কারও জন্য কোন সময় নির্ণয় করে দেবার জন্য অনুরোধ ছিল না, কেউ আমার পরামর্শ নেবার জন্য এখানে আসত না। এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও আরামের মধ্যে উৎসাহ ও উত্তম সহযোগে আমি আমার কাজ করে' যেতে পারতাম। আমি এখানে বিশ্রাম নিই বটে, কিন্তু কার্য্যে অনুপ্রাণিত হই বলে তা' আমার নিকট অধিকতর উপভোগ্য হয়। পুরোপুরিভাবে

অলস হ'য়ে বুদ্ধিবৃত্তিকে অব্যবহার্য্য করে রেখে জবুথবু হয়ে বিশ্রাম করাতে আমার বিশ্বাস নেই। পূর্ণ বিশ্রামের সময়েও বুদ্ধিবৃত্তিকে সাধারণ ভাবে পরিচালিত করতে পারলে আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে তা' শক্তিদায়ক হ'ত। তা'তে আমার দেহ উদ্দীপিত হ'ত, আমার শিরায় শিরায় বিশুদ্ধ রক্তের প্রবাহ সঞ্চারিত হ'ত আর সমস্ত দূষিত পদার্থ দূরীভূত হয়ে নূতন জীবনীশক্তি লাভ হ'ত। হাল্কা কাজের মধ্যে নিমগ্ন থেকে বিশ্রামজাত নিরাময়তা লাভে আমি বিশ্বাসী। আমাদের মধ্যে অনেকেই স্বাস্থ্যের অন্বেষণে স্থান থেকে স্থানান্তরে দ্রুত ছুটোছুটি করে' ঘুরে বেড়ান। এসবের প্রতি আমার কিছুমাত্র আস্থা নেই।

১৮৯৮ সালে এক নৃশংস দুর্ঘটনার প্রতি ভারতীয় এবং বিশেষ ভাবে বাঙ্গালী জনসাধারণের দৃষ্টি পড়ে এবং তাতে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ব্যারাকপুরের ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সরকার চিকিৎসক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। রোগীদের প্রতি সদয় ব্যবহার ও কার্য্যদক্ষতার জন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। অবশ্য তাঁর ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পর্কে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। ব্যারাকপুর ষ্টেশনের গায়েই ছিল তাঁর ডিসপেনসরী। ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাসে একদিন রাত্রিবেলা কাজ শেষ করে তিনি গৃহে ফিরবেন। এমন সময় পানোন্মত্ত তিন জন ইউরোপীয় সৈনিক তাঁর ডিসপেনসরীতে প্রবেশ করে। দু' একটি কথাবার্তার পর উভয় পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয়। তারপর সেই সৈনিকেরা তাঁকে মারাত্মক ভাবে আক্রমণ করে। ফলে তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হয় এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই নৃশংস আক্রমণের পর ডাক্তারের চিৎকার শুনে নিকটস্থ লোকেরা ছুটে আসে এবং আততায়ীদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু অপরাধীরা পালাতে সক্ষম হয়। সেই আতঙ্কজনক অবস্থা সৃষ্টি করার

পর আততায়ীদের মত্ততাও সম্ভবত লোপ পেয়েছিল। ডাক্তার রক্তের মাঝে গড়াগড়ি যেতে লাগলেন। যে সমস্ত লোক সেখানে ছুটে এসেছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন আসামীদের তাড়া করেছিল। দুজন সৈনিক ব্যারাকে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের এক জনের টুপি রাস্তায় পড়েছিল। যারা তাদের পেছনে ধাওয়া করেছিল, তারা সেটি কুড়িয়ে নিল। অবশিষ্ট একজন এক মসজিদে প্রবেশ করতেই তৎক্ষণাৎ বাইর থেকে মসজিদের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিশে খবর দেওয়া হ'ল। পুলিশ এসে সৈনিকটিকে মসজিদের ভিতর থেকে হাতেনাতে ধরে ফেলল।

এই ডাক্তার ছিলেন আমার পারিবারিক চিকিৎসক। তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখতাম। এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের সংবাদে আমি অতিশয় মর্ম্মাহত হয়েছিলাম। আমার ঘরের কাছেই ছিল সে হাসপাতাল। ডাক্তার সেখানেই পড়েছিলেন। আমি আমার সেই মরণাপন্ন বন্ধুর নিকট না গিয়ে ছুটে গেলাম ষোল মাইল দূরবর্ত্তী আলীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে এবং এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের আসামীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে তার বিচার ও দণ্ডের ব্যবস্থা করবার সুপারিশ করতে। তার কারণ, তখনকার দিনে ইউরোপীয় জুরীদের মনমেজাজের কথা বিচার বিবেচনা করে', এ ধরণের মামলায় প্রথমাবধি যত্ন নেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক ছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন মিঃ চারলস্ এলেন। অনেক সম্ভাবনাময় জীবন ছিল তাঁর। বেঁচে থাকলে হয়ত চাকরী জীবনের উচ্চতম পদেও উন্নীত হতেন। তিনি ছিলেন আমার ঘনিষ্ট বন্ধু। চট্টগ্রামে তিনি যখন সেটেলমেণ্টের কাজ করতেন তখনই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেন ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী। তিনি মিঃ এলেনকে বিশেষ ভাবে জানতেন। তিনি

বলতেন মিঃ এলেন একদিন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর হবেন। একবার তিনি আমার ব্যারাকপুরের বাড়ীতে এসেছিলেন। তখনকার দিনে কোন ভারতীয় ভদ্রলোককে কোন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী এভাবে কচিৎ সম্মানিত করতেন। আমরা জনহিতকর বিষয়াদি নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতাম।

ডাক্তারের উপর আক্রমণ সম্পর্কে আমিই তাঁকে প্রথম সংবাদ দিয়েছিলাম। তার পূর্ব্বে এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না। ডাক্তার তখনো বেঁচে ছিলেন। আমি সমস্ত ঘটনাটি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। সব শুনে তিনিও আমারই মত ঘৃণা প্রকাশ করলেন। বললেন, বিনা বিচারে আসামীরা যাতে মুক্তি না পায় সেজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। সে সময়ে সরকারী উকিলবাবু আশুতোষ বিশ্বাসের ফৌজদারী উকিল হিসাবে খুব নাম ডাক ছিল। আমি প্রস্তাব করলাম অবিলম্বে এ মামলা আরম্ভ করবার জন্য তাঁকে নির্দ্দেশ দেওয়া হোক। মিঃ এলেন আমার সঙ্গে একমত হলেন। নির্দ্দেশ দেওয়া হল। এবং আশুতোষ বাবু মামলায় খবরাখবর নেওয়ার জন্য নিজে ব্যারাকপুরে এসেছিলেন।

বিষয়টি আমি এখানেই শেষ করলাম না। লণ্ডনে "ইণ্ডিয়া" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ হ'ত। আমি তারযোগে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে সে পত্রিকায় এক সংবাদ পাঠিয়ে দিলাম। তার ফলে এ বিষয় নিয়ে পার্লামেণ্টে প্রশ্ন উঠেছিল। লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার জন উডবার্ণ-এর সঙ্গে আমি দেখা করে তাঁকেও ঘটনার সম্পর্কে বললাম। তিনি শুনে এ অন্যায় কার্য্যের প্রতি অতিশয় ঘৃণা প্রকাশ করলেন। তিনি আমাকে জানালেন যে, মহামান্য ভাইসরয় লর্ড এলগিন স্বয়ং এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে খবরাখবর করছেন। আলাপ করে' বুঝা গেল যে, পার্ল্যামেণ্টে প্রশ্ন

উঠার ফলে ভারত সচিবের নিকট থেকেও এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে' বার্ত্তা এসেছে।

হাইকোর্টের দায়রাতে মামলা সোপর্দ্দ হ'ল। বিচারপতি মিঃ জেনকিনস তখন হাইকোর্টের সাধারণ বিচারপতিদের অন্যতম। তিনি তখন হাইকোর্টের দায়রা জজ হিসাবে বসতেন। কিন্তু এই মামলার জন্য অধিকাংশ ইউরোপীয় নিয়ে এক বিশেষ জুরী গঠন করে প্রধান বিচারপতি স্যার ফ্রান্সিস ম্যাকলীন স্বয়ং বিচার করতে বসলেন। আসামীদের বিরুদ্ধে খুন, খুন অপেক্ষা লঘু ধরণের নরহত্যা ও গুরুতর আঘাতের অভিযোগ করা হয়েছিল। গুরুতর অভিযোগ দুটির ক্ষেত্রে নির্দ্দোষ হলেও গুরুতর আঘাত করার অভিযোগে সমস্ত জুরী একমত হয়ে আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। আইনত যা' ছিল সর্ব্বাধিক দণ্ড প্রধানবিচারপতি আসামীদিগকে সেই দণ্ডেই দণ্ডিত করেছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় জুরীর মত সম্পর্কে কি মনোভাব তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

পার্ল্যামেণ্টের সদস্য মিঃ ডবল্যু. এস. কেইন এ মামলা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, আসামীদের তিনজনকেই গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া উচিত ছিল। বাস্তবিক পক্ষে একে যদি সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত হত্যা বলে অভিহিত নাও করা যায় তবুও এটি এমনই এক গুরুতর দৈহিক আঘাত ছিল যে, তাতে মৃত্যু ঘটবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং তাকে নরহত্যা না বলে' অন্য কি বলা যায় তা' ধারণার অতীত। আজ অবধি আমি এমন কোন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর দেখা পাই নি যিনি এই কাপুরুষোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা না করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয়দের উপর ইউরোপীয়েরা এরূপ ভাবে আক্রমণ করতে প্রায়ই দেখা যায়।

আমি এরূপ আরও একটি মামলার প্রতি বিশেষ আগ্রহী হয়েছিলাম। সে ক্ষেত্রে দুজন ইউরোপীয় গুরুদত্ত মাইতি নামে এক

ব্যক্তিকে ভীষণ ভাবে প্রহার করেছিল। তার অপরাধ ছিল সেই ইউরোপীয়েরা যখন দাঁড়িয়েছিল সে-সময় সে সে-পথে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। লোকটি ছিল বৃদ্ধ। প্রহারের চোটে লোকটির মৃত্যু হয়। নিম্ন আদালত সেই আসামীদের সামান্য জরিমানার সাজা দিয়ে মুক্তি দেয়। অতি নিকৃষ্ট প্রকৃতির ছিল এই ঘটনা। এ অবস্থায় আসামীদের সমুচিত দণ্ড হওয়া উচিত ছিল। "বেঙ্গলী" পত্রিকাতে আমি এ বিষয়ে লিখেছিলাম। এবং ব্যক্তিগত ভাবে স্যার জন উডবারণকে এ বিষয়ে বলেও ছিলাম। সাজা বর্দ্ধিত করবার জন্য এক আবেদন করা হল। ইতিমধ্যে আসামীদের একজন বুয়র যুদ্ধে যোগ দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে গিয়েছিল। তাকে আর পাওয়া গেল না। অপর আসামীদের পুনর্বিচারে চার মাস কারাবাসের হুকুম হ'ল। সে সরকারের অধীনে পাব্লিক ওয়ার্ক্স ডিপার্টমেণ্টে চাকরী করত। তার মুক্তির পর আমি তার প্রতি কিছু আগ্রহশীল হই এবং তাকে পুনরায় কাজে নিযুক্ত করাতে সক্ষম হই।

এ ধরণের মামলায় নিম্ন আদালতগুলিতে প্রায়ই নিতান্ত দুঃখজনক শ্রেণীবৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। যতই উপরের দিকে ওঠা যায় আবহাওয়া বিশুদ্ধ হয়ে উঠে। আমি ধন্যবাদের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, এ বিষয়ে এখন ইউরোপীয়দের মতের বিশেষ পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হয়েছে। যতই সময় যাবে এবং দুটি সম্প্রদায় পরস্পরের সংস্পর্শে আসবে উত্তরোত্তর ততই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার অবসান হয়ে পরস্পরের সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হয়ে উঠবে।

ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সরকারের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারে দারুণ অর্থাভাব দেখা দেয় এবং তাহারা অসহায় হয়ে পড়ে। পরিবারে তিনিই ছিলেন কর্তা ও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করবার মত একমাত্র ব্যক্তি। তাঁর রোগীর সংখ্যা ছিল অনেক। কিন্তু তাতে অর্থাগম

সে রকম হত না। কারণ এ সমস্ত রোগী ছিল দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। তাঁর পুত্রদের বয়স ছিল খুব অল্প। একজন মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র। আমি লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার জন উডবারণ-এর নিকট গিয়ে তাদের জন্য কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলাম। স্যার জন উডবারণ ছিলেন অতি সদাশয়। আমার প্রার্থনা তিনি অবিলম্বে পূর্ণ করলেন। তিনি আমাকে বললেন, "মিঃ ব্যানার্জী, ডাক্তার সরকারের ছেলে যদি প্রবেশিকা পরীক্ষাটিও পাশ করত, আমি তাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করে দিতে পারতাম। তার যোগ্যতার অভাবের দরুণ সেদিকে আমার হাত বন্ধ। তবুও তাকে আমি সবরেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত করব। ডাক্তার সরকারের এক পুত্র সে পদে নিযুক্ত হয়েছিল। পরে ক্রমশ পরিবার বড় হওয়ার ফলে সকলের ব্যয়ভার বহন করা তার পক্ষে যখন দুঃসাধ্য হয়ে উঠে তখন আমার অনুরোধে তদানীন্তন লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার এডওয়ার্ড বেকার অনুগ্রহ করে' তার ভাইকেও সবরেজিষ্ট্রারের চাকরীতে নিযুক্ত করলেন।

লর্ড কার্জ্জনের সহানুভূতি সূচক কথাবার্ত্তার জন্য ১৮৯৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলাম। আমরা এটিও আশা করেছিলাম যে, তিনি দেশের ক্রমোন্নতি ও জনগণের প্রতি বিশ্বাসের নীতিই গ্রহণ করে চলবেন। পরবর্ত্তী বৎসরের ঘটনাবলী দেখে আমাদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সব চেয়ে আশাবাদী তাঁদেরও সমস্ত আশা ভরসা হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে লাগল। কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলটি যখন সিলেক্ট কমিটির স্তর অতিক্রম করে এল, তার সম্পর্কে ভাইসরয় যা' নির্দ্দেশ দিলেন তা' থেকে সহজেই প্রমাণিত হল যে, লর্ড কার্জ্জনের নীতি যে কেবল প্রতিক্রিয়াশীল তাই নয়, ভারতের জনমতের প্রতিও তাঁর কিছু মাত্র শ্রদ্ধা নেই। তাঁর সে সমস্ত নির্দ্দেশ সম্পর্কে আমি এই স্মরণিকার মধ্যে

ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। সে-সব নির্দ্দেশের ফলে কোলকাতা কর্পোরেশনে আমলাতন্ত্রী ভাব প্রবেশের সুযোগ হল। ওসমস্ত নির্দ্দেশ এমনই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, লোকে বলাবলি করতে লাগল স্যার জন উডবারণ এ কারণে পদত্যাগ করবেন বলে পর্য্যন্ত ভয় দেখিয়েছিলেন। পরে কি কারণে যে তিনি পদত্যাগ করলেন না, তা' আমাদের জানা নেই। তবে তার ফলে কোলকাতায় এত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল যে, লর্ড কার্জ্জনের অপর এক নীতিপ্রসূত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গেই একমাত্র তার তুলনা সম্ভব। জনগণ ক্রত ভাইসরয়-এর প্রতি তাদের আস্থা হারাতে লাগল। ১৮৯৯ সালে লক্ষ্ণৌতে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন বসে সে সময় তাঁর প্রতি জনগণের অবিশ্বাস প্রকাশ করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটির উত্থাপক আমিই ছিলাম। প্রস্তাব ছিল নিম্নোক্তরূপ—

"জন সাধারণের সম্মিলিত বিরোধিতা সত্ত্বেও কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ করিয়া সরকার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিনাশী ও প্রতিক্রিয়াশীল যে নীতির প্রমাণ দিয়াছেন এবং অনুরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে তৎপরতার সহিত বোম্বাই লেজিসলেটিভ কাউনসিলেও এক প্রস্তাব আনয়ন করিয়া স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের গুরুতর বিঘ্ন সাধনে যে নীতির প্রশ্রয় দিতেছেন এই কংগ্রেস তাহা অনুমোদন করে না।"

কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল ছিল একটি স্থানীয় ব্যবস্থা। কিন্তু সারা ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন নীতির বিকাশে ও অগ্রগতিতে তার প্রভাব থাকার ফলে সমগ্র ভারতের দৃষ্টি তখন তার প্রতি নিবদ্ধ ছিল এবং এজন্য সকলেই বিশেষ উদ্বেগ বোধ করেছিলেন। সে সময় কংগ্রেসের স্থায়ী নীতি ছিল, যে সমস্ত প্রশ্নের সঙ্গে সারা ভারতের স্বার্থ ও মতামত জড়িত থাকত

সে সমস্ত প্রশ্ন প্রাদেশিক সমস্যা সংশ্লিষ্ট হলেও কংগ্রেসে সেগুলি আলোচনা করা হবে। কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল নিয়ে আলোচনা করেও কংগ্রেস তার সেই চিরাচরিত রীতিরই অনুসরণ করেছিল। অপর পক্ষে একই নিয়মে অনেক সর্ব্বভারতীয় সমস্যা নিয়েও প্রাদেশিক কনফারেন্স সমূহে আলোচনা হত। এরূপ নীতি অনুসরণের ফলে প্রদেশের জনজীবনের সঙ্গে সর্ব্ব ভারতের জনজীবনের সম্পর্ক নিবিড় হ'ত এবং তা' একটি সুসংবদ্ধ জাতীয় জীবন গঠনের সহায়ক হ'ত। কোলকাতা কর্পোরেশনকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা সম্পর্কে যখন কংগ্রেসে আলোচনা চলছিল তখন সেই কংগ্রেস অধিবেশনে মিঃ আর. সি. দত্তের সভাপতিত্ব করার এক বিশেষ তাৎপর্য্যও ছিল। কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন নিয়ে আমরা যখন বিলাতে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলাম তখন তিনিও বিলাতে ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে তখন যোগাযোগ করি। সে সময় প্রধানত তাঁরই চেষ্টার ফলে ১৮৯৭ সালে এই বিল নিয়ে এক মস্ত বড় বিতর্কের আয়োজন হয়। মিঃ হারবার্ট রবার্টস, বর্ত্তমান লর্ড ক্লাইড, একটি অনুসন্ধান কমিশন গঠনের উপর জোর দেন। তখন বিপক্ষদলীয় স্যার হেনরী ফাউলার বলেছিলেন যে, নির্বাচিত কমিশনারেরা তাঁদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন নি বলে নির্ণয় করবার মত কোন প্রমাণ তিনি পান নি।

সেই বিতর্কের পর আমার ধারণা হয়েছিল হয়ত মিউনিসিপ্যাল বিলটিতে কিছু রদ বদল হবে। আমাদের সে আশা মিথ্যে হল। লর্ড কার্জ্জনের প্রভাবই জয়ী হ'ল। সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শর্ত্তসহ সে বিল আইনে পরিণত হ'ল। সে সব নিয়ে এত মন্তব্য এত সমালোচনা সমস্তই বিফল হ'ল। যে-প্রশাসন নীতির ফলে পরবর্তী কালে দেশময় ব্যাপক অশান্তি বিশৃঙ্খলা

ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল এই আইন ছিল সে সমস্ত নীতির পূর্ব্বাভাষ।

ইংলণ্ডে বৃটিশ কমিটির সঙ্গে একযোগে কাজ করে' ও সভা সমিতির মধ্য দিয়ে সে দেশের জনসাধারণকে ভারতের বিষয়ে সম্যক অবহিত করার এবং অর্থ সংগ্রহার্থে একটি ভাণ্ডার স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধিদল নিযুক্ত করবার সুপারিশ করে' লক্ষ্মৌ অধিবেশনে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

আমি প্রস্তাবটি উত্থাপন করে অর্থের জন্য আবেদন জানিয়েছিলাম। আমার আবেদন যে সফল হয়েছিল একথা বলতে পারি না। আর সেই প্রস্তাব রূপায়িত করবার জন্য তখনই কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয় নি। প্রস্তাবটি কেবল কংগ্রেসের স্থায়ী কর্ম্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েই রইল। প্রস্তাবটি গ্রহণ করবার চেষ্টাটি ছিল এক আকস্মিক বিক্ষুব্ধ আবেগের প্রকাশ মাত্র। অধ্যবসায়ের সঙ্গে তা' সম্পূর্ণ বা সফল করবার কোন চেষ্টা তেমন ছিল না।

১৯০০ সালের কংগ্রেস অধিবেশন বসল লাহোরে। লালা মুরলীধর ছিলেন একজন পাকা কংগ্রেস কর্ম্মী। যতদিন তাঁর শক্তি ও স্বাস্থ্য অটুট ছিল ততদিন ব্যঙ্গ, কৌতুক, রসিকতা ইত্যাদি দিয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সকলকে কি রকম জমিয়ে রাখতেন সে কথা অতীতের কংগ্রেসীদের এখনো মনে আছে। তারপর বার্দ্ধক্যে যখন তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন তখনো কংগ্রেসের আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। লাহোর কংগ্রেসে যাবার নিমন্ত্রণ এসেছিল সেই লালা মুরলীধরের নিকট থেকে।

লালা জয়শীরাম আমার কাছ থেকে এক প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন, যেন লাহোরের কংগ্রেস অধিবেশন

আরম্ভ হবার পুর্বে আমি পাঞ্জাবের কয়েকটি নগর পরিদর্শনে যাই এবং সে সব নগরে জনসভায় বক্তৃতা করি। তিনি ভেবেছিলেন যে, কংগ্রেসের কাজে জনসাধারণকে উদ্দীপিত করবার জন্য এটার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আমার পক্ষে এটি ছিল একটি কর্ত্তব্য। সুতরাং আমি প্রফুল্ল চিত্তেই তা'তে সাড়া দিলাম। ১৯০০ সালের অক্টোবরে আমি আমার শিমুলতলার বাড়ীতে বার্ষিক পূজোর ছুটি বন্ধ করে' দিয়ে পাঞ্জাব যাত্রা করলাম। আমাদের প্রথম সভা হল দিল্লীতে। এখানে ব্যারিষ্টার সর্দ্দার গুরুচাঁদ সিং-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তারপর থেকে পাঞ্জাবে ভ্রমণের সময় তিনি বরাবরই আমার সঙ্গে ছিলেন। দিল্লী, অমৃতসর, লাহোর ও রাওয়ালপিণ্ডিতে জনসভায় আমি বক্তৃতা করলাম। লাহোরে স্বর্গীয় মিঃ ব্র্যাডলো'র সম্মানে একটি স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হয়েছিল। এবং তার মধ্যেই কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। অভ্যর্থনা সমিতির অনুরোধে আমি এই স্মৃতি সৌধের হলের দ্বার উদ্‌ঘাটন করি। পরবর্ত্তী কালে এই হল এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। অবশ্য তা' পুনরায় নির্ম্মিত হয়েছে।

রাওয়ালপিণ্ডিতে থাকতে আমি লালা জয়শীরামের অভাবনীয় মৃত্যুর সংবাদ পাই। লাহোর কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বর্গত বাবু কালীপ্রসন্ন রায়ের ভাষায় লালা জয়শীরাম ছিলেন "পাঞ্জাব প্রদেশে কংগ্রেস আন্দোলনের প্রাণ ও আলোক বর্ত্তিকা।" কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনার বোঝা ও দায়িত্ব পড়েছিল প্রধানত তাঁরই উপর। ১৯০০ সালের লাহোর কংগ্রেসের সফলতার মূলে বিশেষ ভাবে ছিল তাঁরই অক্লান্ত ও অবিচল উৎসাহ এবং বিচক্ষণ দূরদৃষ্টি। জীবনের বিকাশ হবার প্রারম্ভেই এমন একজন লোকের মৃত্যু দেশের পক্ষে ও তার আদর্শের পক্ষে

ছিল এক অপূরণীয় ক্ষতি। আর তার বিষণ্ণ ছায়া আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনকেও ছেয়ে ফেলল।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, লাহোর কংগ্রেসে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন একজন বাঙ্গালী উকিল। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল। এই বীরজাতিরা আমাদের প্রদেশের লোকের প্রতি অবজ্ঞার চোখে দেখে বলে যে কুৎসা রটনা করা হয় এই ঘটনা থেকে তা' মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হয়। বাবু কালীপ্রসন্ন রায় ছিলেন পাঞ্জাব আইন-ব্যবসায়ী সঙ্ঘের এক নেতৃস্থানীয় ভারতীয়। ইউরোপীয় ও ভারতীয় সকলে সমভাবেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। আর এই শ্রদ্ধার মূলে ছিল তাঁর আইনবিষয়ক দক্ষতা, নাগরিক কর্ত্তব্যের প্রতি তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং তাঁর ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের নির্ম্মলতা। লাহোরে লোকের ধারণা ছিল যে, তিনি যদি স্বাধীনচেতা না হতেন ও কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকতেন, তা' হ'লে তিনি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতাও পেতেন এবং পাঞ্জাব চীফ্ কোর্টের বিচারপতি পদেও উন্নীত হতে পারতেন।

সরকারী মেজাজের খেয়ালীপনা এক-এক প্রদেশে এক-এক রকম। কোন কোন প্রদেশে আইন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের পক্ষে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা একটি অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হ'ত। কিন্তু আবার কোন কোন প্রদেশে বিশেষভাবে মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে এ নিয়ে কেউ আপত্তি করত না। ১৯০০ সালের লাহোর কংগ্রেসের মূল সভাপতি ছিলেন মিঃ (পরে স্যার) নারায়ণ চন্দ্রভারকার। তাঁকে যখন কংগ্রেসের সভাপতি হবার জন্ত আমন্ত্রণ জানান হয়, তার পূর্ব্বেই তিনি স্বর্গত বিচারপতি মিঃ রাণাডের স্থলাভিষিক্ত হয়ে বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন

স্যার লরেন্স জেনকিনস্। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি কোন আপত্তি করলেন না। মিঃ আশুতোষ চোধুরী ছিলেন একজন গোঁড়া কংগ্রেসী। স্যার লরেন্স জেনকিনস্ কোলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হবার পর মিঃ আশুতোষ চৌধুরীকে বিচারপতির পদ অর্পণ করেন এবং সে পদ গ্রহণ করতে সম্মতও করেন। লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষে সভাপতির কার্য্য শেষ হবার পর মিঃ চন্দ্রভারকার বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতির কার্য্যে যোগদান করেন। কংগ্রেস সমাবেশে প্রত্যেকেরই জানা ছিল যে, মিঃ চন্দ্রভারকার হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তাব করতে আমাকে অনুরোধ করা হয়। এবং সেই প্রস্তাব করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম, কংগ্রেসের সভাপতির পদ হাইকোর্টের বিচারপতি হবার সদর রাস্তা বলেই বহুবার প্রমাণিত হয়েছে।

পুলিশ, কাষ্টমস, সরকারী রেল অফিস, ওপিয়াম, পাব্লিক ওয়ার্কস, সার্ভে ও অন্যান্য বিভাগে নিম্নতর সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদগুলি থেকে ভারতীয়দের কার্য্যত বাদ দেওয়া হ'ত। এজন্য দুঃখ প্রকাশ করে' লাহোর কংগ্রেসে আমি এক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম।

হাউস অব কমনস্-এ স্যার হেনরী ফাউলারের সঙ্গে এ সম্পর্কে আমি যে কথা বলেছিলাম, তা' আমি কখনো ভুলতে পারব না। আমার মনে একথা গেঁথে গিয়েছিল যে, আমাদের এভাবে বঞ্চিত করা কোন রূপেই সমর্থন করা চলে না এবং আমি একথা বিশ্বাস করতাম যে, এ বিষয়ে বলবার উপযুক্ত যা' কিছু আছে সবই আমাদের পক্ষে। ভারতে ফিরে এসে ভারত সভার সম্পাদকহিসাবে সরকারের নিকট আমি একখানি স্মারকলিপি দাখিল করলাম। প্রাচীন ধারায় অভ্যস্ত সরকারী বিভাগগুলি সহজে নড়ে না। আমাদের চেষ্টার ফল যে বিশেষ সন্তোষজনক হয়েছিল সে কথা

বলতে পারি না। অথবা আমাদের যা পাবার অধিকার ছিল তা' যে পেয়েছিলাম সে কথাও বলা যায় না। তবে সেই স্মারকলিপির ফলে সরকারী বিভাগগুলির কাজকর্ম্ম একটু ত্বরান্বিত হয়েছিল। সরকারকে সহজে নাড়ান যায় না। তবে জনসেবাই যাঁদের কাম্য তাঁদের প্রথম এবং শেষ যোগ্যতাই হল ধৈর্য্য।

১৯০১ সালে কোলকাতায় যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তখনো আমি প্রায় একই প্রকারের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করি এবং তৎসঙ্গে একথাও বলি যে, যুগপৎ ইংলণ্ডে ও ভারতে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে ১৮৯৩ সালের ২রা জুন হাউস-অব-কমনস্-এ যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল তা' যেন কার্য্যকর করার ব্যবস্থা হয়।

মিঃ ডবল্যু. সি. বোনার্জীর পক্ষে এই অধিবেশনেই ছিল কংগ্রেসে শেষবারের মত যোগদান। ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুণ ১৯০২ সালের প্রথম দিকে তিনি ইংলণ্ডে যান। রোগে পঙ্গু হয়েও কংগ্রেসের প্রতি তাঁর উৎসাহ শেষ পর্য্যন্ত অটুট ছিল। সেখানে তিনি নরম পন্থী দলের পক্ষ থেকে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হয়ে পার্ল্যামেণ্টের সদস্য হবার চেষ্টা করেছিলেন। যতদূর জানা যায় তাঁর জয়ের সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু বিধি ছিলেন বাম। স্বাস্থ্যের অবনতির দরুণ সেই নির্ব্বাচনী দ্বন্দ্ব থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিতে তিনি বাধ্য হলেন। তার অনতিকাল পরেই গভীর দুঃখের সঙ্গে তাঁর স্বদেশবাসীগণ জানতে পারলেন যে, ইংলণ্ডে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

তাঁর সময়ে কোলকাতা হাইকোর্ট বার-এ মিঃ ডবল্যু. সি. বোনার্জী ছিলেন নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম। তাঁর আইন ব্যবসা যেমন ছিল লাভজনক তেমনি ব্যাপক। অথচ কংগ্রেসের কার্য্যকলাপেও তাঁর উৎসাহের অবধি ছিল না। একথা বললে

কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত হবে না যে, সে সময়ে বঙ্গদেশে কংগ্রেস আন্দোলনের তিনিই ছিলেন নেতা। সাধারণ লোকেরা যাকে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বলে তিনি তা' ছিলেন না।. এ শব্দটি শুনলে সরকারী মহলও নাসিকা কুঞ্চিত করে থাকে। আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের ফলে তাঁর মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পেল তেমনি সরকারী মহলের চোখেও তাঁর একটি দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্নতা ধরা পড়ল, যা' অন্য কোনরূপে প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল নিতান্তই কম।

মিঃ ডবল্যু. সি. বোনার্জী যে সারা জীবন একজন "পাবলিক ম্যান" ছিলেন একথা বলা যায় না। তাঁর কর্ম্মজীবনের প্রথমে এ সমস্ত জনহিতকর কাজের প্রতি তাঁর উৎসাহ ছিল না, আর উৎসাহ দেবার মত সময়ও ছিল না। তাঁর ব্যবসার প্রকৃতিই ছিল এমন যে, একান্ত একাগ্রতা ভিন্ন তাতে উন্নতি করা চলে না। এজন্য সব সময়েই তিনি তাঁর আইনব্যবসা নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতেন। অবশ্য তাতে তাঁর অর্থাগমও হত প্রচুর। যেমন অন্যদের ক্ষেত্রে তেমনি তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও চোখ ফুটিয়ে দিল ইলবার্ট বিল। নিতান্ত নগ্ন ভাবেই তা' প্রকাশ করল আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেই প্রকাশের দীপ্ত আলোকে নিঃচেষ্ট হয়ে বসে থাকা কোন আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন ভারতবাসীর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। বোধশক্তি যাদের ছিল তারা বুঝতে পারল এটি উচ্চতম দেশসেবার ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্যের ডাক ভিন্ন অন্য কিছু নয়। মিঃ ডবল্যু. সি. বোনার্জী সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কংগ্রেসের জন্মাবধিই তিনি তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছিলেন। আর এতে তাঁর নেতৃত্ব যে কিরূপ শক্তি সঞ্চারিত করেছিল আইনজ্ঞ মহলে সেকথা বুঝতে কারও বাকী ছিল না। বক্তা হিসাবে সে সময় তাঁর জোড়া

ছিল না। উৎসাহের দিক থেকে তাঁর সহকর্ম্মীদের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন যাঁদের প্রায় ঈশ্বরপ্রেরিত বলেও বলা যেতে পারত। কিন্তু তাঁর স্থায় ধীর, পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভবে দক্ষ, উদ্দেশ্য সাধনে নিজেকে তার উপযোগী করে নেওয়াতে সিদ্ধ হস্ত, সংবুদ্ধি দিয়ে ও শাসনকার্য্যের জন্ম সুপরামর্শ দিয়ে পরিচালনা করতে বিচক্ষণ এরূপ ব্যক্তি ছিল দুর্লভ। এবং তাঁর সহকর্ম্মীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। জনসাধারণের নেতা হিসাবে আইনজ্ঞদের মধ্যে তাঁর আসন আজ অবধি শূন্যই রয়েছে। ফরাসী মনীষী মিরাবো তুল্য এই মহান নেতা মহাপ্রয়াণ করেছেন। তাঁর আসন পূর্ণ করবার মত যোগ্য ব্যক্তি আর নেই। এই অসাধারণ সন্তানের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ আজ শোকে মুহ্যমান। এরূপ এক ব্যক্তিকে হারাণ দেশের পক্ষে ছিল এক সাজ্বাতিক ক্ষতি। আর বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভ থেকে এ যাবৎ যত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে সর্ব্বাধিক যে উত্তেজনার ফলে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কম্পিত হয়েছিল, তাতে এরূপ এক ব্যক্তিকে হারাণ বঙ্গদেশের পক্ষে ছিল এক অপূরণীয় ক্ষতি।

১৯০৬ সাল ছিল বঙ্গদেশ তথা ভারতের পক্ষে এক অতি দুর্ভাগ্যের বৎসর। ডবল্যু. সি. বোনার্জী, বদরুদ্দিন তৈয়বজী, আনন্দমোহন বসু, নলিন বিহারী সরকার সব একের পর এক সেখানে চলে গেলেন যেখান থেকে কেউ কোনদিন ফিরে আসেন নি। আর দ্বিখণ্ডিত বঙ্গদেশ তখন আঘাতের যন্ত্রণায় ও শোকে আকুল।

১৮

ষোড়শ অধ্যায়
১৯০০ থেকে ১৯০১ সাল

আমার সাংবাদিকতার কার্য্য যে আরও বিস্তৃতি লাভ করেছিল একথা না বলে আমি ১৯০০ সালের কথা শেষ করতে পারি না। ১৮৭৯ সালে আমি 'বেঙ্গলী' পত্রিকার স্বত্বাধিকারিত্ব ও সম্পাদনার কার্য্যভার গ্রহণ করি। তখন থেকে ১৯০০সাল পর্য্যন্ত পত্রিকাখানি ছিল সাপ্তাহিক। তারপর থেকে তাকে করা হ'ল দৈনিক। তাকে দৈনিক পত্রিকা করার জন্যে আমার নিকট একাধিক বার নানা জনের প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু পত্রিকাখানি দৈনিক করলে আমার অন্যান্য ও জনসেবার কাজ ব্যাহত হ'তে পারে এই ছিল আমার ভয়। কিছুদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম ভারতের স্বার্থ প্রচারের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রয়োজন শেষ হয়ে আসছে। জনগণ জাগ্রত হয়েছে। জনজাগরণের অনুপাতে সদ্যজাত খবরের চাহিদাও বেড়ে গিয়েছে। সাপ্তাহিকের প্রতি আগ্রহ কমে গিয়েছে। পরিস্থিতির চাপে আমাকে এখন উপযোগিতার ধারা মেনে তার কাছে নতি স্বীকার করতে হবে। সময়ের সঙ্গে আমাকে চলতে হবে।

স্বর্গত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব আমার সমস্ত ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কাজে বন্ধুর মত যত্নশীল হয়ে উৎসাহ দিতেন। পত্রিকাখানি দৈনিক করার জন্য তিনিও বিশেষভাবে জোর দিতে লাগলেন। "হিতবাদী" পত্রিকার আংশিক মালিক, মেসার্স সি. কে. সেন য়্যাণ্ড কোম্পানীর বাবু উপেন্দ্রনাথ সেন ও আমার মধ্যে দশ বছরের জন্য এক অংশীদারী চুক্তি সম্পাদিত হ'ল এবং তারপর থেকে "বেঙ্গলী" দৈনিক পত্রিকা হয়ে রয়েছে। ভারতীয় পত্রিকা সমূহের মধ্যে আমরাই সর্বপ্রথম রয়টার সংবাদসরবরাহ সংস্থার

সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তজ্জন্য আমাদের কোন দিনও অনুশোচনা করতে হয় নি।

বেঙ্গলী যতদিন আমার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল ততদিন কি পর্য্যন্ত সফলতা অর্জ্জন করেছিল সে কথা বলা অনর্থক। তবে পত্রিকা জগতে তার যা' স্থান হয়েছিল তা' ছিল প্রধানত পত্রিকাখানির পরিচালক তারাপ্রসন্ন মিত্রের আন্তরিকতা ও ব্যবসানিষ্ঠ দক্ষতারই ফল। তিনিই ছিলেন পত্রিকাখানির সত্তা ও প্রাণ স্বরূপ। তাঁর উপর যে কর্ত্তব্য ন্যস্ত করা হয়েছিল তিনি তাতে দক্ষতা অর্জ্জন করে' সুকৌশল, একাগ্রতা ও সাংগঠনিক শক্তির সমবায়ে পত্রিকাখানি গড়ে তুলেছিলেন। তিনি অবিরাম কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন এবং বেঙ্গলীর সেবায় আক্ষরিক অর্থেই যেন আত্মনিবেদন করেছিলেন। আজ তিনি ইহ জগতে নেই। অথচ যাদের একদিন তাঁর সঙ্গে বা তাঁর অধীনে কাজ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁদের কাছে তাঁর স্মৃতি আজ এক কাম্যসম্পদ হয়ে রয়েছে।

স্বর্গীয় তারাপ্রসন্ন মিত্র ও রিপন কলেজের সুপারিণটেনডেণ্ট স্বর্গীয় অমৃতচন্দ্র ঘোষ-এর জীবন থেকে আমি এক বিরাট শিক্ষা লাভ করেছি। আর তা' হ'ল, কোন ব্যবসা বা অপর কোন প্রতিষ্ঠানকে সফল করে তুলতে হলে যে গুণের সর্ব্বাধিক প্রয়োজন তা' হ'ল সম্পূর্ণ ও অসীম একাগ্রতার সঙ্গে সততা ও কিছু পরিমাণ সাধারণ জ্ঞানের সংমিশ্রণ।

চল্লিশ বৎসরের উপর আমি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এতদিনের অভিজ্ঞতার ফলে আমি বলতে পারি যে, একখানি খবরের কাগজের সফলতা তার সম্পাদক অপেক্ষা তার পরিচালকের উপরেই অধিক নির্ভর করে। সম্পাদকের ব্যক্তিত্বের মূল্য যথেষ্ট। এ এমনি এক সম্পদ যাকে অবজ্ঞা করা চলে না। কিন্তু পরিচালক

মণ্ডলীর দক্ষতা পত্রিকার পক্ষে তদধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবিক পক্ষে দুটি কার্য্যই পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন সম্পাদক ও পরিচালক উভয়ের একের অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সম্পর্ক রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। সম্পাদক জনমতকে নেতৃত্ব দেবে, তাকে পরিচালিত করবে। তবে সাজ্যাতিক ভাবে যদি তা' জনমতের বিরুদ্ধে যায়, তা' হ'লে পাঠকদের মধ্যে অপ্রিয় হয়ে উঠবার ভয় আছে। এবং সে ক্ষেত্রে পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা হ্রাস পাবে, বিজ্ঞাপন কমে যাবে এবং আয়েরও অবনতি ঘটবে।

সাংবাদিক হিসাবে আমি যখন কাজ করেছি তখন আমি রাজদ্রোহিতা, কারও মান হানিকরা বা ব্যক্তিগত ভাবে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করতাম। আনুষ্ঠানিকভাবে বা অন্য কোন প্রকারে আমার বিরুদ্ধে কখনো কোন রাজদ্রোহিতার অভিযোগ হয় নি, যদিও বেঙ্গলীতে আমার কোন কোন লেখা তার খুব কাছাকাছি গিয়েছে বলেই মনে করা হত। ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে সদস্য নির্ব্বাচিত হবার আমার যোগ্যতা আছে কি না এ কথা যখন বিচার্য্য ছিল তখন আমার বিরুদ্ধে যারা রাজদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপনের চেষ্টা করছিল, তাদের অভিযোগের কিছুমাত্র ভিত্তি আছে কি না অনুসন্ধান করবার জন্য বেঙ্গলী পত্রিকার ফাইলগুলি চেয়ে পাঠান হয়েছিল। বোধ হয় পরে বুঝা গিয়েছিল যে, একে বলে বৃথা চেষ্টা এবং সে কারণেই ফাইলগুলি ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি স্বীকার করছি যে আমি জোর দিয়ে লিখতাম। পরিস্থিতির প্রয়োজনে অথবা জনসাধারণ যখন চাইত তখন অধিকতর জোর দিয়েই লিখতাম। বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার পর দেশময় নানা অশান্তি ও বাদানুবাদের সৃষ্টি হতে লাগল।

সরকার তখন এমনি এক নীতি গ্রহণ করল যা' তার পূর্ববর্তী কোন বৃটিশ সরকার কোনদিন করে নি। উত্তেজনাতে সকলের মন তখন অস্থির। আমি স্বীকার করছি যে, সে অবস্থায় লেখনী সংযত করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল।

আমাদের শাসকেরা সংবাদপত্রের কঠোর মন্তব্য সম্পর্কে প্রায়ই অভিযোগ করেন। কিন্তু এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতে তাঁরাই যে বাস্তবিক পক্ষে প্ররোচিত করেন সে কথাটি তাঁরা নিজেদের সুবিধার্থে ভুলে যান। মানহানির সম্পর্কে বলা যায় যে, পত্রিকায় যাঁরা লিখেন তাঁরা সব সময় তা' এড়িয়ে যেতে পারেন না। জনস্বার্থের খাতিরে অনেক সময় ইচ্ছা করেই তাঁরা অপমানজনক কথা বলতে বাধ্য হন এবং তার পরিণতি ভোগ করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সংবাদদাতারাই তাঁকে ডুবিয়ে দেন অথচ তার দণ্ড তাঁকেই ভোগ করতে হয়। পত্রিকাতে যা' কিছু প্রকাশ হয় তজ্জন্য নামে মাত্র সম্পাদক দায়ী। বাস্তবিক পক্ষে কেবল মাত্র সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলিতে যা' প্রকাশ হয় এবং যা' তিনি ব্যক্তিগত ভাবে দেখতে পান অথবা সাধারণ নিয়ম অনুসারে তাঁর অধীন কর্ম্মচারীগণ তাঁর গোচরে আনেন, সে সব ভিন্ন অন্য কিছুর জন্যই তিনি দায়ী নন। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে সংবাদপত্রে যা' কিছুই প্রকাশ হয় তজ্জন্য সম্পাদকই দায়ী বলে গণ্য করা হয়।

আমি একবার ব্যক্তিগত ভাবে এক মামলাতে জড়িয়ে পড়েছিলাম। তারই উল্লেখ করে আমার বক্তব্যটি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলি। ১৯১১ সালের মে মাসে য়্যাডভোকেট জেনারেলের এক আবেদন ক্রমে বিচারপতি মিঃ ফ্লেচার আদালত অবমাননার দায়ে আমার বিরুদ্ধে এক নির্দ্দেশ নামার হুকুম দিলেন। আমার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা সম্পর্কিত এ ছিল দ্বিতীয় মামলা। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়েষ্টন একবার এক মামলায় সাক্ষ্য দেন।

মামলাটি বিচারাধীন থাকা অবস্থাতে বেঙ্গলী পত্রিকায় সে বিষয়ে কিছু মন্তব্য প্রকাশের ফলেই হ'ল আমার মামলাটির উদ্ভব। মন্তব্যটি ছিল একটি উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ। তার লেখক ছিলেন সে সময়ের বেঙ্গলী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, বর্ত্তমানে "ট্রিবিউন" পত্রিকার সর্ব্বাধিসম্পাদক বাবু কালীনাথ রায়। আদালতে আমি যখন জবাব দাখিল করি তখন সেই নিবন্ধ প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব আমি নিজে গ্রহণ করলাম। অত্যন্ত উন্নতমনা বাবু কালীনাথ রায় এতে আপত্তি করলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি এক পত্র লিখে সমস্ত দায়িত্ব থেকে আমাকে মুক্তি দিলেন ও নিজে তার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং স্বীকার করে নিলেন যে সেই নিবন্ধ লিখে যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তা' হলে তিনি নিজেই তজ্জন্য অপরাধী। তাঁর এই স্বীকৃতির সুযোগ নিতে আমি মোটেই ইচ্ছুক ছিলাম না। বাস্তবিক পক্ষে আমার জবাব দ্বারা আমি সেই নিবন্ধের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু কালীনাথ বাবুর অনুরোধে আমি তাঁর পত্রখানি আমার কৌঁসুলী এবং পরবর্ত্তীকালে হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ এ. চৌধুরীকে দেখালাম। মামলার উদ্দেশ্যে আমরা পত্রখানির ব্যবহার করলাম না। তবে মিঃ এ. চৌধুরী তা' য়্যাডভোকেট জেনারেলকে দেখিয়েছিলেন। পরে য়্যাডভোকেট জেনারেলই হয়েছিলেন বিরোধী পক্ষের কৌঁসুলী। চিঠিখানি দেখে তিনি কি ভেবেছিলেন আমি জানি না। তবে বিচারপতি বোধ হয় এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। অন্য একটি কারণ বশতঃ মামলাতে কি একটা ত্রুটি থাকার দরুণ মামলাটি খারিজ হয়ে যায়।

জনসেবী ও বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার দরুণ অনেকেই আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করত। জনসেবার কাজে যোগ দিলে এজন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। অবস্থার ফলেই এরূপ হয়ে থাকে। এ অবস্থায় নিতান্ত ধৈর্য্য ধরে সব সহ্য করা বিশেষ

প্রয়োজন। পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যারা এই বিবাদ প্রথমে আরম্ভ করে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পক্ষেও তা' লাভজনক হয় না।

ভারতে দেখা যায়, জাতিগত তিক্ততা ও ব্যক্তিগত ঈর্ষার ফলে আবহাওয়া ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার রিভার্স টম্পসন একবার কৃষ্ণদাস পালকে অসৎ ও কলঙ্কময় প্রকৃতির লোক বলে' বলেছিলেন। ইম্পিরিয়্যাল কাউনসিলের নির্ব্বাচনে আমি হেরে যাবার পর এক নেতৃস্থানীয় সংবাদপত্র বলেছিল যে, ৩১শে জুলাই যেদিন আমি হেরে যাই সে দিন আমি জনসাধারণের প্রতিনিধি ছিলাম না, যদিও সম্ভবত তার আগের দিন পর্য্যন্ত তা' ছিলাম। এ সব অর্ব্বাচীনসুলভ কাজ নিতান্তই ঘৃণার যোগ্য। আমার প্রতি সব ব্যক্তিগত আক্রমণকে আমি গুরুত্ব দিতাম না। যখন মনে হ'ত তাতে জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে বা মানুষের মনে কোন রকম ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে কেবল তখনই উত্তর দিতাম।

দশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর আমি বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পূর্ণ মালিক হলাম। এরপর থেকে ১৯১৯ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত আমি একাই মালিক ছিলাম। তারপর কাশিমবাজারের মহারাজার সঙ্গে এক চুক্তিবদ্ধ হয়ে আমরা যুক্তভাবে এই পত্রিকার মালিক হই। আমাদের মধ্যে স্থির হয়েছিল, একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত এভাবে থাকবার পর পত্রিকা প্রতিষ্ঠানকে এক সীমাবদ্ধ দায়িত্বপূর্ণ যৌথ কারবারে পরিণত করা হবে। কিন্তু ঘটনাচক্র এমন হল যে, আমি বেঙ্গলী পত্রিকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হলাম। জনসাধারণ সম্পর্কিত আমার কোন নীতি তা' প্রতিফলিত করে না। আর তার সঙ্গে কোন সম্পর্কও এখন আর আমার নেই।

বোম্বাই প্রদেশের আমেদাবাদ সহরে ১৯০২ সালে যখন

কংগ্রেসের অধিবেশন হবার ব্যবস্থা হল, তখন সেখানে সভাপতি হবার জন্ত পুনরায় আমার নিকট আমন্ত্রণ এলো। ১৯০২ সালের অক্টোবরে যখন আমন্ত্রণ আসে আমি তখন শিমুলতলায় ছিলাম। বন্ধুবর স্যার দীনশা ওয়াচ্ছা ব্যক্তিগত ভাবেই আমার কাছে এ বিষয়ে লিখলেন। উত্তরে আমি মিঃ কালীচরণ ব্যানার্জীর দাবী সমর্থন করে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলাম। স্যার দীনশা আবার জানালেন যে, ১৯০২ সালে দিল্লীতে বিরাট দরবার হবে। কাজেই তদনুরূপ এক বিরোধী আকর্ষণ ও বিপরীত প্রভাব সৃষ্টি করা বিশেষ দরকার। স্যার ফিরোজ শা মেটা ও অভ্যর্থনা সমিতির মতে আমারই সভাপতি হওয়া উচিত। তবুও এ সম্মান প্রত্যাখ্যান করে পত্রযোগে আমি জানালাম, "যদি কোনই উপায়ান্তর না থাকে তখন আমি আপনাদের সঙ্গে আছি জানবেন।" আমার এই কথা দ্বারা তাঁরা আমায় চেপে ধরলেন। আর আমার পালাবার উপায় রইল না। যদিও মিঃ কালীচরণ ব্যানার্জী সভাপতি হলেই আমি অধিক খুশী হতাম, তবুও অবশেষে আমাকেই সভাপতি হ'তে হ'ল।

আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশন বিপুল সফলতা অর্জ্জন করেছিল। যেমন উৎসাহের গভীরতায় তেমনি আকারে আমেদাবাদের জনগণ আমাকে এক রাজকীয় অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। আমার সমাপ্তি বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, কংগ্রেসের সভাপতিরূপে এসে আমি যেরূপ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা পেয়েছি রণক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগত কোন বিজয়ী রাজকুমার আপন রাজধানীতে এসে তদধিক উৎসাহের সঙ্গে কোনদিন অভ্যথিত হয় নি। আরও বললাম, এ সম্মান বাস্তবিক পক্ষে আমাকে অথবা আমার ব্যক্তিগত মূল্যকে করা হয় নি। যে মহান আদর্শের প্রতিনিধিরূপে আমি এখানে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, প্রকৃতপক্ষে সেই আদর্শের প্রতিই এই বিপুল সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। সভাপতির

অভিভাষণখানি প্রস্তুত করতে আমার প্রায় ছয় সপ্তাহ সময় লেগেছিল। শিমুলতলাতে থাকতে ৭ই অক্টোবর আরম্ভ করে ২৭শে নভেম্বর তা' শেষ করি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, রমণীয় জলবায়ু মোহনীয় আলোবাতাস, সর্ব্বব্যাপী এক অবিরাম শান্তভাব, সব একত্র মিলে আমার একাজের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ভাষণটি দিতে আমার ছু ঘণ্টা সময় লেগেছিল। প্রায় পাঁচ হাজারের অধিক শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতা দিতে পরিশ্রমও আমার হয়েছিল। তবুও কোন কাগজ বা কোন সংক্ষিপ্ত লেখা ইত্যাদির সাহায্য ব্যতিরেকেই আমার চিরকালীন অভ্যাসমত আমি অনর্গল বক্তৃতা করেছিলাম।

কংগ্রেস অধিবেশন সমাপ্ত হবার কয়েকদিনের মধ্যেই অভিষেক দরবার হবার কথা ছিল। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই অনর্থক ব্যয়বহুল সমারোহের প্রতিবাদ করেছিল। তা'তে ফল কিছুই হ'ল না। তাঁদেরই ইচ্ছার প্রতিধ্বনি করে আমার বক্তৃতার মধ্যে আমি বলেছিলাম, দরবার যখন অনিবার্য্য তখন আমার অনুরোধ এই যে, ১৮৫৮, ১৮৭৭ ও ১৮৮৭ সালে যে সমস্ত দরবার হয়েছিল সে সকল পূর্ব্ববর্ত্তী দরবারে যেমন উপযুক্ত বরদান দ্বারা সেগুলিকে স্মরণীয় করা হয়েছিল বর্ত্তমানেও সেরূপ কিছুর ব্যবস্থা করা হোক। দরবার অনুষ্ঠিত হল, কিন্তু বরদানের কোন কথা ঘোষিত হ'ল না। সেই দরবারের স্মৃতির কিছুমাত্র আজ অবধি যদি অবশিষ্ট থেকে থাকে তা' হ'ল সময়োপযোগী কিছু অসার বাগাড়ম্বর আর অনর্থক প্রচুর অর্থের অপব্যয়ের কথা, যে অপব্যয় ইচ্ছা থাকলে অনায়াসে রোধ করা যেত।

আমার বক্তৃতার মধ্যে তৎকালীন যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় স্থান পেয়েছিল তা' হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রশ্ন। সারা জীবন আমি শিক্ষকতা করেছি এবং স্বভাবত শিক্ষার

সমস্যাতেই আমার ছিল গভীর উৎসাহ। লর্ড কার্জন ভারতের অনেক ক্ষতিই করেছিলেন এবং তন্মধ্যে তাঁর তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের পরিণতিই ছিল বহুদূর প্রসারী ও ক্ষতিকর। দক্ষতার দোহাই দিয়ে তিনি কোলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিকে একটি আমলাতন্ত্রী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। একই অযুহাত দিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কেও আমলাতন্ত্রী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকারের অধীনে নিয়ে আসতে লাগলেন। তাঁর একমাত্র মন্ত্র ছিল 'দক্ষতা'। তাঁর কাছে জনমতের কোনই মূল্য ছিল না। উন্মাদের ন্যায় এই অন্ধ বিশ্বাসের আরাধনায় রত হয়ে জনমতকে তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রতিরোধী করে তুললেন।

১৯০১ সালে লর্ড কার্জ্জন সিমলায় এক শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা সভা ডাকলেন। একমাত্র ইউরোপীয় শিক্ষাবিদেরাই সেখানে নিমন্ত্রিত হলেন। এটি ছিল এক গোপন সভা। তার কার্য্যবিবরণী আজ অবধি প্রকাশ পায় নি। অথচ এই সভাতেই লর্ড কার্জ্জন ঘোষণা করেছিলেন, "ভারতে আসা অবধি গোপণীয়তাকে নীতি হিসাবে পরিহার করেছি। আমি নিশ্চিত রূপে বলতে পারি যে, জনশিক্ষা বিষয়ে এরূপ কোন নীতি আমি কোন দিনই অবলম্বন করব না।" যা' বলা হয় আর যা' করা হয় এ দুয়ের চেয়ে অধিক পার্থক্য আর কখনো দেখা যায় নি। যে সময় তিনি গোপনীয়তার নীতির বিরুদ্ধে এত সরবে বক্তৃতা করছিলেন সে সময় বক্তা স্বয়ং জানতেন যে, পরে তিনিই তা' অবলম্বন করে প্রচারিত নীতিকে স্বেচ্ছায় পদদলিত করবেন। ধৃষ্টতা এর চেয়ে অধিক কি আর হতে পারে? কিন্তু এই ছিল লর্ড কার্জ্জনের রীতি। প্রাচ্যের নৈতিক আদর্শকে নিন্দা করে' পাশ্চাত্যের নৈতিক আদর্শের উচ্চপ্রশংসাকারী এক ব্যক্তি যখন

এরূপে কার্য্য করে, তা' দেখে প্রাচ্যদেশে আমরা কৌতুকই উপভোগ করি।

শিক্ষা বিষয়ক আলোচনাসভা যখন সমাপ্ত হ'ল তখন সঙ্গে সঙ্গেই এক ইউনিভার্সিটি কমিশন গঠিত হ'ল। কমিশনের সদস্যদের নাম প্রকাশ হ'লে দেখা গেল, যদিও যে সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা বিচার করা হ'বে সেগুলির সঙ্গে প্রধানত হিন্দুদের স্বার্থই ছিল জড়িত এবং তার মধ্যে একজনও হিন্দু সদস্য ছিল না, তবুও হিন্দুদিগকে এভাবে বাদ দেওয়ায় বেঙ্গলী পত্রিকাতে আমি তার বিরুদ্ধে ভীষণ ভাবে প্রতিবাদ করলাম। ভারতীয়দের মধ্যে এ বিষয়ে কোনই মতদ্বৈধতা ছিল না। তার ফলে পরে বিচারপতি স্যার গুরুদাস ব্যানার্জীকে এ কমিশনের একজন সদস্য করা হয়।

১৮৮২ সালে যে শিক্ষা-কমিশন গঠিত হয়েছিল তাদের সুপারিশ দাখিল করতে আঠার মাস সময় লেগেছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কমিশন পাঁচমাসের মধ্যেই তার রিপোর্ট দাখিল করল। আর সেই রিপোর্টও ছিল আকস্মিক ভাবে তৈয়ারী। তার ফলে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে এক তীব্র আড়োড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা' বললে আদৌ অত্যুক্তি হবে না। ভারতে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই রিপোর্ট এক ভয়াবহ বিপদরূপে দেখা দিল। ১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশন যে নীতি গ্রহণ করেছিল বর্ত্তমান রিপোর্ট তার আমূল পরিবর্ত্তন করে দিল। এতে সুপারিশ করা হল :—(১) দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলির বিলোপ সাধন, যদিও বঙ্গদেশের অধিক সংখ্যক কলেজই ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর; (২) আইন শিক্ষার ক্লাশগুলির বিলোপ সাধন; এবং (৩) সিণ্ডিকেটের দ্বারা কলেজের ছাত্রদের বেতনের ন্যূনতম হার নির্দ্ধারণ, অর্থাৎ বেতন বৃদ্ধিকরণ। দক্ষতার মান

উন্নয়নের জন্য উচ্চশিক্ষাকে এক নির্দ্দিষ্ট বেষ্টনীর মধ্যে' আবদ্ধ রাখবারও এক প্রয়াস করা হ'ল।

সংখ্যাধিক সদস্যদের রিপোর্টে দেখা গেল তাঁরা খোলাখুলি ভাবেই ভারতীয় আইনজ্ঞদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। রিপোর্টে বলা হয়েছিল, "আইনের ক্লাশগুলি বন্ধ করে' দিলে অনেক ক্ষেত্রে আইনের ছাত্রদের শিক্ষার খরচ বৃদ্ধি পাবে; কিন্তু কেন্দ্রীয় স্কুলসমূহে বৃত্তির ব্যবস্থা হবে; এবং তার ফলে ভারতে আইনজ্ঞদের সংখ্যা যদি কমেও যায় আমরা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি না যে, তাতে অবিমিশ্র ক্ষতিই হবে, কোন লাভ হবে না।" ভারতে আইন ও আইনজ্ঞদের প্রতি বিতৃষ্ণা সরকারী আমলাদের এক স্থায়ী বৈশিষ্ট। কোন এক বিশেষ সময়ে 'পাইওনিয়ার' পত্রিকার স্তম্ভে তা' প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। এক বিরূপ মন্তব্য করে সেখানে বলা হয়েছিল যে, ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের যে উনিশ জন নির্ব্বাচিত সদস্য যুদ্ধোত্তর কালীন এক সংস্কার পরিকল্পনা দাখিল করেছিলেন সেই উনিশজন স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আইনজ্ঞদের অংশই অধিক ছিল।

এ কথাটি লক্ষণীয় যে, কমিশনারেরা নিজেরাই স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁদের প্রস্তাবের ফলে শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহ হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমি যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করেছি সে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করে বিচারপতি মিঃ গুরুদাস ব্যানার্জী তীব্র আপত্তি উঠিয়েছিলেন। রিপোর্টে বর্ণিত সুপারিশের বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। টাউন হলে সভা আহ্বান করা হ'ল। সরকারের কাছে একখানি স্মারকলিপি পাঠান হ'ল। এই স্মারকলিপির প্রস্তুত কার্য্যে প্রধানত আমারই হাত ছিল।

আন্দোলনে কিছু ফল হয়েছিল। সরকার জনমতকে আংশিক

ভাবে গ্রহণ করলেন। ১৯০২ সালের অক্টোবরে স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে এক খানি পত্র বাহির হ'ল। তার মধ্যে বলা হ'ল, "শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলির এক বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থান রয়েছে এবং তারা এক অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সম্পাদন করে।" আইনের ক্লাস বন্ধ করা সম্পর্কে বলা হ'ল, "প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে' কেন্দ্রীয় আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। তা' হতে হবে অন্যদের অনুকরণীয়। একচেটিয়া অধিকার কারও থাকতে পারবে না।" সরকারের এই ঘোষণার উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, কোলকাতার সমস্ত কলেজের আইন ক্লাশগুলি লুপ্ত হ'ল। একমাত্র রিপন কলেজেই তা' রয়ে গেল। কলেজে ছাত্রদের ন্যূনতম বেতন সম্পর্কে সরকার নীরব রইলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করা হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি (বিশেষ ভাবে বলব কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে উচ্চতর শিক্ষা দেবার জন্য অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণ করল এবং তার ফলও হ'ল প্রশংসনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপকদের দ্বারা নিয়মিতভাবে বক্তৃতাদির ব্যবস্থার ফলে উচ্চতর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে লাগল। কিন্তু মোট ফল প্রায় অপরিবর্ত্তিতই রয়ে গেল। কারণ, যেই মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে অধিকাংশ ছাত্র এল তাদের উচ্চশিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি হ'ল বটে, কিন্তু তাদের সম্বল সে তুলনায় বিশেষ বাড়ল না বললেই চলে।

———

সপ্তদশ অধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয় আইন

১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হওয়ার পর তদনুসারে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী প্রস্তুত করবার জন্য এক কমিটি গঠিত হ'ল। আইনটি পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি রিপন কলেজ ও তার আনুষঙ্গিক স্কুলটির জন্য একটি ট্রাষ্টী গঠন করে রিপন কলেজে আমার যত কিছু স্বত্ব ছিল সে সব, লাইব্রেরী, ল্যাবোরেটরী ও তাদের সমস্ত সম্পত্তি এবং নগদ পাঁচ হাজার টাকা তার হাতে ন্যস্ত করলাম। কলেজের সমস্ত স্বত্ব থেকে এ ভাবে আমি নিঃস্বত্ব হলাম এবং তার মধ্যে আমার আর্থিক অথবা অন্য কোন প্রকার স্বার্থই অবশিষ্ট রাখলাম না। আমি সেই ট্রাষ্টীর একজন সদস্য হিসাবে থাকলাম এবং তা'তে আমার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করবার ক্ষমতা রেখে দিলাম।

কলেজ ও স্কুলটি এভাবে জনসাধারণের হাতে ছেড়ে দেবার পর আমি তাদের একখানি স্থায়ী আবাসের ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করি। এরূপ এক বিরাট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসঙ্গতি আমাদের কোনদিনই ছিল না। যে পর্য্যন্ত আমিই প্রতিষ্ঠান দুটির মালিক ছিলাম সে পর্য্যন্ত আমার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের নিমিত্ত জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা বা অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন তা' জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান। সুতরাং সে দিকে আপত্তি থাকবার আর কোন কারণ ছিল না। আমি এবার চাঁদার খাতা খুললাম। ১৯১০ সালে বঙ্গদেশের লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার এডওয়ার্ড বেকার কলেজ গৃহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন।

যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি এত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, তার সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে যুক্ত হওয়ার জন্য স্যার জন রীস স্যার এডওয়ার্ড

বেকারকে ভীষণভাবে আক্রমণ করলেন। নিবন্ধ পাঠ করে স্যার এডওয়ার্ড বেকার আমাকে তাঁর সঙ্গে "বেলভেডিয়ারে" দেখা করবার জন্য এক পত্রযোগে অনুরোধ করলেন। তিনি নিবন্ধটি আমাকে দেখিয়ে বললেন, "আমি এর একটি উত্তর দেবার সঙ্কল্প করেছি"। আর বললেন, "আমার সেই উত্তর হ'ল, রিপন কলেজে আমার আরও পাঁচ হাজার টাকা দান। আপনি একাউনটেণ্ট জেনারেলের কাছে পত্র লিখুন। তিনি টাকাটি আপনাকে দিয়ে দেবেন।" এই ছিল ভদ্রলোকটির স্বভাব। তাঁহার মনোভাব ছিল দৃঢ়, দয়ালু ও আবেগ-প্রবণ। তিনি ছিলেন রিপন কলেজের একজন একনিষ্ঠ বন্ধু। যদিও তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার একটি বিশেষ কর্ত্তব্য রয়েছে, তবুও অতিরঞ্জিত না করেই আমি বলতে পারি যে, তিনি যদি মধ্যস্থ হয়ে হস্তক্ষেপ না করতেন তা' হলে আমি রিপন কলেজের আইন ক্লাশকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারতাম না। আমাদের আইন বিষয়ক পুস্তকালয়ে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি বিশেষ ছিল না। বঙ্গীয় সরকারের পক্ষ থেকে বহু হাজার টাকা মূল্যের আইনের নজীর সম্বলিত পুস্তক তিনি লাইব্রেরিতে দান করেছিলেন।

এক সময় আমাদের আইন শিক্ষার ক্লাশের স্বীকৃতি কেন বন্ধ করে' দেওয়া হবে না তজ্জন্য কারণ দেখাতে নির্দ্দেশ এল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্যপূরণীয় শর্তগুলি আমরা পূরণ করে' দেবার পর সিণ্ডিকেট মত পরিবর্ত্তন করল এবং আইনশিক্ষা ক্লাসের স্বীকৃতি পূর্ব্ববৎ বহাল রয়ে গেল। সিণ্ডিকেটসভায় আমাকে ডেকে সাঙ্ঘাতিক ভাবে জেরা করা হয়েছিল। অবশেষে সিণ্ডিকেট ও রিপন কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে সমস্ত বিবাদের একটা উভয়ের গ্রহণ যোগ্য আপোষ মীমাংসায় তার নিষ্পত্তি হ'ল। এ সমস্ত আলোচনা কালে, সিণ্ডিকেটের মেজাজের পরিবর্ত্তনে সর্ব্বদাই

বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রেক্‌টর স্যার এডওয়ার্ড বেকারের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষিত হ'ত।

কলেজের বাড়ী নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ নিতান্ত সহজ ছিল না। একমাত্র সমাজ যখন বিশেষ ভাবে আলোড়িত হয় তখন ভিন্ন অন্য সময়ে জনসাধারণের নিকট থেকে কোন জনহিতকর কার্য্যের জন্য অর্থসংগ্রহ অত্যধিক আয়াসসাধ্য ও ক্লান্তিকর। ভারতে এরূপ কাজে নানা অদ্ভুদ ধরণের বাধা আসে। আমাদের লোকেরা সাধারণত সঙ্গতিহীন। আর যাদের সঙ্গতি আছে তারাও সব সময় সেরূপ দেশপ্রেমী বা অর্থসাহায্যে ইচ্ছুক থাকে না। সেজন্য একই লোককে বার-বার অর্থসাহায্যের জন্য অনুরোধ করার দরকার হয়। জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে অর্থসাহায্য আশা করবার ক্ষেত্রও আমাদের অতিশয় সীমাবদ্ধ। কাজেই চেষ্টার ফলও তেমন সন্তোষজনক হয় না।

স্যার এডওয়ার্ড ছুটিতে স্বদেশে গেলেন। স্যার উইলিয়াম ডিউক অস্থায়ীভাবে তাঁর স্থলে কাজ করতে লাগলেন। সরকারী আর্থিক সাহায্য দিয়ে ও তার প্রভাব প্রয়োগ করে আমাদিগকে কিছু সাহায্য করবার জন্য আমি তাঁর কাছে আবেদন জানালাম। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একদিন অনুগ্রহ করে' তিনি কলেজের বাড়ী নির্ম্মাণের কার্য্য পরিদর্শনে এলেন। ঠিকাদারদের পাওনা সময় মত মিটাতে না পারার দরুণ তখনো নির্ম্মাণের কাজ বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। তা' দেখে তিনি আমাকে বললেন, "মিঃ ব্যানার্জী, আপনি বিশ্বাসেই দেখছি ভর করে' রয়েছেন"। আমি উত্তর দিলাম, "বিশ্বাসে পাহাড়ও ত টলে"। আমার এ বিশ্বাস যে কিছুমাত্র অমূলক ছিল না তা' তার ফল থেকেই প্রমাণ হয়েছিল। প্রথমে এজন্য আমার সম্ভাব্যব্যয়ের হিসাব ছিল একলক্ষ চোদ্দ হাজার টাকা। স্যার এডওয়ার্ড বেকার আন্দাজ করেছিলেন

একলক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা। বাস্তবিক পক্ষে তাঁর কথাই ঠিক হল। সরকারী দান হিসাবে পাওয়া গেল ষাট হাজার টাকা। কলেজের তহবিল থেকে সামান্যই পাওয়া গেল। অবশিষ্ট টাকা আমি জনসাধারণের নিকট থেকেই সংগ্রহ করি। অর্থের জন্য আমি কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের নিকটেও আবেদন করেছিলাম। তাদের মধ্যে অনেকে কলেজে বিনা বেতনেও শিক্ষা লাভ করেছিল। কিন্তু তাদের নিকট থেকে আশানুরূপ ও সন্তোষজনক কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

বর্ত্তমানে কলেজের সমস্ত দেনা শোধ করে দেওয়া হয়েছে। কলেজ বাড়ীতে এখন চতুর্থ তলাও যোগ হয়েছে। আর কলেজের সংরক্ষিত তহবিলে একলক্ষ টাকার অধিক জমা আছে। সারা দেশে তার আনুষঙ্গিক স্কুল সহ এই কলেজটি হ'ল সর্ব্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তার ছাত্র সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। আর এটিই হ'ল একমাত্র বেসরকারী কলেজ যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়দ্বারা স্বীকৃত একটি আইনশিক্ষা দেবার বিভাগও রয়েছে। কলেজের অর্থসংক্রান্ত সমস্ত নিয়ন্ত্রণের ভার ট্রাষ্টীদের হাতে। কলেজ ও স্কুলটি পরিচালনা করে একটি কাউনসিল। আমি সেই কাউনসিলের সভাপতি। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সঙ্গে পরামর্শ করে আমিই বোর্ড অব ট্রাষ্টের নিয়মাবলী এবং কলেজ কাউনসিলের নিয়মাবলী প্রস্তুত করেছিলাম।

আমি যখন ভাইসরয়-এর লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হলাম এবং তার ফলে দিল্লী ও সিমলাতে সময় কাটাতে লাগলাম তখন কোলকাতায় থেকে কলেজের শিক্ষার কাজে নিয়মিত ভাবে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। এজন্য ১৯১৩ সাল থেকে আমি আমার অধ্যাপনার কাজ হ'তে অবসর গ্রহণ করলাম। যে-কাজের সঙ্গে আমি তৎপূর্ব্ববর্তী

আটত্রিশ বছরের অধিককাল যুক্ত ছিলাম এবং যে-কাজের মধ্যে জীবনে আমি এত আনন্দ উপভোগ করতাম তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়েছিল। আমার দেশের তরুণদের মধ্যে জীবনের এক পুরুষের অধিককাল যে-কাজে ব্যয় করেছিলাম, তার প্রতি যখন ফিরে তাকাই সন্তোষের তৃপ্তিতে তখন আমার মন ভরে যায়। ছাত্রদের আমি ভালবাসতাম। তারাও আমাকে ভালবাসত। তাদের মনকে প্রস্তুত করতে ও তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপিত করতে আমিও কিছু অংশ গ্রহণ করেছিলাম বলে' দাবী করতে পারি। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, আমি নাকি ছাত্রদের মনে রাজনৈতিক ভাবধারার সঞ্চার করেছি। অবশ্যই আমি তা' করেছি। এবং সে সমস্ত হ'ল বাস্তবিক ও উপযুক্ত রাজনৈতিক ভাবধারা যা' বিপ্লবাত্মকনীতি থেকে তাদের রক্ষা করতে সক্ষম হ'বে।

আমি প্রচার করেছি স্বদেশপ্রেম ও তৎসহ বৈধভাবে সুশৃঙ্খল অগ্রগতি। আমি প্রচার করেছি, সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তথেকে স্বায়ত্তশাসনই আমাদের লক্ষ্য এবং বৈধ উপায়ে আইনের পথ ধরেই তা' অর্জ্জন করতে হ'বে। আজ যদি বঙ্গদেশে মুষ্টিমেয় যুবক বিপ্লবাত্মক নীতি গ্রহণ করে' থাকে অনুসন্ধানে দেখা যাবে তার মূলে রয়েছে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। তার সঙ্গে কোন প্রচার কার্য্যের বিশেষ সংস্রব নেই। একজন শিক্ষক বা প্রচারক উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু বিদ্রোহীদের উৎসাহ উদ্দীপনার পরিপোষক লালনক্ষেত্র কখনো সৃষ্টি করতে পারেন না। ফরাসীদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দরুণ মানুষের মন যদি বিপ্লবাত্মক ভাবধারা গ্রহণের উপযোগী হয়ে না উঠত, তা' হ'লে পুস্তিকা প্রচারকদের সমস্ত লেখাই অনুর্ব্বর জমিতে পড়ে ব্যর্থ হয়ে যেত।

সে যাই হোক, ক্লাশে বসে ছাত্রদের পড়াতে, তাদের পরিচালিত করতে তাদের প্রেরণা যোগাতে সব সময় আমি খুব আনন্দ পেতাম। যখন তাদের সঙ্গে থাকতাম আমি যুবোচিত উদ্দীপনা পেতাম। আজ এই জীবন সায়াহ্নেও আমার এই যে আশাবাদী মনোভাব অক্ষুণ্ণ রয়েছে তারও কারণ তরুণদের সঙ্গে আমার অবিরাম ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং তাদের প্রতি ও তাদের কল্যাণের প্রতি আমার সজীব উৎসাহ ও উদ্যমশীলতা। ক্লাশরুমগুলি ছিল আমার শিক্ষাক্ষেত্র। আমি যখন তরুণদের সত্যাশ্রয়ী, সৎ ও দেশপ্রেমী হতে শিক্ষা দিতাম, তারাও তার পরিবর্তে কিশোরোচিত উৎসাহ, যুবোচিত উদ্দীপনা এবং জীবনের প্রতি উজ্জ্বল দৃষ্টিভঙ্গি আমার মধ্যে সঞ্চারিত করত। যখনই আমি ক্লাশরুম থেকে ফিরে আসতাম আমি অধিকতর যুবোচিত শক্তি সঙ্গে করে ফিরতাম। আমার দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে কর্মের সংস্পর্শে সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত এই শক্তিই ছিল আমার চরম সম্পদ।

ফ্রেডারিক দ গ্রেট কোন স্কুল-মাষ্টারকে কোন প্রশাসনিক কার্য্যে নিযুক্ত করতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বলেছিলেন, বঙ্গদেশের জনৈক লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর সেই নিয়মেরই অনুসরণ করতেন। নানা বিষয়ের সংস্পর্শে থাকার ফলে জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় গুণগুলি স্কুলমাষ্টারেরাই আয়ত্ত করতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক রাষ্ট্রপতি স্কুলমাষ্টারদের ভিতর থেকেই হয়েছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ তরুণদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে আমি যে কিরূপ উপকৃত হয়েছিলাম তা' বলে শেষ করা যাবে না। যদিও এখন আমি শিক্ষকতা করি না তথাপি কলেজ কাউনসিলের সভাপতি হিসাবে আমি কলেজ পরিচালনার সঙ্গে এখনো যুক্ত রয়েছি। যেদিন পার্থিব সমস্ত বিষয়ের প্রতি আমার উৎসাহ থেমে

যাবে কেবল সেদিনই কলেজ ও শিক্ষার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্কের অবসান হবে।

পাঁচ বছর আমি সিনেটের সদস্য ছিলাম। কোন সরকারী মনোনয়নের ফলে আমি এ আসন লাভ করি নি। আমাকে নির্ব্বাচনের জন্য আমি ছিলাম আমার সমকক্ষ-স্নাতকদের নিকটেই ঋণি। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রিভুক্ত স্নাতকেরা পাঁচ জন সদস্যকে সিনেটে পাঠাবার অধিকার পেলেন। অন্তত দশ বছরের পুরাতন স্নাতকেরাই সদস্য নির্ব্বাচিত হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। আমি যখন নির্ব্বাচন প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালাম সকলের চেয়ে অধিক সংখ্যক ভোট পেয়ে আমি জয় লাভ করলাম।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হওয়ার পূর্ব্বে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত নিয়মেই এক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। যাঁরা ১৮৬৭ সালের পূর্ব্বে এম. এ. এবং বি. এ. পাশ করেছেন কেবল তাঁরাই নির্ব্বাচন প্রার্থীরূপে দাঁড়াতে পারতেন। সে বছরে বা সে বছরের পরে যাঁরা পাশ করেছিলেন তাঁরা কেন যে নির্ব্বাচন প্রার্থী হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন সে সমস্যার সমাধান সরকারী দানবেরা করেন নি। তার ফলে তখন এ বিষয় নিয়ে বহু মন্তব্য ও বহু সমালোচনাও হয়েছিল। ১৮৬৮ সালে যাঁরা স্নাতক হয়েছিলেন তাঁদের উপর বিশেষ কোন বাধা নিষেধ আরোপ করা ছিল না। পূর্ববর্ত্তী বছরের স্নাতকদের অপেক্ষা এঁদের নিকৃষ্ট বলে বিবেচনা করবারও কিছুমাত্র কারণ ছিল না। তৎসত্ত্বেও নির্ব্বাচন প্রার্থী হবার অধিকার থেকে কেন তাঁদের বঞ্চিত করা হ'ল? যদি এমন নিয়ম হত যে, কেবল মাত্র কমপক্ষে বিশ বা পঁচিশ বছরের পুরাতন স্নাতকেরাই প্রার্থী হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, তারও একটা সদর্থ করা যেত। বলা যেত অভিজ্ঞ স্নাতকেরা নির্ব্বাচন যোগ্য হবেন। আমার হিতাকাঙ্ক্ষীরা আমায় বলেছিলেন, সেরূপ করা হলে যাঁরা

নিয়মাবলী রচনা করেছিলেন তাঁদের গোপন উদ্দেশ্য সফল হত না। তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, আমাকে বাদ দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই এ নিয়মটি বিশেষভাবে রচিত হয়েছিল, যে হেতু আমি ছিলাম ১৮৬৮ সালের স্নাতক।

এরূপ ভাবে বাধা সৃষ্টি করা এতই অযৌক্তিক ছিল যে, তা' নিয়ে এলবার্ট হলে এক জনসভা আহূত হয়েছিল। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নেতৃস্থানীয় স্নাতক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এ নিয়ম পরিবর্ত্তনের সুপারিশ করে' প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল। কিন্তু সবই বৃথা হ'ল। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইনের দ্বারা অন্তত দশ বৎসরের পুরাতন স্নাতকদিগকে নির্ব্বাচন প্রার্থী হবার অধিকার নিশ্চিতভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করা অবধি সেই পুরাতন নিয়মই চলতে লাগল।

সিনেটে আমার সদস্য থাকা কালে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছিল সরকারের বিবেচনার জন্য রেগুলেশন সমূহ রচনা করা। আমি কমিটিতে ছিলাম। সকলেই কঠোর পরিশ্রম করলাম। আমাদের সমস্ত সুপারিশই যে গ্রাহ্য হয়েছিল একথা বলতে পারি না। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপারিশ অগ্রাহ্য হয়েছিল। আমাদের সুপারিশ ছিল, ইংলণ্ডের ইতিহাস প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য তালিকাভুক্ত থাকা উচিত। প্রস্তাবিত রেগুলেশন সমূহের চূড়ান্ত বিচারের জন্য একটি সরকারী পর্য্যায়ের কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটি আমাদের উক্ত সুরারিশ অগ্রাহ্য করল। ইংলণ্ডের ইতিহাস যারা জানে না তারা যে কি ভাবে ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করবে তা' এমনি এক বিভ্রান্তিকর বিষয় যে, তার সমাধান একদিন না একদিন রেগুলেশন রচয়িতা ও ভারত সরকারকে কোন না কোন ভাবে করতেই হবে।

আমি যখন সিনেটের সদস্য হই তখন উপাচার্য্য ছিলেন

স্যার অ্যালেকজেণ্ডার পেডলার। বিশ্ববিদ্যালয় আইন রচনাতে তাঁরই প্রধান ভূমিকা ছিল। লেজিসলেটিভ কাউনসিলে আইনটিকে তিনিই পরিচালিত করেছিলেন। আইনটিও প্রধানত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনেই পরিকল্পিত হয়েছিল। এবং যথাযথ ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানও তাঁকেই করা হয়েছিল। তাঁর পরে বিচারপতি মিঃ আশুতোষ মুখার্জী সে পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালের পরিচয়, শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাবলী সম্পর্কে তাঁর বিস্তৃত উপলব্ধি, এ সমস্ত বিষয় নিয়ে কাজ করার মত তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ইত্যাদির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষ সর্ব্বাধিক আকর্ষণীয় ব্যক্তি হয়ে উঠেন। অনেক বছর পর্য্যন্ত তিনি উপাচার্য্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর কার্য্যকালে সর্ব্বোচ্চ প্রভাব প্রয়োগ করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনা করতেন। একথা বলা প্রয়োজন যে, তিনি বিচার বিবেচনা করে, প্রত্যেকের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশন সমূহ ব্যবহার করেতন। তার ফলে বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজের মনের মধ্যে তৎপূর্বে যে সমস্ত উদ্বিগ্নতা ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল, তা' আংশিক ভাবে প্রশমিত হয়েছিল। তিনি উপাচার্য্য থাকা কালেই একটি বিজ্ঞান কলেজের জন্য স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাশবিহারী ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের রাজোচিত দানসমূহ করেছিলেন। তাঁর কর্ম্ম দক্ষতায় তাঁদের আস্থা ছিল। তাঁরা নিঃসন্দেহে মনে করেছিলেন যে, যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে তাঁরা সাহায্য দিয়েছেন, স্যার আশুতোষের দক্ষতা ও পরিচালনার ফলে সে-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় ভাবেই স্থাপিত হবে। তাঁর যেমন একাগ্রতা ও কর্ম্মকুশলতা ছিল এমন একাগ্রতা ও কর্ম্মকুশলতাহীন কোন্ উপাচার্য্যের পক্ষে এরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি করা বোধ হয় কখনো সম্ভব হত না। তিনি যখন উপাচার্য্য

রূপে কাজ করছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর বিভাগেও শিক্ষণের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

স্যার আশুতোষের পরিচালন কালে একটি বিষয় নিয়ে যে অত্যধিক মন্তব্য ও সমালোচনা হয়েছিল তা' হ'ল একমাত্র রিপন কলেজ ব্যতীত অন্য সমস্ত বেসরকারী কলেজে আইন অধ্যয়ন বন্ধ করে দেওয়া। সম্ভবত তাঁর মূলগত উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিখ্যাত আইন-কলেজ সমূহের অনুরূপ একটি আদর্শ কেন্দ্রীয় কলেজ স্থাপন করে' আইন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মান উন্নয়ন করা। তবে বেসরকারী কলেজের আইন-অধ্যয়ন বন্ধ করে দেওয়ার পরিবর্ত্তে অধ্যাপনার মান উন্নত করার উপর জোর দিয়েও সে উদ্দেশ্যকে সফল করা যেত। স্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলে শিক্ষা কেন্দ্রে দক্ষতার মান উন্নত হয়। একচেটিয়া অধিকার জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকরই হয়ে থাকে।

বিচারপতির কাজ হ'তে অবসর নেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু বঙ্গদেশের ও ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সাঙ্ঘাতিক ক্ষতিকর হয়েছিল সেজন্য সর্ব্বাগ্রে দুঃখ প্রকাশ না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্যরূপে তিনি যত কাজ করেছিলেন তার বিবরণ সমাপ্ত করতে যাওয়া সম্ভব নয়। বঙ্গদেশের শিক্ষাজগতে তিনি ছিলেন এক অদ্বিতীয় পুরুষ। এবং তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করার উপযুক্ত লোক সহজে পাওয়া অসম্ভব। তাঁর সম্মানে সারা প্রদেশে যে সংখ্যক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা' থেকেই প্রমাণ হয় এই জাতীয়শোকে দেশবাসী কি প্রকার অভিভূত হয়েছিল।

১৯০১ সালে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্য হিসাবে আমার কাজ শেষ হ'ল। সেই বছরেই আমি ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্যপদ প্রার্থী হয়ে দাঁড়াই। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দ্বারভাঙ্গার বর্ত্তমান মহারাজা। আমার পরাজয়

হ'ল। যে সকল অবস্থার ফলে আমার পরাজয় ঘটেছিল, তা' ছিল বড়ই অদ্ভুত। মহারাজার ও আমার ভোট সমান সমান হ'ল। প্রত্যেকেই পেয়েছিলাম পাঁচ ভোট করে। বিষয়টি গেল ভারত সরকারের কাছে। কাউনসিলের রেগুলেশন অনুসারে ভোট দান সমাপ্তির দুই মাসের মধ্যে সরকারী আদেশ প্রকাশ হবার কথা। লর্ড কার্জ্জনের সরকার এ নীতি ভঙ্গ করলেন। তিন মাস পর্য্যন্ত সরকার কিছুই করলেন না। তারপর বেঙ্গল কাউনসিলে আমার সদস্য থাকার কাল যখন শেষ হয়ে গেল এবং সে কারণে আমার পক্ষে আমার ভোট দেবার অধিকার যখন লুপ্ত হ'ল, তখনই ভারত সরকার পুনর্নির্ব্বাচনের আদেশ দিলেন।

এ ছিল এক কূটনৈতিক চালবাজী। তখনকার নিয়মের বিরোধী। তার মধ্যে ন্যায়বিচারের চিহ্নমাত্র ছিল না। আর তার পরিণতি হয়েছিল, আমি গভর্ণর-জেনারেলের কাউনসিল থেকে বাদ পড়লাম। তার পূর্ব্বেও আমি ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের আসনের জন্য বহুবার দাঁড়িয়েছিলাম। আমার ধারণা প্রতিবারেই আমার বিরুদ্ধে সরকারী প্রভাব প্রযুক্ত হয়েছিল। আমার এক বিহার প্রদেশীয় বন্ধুকে বেঙ্গল কাউনসিলে সদস্য হ'তে সাহায্য করেছিলাম। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি আমাকে নিশ্চিতই ভোট দিতেন। কিন্তু একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এ বিষয়ে তাঁকে অনুরোধ করায় তা' উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। উভয় পক্ষের কারও নামের উল্লেখ না করে, ঘটনাটি সে সময় সংবাদ পত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়
বঙ্গদেশ বিভাজন

বঙ্গদেশের ইতিহাসে ১৯০৫ সন একটি স্মরণীয় বছর। এ বছরেই যে এক নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল সে কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। এই বছরটি দেশের ভবিষ্যত ইতিহাসে ও বঙ্গদেশের জনজীবনে এক গভীর ও সুদূর প্রসারী প্রভাব রেখে গেছে। এ বছরেই বঙ্গদেশ বিভক্ত হয়েছিল।

কিছুকাল যাবৎ সরকারী মহলে এক ধারণা হয়েছিল যে, একজন একক শাসকের দায়িত্বের পক্ষে বঙ্গদেশটি অনেক বড় এবং তার প্রশাসনিক মানের উন্নতির স্বার্থে তাকে বিভক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। এ ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই ১৮৭৪ সালে আসাম প্রদেশকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পৃথকভাবে শাসিত অঞ্চল হিসাবে একজন চীফ্ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। যদিও সেই বিচ্ছিন্ন করা আসাম প্রদেশের মধ্যে শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়াল পাড়া এ তিনটি বঙ্গভাষাভাষী জিলাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তবুও তখন এ বিষয় নিয়ে কেহই কোন সমালোচনা করে নি। সে সময় জনমত বলতে তেমন কিছুই ছিল না। আর তখন বঙ্গভাষাভাষীদের সংহতিও ছিল না এবং প্রদেশের জনজীবনে ক্রমবর্দ্ধমান একত্ববোধও সেরূপ দানা বেঁধে উঠে নি। তার ফলে এক প্রকার বিনা আপত্তিতেই পরিবর্ত্তনটি ঘটে গিয়েছিল। হয়ত তাঁদের স্বার্থের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে এই আশা করে' আসামবাসীরা একে স্বাগতই জানিয়েছিলেন।

কিন্তু ভালই হোক আর মন্দই হোক সব কিছুই ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। প্রশাসনিক বিষয়ে বা মানুষের অন্য সব বিষয়েও কোনকিছু চিরদিন স্থির থাকে না। আমলাতন্ত্রীরা অবিলম্বেই আবিষ্কার করলেন যে বিচ্ছিন্নতার পরিকল্পনাকে সুদক্ষতা ও আমলাদের স্বার্থে

আরও বিস্তৃত করা প্রয়োজন। সরকারী কর্ম্মীদের কাঠামো বলতে আসামের নিজস্ব তেমন কিছু ছিল না। আসাম অঞ্চলের সিভিল সার্ভিসে লোক এত কম ছিল যে, তা' দিয়ে বিশেষ কোন কর্ম্মচারী-কাঠামো নির্ম্মাণের কোন যৌক্তিকতাও থাকতে পারে না। কখনো বঙ্গদেশ থেকে কখনো বা উত্তর প্রদেশ থেকে সরকারী কর্ম্মচারীদের নিয়ে কোন নির্দ্দিষ্টকালের জন্য আসামে নিযুক্ত করা হ'ত এবং কার্য্যকাল শেষ হলে তারা নিজ নিজ প্রদেশের চাকরীতে ফিরে যেত। আসামে উচ্চতর সরকারী পদের সংখ্যাও ছিল কম আর তাতে উন্নতির সম্ভাবনাও ছিল নিতান্তই সামান্য। আসামের স্বার্থ এ সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের স্বার্থের সঙ্গেও জড়িত ছিল। আর এজন্যই আসামকে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রদেশে পরিণত করা বিশেষ প্রয়োজন বোধ হল।

অধিকতর বিভাজননীতি অনুসরণ করে সরকারী আমলারা এক বৃহত্তর আসাম গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। প্রস্তাব হল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জিলা নিয়ে গঠিত যে চট্টগ্রাম বিভাগ ছিল তাকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হোক। বঙ্গদেশের জনমতের সমর্থন সহ চট্টগ্রামবাসীগণের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হ'ল। শাসন সংস্কারের পর তখন নূতন লেজিসলেটিভ কাউনসিল পুনর্গঠিত হয়েছে। জনমত তখন ক্রমশ বর্দ্ধিত হয়ে চলেছে। তাকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করা তখন আর সম্ভব নয়। প্রবল প্রতিবাদের ফলে প্রস্তাবটি বর্জ্জন করা হল। কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যক্ত হ'ল না। কোন এক অধিকতর শুভমুহূর্ত্তে আত্মপ্রকাশের আশা নিয়ে প্রস্তাবটি আমলাদের মনমানসের অন্তস্থলে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

লর্ড কার্জ্জন তখন ক্ষমতার শীর্ষে। তাঁর উৎসাহ খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। সমস্ত কিছুই ওলটপালট করে চলেছেন। প্রাদেশিক

সীমারেখার প্রতি তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল। ভারতের ম্যাপটিকে শান্তিপূর্ণভাবে তিনি নূতন করে অঙ্কিত করবেন, যার মধ্যে থেকে যাবে তাঁর প্রতিভা ও উচ্চতম ব্যক্তিত্বের ছাপ। যে প্রশ্নটি এতদিন অনিশ্চিত ভাবে ছিল সেটিই এখন উপস্থিত হ'ল। বিষয়টি হাতে নিয়ে তাকে আরও বিস্তৃত করা হ'ল। প্রস্তাবটি এখন যে আকার নিল তা' হ'ল, সমস্ত চট্টগ্রাম বিভাগটিকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জিলাও তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সমস্ত অঞ্চলটিকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বঙ্গদেশের জনগণের নিকটেও এই আকারেই প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য উপস্থিত হ'ল। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে বঙ্গদেশের সমস্ত লোকের মধ্যেই এর বিরুদ্ধে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল। দিকে-দিকে প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'তে লাগল। এই প্রতিবাদ উপেক্ষা করা ছিল সরকারের ক্ষমতার বাইরে। পূর্ব্ববঙ্গের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে তাদের বশ করে' তাদের সম্মতি অর্জ্জনের জন্য সরকার চেষ্টা করতে লাগল। এ সমস্ত বৈঠক বসত তৎকালীন লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার এণ্ড ফ্রেজার-এর সভাপতিত্বে "বেলভেডিয়ার" প্রাসাদে। মিঃ (পরে স্যার এ.) চৌধুরী তখন ছিলেন এক নব গঠিত জমিদার সমিতির জীবন ও আত্মার স্বরূপ। এ সমস্ত বৈঠকের ব্যবস্থাও তিনিই করতেন। মিঃ চৌধুরী আমাকেও এ সমস্ত বৈঠকে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। আমি বললাম, এ রকম একজন উপযুক্ত লোকের হাতে যখন এ সব ব্যবস্থার ভার রয়েছে তখন আমার যোগ দেবার কোনই প্রয়োজন নেই। উৎসুক দর্শকের মত আমি এ সব কর্ম্মপ্রণালী লক্ষ্য করে যেতে লাগলাম। আমি সব জানতে ও প্রয়োজন হলে সাহায্য করতেও আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে এ সব বৈঠকে যোগও দিলাম না, তাতে কোন অংশও গ্রহণ করলাম না।

আমার একটা ধারণা হয়েছিল যে, এ সমস্ত আলোচনা ও বৈঠকের

ফলে সরকার জনমতের কাছে মাথা নত করে সমর্থনের অযোগ্য এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু পরে প্রমাণ হয়েছিল যে, আমার এরূপ ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ হবার মত কিছুই ছিল না। ব্যক্তিগত ভাবে জনমত সম্বন্ধে জানবার অছিলায় লর্ড কার্জ্জন পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণে গেলেন। কিন্তু তার বাস্তবিক উদ্দেশ্য ছিল ভীতিপ্রদর্শন করে' কার্য্য উদ্ধার করা। তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে দেশের সর্বত্র যে এক নূতন উদ্দীপনা জন্মলাভ করেছিল সে বিষয়ে তিনি এতই অজ্ঞ ছিলেন যে, তিনি মনে করেছিলেন তিনি একবার সেখানে উপস্থিত হলেই পূর্ব্ববঙ্গের নেতাগণ তাঁর ইচ্ছামত উঠ্‌বস্‌ আরম্ভ করবেন। তিনি হিসাবে ভুল করেছিলেন। ময়মনসিংহতে গিয়ে তিনি মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য মহাশয়ের অতিথি হলেন। বঙ্গদেশের জমিদারদের মধ্যে এরূপ সুরুচিসম্পন্ন এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্বপূর্ণ লোক খুব কমই ছিল। লর্ড কার্জ্জনের সম্মানে তিনি তাঁর জন্য রাজকীয় আতিথেয়তার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু নম্র অথচ দৃঢ় মর্য্যাদাপূর্ণ ভাষায় লর্ড কার্জ্জনকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, বঙ্গদেশ বিভাজনকে তিনি এক মারাত্মক বিপর্য্যয় বলে মনে করবেন এবং কিছুতেই তিনি তা' সমর্থন করবেন না। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যখন চলছিল তিনি ছিলেন তার পুরোধাদের অন্যতম।

এই পরিভ্রমণের সময় দেশ বিভক্ত করার পরিকল্পনাকে আরও বিস্তৃত করা হ'ল। প্রথমবারের মত এখন প্রস্তাব করা হ'ল, এই পরিবর্দ্ধিত ও পরিকল্পিত পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে সমস্ত উত্তরবঙ্গ এবং ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জিলাগুলিও অন্তর্ভুক্ত হ'বে।

অত্যন্ত গোপনে বসে গোপন আলোচনার পর চুপিচুপি এই সংশোধিত পরিকল্পনাটি স্থির করা হল। জনসাধারণ তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারল না। কোন প্রতিনিধিমূলক বৈঠকের সামনে তা' উপস্থিত করার রীতিও আর অনুসরণ করা হল না। লর্ড মর্লে তাঁর

আসন থেকে পার্ল্যামেণ্টে বলেছিলেন, "এই চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি বিচার বিবেচনার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের কোন ব্যক্তির কাছেই উপস্থাপিত করা হয় নি"। কিন্তু কেন? এই যে লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের সভাপতিত্বে বেলভেডিয়ার প্রাসাদে পূর্ব্ববঙ্গের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনার প্রথম স্তরে উচ্চকণ্ঠে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধার ও তজ্জন্য বারংবার উৎকণ্ঠা প্রকাশের ভান করা হয়েছিল সে সবেরই বা কি হ'ল ?

প্রকৃত ঘটনাটি ছিল জনমতকে শ্রদ্ধা করবার বা তাদের মত মেনে নেবার আদৌ ইচ্ছা কোনদিন সরকারের ছিল না। লর্ড কার্জ্জন এবং স্যার এণ্ড্রু ফেজার মনে করেছিলেন নেতারা তাঁদের কথা মেনে নিতে সম্মত হবেন। যখন তাতে সফল হলেন না, তখন তাঁরা জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। কিন্তু যথাযথ প্রশাসন নীতিতে যে অন্তর্নিহিত সাহসের প্রয়োজন তা' তাঁদের ছিল না। এই কারণে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত ভাবে স্থির হবার পর জনসাধারণকে সে সম্পর্কে কিছুমাত্র জানতে না দিয়ে তাকে এক গোপন পত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল। বস্তুত লর্ড কার্জ্জনের পূর্ব্ববঙ্গ পরিদর্শনের পর ঝড়ের পূর্ব্বাভাসের মত এমন এক স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল যে, অনেকে মনে করেছিল হয়ত বঙ্গ বিভাজন পরিকল্পনাটিই পরিত্যক্ত হয়েছে। গোপনে গোপনে কি স্থির হয়েছিল আমরা যদি তার কিঞ্চিৎ মাত্র আভাসও পেতাম, তা' হ'লে সেই গোপন পত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ইংলণ্ডে এক প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণ করতাম, যাতে সেই গোপন পত্রের সুপারিশকে বানচাল করে' দেওয়া যেতে পারে। আমি নিজেও সেই প্রতিনিধিমণ্ডলীতে যোগ দিতাম।

ভারত সচিবের পত্র থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে, তিনি ইতস্ততঃ করেই বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, এক বিকল্প পরিকল্পনা দিয়ে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে

যেমন সিন্ধু প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, অনুরূপ ভাবে এ ক্ষেত্রেও প্রশাসনের বোঝা লাঘব করা যেতে পারে। এবং আমি যখন ১৯০১ সালে গরমের সময় লণ্ডনে মিঃ ব্রোডরিক্-এর সঙ্গে দেখা করি এবং বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে আলোচনা করি, সে সময় তিনি তা' ন্যায্য হয়েছে বলে' প্রমাণ করতে এতটুকুও চেষ্টা করেন নি। এটি আমার স্থির বিশ্বাস যে, এই চূড়ান্ত পরিকল্পনার বিষয়ে যদি গভীর গোপনতা রক্ষা না করা হ'ত এবং সে কারণে সংবাদের অভাববশত আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট না থাকতাম, তা' হ'লে ভারতসচিব কোন মতেই বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে সম্মতি দিতেন না। সময় মত ইংলণ্ডে যদি প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণ করা যেত তা' হ'লে সেখানেই তার যবনিকাপাত হ'ত। তবে কি যে হ'তে পারত তা' নিয়ে গবেষণা করা অনর্থক।

১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই ঘোষণা করা হ'ল বঙ্গদেশকে বিভক্ত করা হবে এবং সেই পরিকল্পনার বিশদ অংশগুলিও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হ'ল। এই প্রথমবার সকলে জানতে পারল যে, উত্তরবঙ্গ ও তার সমস্ত ঐতিহাসিক সম্পর্ক পুরাতন প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। সংবাদ শুনে মানুষের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। জনসাধারণ তখন বিস্ময়ে বিহ্বল। কিন্তু বিহ্বলতা সত্ত্বেও আমরা দিশাহারা হলাম না। আমরা বৈধ উপায়ে আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে প্রতিরোধ করতে অথবা যা'তে এই বিভাজন পরিকল্পনা পরিত্যক্ত না হলেও তাকে অন্ততঃ সংশোধন করে নেওয়া হয় এ চেষ্টা করতে সঙ্কল্প করলাম।

আমাদের মনে হতে লাগল, আমাদের উপর চালাকী করা হয়েছে, আমাদের অপমান করা হয়েছে এবং আমাদের অত্যন্ত হীন করা হয়েছে। আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের ভবিষ্যত যেতে বসেছে। বঙ্গভাষাভাষীদের ক্রম বর্দ্ধমান জাগৃতি ও সংহতিকে ধ্বংশ করবার উদ্দেশ্যে এটি একটি গূঢ় চক্রান্ত। প্রথমে, এতে ছিল প্রশাসনিক উদ্দেশ্য

সাধন। তারপর তার রং পরিবর্ত্তন হ'ল, তারমধ্যে রাজনৈতিক গন্ধ সঞ্চারিত হ'ল এবং এভাবে যদি তাকে চলতে দেওয়া হয়, তা' হ'লে হিন্দু-মুসলমানের যে ঘনিষ্ঠ একতার উপর ভারতের উন্নতির সম্ভাবনা প্রধানত নির্ভর করে, তা' এবং তৎসঙ্গে দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির স্বপ্নও চিরকালের মত ধ্বংস হয়ে যাবে। এরূপ মনে করবার কারণ এই যে, সরকারী পক্ষ থেকে একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে, পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি মুসলমান প্রদেশ গঠন করা হ'বে এবং এই নবগঠিত প্রদেশে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যকেই নূতন নীতি হিসাবে স্বীকার করে' নেওয়া হবে।

কাল বিলম্ব না করে' আমরা কাজে নেমে পড়লাম। পাথুরিয়াঘাটায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে আমরা এক পরামর্শ সভার আয়োজন করলাম। সেই সভাতে মহারাজা স্বয়ং উপস্থিত থেকে আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন।

পরামর্শসভায় স্থির হ'ল মহারাজা ভাইসরয়-এর নিকট একখানি তারবার্ত্তা পাঠিয়ে তাঁর নির্দ্দেশটি পুনর্বিবেচনা করে' দেখতে অনুরোধ করবেন এবং যদি প্রশাসনিক কারণ বশতঃ বঙ্গদেশ বিভক্ত করা অপরিহার্য্য হয় তা' হ'লে যাতে সমস্ত বঙ্গভাষাভাষী একই প্রশাসনের অন্তর্গত হয়ে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা যেন তিনি করেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, পরবর্ত্তীকালে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন দেশ বিভক্ত করেছিলেন তখন এই সভায় গৃহীত নীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন।

বঙ্গদেশকে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করে' তার একটিতে সমস্ত বঙ্গভাষাভাষীকে এবং অপরটিতে অবশিষ্ট সকলকে যদি রাখা হত, তা' হ'লে সমস্ত প্রশাসনিক অসুবিধাও দূর হয়ে যেত, আর জনসাধারণও সন্তুষ্ট হ'তে পারত। কিন্তু তাতে লর্ড কার্জ্জন ও তাঁর সরকার সন্তুষ্ট হতেন না। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, তার পশ্চাতে এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। মহারাজার অনুরোধ রক্ষা করতে গেলে সে উদ্দেশ্য

সফল হ'ত না। লর্ড হার্ডিঞ্জ আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করেছিলেন, তবে তাঁর নীতি ও উদ্দেশ্য ছিল লর্ড কার্জ্জনের নীতি ও উদ্দেশ্য থেকে স্বতন্ত্র।

মহারাজার প্রাসাদে এই সভা হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই পরামর্শ সভা বসত। কখনো বসত ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের ঘরে, কখনো ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে। বঙ্গ-বিভাজনের বিরোধী ইতিহাসে ৭ই আগষ্ট একটি স্মরণীয় দিন। সভায় স্থির হয়েছিল যে ৭ই আগষ্ট টাউন হলে একটি জনসভা করতে হবে। সভায় উপস্থিত থাকবার জন্য প্রতিনিধিগণকে নিমন্ত্রণ করে মফস্বলে পত্র প্রেরণ করা হ'ল। সাড়া পাওয়া গেল উৎসাহব্যঞ্জক ও পূর্ণমতৈক্যের। মফস্বলের লোকদিগকে সংগঠিত করবার উদ্দেশ্যে এবং তা'দিগকে অধিকতর সময় দেবার জন্য ময়মনসিংহ থেকে বন্ধুবর বাবু অনাথবন্ধু গুহ সভাটি মুলতুবি করে সভার তারিখ পালটে দেবার জন্য অনুরোধ করে আমার নিকট এক চিঠি পাঠালেন। আর সময় ব্যয় না করে অবিলম্বে প্রথম আক্রমণ আরম্ভ করবার জন্য সকলেই এত উদ্‌গ্রীব ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, সহকর্ম্মীদের সঙ্গে পরামর্শের পর আমি উত্তর দিলাম, সময়ের মূল্য এখন অত্যন্ত অধিক। সত্বরই প্রথমে বিরাটভাবে এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে যাতে এই আন্দোলনকে তা' পথ দেখাতে ও নেতৃত্ব দিতে পারে এবং সারা প্রদেশে যেরূপে আন্দোলন বিস্তৃত ও প্রসারিত হবে তার সঙ্গে তা' সমন্বয় রক্ষা করতে পারে।

৭ই আগষ্টের সভায় যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে তা' নিয়ে একাধিক বৈঠকে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হ'ল। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ থেকে নেতারা এসে সে সমস্ত বৈঠকে যোগ দিতেন। সকলের ধারণা হয়েছিল যে, কেবল জনসভা করে' বিশেষ লাভ হবে না। লর্ড কার্জ্জনের সরকার এ সমস্ত জনসভাকে ক্রমাগত অবজ্ঞা করে' এসেছে এবং জনসাধারণের

বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রতি স্পষ্ট ভাবে ঘৃণা প্রকাশ করেছে। সেজন্য তার অতিরিক্ত কিছু করা এখন প্রয়োজন। এমন কিছু করতে হবে যা' থেকে প্রমাণ হবে যে, এই আন্দোলনের পশ্চাতে রয়েছে মানুষের তীব্র ক্রোধ। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের ঘরে বসে প্রায় প্রতিদিন বৈঠক হ'ত। বৈঠকগুলিতে বিভিন্ন ধরণের যে সকল প্রস্তাব আসত সে সব এখনো আমার মনে আছে। তন্মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল—আমরা অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যপদ ইত্যাদির মত যে সমস্ত পদের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম সে সব ত্যাগ করব। কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবে এই আপত্তি উঠল যে, এ সমস্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার-আসন প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকলে আমাদের দেশবাসীদিগকে সেবা করবার সুযোগ পাওয়া যাবে এবং ভবিষ্যত সংগ্রামের পরিপোষক প্রভাব-প্রতিপত্তির উৎস হিসাবেও তা'দিগকে ব্যবহার করা যাবে। তদ্ভিন্ন এরূপ এক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সমগ্র দেশ যে আমাদের অনুসরণ করবে সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এই বিরাট আসন্ন সংঘর্ষের মুখে কোন আংশিক নিস্ফলতাও সর্ব্বনাশ ঘটাবে। এ সমস্ত বিচার করে সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হ'ল।

ঊনবিংশ অধ্যায়

বর্জ্জননীতি ও স্বদেশী আন্দোলন

এ সমস্ত আলোচনা যখন চলছিল, তখন একটা বিষয় নিয়ে সকলেই বিশেষ ভাবে বলাবলি করতে থাকেন। এটিই পরে "বর্জ্জন আন্দোলন" বা 'বয়কট্ মুভ্‌মেণ্ট' নামে আমাদের আলোচনার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। এর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে। কার উর্ব্বর মস্তিষ্ক থেকে তা' উৎসারিত হয়েছিল—কবেই বা তা' দেখল প্রথম আলো? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া শক্ত। কোন ঘটনার ফলে মানুষের মধ্যে যখন আলোড়ন উঠে তার মনের গোপন উৎসসমূহকে স্পর্শ করে এবং যখন কোন চরম দুর্দ্দশা তার সুপ্ত শক্তিগুলিকে চালিত করতে থাকে, অথবা যখন জাতির ইতিহাসের কোন অধ্যায়কে উন্মুক্ত করবার সম্ভাবনায় কোন এক বাঞ্ছিত আদর্শের নিমিত্ত কাজ করবার অভিপ্রায়ে মানুষ উন্মত্ত হয়, তখন নূতন নূতন চিন্তাধারার চাপে তার আদর্শের পরিবেশও ফলপ্রসূ হয়ে উঠে। কারণ তখন সমস্ত সমাজের মনও কাজ করতে আরম্ভ করে এবং জাতির সামগ্রিক চিন্তাধারার প্রতি তার যা' দেয় তা' থেকে তাকে বঞ্চিত করে না।

ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্ল্‌স ও তাঁর পার্ল্যামেন্টের মধ্যে যে গৃহবিবাদ হয়েছিল তার প্রাক্‌কালে ইংরেজদের সমাজের অবস্থা সম্পর্কে মেকলের লেখা বহু সুস্পষ্ট বিবরণ ছাত্রজীবনেই পড়েছিলাম। আসন্ন সংগ্রাম কি ভাবে অন্য সমস্ত কিছুকেই ছেয়ে ফেলেছিল, কিরূপে তা' বিলাতের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে' লোকে যখন আগুনের চারপাশে বসে' আগুন পোহাত তখন সকলের মুখে মুখে আলোচিত হ'তে থাকত, কি প্রকারে তা' মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে নূতন

জীবনের সন্ধান দিয়ে উদ্দীপিত করে তুলত, এ সমস্ত বিষয়ের নিখুঁত বিবরণ মেকলের লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গও অনেকটা ঐ ধরণের এক উৎকণ্ঠায় মানুষের মনকে ছেয়ে ফেলল। কেউ যা কোনদিন কল্পনাও করে নি এরূপ এক ঘটনা তাদের প্রদেশকে কি অবস্থায় নিয়ে চলেছে তা' ভেবেই সমস্ত লোক অস্থির হয়ে উঠল। বেলভেডিয়ার প্রাসাদে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পর সমস্ত ঘটনাবলী দেখে মানুষ প্রবল বিস্ময় ও ঘৃণার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে লাগল। মানুষের মনের যখন এই অবস্থা তখনই, কে জানি না, হয়ত বহুলোক একসঙ্গে বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন আরম্ভ করল। প্রথমে পাবনার এক জনসভায় তা' প্রচার করা হ'ল। তারপর মফস্বলের অন্যান্য সহরেও জনসভা করে' তার প্রচার আরম্ভ হয়। চীনদেশীয়েরা যে সফলতার সঙ্গে মার্কিন পণ্য বর্জ্জন করেছিল সমগ্র এশিয়া মহাদেশে তা' প্রচার হ'তে লাগল। ভারতের সংবাদপত্রগুলিতেও সে সব তথ্য উদ্ধৃত হ'তে লাগল।

কিছুকাল পূর্ব্ব থেকেই একটি শিল্পোন্নতি আন্দোলন আরম্ভ করবার কথা মানুষের মনে দানা বাঁধছিল। বিলেতী পণ্য বর্জ্জিত হলে দেশীপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং তাতে দেশীশিল্পের উন্নতি হবে। এ কারণে বিলেতীপণ্য বর্জ্জন আন্দোলনকে শিল্পোন্নতি আন্দোলন আরও শক্তিশালী করে তুলল। স্বদেশী আন্দোলন ত আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। অন্তত স্বদেশীর প্রেরণা তখন সর্ব্বত্র আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একদল তাতে প্রচুর উৎসাহ যোগাচ্ছে। প্রত্যেকেই ক্রমশ অনুভব করতে লাগল শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা কিরূপ অসহায়। অনতিবিলম্বে সকলে বুঝতে পারল যে, ব্যাপকতায় ও প্রকৃতিতে এই পণ্যবর্জ্জনের ফলে এক ঢিলে দু' পাখী মারা যাবে। রাজনৈতিক ও শিল্পনৈতিক উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হবে।

দিনের পর দিন আমাদের পরামর্শ সভাগুলিতে পণ্য বর্জ্জনের বিষয়টি উৎকণ্ঠার সঙ্গে আলোচিত হ'তে লাগল। এই আলোচনার ফলে আমাদের মধ্যে এক প্রকার মতৈক্যও প্রতিষ্ঠিত হ'ল। প্রত্যেকেই স্বীকার করল যে, তখন জনসাধারণের মনের যেরূপ অবস্থা, তাতে এই আন্দোলনে জনগণের সমর্থন পাওয়া যাবে। তার ফল দেখে পরে দেখা গিয়েছিল যে, আমাদের এ ধারণা বাস্তবিকই নির্ভুল ছিল।

এর বিরুদ্ধে একমাত্র যে আপত্তি দেখা দিয়েছিল এবং যা' নিয়ে বিশেষভাবে বিচার বিবেচনাও করা হয়েছিল, তা' হ'ল আমাদের যে সমস্ত হিতৈষী ইংরেজ বন্ধু ছিলেন তাঁদের মনের উপর এর প্রতিক্রিয়া কি হবে। তাঁরা কি একে সমর্থন করবেন? তাঁরা কি এর প্রতি সহানুভূতীশীল হবেন? তাঁরা কি একে আমাদের একটি স্পষ্ট বিরূপ মনোভাবের প্রকাশ বলে গণ্য করবেন না? আমি আগেই বলেছি কোলকাতাতে তখন বহু ইংরেজ ছিলেন যাঁরা বঙ্গভঙ্গ নীতি এবং যে উপায়ে ও যে ভাবে তা' কার্য্যে পরিণত করা হয়েছে, তার তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁরা তাঁদের পরামর্শ ও নৈতিক সমর্থন দিয়ে আমাদের সহায়তা করছিলেন। তাঁদের সহানুভূতি আমাদের যথেষ্ট উপকার সাধন করছিল। এবং যাতে আমরা তা' থেকে বঞ্চিও না হই, আমাদের এ সমস্ত বন্ধু যাতে আমাদের প্রতি বিরাগ না হন, সে বিষয়ে আমরা সচেষ্ট ছিলাম। তা' ছাড়া ভারত সরকারের সংকল্পের বিরুদ্ধে আমাদের আবেদন ছিল বৃটিশ জনসাধারণেরই কাছে। লর্ড কার্জ্জন ও ইণ্ডিয়া অফিস যে তাঁদের আদেশের পুনর্বিবেচনা বন্ধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন সে কথাও আমাদের অজানা ছিল না। এ সমস্ত কারণে বৃটিশ জনসাধারণ আমাদের এই বিলেতীপণ্য বর্জ্জননীতিকে কি ভাবে গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে আমরা বিশেষ চিন্তিত ছিলাম।

সে দিক থেকে আমাদের এই আন্দোলন মূলত বা পরেও কখনো বৃটিশ বিরোধী ছিল না, যদিও সরকারী সমালোচকেরা অবিরত সে

ভাবেই তার ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করত। যে সমস্ত ইংরেজের সঙ্গে তাঁদের দেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে আমরা মনে করতাম, তাঁদের কাছ থেকে এ বিষয়ে বিলেতের জনসাধারণ কি ভাববে, কি ভাবে তাকে নেবে, তা' জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকতাম। ভারত সরকারের আদেশ বাতিল করবার উদ্দেশ্যে যে-বৃটিশ জনসাধারণের নিকট আবেদন করা হবে সেই বৃটিশের বিরুদ্ধে যদি আন্দোলন করা হয় তাকে বুদ্ধির পরিচায়ক বলা চলে না। এই আন্দোলন যাঁরা আরম্ভ করেছিলেন তাঁদের কারও সাধারণ বুদ্ধির অভাব ছিল না। যা' করলে বৃটিশ জনগণ তাঁদের আবেদনে কর্ণপাত করবেন না এরূপ কোন কাজ করবার মত বুদ্ধিহীনও তাঁরা ছিলেন না।

টাউন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার শর্তগুলি পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় তাঁদের পরিপোষক স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্য কত সতর্কতা ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে উদ্যোক্তাগণ অগ্রসর হচ্ছিলেন। আমরা যে প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করব বলে স্থির করেছিলাম তাদের সম্পর্কে তাদের বিষয় বস্তু সম্পর্কে আমাদের ইংরেজ বন্ধুগণের সঙ্গে পরামর্শ করতে ও তাঁরা কি মনে করেন জেনে নিতে আমার উপর ভার দেওয়া হয়েছিল। এ সমস্ত আলোচনা ও মতামত আদান-প্রদান এতই গোপনে হয়েছিল যে, যাঁদের সঙ্গে তা' হয়েছিল এতদিন পরেও তাঁদের নাম প্রকাশ করা আমি উচিত বলে মনে করি না। তবে একথা বলা যায় যে, আমরা যে নীতি গ্রহণ করতে সাবস্ত্য করেছিলাম তাঁরা প্রত্যেকেই তা' গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে আমাদের চূড়ান্ত ও সর্ব্বশেষ পরামর্শসভা বসল। সেখানেই আমরা নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করার কথা নিশ্চিতভাবে স্থির করলাম :—

"ভারতের বিষয়ে বৃটিশ জনসাধারণের উদাসীনতার ফলে বর্ত্তমান সরকার ভারতের জনমতকে যেরূপে উপেক্ষা করিতেছেন তাহার

প্রতিবাদ স্বরূপ এদেশের মফস্বল অঞ্চলে অনুষ্ঠিত বহুসংখ্যক জনসভাতে বঙ্গদেশ বিভক্ত করিবার প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্য্যন্ত বিলাতী পণ্যক্রয় বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত সূচক যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার প্রতি এই সভা পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে।"

সুতরাং দেখা যাবে যে, বিলাতী পণ্যবর্জ্জন নীতিটি ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক সাময়িক ব্যবস্থা। উদ্দেশ্য সাধিত হবার পর এ নীতির প্রয়োজন শেষ হবে এবং তখন তা পরিত্যাগ করা হ'বে। এ নীতির একমাত্র অভীষ্ট ও উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গদেশের ব্যাপক অসন্তোষের প্রতি বৃটিশ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বঙ্গদেশ বিভক্ত করার প্রস্তাব সংশোধিত হ'লে মানুষের অভিযোগ লোপ পাবে এবং তখন পণ্যবর্জ্জন নীতিরও সমাপ্তি ঘটবে। এ প্রতিশ্রুতি পরে রক্ষাও করা হয়েছিল।

এই পণ্যবর্জ্জনের কার্য্যপদ্ধতির মাত্রা কোন কোন ক্ষেত্রে যে সীমা অতিক্রম করেছিল সে-কথা কেউ অস্বীকার করবে না। তবে যে-কোন আন্দোলন বৈধ উপায়ে করতে গেলে তার মধ্যে এরূপ অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হয়। মানুষের স্বভাবই সেজন্য দায়ী। যে-কোন আদর্শের কথাই চিন্তা করা যাক না কেন, তা যতই পবিত্র ও মহৎ হোক, তার সমর্থকদের মধ্যে সর্ব্বদা দুটি দল থাকে। তাদের একদল হয় নরমপন্থী, অপর দল চরমপন্থী। যে কোন বৈধ আন্দোলনের ক্ষেত্রেই কিছু পরিমাণ মাত্রাধিক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে সেজন্য জনগণের অভিযোগের প্রতিকারে বৈধ উপায় গ্রহণ করা হবে না, এরূপ কথা কেউ কোন দিন বলে না। এরূপ অভিমত যদি প্রকাশ করা হ'ত, তা' হ'লে মানব-ইতিহাসের অনেক আকর্ষণীয় অধ্যায় এখনো অলিখিত থেকে যেত। আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম প্রভৃতির মত যে-সমস্ত সদ্‌গুণ বৈধ উপায়ে মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত থাকে সেসব থেকে মানুষ বঞ্চিত হত। বঙ্গদেশে নিতান্ত মুষ্টিমেয় একদল

লোক বিদ্রোহাত্মক প্রচার কার্য্য চালিয়ে যাচ্ছে বলে, সমস্ত বৈধ উপায় পরিত্যাগ করতে হ'বে, এ কথা কে বলবে? অবশ্য ভারতের প্রগতি যাদের কাম্য নয়, ভারতের যারা চিরশত্রু তারা ততোধিক কিছু ইচ্ছা করে না। যারা ভারতের প্রকৃত হিতাকাঙ্খী তাদের কাছে তা' এক আকস্মিক দুর্ঘটনারই সামিল।

পণ্যবর্জ্জন প্রস্তাবের ভার বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের উপর অর্পিত হ'ল। তাঁর মত সংযমী দেশপ্রেমিক এবং একাজের উপযুক্ত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি বঙ্গদেশের তৎকালীন নায়কদের মধ্যে ছিলেন না। তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তখন চরমে। বঙ্গদেশে সে সময় ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র ছিল "ইণ্ডিয়ান মিরার"। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন তার সম্পাদক। বহুকাল যাবৎ অধ্যবসায় ও সাহসের সঙ্গে তিনি স্বদেশের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি যাঁরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন, তাঁরাও তাঁর চরিত্রের গাম্ভীর্য্য ও আত্মসংযমের জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁর দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে যাবেন বলেই আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু যে অপরিসীম জনপ্রিয়তা একদিন তাঁকে তাঁর দেশবাসীগণের পরামর্শদাতার শীর্ষাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে জীবনের অন্তিম অধ্যায়ে তার দীপ্তি স্তিমিত হয়ে পড়ল। বঙ্গদেশে সময়ের অনুপযোগী সন্ত্রাসবাদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রচার মানুষের মনোবৃত্তিকে এরূপ এক আবেগ প্রবাহে পরিচালিত করল, যা' ভবিষ্যতে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এতে নরেন্দ্রনাথ বিশেষ চিন্তিত ও হতাশ হয়ে পড়লেন। কর্ত্তৃপক্ষকে সমর্থন করতে উৎকণ্ঠিত হয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার যিনি একদিন ছিলেন পুরোধা তিনি দেশীয় ভাষায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্যে সরকার থেকে ভাতা গ্রহণ করতেও দ্বিধা করিলেন না।

সরকারের এ নীতি ছিল ইংরেজ চরিত্রের পরিপন্থী ও অবিবেচনা পূর্ণ। কারণ, এরূপ কোন পত্রিকা মানুষের মনে কোনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু যে সাংবাদিক-প্রচেষ্টাকে তাঁর দেশবাসী প্রবলভাবে নিন্দা করল, তারই পরিপোষণে বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন যে তাঁর নাম, প্রভাব, প্রতিপত্তিকে ব্যবহার করতে দিতে সম্মত হয়েছিলেন, তা' জাতির পক্ষে ছিল এক গভীর দুঃখের বিষয়। তবে এই অতি উজ্জ্বল ও উপকারী জীবনের এই ছিল একমাত্র কলঙ্ক। আমাদের যুগের ঐতিহাসিকেরা নরেন্দ্রনাথ সেনকে জনস্বার্থ রক্ষায় তাঁর নির্ভীকতা ও জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে তাঁর একাগ্র সেবাপরায়ণতার জন্য সমকালীনদের মধ্যে তাঁর যোগ্য আসন দেবেন। যদি এক অসাধারণ বাধাবিপত্তিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর অসতর্ক পদক্ষেপ স্খলিতও হয়ে থাকে, তবুও বলব আমাদের মধ্যে এমন নির্দোষ ব্যক্তি কে আছে, যে কখনো মনুষ্যোচিত কোন দুর্ব্বলতার শিকার হয় নি এবং যে অবলীলাক্রমে তাঁর প্রতিই প্রথম ঢিলটি নিক্ষেপ করতে পারে?

আমার মনে পড়ে সেই দিনগুলির কথা, যখন নরেন্দ্রনাথ সেনের যৌবনোচিত শক্তি, সামর্থ্য ও সৌর্য্য ছিল, যখন বার্দ্ধক্যের গুরুভার ও হতাশা তাঁর মহৎ অন্তঃকরণের উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় নি যখন তিনি ছিলেন অন্যায়কারীর আতঙ্কস্বরূপ এবং যখন তাঁর দেশের শত্রুরা তাঁকে দেখলে ভয়ে পিছিয়ে যেত। আমি তাঁকে তাঁর মৃত্যুর পূর্বদিনও দেখেছিলাম। তা' ছিল আগষ্ট মাসের এক অত্যন্ত গরমের দিন। নরেন্দ্রনাথ সেন লম্বাভাবে আপন শয্যায় শায়িত ছিলেন। এত দুর্বল ছিলেন যে, কথা পর্য্যন্ত বলতে পারছিলেন না। কিন্তু তবুও তাঁর মৌলিক মানসিক শক্তিগুলি তখনো ছিল প্রবল। আমাদের পরস্পারের মধ্যে কোন কথা হ'ল না। পরস্পরকে আমরা দেখলাম মাত্র। তিনি যে ভাবে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, আমার মনে হ'তে লাগল, তার মধ্যে যেন অতীত

স্মৃতিগুলি মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। তাঁর চোখ থেকে বিন্দুবিন্দু অশ্রু কপোল বেয়ে ঝড়ে পড়তে লাগল। আমার জলভরা চোখ তখন ছলছল করছে। আমি অশ্রুরোধের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলাম। আর আমার চতুর্দ্দিকে মৃত্যু-কক্ষ তখন আমাকে ঘিরে রয়েছে। এক গভীর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে আসতে আসতে আমি চিন্তা করতে লাগলাম একে একে আমার মাননীয় সহকর্ম্মিগণ বিদায় নিচ্ছেন আর এই জগতটা দিয়ে যাচ্ছেন "আমাকে ও গভীর তিমিরকে।"

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কোন ইউরোপীয় সংবাদপত্রে সে সময় পণ্যবর্জন প্রস্তাব গ্রহণকে নিন্দা করে' কিছু প্রকাশিত হয় নি। পরে যদিও ক্রোধ প্রকাশ পায়, কিন্তু ঠিক সে-সময় কোন তীব্র ক্রোধের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। ইংলিশম্যান পত্রিকা লিখেছিল, "এই পণ্যবর্জ্জননীতি যদি সফল হয় তা' হলে এ-বিবাদ আরও তিক্ত হবে, আর যদি সফল না হয় তা' হলে সমগ্র আন্দোলন ও তার সমর্থকেরা হাস্যাস্পদ হবে।" ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা সমস্ত আন্দোলনটিকে বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেবার প্রয়াসী ছিল। কিন্তু তা' এক বৃটিশবিরোধী উত্তেজনার প্রবর্ত্তক বলে কোন ক্ষোভ প্রকাশের চেষ্টা করে নি।

ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকা বলেছিল,—"যাঁদের চেষ্টাতে পণ্যবর্জ্জন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাঁরা যে চীনদেশবাসীদের দৃষ্টান্তেই অনুপ্রাণিত তা'তে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। সম্ভবত তাঁরা অতিরিক্ত আশাবাদী বলেই ধরে নিয়েছেন যে, চীনদেশীয়রা মার্কিণ পণ্য বর্জ্জন করে' যেমন তাঁদের উদ্দেশ্য সফল করতে পেরেছেন বলে মনে হয়, তেমনি তাঁরাও ইউরোপীয় পণ্যবর্জ্জন করে' সেরূপ সফলতা লাভ করতে পারবেন। একাধিক কারণে তাঁদের এরূপ ধারণা ইউরোপীয়দের হাসির উদ্রেক করবে। তবে তা' সত্ত্বেও এ-আন্দোলনের পেছনে কোন নিষ্ঠা নেই বা এ আন্দোলন কিছু নয়, এরূপ মনে করা সরকারের পক্ষে অবিবেচকের মত কাজ হবে। অপরপক্ষে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে,

কিছুকাল যাবৎ এ প্রদেশের লোকেরা অন্যান্য ও অধিকতর শক্তিশালী উপায়ে প্রতিবাদ জানাবার কৌশলও আয়ত্ত করছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতি রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে যে এই নূতন ধারা প্রবাহিত করেছে তার কার্য্যকারিতা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি রাখা উচিত।”

পণ্যবর্জ্জন সম্পর্কে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি আমি বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করেছি। তার কারণ, আমি দেখাতে চাই যে, পরবর্ত্তী কালে ভিন্নরূপী যে সমস্ত ঘটনার উদ্ভব হয়েছিল, তা' ছিল, আমাদের আন্দোলনের সফলতা দেখে সরকার পক্ষ যে-সকল তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল, তারই প্রতিক্রিয়া। আমলাতন্ত্র কোনদিন নূতন পরিস্থিতি বা অপ্রত্যাশিত প্রগতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারে না। এক ঘেয়ে ভাবে চলতে পারলে, অতীতের বস্তাপচা ধুলোয় মলিন, জীর্ণ, নথিপত্র ও নজীর থেকে নির্দ্দেশ নিয়ে চলতে পারলেই আমলাতন্ত্র খুসি হয় ও নিজেকে নিরাপদ বলে মনে করে। কিন্তু দিগন্তে যখন ঘনঘটা দেখা দেয়, যখন সম্মুখে দেখে ভয়ঙ্কর ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ, আমলাতন্ত্রী মন তখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পূর্ব্বনজীর থেকে আর সাহায্য পাওয়া যায় না। আমলাতন্ত্র অস্থির হয়ে উঠে। তার মনের সাম্যভাব লুপ্ত হয়। অস্থিরতা ক্রমশ ক্রোধে পরিণত হয়। যেখানে বিপদের কোন চিহ্ন নেই সেখানেও বিপদের আশঙ্কা করে' অকারণ বীরত্ব প্রকাশ করতে থাকে। তার ফলে এমন সমস্ত উৎপাত সৃষ্টি হয় যা' যে-কোন বুদ্ধিমান ও শান্তমস্তিষ্ক ব্যক্তি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

ইতিপূর্ব্বে ভারতে পণ্যবর্জ্জন আন্দোলনের চেষ্টাও কেউ করে নি বা সে বিষয়ে চিন্তাও করে নি। এ ছিল এক সাহসিকতাপূর্ণ কল্পনা। যেমন ষ্টেটসম্যান পত্রিকা তেমনি সমস্ত দর্শকই প্রথমে এ আন্দোলনকে উপহাস করে' উপেক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অনতিবিলম্বে

তা' যেরূপ সাফল্য লাভ করল তা' থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল তার পশ্চাতে জনসাধারণের কি পরিমাণ উদ্দীপনা ও আবেগ রয়েছে। প্রায় সমস্ত লোকের সমর্থন না থাকলে পণ্যবর্জ্জন আন্দোলন কখনই সফল হ'ত না। তার সফলতা দেখে সবার চোখ ফুটল। এই সাফল্যের মাত্রা এতই অধিক হয়েছিল যে, এমন কি এর প্রবর্ত্তকদেরও ছিল তা' আশার অতীত। কিন্তু তৎকালীন আমলাতন্ত্র তাদের নজীর ও নথিপত্রের বহির্ভূত কোন দিক থেকে কিছু শিখতে ইচ্ছুক ছিল না। মহাকরণের তাকের বর্ষবর্ষব্যাপী সংগৃহীত ধূলিকালির পবিত্র স্পর্শ ব্যতীত তাদের শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হ'ত না। মানুষ যখন ঘৃণায়, আবেগে, ক্রোধে টগবগ করে প্রায় আত্মসংযম পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলল, তা' দেখে আমলাতন্ত্র ভয়ে বিহ্বল হয়ে গেল। বুদ্ধি করে' অগ্রসর হয়ে যদি তখন একটি আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করত, তাতে ফল ভালই হ'ত। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আমলাতন্ত্রের কর্ণধারেরা দমননীতি প্রয়োগের চেষ্টা করল। তার ফলে অগ্নিতে ঘৃত সংযোগ হ'ল, আর দাউদাউ করে' তা' জ্বলে উঠল।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম আরম্ভ হ'ল, তার ঘটনা পরম্পরায় আমার উপরোক্ত মন্তব্যগুলিকেই প্রমাণিত করল। আইন ও শৃঙ্খলার নামে সর্ব্বক্ষণ জনমতকে ও জনবক্তব্যকে নিয়মিত ভাবে দমন করবার চেষ্টা চলতে লাগল। এ সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বদা যেমন হয়ে থাকে, দমনের চেষ্টা দমনকারীকেই ফিরে আঘাত করল। দমনের ব্যবস্থা প্রচণ্ডতর করা হ'ল এবং অধিকতর প্রত্যক্ষ ভাবেই সেসব ব্যর্থ হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি পেতে লাগল। দ্রুত দেশময় অশান্তি ছড়িয়ে পড়ল।

ছাত্রসমাজের মধ্যেও যে সে সময় এক গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়ে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং অতিরিক্ত উৎসাহের আতিশয্যে কোন কোন ক্ষেত্রে তারা মাত্রা অতিক্রম করল। নূতন

কোন আবেগের ঢেউ যখন কোন একটি সমাজের অন্তরে দোলা দেয়, তখন তার ভাবপ্রবন তরুণেরাই সেই উচ্ছ্বাসের বেগ পূর্ণভাবে অনুভব করে। যুগে-যুগে নবনব আন্দোলনের প্রচারকেরা চিরকাল তরুণদের প্রতি উদ্দেশ্য করেই তাঁদের বক্তৃতা করে গেছেন। খৃষ্টধর্মের প্রবর্ত্তক দৈবশক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে বলেছিলেন, "শিশুদিগকে আসতে দাও আমার কাছে"। গ্রীস, ইতালি, আমেরিকা, জার্ম্মানী, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যখনই কোন নূতন আশার বাণী দিয়ে নূতন মত প্রচারিত হয়েছে তখনই তরুণেরাই সমধিক উৎসাহে সে ডাকে সাড়া দিয়েছে।

এই বিরাট জাতীয় আন্দোলনে আমাদের সহায়তা করবার জন্য আমিও যুবকদের কাছেই আবেদন করলাম। আদালত অবমাননার দায়ে আমাকে যখন কারাবাসে পাঠান হয়েছিল কি আবেগে যুবসমাজ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল আমি তা' জানতাম। আমি বুঝতে পারলাম তারাই জনমত সৃষ্টি করতে আমাদের সহায়ক হবে। তা' না হ'লে আমরা সফল হ'তে পারব না। বহু জনসভায় বক্তৃতা করে তাদের ডাক দিলাম এবং তাদের নিকট থেকে প্রবল সাড়া পেলাম। বঙ্গভঙ্গের ফলে এমনিতেই যুবসমাজ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তবে সেই বঙ্গভঙ্গ রদ করবার জন্য প্রচার করা অপেক্ষা ব্যাপকভাবে স্বদেশী আন্দোলনের প্রচারের দিকেই তারা ঝোঁক দিল বেশী।

তাদের উৎসাহ তখন এমন এক স্তরে যা' আমি আর কখনো দেখি নি। কোন স্কুল বা কলেজের ছাত্র বিদেশী কাপড়ের জামাকাপড় বা ধুতি পরলে তার আর নিস্তার থাকত না। বিদেশী কাগজ দিয়ে খাতা তৈরী করলে ছাত্রেরা পরীক্ষার সময় সে সমস্ত খাতায় লিখতে আপত্তি করত। আমার মনে আছে, একবার রিপন কলেজিয়েট স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর একজন ছাত্র বিলাতী কাপড়ে তৈরী একটি সার্ট পরে' স্কুলে এসেছিল। ছাত্রেরা টের পাওয়া মাত্রই সে সার্ট টুকরো টুকরো করে' ছিঁড়ে ফেলল। ছাত্রটির চামড়া যে ছিঁড়ে ফেলল না তাই যেন যথেষ্ট।

এরূপ আর এক ঘটনার কথা বলি। রিপন কলেজে সেবার পরীক্ষা। উত্তর লিখবার জন্য কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ যে-সমস্ত খাতা বিলি করলেন, সেগুলি ছিল বিদেশী কাগজে তৈরী। ছাত্রেরা কাগজগুলি স্পর্শও করল না। ছাত্রদের মধ্যে এমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল যে, তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হ'ল না। অবশেষে দেশী কাগজ এনে দেবার পর যথারীতি পরীক্ষা চলতে লাগল।

ছাত্রদের এই অভূতপূর্ব্ব উৎসাহই ক্রমশঃ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। জনগণের মধ্যে দেখা দিল এক আশ্চর্য্যজনক উচ্ছ্বাস। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ বাহির থেকে ঘরের অভ্যন্তরে গিয়েও ধাক্কা দিল। পুরুষদের অপেক্ষা মহিলারাই তখন অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। আমার এক আত্মীয় আমার পাঁচ বছর বয়সের নাতনীর জন্য একজোড়া বিলেতী জুতো কিনে পাঠিয়ে ছিলেন। আমার নাতনী সে জুতো পরল না। ফিরিয়ে দিল। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আগ্রহে ও উৎসাহে বাতাস তখন ভরপুর। বলা বাহুল্য, যুব সমাজের একাগ্র চেষ্টার ফলেই এই অভাবনীয় নৈতিক পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়েছিল।

আমার সময়ে আমি কোন বিদ্রোহ দেখি নি এবং বিদ্রোহ বস্তুটি যে কি তা' কল্পনাও করতে পারতাম না। তবে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশের যে উত্থান দেখা দিয়েছিল বোধ হয় তার মধ্যে আমি বিদ্রোহাত্মক এক আন্দোলনের পূর্ব্বাভাস ও জনমতের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করতে পেরেছিলাম। সর্ব্বত্র এক প্রচণ্ড উত্তেজনা। এ অবস্থায় বাতাস অদ্ভুত ভাবে গরম হয়ে উঠে। যুবা-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রত্যেকেই তখন উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ে। এক অদৃশ্য প্রবণতার ইঙ্গিতে তখন তারা দুলতে থাকে। যুক্তি তখন স্তব্ধ হয়ে যায়। বিচার বুদ্ধি লোপ পায়। আবেগের তরঙ্গ সমাজমনকে নাড়া দেয় আর তা' সম্মুখে যা' পায় সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। একজন প্রসিদ্ধ

ডাক্তার আমায় বলেছেন, স্বদেশী আন্দোলন যখন তার চরম পর্য্যায়ে তখন তাঁর এক রোগী, ছয় বৎসর বয়সের একটি মেয়ে—অসুখের ঘোরে প্রলাপ বকতে-বকতে বলছিল, বিদেশী ঔষধ সে কিছুতেই খাবে না।

জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে কি করে এমন হ'ল। চোখে যা' দেখা গেল অথবা বাইরের যা' পরিস্থিতি ছিল, তা' থেকে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। তারমধ্যে যদি কোন গোপন রহস্য থেকেও থাকে ইতিহাসের একাগ্রচিত্ত ছাত্রের চোখে ধরা পড়বার আগেই তা' মিলিয়ে যায়। বঙ্গভঙ্গ রদ করবার জন্য যে আন্দোলন হয়েছিল তা' থেকেই যে স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল একথাও বলা যায় না। বাস্তবিক ঘটনা হ'ল, রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে বঙ্গদেশে যে জাতীয় জাগরণ হয়েছিল তার সঙ্গে যুগপৎ স্বদেশী আন্দোলনও আরম্ভ হয়েছিল। মানুষের মন পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে ভাগ ভাগ হয়ে থাকে না। এ একটি প্রাণবন্ত পদার্থ। তার কোন অংশে যখন কোন প্রবণতা অনুভূত হয়, সমস্ত মনটিই তা'তে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। আর মানুষের সামগ্রিক কার্য্যাবলীতেই হয় তার প্রকাশ। বিগত শতাব্দীর আট দশকের প্রথমের দিকে যখন কংগ্রেস আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, তখন এবং এখনো, ভারতের স্বার্থের বিরোধী যে সব লেখক ছিলেন, তাঁরা প্রায়ই বলতেন, সর্ব্বাগ্রে সমাজসংস্কার ইত্যাদির ন্যায় গুরুতর সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করলে তা' স্বাভাবিক হ'ত। কল্যাণকরও হ'ত। আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নতির পর তাদের ভিত্তি যখন সুদৃঢ় হবে তখন রাজনীতির বিষয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। আমাদের জাতীয় প্রগতির ইতিহাস তাঁদের সেই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। আমাদের সমাজ সংস্কার, শিল্প জাগরণ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সমস্তই এক বিরাট জাতীয় জাগরণের ধারা বেয়ে চলেছিল। আর সেই জাতীয় জাগরণের মূল নিহিত ছিল আমাদের নেতৃবর্গের রাজনৈতিক কার্য্যাবলীর মধ্যে। সমস্ত

সংস্কারই যে পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, তাঁ'রা একে অন্যের সঙ্গে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা আবদ্ধ এবং এভাবে পরস্পরকে শক্তি যোগায়, এ সত্যটি আর একবার সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কার্য্যাবলী মানুষের মনকে উদার করে' তার মধ্যে সংস্কারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। কেশবচন্দ্র সেন তারই সহায়ে মানুষের বিবেক ও সংস্কার প্রবৃত্তির নিকট আবেদন জানাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর কাজ পর্য্যায়ক্রমে কৃষ্ণদাস পাল ও অন্যদের কাজের সহায়ক হয়। পাশ্চাত্যের সঙ্গে সদ্য পরিচিত, পাশ্চাত্যের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, এক নূতন রাজনৈতিকগোষ্ঠী জীর্ণ-পুরাতন পথ পরিত্যাগ করে' দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও এমন কি, আপামর জনসাধারণের কাছে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে আবেদন জানিয়ে তাঁদের কর্ম্মপথের এক নব দিগন্ত উন্মুক্ত করে' দিলেন। নূতন মত, নূতন পথ মানুষের অন্তরে সাড়া জাগাল। নূতন ভাবে শক্তি সঞ্চার করল। আর তারই ফল হয়েছিল এক নব জাগ্রত জাতীয় জীবনের বহুমুখী প্রতিভার আত্মপ্রকাশ।

স্বাভাবিক ভাবেই তখন এল শিল্পজাগরণ। নূতন উদ্দীপনা নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য সকলে কাজে লেগে গেল। এ পথের সর্ব্বপ্রথম অগ্রদূতদের অন্যতম ছিলেন মিঃ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। তিনি এমন এক পরিবার থেকে এসেছিলেন, কর্ম্মদক্ষতার জন্য যার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরীও এ পরিবারেরই অন্তর্গত ছিলেন। মিঃ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন কোলকাতা হাইকোর্ট বারের একজন সভ্য। "উইকলী নোটস্" নামক আইন সম্পর্কিত পত্রিকাখানি তিনিই আরম্ভ করেছিলেন। আইন পত্রিকাগুলির মধ্যে এ পত্রিকাখানির প্রতিষ্ঠা ও প্রামাণ্য নজীর হিসাবে যশ আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে তিনি আর আইন ব্যবসা করেন না। দেশীয় শিল্পের উন্নতির প্রতি তাঁর এক

দুর্নিবার উৎসাহ রয়েছে। ভারতের জাতীয় মহাসভার আনুষাঙ্গিক হিসাবে স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্যের সাহায্যে যে-প্রথম স্বদেশী শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল তা' ছিল তাঁরই সৃষ্টি। সে ছিল ১৮৯৬ সালে। ১৯০৬ সালে যখন কোলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে তখনও অধিকতর পরিবর্দ্ধিত আকারে তিনি অনুরূপ আর এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন।

সুতরাং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিবাদ যখন উপস্থিত হ'ল তৎপূর্ব্বেই স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই আমাদের দেশের লোকের রাজনীতি সম্পর্কিত উৎসাহ ও শিল্পোন্নতির উৎসাহ পরস্পরের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলন বাস্তবিক পক্ষে ছিল এক প্রতিরক্ষামূলক আন্দোলন। আমাদের দেশের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আমাদের হাতে ছিল না। ছিল অন্যদের হাতে। শুল্ক প্রাচীর নির্ম্মাণ করে' আইন পরিষদের নির্দ্দেশের সাহায্যে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষিত করা যখন সম্ভব হল না, তখন আমরা আমাদের দেশের লোকের ইচ্ছাশক্তির প্রাচীর দিয়ে ঘিরে আমাদের দেশের শিল্পকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলাম। কেবলমাত্র অতিশয় ভাবপ্রবণ একটি জাতি যখন সার্বিকভাবে কোন ভাবের আবেশে ভেসে যেতে থাকে, তখনই এরূপ একটি আন্দোলন সফল হ'তে পারে।

বিদেশী সংবাদপত্রগুলি সমস্ত বিষয়টিকে এক প্রকাণ্ড ভুল বলে মন্তব্য করল। তাদের স্থির বিশ্বাস ছিল বিষয়টি কিছুকাল মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে' পরে তাদের মন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে যাবে। যখন দেখা গেল আন্দোলন বহুদিন পর্য্যন্ত চলল এবং যে দীর্ঘ ছয় বৎসর বঙ্গদেশ বিভক্ত অবস্থায় ছিল সেই ছয় বৎসর পূর্ণোদ্যমে আন্দোলন চলতে লাগল, তখন পাশ্চাত্য জগতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত বিদেশী পর্যটকদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। বঙ্গদেশবাসিগণ অনেক বছর ধরে' বিদেশ থেকে আমদানী করা

অপেক্ষাকৃত সস্তা দামে অধিকতর টেকসই পণ্য ক্রয় করার পরিবর্ত্তে অধিক মূল্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম মজবুত হলেও দেশে উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তা' থেকেই প্রমাণিত হয়, উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের কি পরিমাণ নিষ্ঠা ছিল এবং সেজন্য কিরূপ স্বার্থত্যাগ তা'রা করেছিল। যখনই প্রয়োজন হয়েছে এদিকে কোনদিন তাদের উৎসাহের অভাব দেখা যায় নি। কিন্তু আমার মনে হয় তাদের এই গুণের যোগ্য সমাদর আমরা সব সময় করি নি।

কোন শক্তিশালী উচ্ছ্বাস যখন সর্ব্বগ্রাসী হয়, তখন সে দুকূল ভেঙ্গে তার সীমা অতিক্রম করে এবং তখন তা' জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। স্বদেশী আন্দোলনের আমলে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সমস্ত কাঠামোও স্বদেশানুরাগে রঞ্জিত হয়ে গেল। বিদেশী চিনি বা লবণ দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করলে নিমন্ত্রিতেরা ভোজন করত না। জনমতের চাপে কোন বাঙালীই বিলেতী ধুতি বা শাড়ী পরার কথা ভাবতে পারত না। আর কম দামে তা' ক্রয় করবার কোন অভিপ্রায় যার থাকত, সেও তা' করত লোকচক্ষুর অগোচরে গোপনে নৈশ অন্ধকারের অন্তরালে।

বিংশ অধ্যায়
স্বাদেশিকতাবাদ ও বন্দেমাতরম্

অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই শুনেছি। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ের তুলনায় দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ-পত্রগুলির প্রভাব আজ বহুদূর বিস্তৃত। তাদের বক্তব্য স্পষ্ট ভাবেই অসহযোগপন্থী। কিন্তু বাস্তবিক ভাবে বলতে গেলে স্বাদেশিকতাবাদ যেভাবে আমাদের বাড়ীঘরে আমাদের পারিবারিক জীবনে তার প্রভাব বিস্তার করেছিল তার তুলনায় অসহযোগ কিছুই নয়। স্বদেশী আন্দোলন যখন পূর্ণোদ্যমে চলছিল তখন স্বাদেশিকতাবাদ যেরূপ একটি সমাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, অসহযোগ যে কয়টি কেন্দ্রে শক্তিশালীও ছিল সেখানেও তা' সেরূপ কিছু হয় নি। বঙ্গদেশে অসংখ্য গ্রাম আছে সেখানে চরখা বা খদ্দর কি পদার্থ কেউ জানে না। ঘটনা তার বিপরীত হলেই আমি আনন্দিত হতাম। কিন্তু যা' সত্য তা'কে অস্বীকার করার উপায় নেই। একটি রাজনৈতিক সংঘর্ষ শিল্পআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিছুকালের জন্য শক্তি সংগ্রহ করে' কিছুদূর হয়ত অগ্রসর হ'তে পারে, কিন্তু এরূপ সংযোগের ফলে শেষ পর্য্যন্ত তা' ক্ষতিগ্রস্তই হয়ে থাকে। শিল্প পরিচালনা করতে হবে ব্যবসার নিয়ম অনুসারে। কি ভাবে ব্যবসা চালাতে হ'বে, কি ভাবে তার উন্নতি হ'বে, এ সমস্ত প্রশ্ন শেষ অবধি ব্যবসা সংক্রান্ত বিচার বিবেচনার উপরেই নির্ভর করবে। মূলধন, সংগঠন, দক্ষতা—এসমস্তই হ'ল যে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি। দেশপ্রেমের আবেগ তা'তে যে সহায়তা করে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা' কেবল মাত্র কিছুসময়ের জন্যই সম্ভব। স্বাভাবিক অবস্থা যখন ফিরে আসে তখন তা' লোপ পায়।

কোন কোন সময় বলা হয় আমাদের গণআন্দোলনগুলির কিছুমাত্র সত্বা নেই। বৃহৎ জনসমাজকে সব সময় আমাদের সঙ্গে নিতে আমাদের অনিচ্ছাকেই তার কারণ বলে বলা হয়ে থাকে। এবিষয়টি বিচারের ক্ষেত্রও এটি নয়, সময়ও এটি নয়। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত না হ'লে জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে কোন আন্দোলনের সঙ্গেই যুক্ত হয় না। সমাজের বুদ্ধিসম্পন্ন নেতৃবর্গ থেকেই যে কোন বড় রকমের আন্দোলনের উদ্ভব হয়। আর তারাই তাকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। জনসাধারণ তাদের নৈতিক সমর্থন ও সহানুভূতি দ্বারা আন্দোলনের গুরুত্ববর্দ্ধন করে মাত্র। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই তা'রা মুখর হয়ে উঠে তাদের মনোভাব প্রদর্শন করে। যখন তাদের আবেগ সংযত করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয় অথবা যখন তাদের অন্তরে অতীতের অন্যায় ব্যবহারের স্মৃতি জেগে উঠে বা বর্ত্তমান দলননীতি অসহ্য হয়ে উঠে, তখন তা'রা অসংযত হয়ে পড়ে। স্বদেশী আন্দোলন জনসাধারণের নিকট তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূল বলে বোধ হয়েছিল। তা'রা বুঝতে পেরেছিল যে, এই আন্দোলন যদি সফল হয় তা' হলে তাদের বাস্তব উন্নতির এক নূতন যুগের সূচনা হবে।

পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে আমি যখন জনহিতকর কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করি তখন আমার সম্মুখে তিনটি আদর্শ ছিল। এরাই চিরদিন আমাকে প্রেরণা দিয়েছে। আমার রাজনৈতিক জীবনে বহু উত্থানপতনের মধ্যেও যখনই সুযোগ হয়েছে আমি সেগুলিকে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছি। এই আদর্শগুলি ছিল,—(১) যে-সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে আমাদের সকলের রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত, সেসব বিষয়ের উন্নতির জন্য ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একই মঞ্চে একত্র করে ঐক্যবদ্ধ করা; (২) ভারতের উন্নতির ক্ষেত্রে প্রথম অপরিহার্য্য শর্ত্ত হিসাবে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক

স্থাপিত করা এবং (৩) সামগ্রিকভাবে জনগণকে উন্নত করা ও আমাদের সমস্ত গণআন্দোলনে তা'দিগকে আমাদের সহযোগী করা। প্রথম দুটি আদর্শকে সার্থক করবার অভিপ্রাবে ১৮৭৬ ও ১৮৭৭ সালে আমি সারা ভারতে পরিভ্রমণ করি; অসংখ্য জনসভাতে ভারতীয় ঐক্য সম্পর্কে বক্তৃতা করি এবং আমাদের চরম দুর্দ্দশার প্রতিকারের জন্য সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে একত্র দাবী উপস্থিত করতে চেষ্টা করি। আমার জীবনের একটি আদর্শকে সার্থক করে তুলবার জন্য স্বদেশী আন্দোলন এক চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছিল এবং আমি সোৎসাহে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বরণ করে নিয়েছিলাম।

বঙ্গদেশময় এবং এমন কি, আমাদের প্রদেশের বাইরেও স্বদেশীসভা অনুষ্ঠিত হতে লাগল। যত জায়গাতে ও যত সভায় আমার শক্তি ও স্বাস্থ্য অনুযায়ী আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত আমি উপস্থিত থেকে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলায়) বক্তৃতা করতাম। তখন সময় ছিল অসম্ভব উত্তেজনাপূর্ণ ও কাজ ছিল কঠোর পরিশ্রমের। কেউ বসে' থাকত না। প্রত্যেকেই যথাশক্তি কাজ করত। নানা দুর্গম, অদ্ভুত ও অজানা স্থানে আমরা যেতাম। অনভ্যস্ত খাবার খেতাম। তা' নিয়ে আমরা কোনদিন কিছু মনে করতাম না। কোন অভিযোগ করতাম না। দূরদূর স্থানে কঠিনতম কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করেও আমরা নীরবে সব সহ্য করতাম। ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতি রোগের সম্মুখীন হ'তাম। আমাদের উৎসাহই এসব বিপদে আমাদের রক্ষা ক'রত। আমাদের বিশ্বাস ছিল কোন বিপদ বা রোগ আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। আমাদের এই নৈতিক প্রতিষেধক একদিনের জন্যও ব্যর্থ হয় নি।

এ প্রসঙ্গে আমার এক বন্ধুর কথা আমি উল্লেখ না করে' পারি না, বিশেষত এজন্য যে, বহুকাল হ'ল আমরা তাঁকে হারিয়েছি। আমি হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত কালিপ্রসন্ন কাব্য বিশারদের

কথা বলছি। মূত্রাশয়ের রোগে সাঙ্ঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হয়েও ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি প্রত্যেক স্বদেশী সভায় উপস্থিত হয়ে আমন্ত্রণ রক্ষা করতেন। স্বদেশী সভাসমূহে তিনি এক নূতনত্ব যোগ করেছিলেন। আজকাল জনসাধারণের প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই তাঁর সেই নীতিকে অনুসরণ করা হয়। সময়োপযোগী কোন দেশপ্রেমাত্মক গান দিয়ে এ সকল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। সঙ্গীতে কাব্যবিশারদের চমৎকার দক্ষতা ছিল। তিনি নিজে গান করতে পারতেন না। কিন্তু তিনি অতি মনোরম গীত রচনা করতে পারতেন। স্বদেশী সভাগুলিতে যখন তাঁর রচিত গানসমূহ গাওয়া হত তখন শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যেত। এই গান রচনা ছিল তাঁর এক সহজাত ক্ষমতা। তিনি ভালমত হিন্দী ভাষা জানতেন না। তা' সত্ত্বেও তাঁর দ্বারা রচিত একটি হিন্দীগান 'দেখিয়ে ক্যা হালত' তন্ময় হয়ে লোকে শুনত। এই গানের মধ্যে তিনি স্বদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে বিদেশী দ্রব্যের প্রতি আগ্রহকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। ১৯০৬ সালে হাজার-হাজার লোকের সম্মুখে কোলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে এই গান করা হলে শ্রোতারা উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে উঠে।

যখনই কাব্যবিশারদ কোন সভায় যোগ দিতে যেতেন তখনই তিনি দু'জন পারদর্শী গায়ককে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাঁদের দ্বারা উদ্বোধনী গান গাওয়ার পর এ সমস্ত স্বদেশী সভার কার্য্য আরম্ভ হ'ত এবং সমাপ্তি গান দিয়ে সভার কার্য্য শেষ করা হ'ত। তিনি নিজে এই গায়কদের গান শিখাতেন, তাদের বেতন দিতেন এবং তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থাদি করতেন। যদিও তাঁর আর্থিক সঙ্গতি তেমন কিছুই ছিল না তবুও এই গায়কদের জন্য তিনি বাইরের কোন সাহায্য গ্রহণ করতেন না। বক্তা হিসাবে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল না। কিন্তু লেখক হিসাবে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। যে-সমস্ত লোক ভারতের অগ্রগতির পথে শত্রুতা করত কাব্যবিশারদের শক্তিশালী লেখনী ও

তীব্র ভাষা নির্ম্মমভাবে তাদের বিরুদ্ধে সঞ্চালিত হ'ত। তিনি ছিলেন একজন একান্ত স্বদেশপ্রেমিক ও মাতৃভূমির একনিষ্ঠ সেবক। আমার মনে আছে ১৮৯৯ সালে কিভাবে শরীরে জ্বর নিয়ে এবং মাথার উপর এক মানহানির মামলার ওয়ারেণ্ট নিয়ে তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। নিজের শরীর ও জীবনের প্রতি তাঁর কোনই মমতা ছিল না। কোন পরামর্শ বা ভৎসনাতেও কাণ দিতেন না। প্রবল ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করে' প্রয়োজন বোধে অবাধ্যের মত নিজে কাজ করে যেতেন। তার ফলে তিনি দ্রুত মৃত্যুর পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। তাঁর হিতাকাঙ্খী ও প্রিয়জনেরা লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে হলে এবং তাঁকে তাঁর একাগ্র ও একনিষ্ঠ স্বদেশ সেবার শ্রমজনিত স্বাস্থ্যের অবনতি থেকে উদ্ধার করতে হলে, তাঁকে তাঁর এই সখের কর্ম্মস্থল থেকে স্থানান্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক। সে সময় তাঁর এক বন্ধু এক যাত্রীবাহী জাহাজের ডাক্তার হিসাবে জাপান যাচ্ছিলেন। বিশ্রাম ও সমুদ্র যাত্রাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে মনে করে' কাব্যবিশারদের আত্মীয়েরা তাঁকে জাপান যেতে সম্মত করালেন। কি কারণে মনে পড়ছে না প্রস্তাবটি আমার মনঃপূত হ'ল না। আমার মনে হতে লাগল এ যেন কোন এক অশুভ মুহূর্ত্তের পূর্ব্বলক্ষণ। হয়ত তিনি চলে গেলে আমাদের জনসেবার কাজ ব্যাহত হতে পারে এরূপ কোন বিষয় আমার মনের মধ্যে গোপনে কাজ করছিল এবং তার ফলেই নিরপেক্ষ ভাবে কিছু স্থির করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। সে যাই হোক, আমি কাব্যবিশারদকে জাপান যাওয়া থেকে বিরত করলাম। তিনি বলতেন আমি তাঁর রাজনৈতিক গুরু। এরূপ অবশ্য আরও অনেকেই বলত। কিন্তু কাব্যবিশারদের নিষ্ঠা বা একাগ্রতা তাদের ছিল না। বরঞ্চ গুরুর প্রতি কাদা ছুঁড়বার জন্যই তারা ছিল অধিকতর তৎপর। কিন্তু কাব্যবিশারদ আমার পরামর্শ মত জাপান যাবার সংকল্প ত্যাগ

করলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সকলের চাপের কাছে তিনি নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। কোলকাতা থেকে কয়েক মাইল দূরে বেঙ্গল-নাগপুর লাইনে মুগকল্যাণে আমাদের এক স্বদেশীসভা হচ্ছিল। আমরা যখন সভা থেকে ফিরে এলাম, হাওড়া রেলষ্টেশনের সামনে তিনি আমার নিকট থেকে বিদায় নিলেন। তিনি আমার পায়ের ধুলো নিলেন। আমি তাঁকে আশীর্ব্বাদ করলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে আর আমাদের দেখা হ'ল না। জাপান থেকে ফিরবার পথে সমুদ্রবক্ষেই জাহাজে তাঁর মৃত্যু হয়।

যিনি আমাদের ভাষার সম্পদ ও সমৃদ্ধিকে অতুল বিক্রমে এমন এক প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত করেছিলেন যে, তার ফলে তাঁর নিজের ও দেশের শত্রুরা তাঁকে এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক বলে' মনে করত, বঙ্গদেশ তার সেই দক্ষতম স্বদেশপ্রেমী সাংবাদিক কাব্যবিশারদকে মর্ম্মান্তিক ভাবে চিরতরে এরূপে হারাল। একথা সত্য যে, তিনি ব্যক্তিত্বের উর্দ্ধে উঠতে পারতেন না। দেশীয় ভাষায় যাঁরা সাংবাদিকতা করেন তাঁদের এক শ্রেণীর মধ্যে এদোষটি সচরাচর লক্ষ্য করা যায়। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা এখনো তাকে অতিক্রম করতে পারি নি। অনেক ক্ষেত্রে তিনি যে মানুষের পারিবারিক জীবনের মধ্যেও প্রবেশ করে' তার পবিত্রতা বিঘ্নিত করতে প্রয়াসী হতেন এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। তবে যারা বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীর ছদ্মবেশে গোপনে দেশের শত্রুতা করত তাদের প্রতিই ছিল তাঁর কঠোরতম ব্যক্তিগত আক্রমণ। ১৯০৭ সালের ৭ই জুলাই কোলকাতায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেল। তার পক্ষকাল পরে বারাসতে ২৪-পরগণা জিলা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কাব্যবিশারদ রচিত গানের সহযোগে যখন সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয় শ্রোতাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই অশ্রু সম্বরণ করতে পেরেছিলেন। হতে পারে তাঁর দোষত্রুটি ছিল। বলা যেতে পারে বেশীই ছিল। কিন্তু যে বিশ্বস্ততার সঙ্গে, যে-একনিষ্ঠতার সঙ্গে,

যে-সাহসিকতার সঙ্গে তিনি অবিরাম দেশের সেবা করে গিয়েছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই বিরল।

যদিও এক মহান 'স্বদেশী'-সেবী চলে গেলেন, তথাপি আদর্শ অক্ষুণ্ণ রইল। সমস্ত বড় বড় আন্দোলনই, বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রেরণা ও প্রতিভার নিকট যতই ঋণী হোক না কেন, সেগুলি বহুলাংশে এমন কি, তার নির্দ্দেশক ব্যক্তিদের প্রভাব থেকেও মুক্ত থাকে। তাঁরা বীজ বপন করে' চলে' যান। নূতন যাঁরা আসেন তাঁরা যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের সমান সব সময় নাও হতে পারেন। তবুও সে বীজ নূতনদের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়। তাঁরাই সে ভার বহন করে' সেই অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্তির পথে অগ্রসর করে' দেন। তাঁর সমকালে যে-প্রচণ্ড আবেগে মানুষ উন্মত্তের মত হয়ে গিয়েছিল, কাব্যবিশারদের উদ্দাম উৎসাহ ছিল তারই প্রতিবিম্ব।

জনসাধারণের উচ্ছ্বাসের প্রচণ্ডতা সরকারকে আতঙ্কগ্রস্ত করল। সরকার গতানুগতিক চণ্ডনীতির আশ্রয় নিল। ফলে মানুষের ক্ষোভ বহুগুণ বর্দ্ধিত হ'ল। ট্যাসিট্যাস বলেছেন, এগ্রিকোলা নাকি এই বিচক্ষণ উক্তি করেছিলেন যে, রাজ্যশাসন অপেক্ষা গৃহশাসন অধিকতর শক্ত কাজ। পারিবারিক জীবনে যখন কোন বিষয় নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে, বন্ধুবান্ধবদের সৎপরামর্শ, সময় ও শুভবুদ্ধির প্রভাব স্বাভাবিক অবস্থাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সহায়তা করে। এবং সাধারণতঃ সে সব ফলপ্রসূও হয়। কিন্তু যখন কোন অভাবনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সশস্ত্র ও সর্ব্বশক্তিমান আমলাতন্ত্র তখন সোজাসুজি ব্যবস্থা গ্রহণের লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পারে না: পোষণনীতিই তখন সহজ ও কার্য্যকর বলে' বোধ হয়। দ্রুত কার্য্য সম্পন্ন করবার উদ্দাম উৎসাহে শেষ পর্যন্ত তার নৈতিক পরিণতি কি মারাত্মক হতে পারে বা তার জন্য কি মূল্য দিতে হতে পারে এসব বিষয় আর চোখেই পড়ে না। তাতে হয়ত সাময়িক ভাবে সফলতাও পাওয়া যায়। কিন্তু

তা'তে যা' অনিষ্ট হয়, তা' হয় চিরস্থায়ী এবং ভবিষ্যতের ঝঞ্ঝাটের বীজও তখনই রোপিত হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি, স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্র ও যুবসমাজই বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিল। তাদের উৎসাহে সারাদেশ উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল। তারাই হয়েছিল এ আদর্শের স্বনিযুক্ত প্রচারক। তাদের কার্য্যাবলীকে সীমায়িত করে' নিয়ন্ত্রিত করারও প্রয়োজন বোধ হয়েছিল। তদনুসারে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের প্রধানদের নিকট একখানা বিজ্ঞপ্তিও প্রেরণ করেছিলেন। বিজ্ঞপ্তির মধ্যে বলা হয়েছিল যে, যদি স্কুল ও কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকগণ তাঁদের ছাত্রদিগকে তথাকথিত স্বদেশীআন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বয়কট, পিকেটিং ও অপরাপর অন্যায় কার্য্যাবলীতে প্রকাশ্যভাবে অংশ গ্রহণ করতে বাধা না দেন, তা' হলে স্কুল ও কলেজসমূহের 'গ্র্যাণ্ট-ইন্-এইড' বন্ধ করে দেওয়া হবে, বৃত্তি লাভের সুযোগ থেকে তাদের ছাত্রদিগকে বঞ্চিত করা হবে এবং সে সমস্ত স্কুল-কলেজের অনুমোদন বন্ধ করে দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দ্দেশ দেওয়া হবে। মফস্বলের স্কুল সমূহেই সে বিজ্ঞপ্তিগুলি পাঠান হয়েছিল।

এ বিজ্ঞপ্তিতে কোলকাতা ও মফস্বলের ছাত্রদিগকে সমপর্য্যায়ের বলে গণ্য করা হ'ল না। কিন্তু মফস্বলের ছাত্রদের মত কোলকাতাতেও ছেলেরা স্বদেশীর কাজে অত্যন্ত উৎসাহী ছিল। উত্তেজনা যখন চরমে তখন বহু ছাত্র দিনের পর দিন ময়দানের এক কোণে দাঁড়িয়ে হোয়াইটেওয়ে লেইড ল'র বাড়ীতে কাহারা আসা যাওয়া করছে সেদিকে লক্ষ্য রাখত, বিদেশী পণ্য ক্রয় থেকে বিরত থাকবার জন্য ভারতীয়-দিগকে অনুরোধ করত, অথবা কেউ ক্রয় করে' থাকলে ভবিষ্যতে এ ভুল আর না করবার জন্য অনুরোধ জানাত। সে-সময় আমার কাছে একবার খবর এসেছিল, জনৈক কেতাদোরস্ত বাঙ্গালী মহিলাকে হোয়াইটেওয়ে লেইড ল'র দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে এসব

যুবকদের থেকে কয়েকজন সে মহিলার পায়ের উপর পড়ল এবং তাঁকে অনুরোধ করতে লাগল যেন একই প্রকারের দেশে প্রস্তুত দ্রব্য পাওয়া গেলে ভবিষ্যতে আর বিদেশী দ্রব্য কখনো ক্রয় করবেন না বলে' প্রতিশ্রুতি দেন।

উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তির ফলে উত্তেজনা বৃদ্ধিই পেল। চতুর্দ্দিক থেকে তার নিন্দা হ'তে লাগল। এমন কি, যারা সচরাচর সরকারী নীতির সমর্থক তারাও সরকারকে এজন্য দোষারোপ করতে লাগল। ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকা এই বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এমন এক ভাষা প্রয়োগ করেছিল যা' একমাত্র অত্যন্ত মন্দ ব্যবস্থাকে ধিক্কার দেবার প্রয়োজনে ভিন্ন আর কখনো তার স্তম্ভে ব্যবহৃত হয় নি। ক্রোধ ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকা লিখেছিল, "আমরা বাস্তবিক পক্ষে জানতে ইচ্ছা করি এই জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খ কর্ম্মচারীটি কে, যার অনুরোধে লেফটেন্যান্ট গভর্ণর এরূপ এক আদেশ অনুমোদন করলেন?" পত্রিকাখানিতে আরও লেখা হয়েছিল, "এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা গত কয়েক সপ্তাহের কাল্পনিক ভয়ে ভীত কোন ব্যক্তির দ্বারা সরকার এ ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়েছে।" সবশেষে মন্তব্যটি এই বলে' সমাপ্ত করেছে, "অবিবেচকের ন্যায় সরকার যে শিশুসুলভ ও নিষ্ফল এক নীতির পথে পদক্ষেপ করেছে তার এক মাত্র পরিণতি হবে একদল শহীদ সৃষ্টি করা"। ছাত্রদিগকে বাধাদানের উদ্দেশ্যে সেই নিরোধক প্রকৃতি বিশিষ্ট বিজ্ঞপ্তিটি যখন প্রথম প্রকাশ হয়েছিল তখন এক নেতৃস্থানীয় ইংরেজী পত্রিকার এই ছিল ভাষা। কিন্তু এভাবে একের পর এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হ'তে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাও পর পর প্রশমিত হওয়ার পরিবর্ত্তে বেড়েই চলল।

এই বিজ্ঞপ্তিগুলির অন্যতম ছিল 'বন্দেমাতরম' বিজ্ঞপ্তি। এটি প্রচার করেছিল পূর্ব্ববঙ্গের নূতন সরকার। তার মধ্যে বলা হয়েছিল

যে, রাজপথে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেওয়া অবৈধ বলে গণ্য হবে। ভারতের পৌরাণিক উপাখ্যান সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন বলে খ্যাত এক উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর সন্ধান পাওয়া গেল। তাঁর বিদ্যার দৌড় এতদূর পর্য্যন্ত গেল যে, তিনি বললেন, বন্দেমাতরম্ হ'ল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে মহাকালীকে আহ্বান করবার মন্ত্র। কোথা থেকে যে তাঁর এরূপ ধারণা হয়েছিল জানা শক্ত। 'বন্দেমাতরম্'-এর প্রথম কলির শব্দগুলি একটি গানের অংশ। মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, আরাধনার ভাবে পরিপূর্ণ। তার শক্তি ও সৌন্দর্য্যের মনোরম বর্ণনা রয়েছে তার মধ্যে। 'মাতৃভূমি আমাদের সকলেরই মা; সেই মা'কে আমি প্রণাম করি'—এইত শব্দগুলির সরলার্থ। কিন্তু সরকারী মহলে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তা'র ফলে এক নির্দ্দোষ মন্ত্রের মধ্যে এক অত্যন্ত অশুভকর অর্থ জুড়ে দিল। এবং পূর্ব্ববঙ্গের সরকার রাস্তাঘাটে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করল। আমরা আইনজ্ঞের পরামর্শ নিলাম। কোলকাতা হাইকোর্টে মিঃ পাগ নামে একজন প্রসিদ্ধ য়্যাডভোকেট ছিলেন। তিনি বিজ্ঞপ্তিটি আইন বিরোধী বলে' আমাদের পক্ষেই অভিমত প্রকাশ করলেন।

বরিশাল কনফারেন্সে এই বন্দেমাতরম্ এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। তা' পরে বলছি। তার আগে ধন্যবাদের সঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, ইতিমধ্যে এ বিষয়ে সরকারী দৃষ্টিকোণের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। এবং জাতীয় দৃষ্টি ভঙ্গিকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একবার উত্তর বঙ্গে সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জাতীয় সঙ্গীত হ'ল ততক্ষণ অন্যান্য শ্রোতার সঙ্গে বৃটিশ সামরিক কর্ম্মচারিগণও দাঁড়িয়ে ছিলেন। বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের সৈনিকগণ রাজানুগত সামরিক পোষাক পরিধান করে' বহু সহর

পরিভ্রমণ করেছিলেন। এবং সর্ব্বত্রই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তুলেই দেশবাসিগণ তাঁদের অভ্যর্থনা করেছিলেন। তাঁরা যখন এসমস্ত সভায় ভাষণ দিতেন, তাঁদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিদের অনুমোদন নিয়ে ও তাঁদের সাক্ষাতে কেউ কেউ বলতেন, বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে জার্ম্মান আক্রমণ প্রতিরোধ করা অপেক্ষা গর্ব্ব ও আনন্দের বিষয় তাঁদের আর কিছু হবে না।

যে ধ্বনি একদিন নিষিদ্ধ হয়েছিল, যে ধ্বনির প্রচার সর্ব্বত্র বারণ ছিল এবং যে ধ্বনিকে নিশ্চিহ্ন করবার উদ্দেশ্যে দমননীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল, সেই ধ্বনি এখন সমগ্র ভারতের ধ্বনি, সমগ্র ভারতবাসীর ধ্বনি। এমন কোন শিক্ষিত ভারতীয় আজ নেই যার মুখে এ ধ্বনি উচ্চারিত না হয়। দেশপ্রেমের আবেগে যখন সে ভেসে যেতে থাকে, গভীর আনন্দে সে এ ধ্বনিই দিতে থাকে। আরও বিশেষরূপে লক্ষ্য করার কথা এই যে, সরকারী মহলও এখন আর একে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে রাজদ্রোহীদের সমাবেশের ডাক বলে মনে করে না।

'বন্দে মাতরম্' বলে যে গানটি আরম্ভ করা হয়, তা' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দ মঠ' গ্রন্থেরই একটি গান। গানটি বাংলা হলেও সংস্কৃত শব্দে তা' এতই সমৃদ্ধ যে, ভারতের সর্বত্র শিক্ষিত মাত্রেই তার অর্থ বুঝতে পারে। মহিমান্বিত রচনাশৈলী, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, স্বদেশ প্রেমের ঐকান্তিকতা ইত্যাদি এই গানটিকে জাতীয় সঙ্গীতের পদে অধিষ্ঠিত করেছে এবং তাকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্য্যাদা দিয়েছে। যে-কোন জাতীয় সমাবেশেই আজ এগানটি এক যোগ্য উদ্বোধন সঙ্গীতরূপে পরিগণিত। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বা স্বদেশী আন্দোলনে এ গানের যে কি ভূমিকা হ'বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোনদিন কল্পনাও করতে পারেন নি। দান্তে যখন ইতালির ঐক্যের গান গেয়েছিলেন তিনিও জানতেন না ইতালির

রাজনৈতিক বিবর্ত্তনে তাঁর গানের ভূমিকা কি হ'বে অথবা তাঁর সেই গান ম্যাজিনী ও গ্যারিবল্ডী কিরূপভাবে কাজে লাগাবেন। প্রতিভাধর ব্যক্তিরা তাঁদের আদর্শকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে যান। সে-সবের কিছু কিছু উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়ে। কালের শক্তি ও সময় সেসব লালিত-পালিত করে। এসবই পরিপক্ক হয়ে ভবিষ্যত বংশধরদিগকে প্রচুর ফসল দান করে।

একবিংশ অধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলন ও আনুষঙ্গিক প্রশ্নাবলী

আমাদের সাহিত্যের মধ্যে, রাজনীতির মধ্যে, শিল্পনীতির মধ্যে এবং সকল প্রকার কাজকর্ম্মের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন এক নূতন শক্তি সঞ্চার করেছিল। সে সময় জাতীয় অনুভূতির যে এক ক্রমবর্দ্ধমান উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল তার সম্পূর্ণ প্রভাব পড়েছিল সাহিত্যের উপর। সাহিত্য ও কাব্যের ভিতর দিয়ে তার প্রকাশ হয়েছিল। সাংবাদিকতা এমন এক প্রেরণা পেয়েছিল যে, তৎপূর্ব্বে বহুকাল সেরূপ পায় নি। নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশী সভা-সমিতিতে তখন বাংলায় যে-সমস্ত বক্তৃতা দেওয়া হ'ত সে সবের বাগ্মিতার তুলনা হয় না। দুর্ভাগ্যবশত সে সমস্ত বক্তৃতা রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা হয় নি। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে, অন্তত বঙ্গদেশে, সেরূপ বাগ্মিতা কোথায়? যা' কিছু হীন, ঘৃণ্য বা বিদ্বেষপূর্ণ, তাকে ঠেলে ফেলে জাতির জীবনকে উন্নতির পথে, প্রগতির পথে, তার মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের পথে পরিচালিত করতে পারে, এমন প্রেরণা, দেশপ্রেমের ব্যাকুলতা, সাহিত্য বা সাংবাদিকতা আজ কোথায়? এখন তার কিছুই নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত আছে কেবল কথা আর কথা। কিম্বা স্বদেশীপনার নামে বিদ্বেষ ও কুৎসা প্রচারের অপচেষ্টা। একে বড় জোর মানবসমাজের বৃহত্তর স্বার্থ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে' আত্মনির্বাসনের এক অপরূপ প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। মানবজাতির বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে জাতি হিসাবে আমাদের বেঁচে থাকতে হ'বে, উন্নতি করতে হ'বে, বিকাশ লাভ করতে হ'বে। যে রসে সমগ্র মনুষ্যজাতি সঞ্জীবিত তা' থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে; জীবন নদীর স্রোতে ভেসে যেতে হবে ভাটির দিকে;

মানুষের সংস্কৃতি, কলা, সভ্যতা আমাদের পুষ্ট করবে না; আমাদের ভোগে লাগবে না; সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্নতাতেই হবে আমাদের আনন্দ; নিঃসঙ্গতাই হবে আমাদের গর্বের বিষয়—এরূপ এক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করাও আমার পক্ষে অসহ্য। এর ফলে জগতে অন্যেরা যখন আকারে দৈত্য হবে, আমাদের বিকাশ তখন স্তব্ধ হয়ে যাবে, আর আমরা হয়ে যাব চিরদিনের মত পঙ্গু।

কিন্তু এসব চিন্তা এখন থাক। বরং স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব যখন তার শীর্ষে তখন যে তার বহুমুখী বিকাশ দেখা গিয়েছিল সে সম্বন্ধেই কিছু বলা যাক। জাতির কাজকর্ম্মের মধ্যে শিল্পের ক্ষেত্রেই তখন এক অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। সাবান তৈয়ারের কারখানা, দেশলাই তৈয়ারের কারখানা, বস্ত্র তৈয়ারের কারখানা একের পর এক স্থাপিত হ'তে লাগল। তাঁতশিল্প আপনা হতেই এক নূতন উদ্দীপনা পেল। ম্যানচেষ্টারের বস্ত্র আমদানীর ফলে তৎপূর্বের তাঁতের ব্যবসা এক প্রকার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। শিল্পীশ্রেণী হিসাবে তাঁতীরা হয়েছিল মরণমুখী। এখন তাদের ব্যবসা পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। এক স্বদেশী সভায় যোগ দেবার অভিপ্রায়ে আমি হুগলী জিলার হরিপালে গিয়েছিলাম। সেখানে ছিল বহু সংখ্যক তাঁতীর বাস। তা'রা দুহাত তুলে আমায় আশীর্বাদ করল। আমরা তাদের বাড়ীতেও গিয়েছিলাম। সেখানে তাদের ঘরবাড়ীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তাদের সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল। সমগ্র দেশেই হয়েছিল এ অবস্থা। তৎকালীন সরকারী বিবৃতির মধ্যেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সাময়িক উৎসাহের প্রাবল্যে ও দেশের শিল্পকে অগ্রসর করে দেবার অধীর আগ্রহে সংগঠনের মৌলিক বিষয়গুলি অবহেলিতই রয়ে গেল। এবং এসব উদ্যোগে যে দক্ষতা ও বিচক্ষণতার একটা প্রয়োজন আছে তার প্রতি যথাযোগ্য যত্ন নেওয়া হ'ল না। মূলধন যথেষ্ট সংগৃহীত হয়েছিল, কিন্তু বিচক্ষণতার অভাবে

তা'কে ঠিকমত কাজে লাগান গেল না। অবিলম্বে ভেঙ্গে গেল সমস্ত সফলতার স্বপ্ন। স্বদেশীর প্রতি মানুষের উৎসাহও ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এই আন্দোলনের ফলে যে শিল্পোন্নতির সুযোগ দেশে এসেছিল সরকার পক্ষ থেকে তার সদ্ব্যবহারের কিছুমাত্র চেষ্টা হল না। সরকার যদি এ সময় পুরোভাগে এসে বিজ্ঞতার সঙ্গে এই শিল্প আন্দোলনকে সুপথে পরিচালিত করত, তা' হ'লে নিজেদের কর্ম্মের দ্বারা দেশের মধ্যে যে রাজনৈতিক তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল তা' বহুলাংশে প্রশমিত হ'ত এবং দেশের শিল্প সমস্যার সমাধানের পথেও অনেক দূর অগ্রসর হতে পারত। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্যম লক্ষ্য করেই বোধ হয় সরকার তার কর্ম্মপন্থা স্থির করল। এক দারুণ উদাসীনতার ভাব সরকারকে অধিকার করে বসল এবং অনেক ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে শিল্পোন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। বালকেরা বালসুলভ অন্যায়ের জন্য কঠোর দণ্ড পেতে লাগল এবং সারা দেশে একদল তরুণ শহীদের সৃষ্টি হ'ল। এমনি করে যুবকদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ রোপণ হ'তে লাগল। বেশী দিন অতিবাহিত হতে না হতেই তার তিক্ত ফল লক্ষ্য করা গেল। অশান্তিময় সন্ত্রাসবাদের বিকাশ তারই পরিণতি। অতি দুঃখে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এখনো তা শেষ হয় নি।

আমাদের ছেলেদের মাত্রাতিরিক্ত অন্যায় ও তাদের বিরুদ্ধে সরকারের দমননীতি সত্ত্বেও স্বদেশী আন্দোলন দুর্ব্বার গতিতে অগ্রসর হ'তে থাকে। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য পরিধেয় বস্ত্রের জন্য, আমাদের ধুতি শাড়ীর জন্য ম্যানচেষ্টার ও বিদেশী বাজারের নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভ করাই ছিল এ আন্দোলনের সর্ব্বক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। বোম্বাই থেকে সে সময় কিছু কাপড় আসত। স্বদেশী আন্দোলন যখন জমজমাট বোম্বাইয়ের সুতাকলগুলিতে তখন সমৃদ্ধির জোয়ার এসেছে।

আশা করা হয়েছিল যে, বঙ্গদেশও হয়ত তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিছু কিছু সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। অনেকদিন যাবৎ হুগলী জিলার শ্রীরামপুরে একটি কাপড়ের কল ছিল। সেই মিলটি ক্রয় করে' তার উৎপাদনের কাজ আরও বর্দ্ধিত করবার সঙ্কল্প করা হ'ল। এজন্য প্রায় আঠার লক্ষ টাকার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তজ্জন্য একখানি আবেদন প্রচার করা হ'ল। আমিও তা'তে স্বাক্ষর দিয়েছিলাম। টাকাও অনায়াসেই সংগ্রহ হ'ল। আমাদের মধ্যবিত্তশ্রেণী, এমন কি, আমাদের মহিলারাও টাকা দিয়েছিলেন। মিল কিনে তার নূতন নামকরণ করে' তাকে পরিবর্দ্ধিত করা হ'ল। এ উদ্যোগে মহিলারা যেরূপ উৎসাহ দেখিয়েছিলেন তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মিলের নাম করা হয়েছিল 'বঙ্গলক্ষ্মী মিল'। এ মিলকে বহু উত্থান পতন বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে হ'লে মূল্য ত দিতেই হয়। আমরাও তাই করেছি এবং দক্ষতাও অর্জ্জন করেছি। আমি বিশ্বাস করি এতে ভবিষ্যতে আমাদের উপকার হবে। বর্ত্তমানে এ-মিল এক নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। আমি আশা করি, এ-মিল উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল যে, শিল্পে উন্নতি করতে হ'লে ব্যাঙ্ক-এর সাহায্য ও সহযোগিতা অপরিহার্য্য। সচরাচর অভিযোগ করা হ'ত যে, ইউরোপীয়দের পরিচালনাধীন ব্যাঙ্ক-সমূহ ভারতীয়দের ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে অবহেলা করে। এ অবস্থায় আমাদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক থাকা একান্ত আবশ্যক। তদনুসারে ভারতীয় ডাইরেকটারমণ্ডলীর অধীনে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় 'বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। তার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে' মনে হয় বঙ্গদেশে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসা সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ন্যায়

তাকেও বহু ভাগ্য পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। এক সময় তার অবস্থা বিশেষ সঙ্কটজনকও হয়েছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, সে মেঘ এখন কেটে গিয়েছে।

ভারতীয় পরিচালনায় বীমা কোম্পানীর প্রবর্ত্তনেও স্বদেশী আন্দোলন উৎসাহ দিয়েছিল। বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলনের এক বার্ষিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম যে, আমাদের শক্তিকে এপথে পরিচালনা করলেও আমাদের লাভবান হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমার এ প্রস্তাব অনেকেরই মনঃপুত হয়েছিল। এবং অনেক বীমাকোম্পানীর প্রতিষ্ঠাও করা হয়েছিল। এদের মধ্যে ন্যাশান্যাল ও হিন্দুস্থান কোপারেটিভ ইনসিওরেন্স কোম্পানী দুটি বিশেষ সাফল্য ও খ্যাতি অর্জ্জন করেছে।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রথম প্রদর্শন করা হয়েছিল ৭ই আগষ্ট তারিখে। এবং সে সঙ্গেই স্বদেশী আন্দোলনেরও প্রবর্ত্তন করা হয়েছিল। এ বিক্ষোভ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। মিঃ জে. চৌধুরীর নেতৃত্বে কোলকাতার যুবকেরা এক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শোভাযাত্রা করে' কলেজ স্কোয়ার থেকে পদব্রজে টাউন হলে গিয়েছিল। ভারতীয় দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সহরের ভারতীয় অঞ্চল জনশূন্য হয়ে প্রায় নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু টাউন হলের সন্নিকটে সকলেই ছিল গভীর উৎসাহে প্রাণচঞ্চল। বিরাট এক জনতা সেখানে সমবেত হয়েছিল। তারা দ্রুত গিয়ে উপর ও নীচের হ'ল পূর্ণ করে ফেলল। হলের মধ্যে যখন স্থানাভাব হ'ল তখন হলের বাইরের স্থান ও ময়দানে আঙ্গিনা পর্য্যন্ত জনপূর্ণ হয়ে গেল। আমরা উপরের হলে, নীচের হলে ও বেন্টিঙ্ক-এর প্রতিমূর্ত্তির নিকটে ময়দানে,—এ তিন স্থানে যুগপৎ তিনটি সভা করার সিদ্ধান্ত করলাম। টাউন হলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমি এ সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করলাম। প্রত্যেকেই তা' বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করল। এই বৃহৎ জনতা অবিলম্বে

তিন ভাগ হয়ে গেল। এবং এক-এক ভাগ এক-এক স্থানে গিয়ে উপবেশন করল। তারমধ্যে কোথাও কোন হট্টগোল বা বিশৃঙ্খলার চিহ্ন ছিল না। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবার আগে পর্য্যন্ত আমাদের সাম্প্রতিক কালের জনসভাগুলিতে জনসাধারণের শৃঙ্খলা রক্ষার দৃষ্টান্ত ছিল প্রশংসার যোগ্য। যে-সমস্ত বিদেশী পর্য্যটক সে সময় আমাদের বৃহৎ বৃহৎ বিক্ষোভ প্রদর্শন দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা নিতান্ত উত্তেজনার মুহূর্ত্তেও আমাদের জনগণের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও নেতৃবর্গের নির্দ্দেশ পালনের প্রস্তুতি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন। জনগণ যে নিজেদের কাজকর্ম্ম নিজেরাই পরিচালিত করতে সক্ষম, এসব থেকেও তা' সহজেই প্রমাণ হয়।

আমি তিনটি সভাতেই বক্তৃতা করেছিলাম। লোকের উৎসাহের সীমা ছিল না। লোকের মনে যে তখন কি প্রকার স্বদেশী ভাবধারণা এসেছিল একটি ঘটনা থেকে তা' কিছুটা বোঝা যাবে। সভা হবার কিছুদিন আগে স্থির হয়েছিল যে, জনসাধারণ শোক প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যেই সভায় যোগ দেবে, সুতরাং সভার দিন টাউন হলের উপরের তলাটি শোকের প্রতীক হিসাবে কাল কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হবে। এ উদ্দেশ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে হোয়াইটওয়ে লেইড ল য়্যাণ্ড কোম্পানীর উপর ভার দেওয়া হ'ল। এবং তারা তদনুযায়ী কাজও করল। সভার দিন সকালে মিঃ হালিম গজনভী এসে আমাকে জানালেন যে, ও সমস্ত বিলেতী কাল কাপড় যদি হল থেকে না খুলে ফেলা হয়, তা' হলে সভায় গোলযোগ হবার আশঙ্কা আছে। হাতে তখন আর বিশেষ সময়ও ছিল না। এজন্য কাল বিলম্ব না করে' বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করা হ'ল এবং সভা হবার পূর্ব্বেই সমস্ত কাল কাপড় খুলে ফেলা হ'ল। মানুষ ধৈর্য্য হারাতে আরম্ভ করেছিল। আমরা কিছুতেই তা' অবজ্ঞা করতে পারছিলাম না। আরম্ভেই শিবিরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হ'তে দেওয়া আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

এবার জল গড়াতে লাগল। প্রথম দিনের বিক্ষোভের সফলতা মানুষের মনে বিশ্বাস ও দেশপ্রেমের উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। এ সভায় বঙ্গদেশের সমস্ত স্থান থেকে যত প্রতিনিধি এসেছিলেন আমি আমাদের অপর কোন সভায় সেরূপ দেখি নি। বঙ্গভঙ্গের ফলে মানুষের মনে বৃটিশ সরকারের প্রতি এক অভূতপূর্ব্ব ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল। বঙ্গদেশের প্রতিনিধিবর্গের মুখ থেকে বজ্রনির্ঘোষে প্রতিবাদের ধ্বনি উঠেছিল,—বঙ্গদেশ এক ও অবিচ্ছিন্ন। যে-সকল প্রতিনিধি কোলকাতার সভায় যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ও স্বদেশীর সমর্থনে অবিরাম আন্দোলন চালাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েই গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন। তারপর দুটি আন্দোলনই পরস্পর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পাশাপাশি চলতে লাগল। স্বদেশী আন্দোলনের উচ্ছ্বাসের ফলে ম্যানচেষ্টার থেকে পণ্য আমদানী বন্ধ হয়ে গেল। যে-সকল মারওয়াড়ী ব্যবসায়ী এ পণ্যের ব্যবসা করতেন তাঁরা প্রমাদ গণলেন। যে সমস্ত পণ্য তখনো তাঁদের হাতে ছিল অন্তত সে সব যাতে বিক্রয় করে' দেওয়া যায় তজ্জন্য তাঁদের সাহায্য করতে আমাদিগকে অনুরোধ করতে লাগলেন। যে-সমস্ত পণ্য তখন তাঁদের হাতে ছিল তা' শেষ হয়ে যাবার পর আর বিদেশী পণ্য আমদানী করবেন না বলে' প্রতিশ্রুতি পেলে আমরা তাঁদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক ছিলাম। আলাপ-আলোচনায় বহুদিন পর্য্যন্ত বৃথা অনেক সময় নষ্ট হয়েছিল। শেষ অবধি ফল কিছুই হ'ল না।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সুনিশ্চিত ব্যবস্থা (সেটেল্‌ড ফ্যাক্ট)

অক্টোবর মাস দ্রুত এগিয়ে আসছিল। বঙ্গদেশ যে বিভক্ত করা হ'ল, অক্টোবর মাসের ১৬ই তারিখ থেকেই তা' কার্য্যকরী হ'বে। বঙ্গদেশের পক্ষে তা' হ'বে এক জাতীয় শোকের দিন। আমরা সেদিনটিকে সেভাবেই পালন করব বলে' সঙ্কল্প করলাম। এবং সমগ্র দেশ আমাদের সে ডাকে অন্তর থেকে সাড়া দিয়েছিল। মফস্বলের নেতৃবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করেই শোক প্রকাশের জন্য এক কার্য্যতালিকা নির্ণয় করা হয়েছিল এবং তা' ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল। স্থির হয়েছিল,—(১) যে সমস্ত লোককে আমরা ভাইয়ের মত বলে' মনে করি সে সমস্ত লোকের হাতে লালসুতো বেঁধে দিয়ে রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান পালন করা হবে। অবিভক্ত বঙ্গদেশ থেকে যে অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল তাদের সঙ্গে নূতন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের প্রতীক হিসাবে রাখীবন্ধনরূপ এই প্রাচীন প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়েছিল। (২) ১৬ই অক্টোবর তারিখে অনশন পালন করা হ'বে। সেদিন গৃহস্থের বাড়ীতে হবে অরন্ধন। উনান জ্বালান হবে না এবং পঙ্গু ও রুগ্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারও নিমিত্ত অন্ন পাককরা হবে না। প্রত্যেকে সেদিন খালি পায়ে চলাফেরা করবে এবং ভোরে গঙ্গায় স্নান করে' শুদ্ধ হ'বে। এ ছিল এক আত্মপ্রবঞ্চনামূলক জরুরী ব্যবস্থা। কিন্তু প্রত্যেকেই সানন্দে তা' মেনে নিয়েছিল। সমগ্র জাতি মনপ্রাণ দিয়ে সমস্ত নির্দ্দেশ পালন করেছিল।

কিন্তু কেবল মাত্র এটুকুই নয়। কোন এক গঠনমূলক পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করে' এ দিনটি স্মরণীয় করে' রাখতে হ'বে। আমি একটি 'ফেডারেশন হল' নির্ম্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বঙ্গদেশ যে বিভক্ত করা হয়েছিল, তার বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে পুনরায় যদি সংযুক্ত করা নাও হয় অথবা আংশিকভাবে হলেও সেই

বিভাজন পরিবর্ত্তিত না হয়, তা' হ'লে এই হল তাদের অবিভাজ্য একতার প্রতীক হয়ে থাকবে এবং এই হল হবে মূল বঙ্গদেশ ও তার বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের মিলন ক্ষেত্র। ফরাসী দেশের পেরি (স্) নগরীর 'হোটেল ইনভ্যালিডেস'-এ যা' দেখেছিলাম তা' থেকেই আমার মনে এ-ধারণাটি এসেছিল। সেখানে নেপোলিয়নের সমাধির চারদিকে জলপাইপত্রের শিরোমাল্যেভূষিত কতকগুলি মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিগুলি বিভিন্ন প্রদেশের প্রতীক। আমি যখন দেখেছিলাম তখন আলসাক্ ও লরেণ প্রদেশের প্রতীকরূপে মূর্ত্তিগুলি শোকবস্ত্র ও অবগুণ্ঠনে আবৃত ছিল। আমার মনে হয়েছিল আমরাও অনুরূপ একখানি স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করে' বঙ্গদেশের প্রত্যেক জিলার প্রতীক স্বরূপ এক একটি মূর্ত্তি তার চারদিকে বসিয়ে দেব। এবং যে সমস্ত জিলাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে সে জিলাগুলি পুনরায় বঙ্গদেশে যুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাদের প্রতীক মূর্ত্তিগুলিকে শোকবস্ত্রে ঢেকে রাখবার ব্যবস্থা করব। জনগণের অন্যান্য সমষ্টিগত প্রয়োজনেও এই হলটি ব্যবহৃত হ'তে পারবে। এ উপায় অবলম্বন করে' বঙ্গদেশ বিভক্ত করার ঘটনাটিকে মানুষের মনে চিরজাগ্রত রাখা যাবে এবং বিচ্ছিন্ন অংশগুলি মূল বঙ্গদেশের সঙ্গে পুনঃ সংযুক্ত করণের প্রচেষ্টাকে স্থায়ী ভাবে উৎসাহ দেওয়া যাবে।

গভীর যত্নের সঙ্গে আমার প্রস্তাবটি বিবেচনা করা হ'ল। ভারতের চিরকল্যাণকামী, ভারতের সেবায় আত্মনিবেদন করে' ভারতের মাটিতে যিনি দেহত্যাগ করেছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সেই মহীয়সী রমণী ভগ্নী নিবেদিতা ও স্যার তারকনাথ পালিত আমার প্রস্তাবটি অন্তরের সহিত সমর্থন করেছিলেন। বঙ্গদেশে বিজ্ঞানশিক্ষার উদ্দেশ্যে যে নৃপতি-সুলভ দান করেছেন তজ্জন্য স্যার তারকনাথ পালিত ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর সহানুভূতি ছিল বহুমুখী। যে দিন তাঁর প্রাণে সাড়া জাগল তারপর থেকে তিনি

সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সুক্ষ্ম আইনজ্ঞান, স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি, বন্ধুত্বপূর্ণ সহৃদয়তা ও উৎসাহদান সহযোগে দেশের জনস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁর ছিল সদা সতর্ক প্রহরা। বঙ্গভঙ্গ রদ করবার জন্য আমরা যে চেষ্টা চালাচ্ছিলাম তিনি মনপ্রাণ দিয়ে তার সাহায্য করতে লাগলেন। এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েও যখনই সম্ভব হ'ত তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। তাঁর সুচিন্তিত পরিচালনা ছিল আমাদের এক অমূল্য সম্পদ।

১৬ই অক্টোবর তারিখে ফেডারেশন হলের শিলান্যাস করাই যে আমাদের একমাত্র কর্ম্ম ছিল তা নয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এবং স্বদেশী আন্দোলনও ছিল সেই কর্ম্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত। স্থির হ'ল সেদিন আমরা খুব বড় রকমের এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করব যাতে প্রধানত তাঁতশিল্পের সাহায্যার্থে একটি জাতীয় অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলা যায়।

সংক্ষেপে এপ্রকারই ছিল আমাদের ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখের কর্ম্মসূচী। বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থাকে এদিনই কার্য্যকরী করবার কথা ছিল। সমস্ত আয়োজন যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা দেখাশুনা করবার জন্য আগের রাত্রিতে আমাদের কর্ম্মীরা আর ঘরে ফিরবার অবসর পেল না। অত্যধিক শ্রান্তক্লান্ত হয়েও তাদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। কার্য্যসূচী অনুযায়ী সমস্ত প্রচেষ্টাই যে সফল হবে সে বিষয়ে যখন নিঃসন্দেহ হ'ল তখন তারা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। প্রত্যূষে উষার আলো দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কোলকাতার পথে পথে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল। যুবাবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে লোক দলে দলে তালে তালে পা ফেলে চলল গঙ্গার দিকে স্নান করতে। আর যাকেই পথে দেখল তার হাতে রাখী বেঁধে দিল। সাথে সাথে বন্দেমাতরম্ ও অন্যান্য দেশাত্মবোধক

গান করতে করতে চলল সংকীর্ত্তনের দল। গঙ্গার ঘাট লোকে লোকারণ্য। কোথাও তিল ধারণের স্থান ছিল না। অগণন নারী পুরুষ সমুদ্রের তরঙ্গের মত এসে এখানে যেন ভেঙ্গে পড়ছিল। প্রত্যেকের হাতে রাখীর গুচ্ছ। পরিচিত সকলের হাতেই তা'রা তা' বেঁধে দিল।

ভোর হতেই আমিও বেরিয়ে বিডন স্কোয়ারে, সেণ্ট্র্যাল কলেজে ও অন্যান্য স্থানে পরিভ্রমণ করতে লাগলাম। সব স্থানেই প্রচুর জনসমাবেশ হয়েছিল। আমি সে সব স্থানে বক্তৃতাও দিয়েছিলাম। তরুণেরা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে' আমার পদধূলি নিতে লাগল। আমার হাতে সেদিন এত রাখী বেঁধে দিয়েছিল যে, আমার দুখানা হাতই লাল হয়ে গিয়েছিল। এরূপ একটি দিনের জন্য হলেও বেঁচে থাকা জীবনে সার্থক। কারণ মানুষের সারা জীবনে এরূপ উৎসাহ ও উদ্যমের দিন বোধ হয় কেবল একটি বারই আসে। তবে সেদিন আমাদের কঠোর পরিশ্রমও করতে হয়েছিল।

ফেডারেশন হলের শিলান্যাসের সভার সময় স্থির ছিল বিকাল সাড়ে তিনটা। সভার আরম্ভের বহু আগে থেকেই এত লোক সমবেত হয়েছিল যে, সেখানে স্থান সংকুলান অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং মানুষ তখন নিকটস্থ পথের উপর জমা হ'তে থাকে। ফলে পার্শ্ববর্ত্তী অলিগলি দিয়ে লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। আন্দাজ করা হয়েছিল অন্তত পঞ্চাশ হাজার লোক সেখানে জমা হয়েছিল। অথচ জনতা এত শান্ত ও সুশৃঙ্খল ছিল যে, তা' নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পুলিসের প্রয়োজন হয় নি। আর কোন পুলিসকে সেখানে দেখাও যায় নি। বিভিন্ন থানাতে পুলিসকে জমা করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সহরে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বা যানবাহনাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের সাহায্যেরও প্রয়োজন হয় নি। আগেই স্থির হয়েছিল মিঃ আনন্দ মোহন বোস হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন।

মিঃ বোসের সম্পর্কে অপর এক প্রসঙ্গে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি। বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা অংশের ময়মনসিংহ জিলাতে তাঁর বাড়ী। এজন্য বঙ্গদেশকে বিভক্ত করা তাঁর পক্ষে শুধুমাত্র বিরাট এক জাতীয় সংকটই ছিলনা, ব্যক্তিগত ভাবেও অভিযোগ করার তাঁর কারণ ছিল। সাঙ্ঘাতিক এক রোগে তিনি ছিলেন তখন পঙ্গু। বারটি মাস তারপর অতিবাহিত না হতেই সে রোগে তিনি পরলোক গমন করেন। রুগ্ন হয়ে শয্যাগত থাকা সত্বেও অন্যান্য মহাত্মাদের ন্যায়, তাঁর উদ্যমশীলতা দেহের কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করত। মৃত্যুর ছায়ার কাছাকাছি দাঁড়িয়েও দুর্ব্বল শরীর নিয়ে তিনি অবিরাম জনসাধারণের কাজে উৎসাহ দিতেন। আমরা তাঁর নিকট গেলাম। তাঁর চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তাঁরা জানালেন, যদি যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা যায় তবে তিনি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন। স্বেচ্ছাচারী শক্তির কার্য্যের ফলে বঙ্গদেশের যে মহান সন্তান তাঁর আবহমান কালের যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বদেশ প্রেমের বহ্নিতে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁকে দিয়ে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দ বোধ করলাম।

প্রাণঘাতী অসুখে আক্রান্ত হয়েও রোগশয্যায় থেকে তিনি যে বক্তৃতা প্রস্তুত করেছিলেন তাতে জড়বস্তুর উপর মন ও উদ্যমশীলতারই বিজয় সূচিত হয়। আমার মনে হয়, তাঁর এই বক্তৃতা ছিল তাঁর বাগ্মিতাশক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁর এই বক্তৃতা শুনবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁরা জানেন যে, তাঁর এই বাগ্মিতা ছিল সর্ব্বাধিক উদার ও মহৎ। রাজহংসের মৃত্যুকালীন শেষ সঙ্গীত বলে একটি কথা আছে। বাস্তবিক পক্ষে কয়েক মাসের মধ্যে যা' ঘটে গেল তা' বিচার করলে দেখা যাবে তাঁর এই বক্তৃতাও ছিল সেরূপ। কারণ এটিই ছিল তাঁর সর্ব্বশেষ বক্তৃতা। আনন্দমোহন তখন এত দুর্ব্বল যে, উঠে দাঁড়াবার পর্য্যন্ত তাঁর ক্ষমতা ছিল না। তা'র ফলে

তাঁর ভাষণটি আমারই পাঠ করে দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর চিকিৎসকদিগকে সঙ্গে করে' পঙ্গুদের উপযোগী একখানি আসনে (ইনভ্যালিড চেয়ারে) বসিয়ে যথা সময়ে তাঁকে সভায় এনে উপস্থিত করা হ'ল। তাঁকে দেখা মাত্র চতুর্দ্দিক থেকে তুমুল বন্দে মাতরম্‌ধ্বনি আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই বিপুল জনতা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হ'ল যেন মরণের ওপার থেকে কাউকে ফিরে আসতে দেখে সকলে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন করল। কয়েকমাস যাবৎ জনসাধারণ আনন্দমোহনের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানতে পারল না। একমাত্র সংবাদ যা' পাওয়া যেত তা' হ'ল, তিনি দিন দিন অসুস্থতা বশতঃ ক্রমশ দুর্ব্বল হয়ে তিলেতিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছেন।

শ্রোতারা শান্ত হবার পর স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী তাঁর আসন ছেড়ে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন। এবং বাংলাভাষায় এক ভাবগর্ভ ও বাগ্মিতামুখর বক্তৃতায় বঙ্গভঙ্গের নীতির তীব্র নিন্দা ক'রে সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করবার জন্য আনন্দমোহন বোসের নাম প্রস্তাব করলেন। বিপুল হর্ষধ্বনির সঙ্গে সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হ'ল। এক রাজনৈতিক সভামণ্ডপে বক্তা হিসাবে স্যার গুরুদাস ব্যানার্জীর মত একজন লোকের উপস্থিতি এতই বৈশিষ্টপূর্ণ ছিল যে, তা' থেকেই এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পশ্চাতে মানুষের আবেগের গভীরতার বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সঠিক ধারণা হওয়া ও তাদের চোখ ফোটা উচিত ছিল। একজন বিচারপতির কোন বিশেষ রাজনীতি নেই। স্যার গুরুদাসের মতে কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরও তা' থাকা অনুচিত। আমরা তাঁর এমত পোষণ করতেও পারি, না করতেও পারি। বহু খ্যাতনামা ভারতীয় বিচারপতি ভিন্ন মত পোষণ করেন। এবং চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের পর তৎকালীন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেন নি। তবে স্যার গুরুদাস

তাঁদের সঙ্গে একমত না হয়ে নিজের মত ধরেই চলতেন। তাঁর এই শান্ত দৃঢ়তা ছিল তাঁর এক বৈশিষ্ট্য। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেই সর্ব্বগ্রাসী দুর্নিবার জনমতের উচ্ছ্বাস আমাদের ছেলে, বৃদ্ধ, যুবা, ধনী, দরিদ্র, পুরুষ, নারী, সকলেরই মনকে জয় করেছিল। সম্ভবতঃ সে উচ্ছ্বাসের মুখে তিনিও ভেসে গেলেন। বঙ্গভঙ্গের ফলে প্রত্যেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তবে কোন কোন ব্যক্তি নিরপেক্ষতার ভাণ করতে লাগল। আর যা'রা ছিল চাকরীর উমেদার অথবা মোসাহেব তা'রা দেখাতে লাগল যেন সরকারের দেশবিভাগ নীতিতে তা'রা আনন্দিতই হয়েছে।

সভাপতি নির্ব্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর, আমি তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলাম। যে বিশাল জনসমুদ্র সেদিনের সভায় উপস্থিত ছিল আমার মনে হয় তাদের প্রত্যেকেই আমার কথা শুনতে পেয়েছিল। রাস্তার অপর দিকে ছিল মিঃ আনন্দমোহন বোসের বাড়ী। আমি পরে শুনেছিলাম সেখানেও আমার গলার শব্দ স্পষ্ট শোনা গিয়েছিল। শ্রোতাদের মধ্যে গুরু নানকের বংশধর বাবু কাউর সিং নামে একজন অতি উচ্চবর্গের ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তিনি এ অনুষ্ঠানকে আশীর্ব্বাদ করলেন। ভিত্তি-প্রস্তরখানি স্থাপিত হবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে স্যার আশুতোষ চৌধুরী ইংরাজী ভাষায় এক ঘোষণা প্রচার করেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন। ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ :—

'যে হেতু সমগ্র বাঙ্গালীজাতির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার বঙ্গদেশকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা সমুচিত বলে' স্থির করেছেন, সেই হেতু আমরা এতদ্বারা অঙ্গীকার করে' ঘোষণা করছি যে, আমাদের প্রদেশের পক্ষে অনিষ্টকর এই অঙ্গচ্ছেদ প্রতিহত করে' আমাদের জাতীয় একতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে

-আমরা জাতি হিসাবে আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করব। ভগবান আমাদের সহায় হোন।—এ. এম. বোস।'

সভার পূর্ব্বে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার অফিসে বসে' ঘোষণাটি স্থির করা হয় এবং সেখান থেকেই আমরা ফেডারেশন ময়দানের দিকে যাত্রা করি। পরে কেউ কেউ বলেছিল যে, কোন ঘোষণা প্রচার করবার অধিকার আমাদের নেই, কেবলমাত্র শাসন কর্ত্তৃপক্ষই তা' করতে পারেন। আইনের দিক থেকে এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বিচার আমার পক্ষে অসম্ভব। আর যে সময়ে ঘোষণাটি হয়েছিল সে সময়ে এ বিষয় নিয়ে আমরা চিন্তাও করিনি। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের একতা যে অবিনাশী, একটি স্থায়ী স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করে' সে-কথা স্মরণীয় করবার অভিপ্রায়ে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলাম, ঘোষণাটির প্রচার ছিল তারই উপযুক্ত পরিণতি। বঙ্গদেশকে বিভক্ত করার কুফল প্রতিহত করে' আমাদের জাতীয় সংহতি রক্ষা করব বলে আমরা যে অঙ্গীকার করেছিলাম এই হলকে তারই এক মূর্ত্ত প্রতীকরূপে গড়ে তুলবার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। আমরা মনে করেছিলাম যে, এই শুভমুহূর্ত্তে এ-বিষয়টি এক স্পষ্ট ও শক্তিশালী বিবৃতির দ্বারা প্রচার করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

হল নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে পরে আমরা ফেডারেশন ময়দান ক্রয়ও করেছিলাম। কিন্তু স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের আর প্রয়োজন হ'ল না। বঙ্গদেশ বিভক্ত করবার পূর্ব্বপ্রস্তাব আংশিকরূপে পরিবর্ত্তিত হ'ল এবং নিতান্ত দূর অঞ্চলের ভিন্ন অন্য সমস্ত অঞ্চলের বঙ্গভাষাভাষী-দিগকে পুনরায় সংযুক্ত করা হ'ল। আমাদের প্রদেশ বিভক্ত করার ঘটনাকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে হলটি নির্ম্মাণ করে দেশকে পুনর্মিলিত করবার প্রচেষ্টাকে জাগ্রত রাখবার আর আবশ্যকতা রইল না। যদি তা' করা হ'ত তবে হয়ত এক তিক্ত মনান্তরকেই কালের

গর্ভে বিলুপ্ত হতে না দিয়ে অকারণে বাঁচিয়ে রাখা হ'ত এবং তা' ক্ষতিকরই হ'ত।

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর তাঁর চিকিৎসকগণকে সঙ্গে করে' মিঃ আনন্দমোহন বোসকে রাস্তার অপরদিকে তাঁর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সভার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাঁর তেমন কোন ক্লান্তি বা শ্রমজনিত অবনতি লক্ষ্য করা গেল না। তাঁর দুর্জ্জয় উদ্যম ও মহোৎসাহ তাঁর সমস্ত শারীরিক দুর্ব্বলতা ও অসুস্থতাকে পরাভূত করে' তাঁকে চালিয়ে নিচ্ছিল।

তা' ছাড়া সেই মহতী সভায় অগণিত জনমণ্ডলীর স্বদেশ প্রেমের উচ্ছ্বাস ও সঙ্কল্প তখন যে এক নৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল তার ফলেও তিনি তাঁর শারীরিক দুঃখকষ্টকে ভুলে' গিয়েছিলেন। তাঁর প্রিয়জনেরা তাঁর জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন ছিলেন। তবুও যেরূপে তিনি শরীরের সেই রোগক্ষিন্ন অবস্থাতেও সেই মহানুষ্ঠানের কাজকর্ম্ম যথাযোগ্য সুচারুরূপে ও মর্য্যাদার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন, তজ্জন্য তাঁর আত্মীয়বর্গ অত্যধিক আনন্দ ও গর্ব্ববোধ করছিলেন।

অনুষ্ঠানের শেষে সমবেত জনতা প্রায় দুমাইল পথ অতিক্রম করে' খালি পায়ে রায় পশুপতিনাথ বোসের প্রাসাদোপম বাড়ীর দিকে চলল। তৎপূর্ব্বেই স্থির হয়েছিল, দেশীয় শিল্পের সাহায্যে জাতীয় ভাণ্ডারের জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করা হ'বে তা' ঐ প্রাসাদের আঙ্গিনাতে বসেই করা হ'বে। তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। স্যার আশুতোষ চৌধুরী, মিঃ জে. চৌধুরী, মিঃ অম্বিকাচরণ মজুমদার এবং আমি আরও কয়েকজন বন্ধুসহ খালি পায়ে প্রস্তরাকীর্ণ পথ ধরে' হাঁটতে লাগলাম। প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে দেখি আঙ্গিনাতে অসংখ্য লোক ঠেলাঠেলি করছে এবং আরও লোক তখনো আসছে। লোকের ভীড় ঠেলে অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। লোকেরা ছুটে এসে আমার

পায়ের ধূলো নিতে লাগল। এ বিষয়ে তখন এক দৈনিক সংবাদপত্রে যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, তা' থেকে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করছি :

'এই সঙ্কটমুহূর্তে তাঁর বন্ধুগণ তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ভীড়ের চাপ থেকে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু লোকেরা হতাশ হয়ে বলতে লাগল, বাবু সুরেন্দ্রনাথকে দেখব, তাঁর আশীর্ব্বাদ নেব বলেইত আমরা না খেয়ে না দেয়ে এতদূর এসেছি। অনুরূপভাবে, সভা ভাঙ্গবার পর বাবু সুরেন্দ্রনাথ যখন ফিরবার উদ্দেশ্যে রাস্তায় এলেন চারদিক থেকে জনতা তাঁর কাছে ছুটে আসতে লাগল। সে সময় আলিপুরের সিনিয়র সরকারী উকিল বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ গাড়ী করে সেপথে যাচ্ছিলেন। এবং তাঁর চেষ্টাতেই বাবু সুরেন্দ্রনাথ ভীড়ের চাপ থেকে রক্ষা পান।'

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেদিন আমরা ৭০,০০০৲ টাকা সংগ্রহ করেছিলাম। লোকের কাছ থেকে অল্প-অল্প টাকা সংগ্রহ করেই মোট এই সত্তর হাজার টাকা হয়েছিল। এবং বঙ্গদেশের মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোকেরাই এই টাকাটি দিয়েছিল। রাজা মহারাজারাও টাকা দিয়েছিলেন। তবে তার পরিমাণ সামান্যই। এ টাকা দেবার জন্য কোন ব্যক্তিকে অনুরোধ করতে হয় নি। মনের আবেগে লোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে টাকা দান করেছিল। তাঁতশিল্প ও পারিবারিক শিল্পের উন্নয়নের জন্যই এ টাকা ব্যয় করা হ'বে বলে' স্থির হয়েছিল। কিছু অর্থ তাঁতশিল্প বিদ্যালয়ের জন্যও ব্যয় করা হয়েছিল। কিন্তু তা'তে বিদ্যালয়সমূহের কোন উন্নতি হ'ল না এবং সে জন্য পরে বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দিতে হ'ল। অবশিষ্ট টাকা ট্রাষ্টীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে আমানত আছে। এই টাকা থেকে যে সুদ পাওয়া যায় তার কিছু অংশ লেডী কারমাইকেল দ্বারা স্থাপিত পারিবারিকশিল্প সমিতিকে এবং কিছু অংশ ভারতীয় মহিলাশিল্পশিক্ষা বিদ্যালয়কে মাসিক অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবরের পরের মাসগুলি ছিল দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ ও অশান্তিময়। সরকারী নীতি, বিশেষভাবে স্যার ব্যামফিলড্‌-এর শাসনাধীন পূর্ববঙ্গের সরকারী নীতি, উত্তেজনাময় পরিস্থিতিকে আরও উত্তেজিত করে' তুলল। কিছুটা ঠাট্টার ছলে ও কিছুটা ঐকান্তিকভাবে তিনি বলেছিলেন, হিন্দু ও মুসলমান নামে তাঁর দুটি পত্নী আছে, তন্মধ্যে মুসলমান নামক পত্নীকেই তিনি অধিকতর ভালবাসেন। স্থিরমস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই তাঁর কথা শুনে' বিস্মিত হয়েছিলেন। যে শাসক প্রকাশ্যভাবে এরূপ নির্লজ্জ রসিকতা করতে পারে সে ব্যক্তি এই উচ্চ পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। সরকারী কর্মচারীরাও তাঁরই অনুসরণ করতে লাগল। এ সংক্রমণ বিচারালয় পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এক সর্ব্বজনবিদিত মামলায় এরূপ অন্যায়কারী এক বিচারককে কোলকাতা হাইকোর্ট তীব্রভাষায় নিন্দা করলেন। ১৯০৭ সালে কুমিল্লা রায়টিং কেসের আসামীর দণ্ড রদ করে দিয়ে হাইকোর্ট বললেন :

"সাক্ষীগণকে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে' তাদের এক শ্রেণীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা ও অপর শ্রেণীর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করার যে-নীতি এ মামলায় বিচারক অবলম্বন করেছেন, তা' বিশেষ রূপে নিন্দার যোগ্য। বিচারকের উচিত ছিল, যে সাক্ষ্য প্রমাণ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছিল তারই বিবেচনা করা এবং কোন শ্রেণী বিশেষের প্রতি পূর্ব্ব ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে কোন সহানুভূতি প্রদর্শন না করে' সমস্ত বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে বিচার করা।"

দ্বিধাহীন ন্যায়পরায়ণতা ও বিচারসংক্রান্ত সংযমের জন্য যে হাইকোর্টের ঐতিহ্য সুবিদিত সেই হাইকোর্টই এক্ষেত্রে এরূপ কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গীয় সরকার যদি কেবলমাত্র পক্ষপাতিত্বের দোষেই দুষ্ট হতেন তা' হলেও পরিস্থিতির এত অবনতি হ'ত না। কিন্তু বঙ্গদেশ বিভক্ত হবার পরেই দমননীতি আরম্ভ হয়।

তা'র ফলে সরকারের সামনে নানা জটিলতা ও অসুবিধা উপস্থিত হ'তে লাগল। পূর্ব্বেই বলেছি প্রকাশ্য রাজপথে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়া এবং প্রকাশ্য স্থানে সভা সমিতির অনুষ্ঠান করা নিষিদ্ধ হয়েছিল। শান্তিপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে মিলিটারী পুলিস নিযুক্ত করা হ'ল। তা'রা হিন্দুসম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের উপরেও অত্যাচার করতে লাগল। এ অবস্থায় জনসাধারণের মনে সরকারের প্রতি এক তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হ'তে থাকে। স্বদেশী বিজ্ঞপ্তি প্রচারের নামে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। বরিশালের জননেতা বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন এক সর্ব্বজন মান্য ব্যক্তি। মিঃ জ্যাক কর্ত্তৃক তিনিও এভাবে অভিযুক্ত হলেন। এই অভিযোগ ছিল ভিত্তিহীন। বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত দেওয়ানী আদালতে মানহানির মামলা করে' এজন্য ক্ষতিপূরণও আদায় করেছিলেন। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রতিনিধিদের উপর পুলিস লাঠি চালিয়ে জোর করে সম্মেলন ছত্রভঙ্গ করে' দেওয়ার পর অবস্থা চরমে উপস্থিত হ'ল।

———

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বরিশাল

যে বরিশাল সম্মেলনের সঙ্গে আমি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলাম এবার তার বিবরণের প্রতি আমি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। সম্মেলনের কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাদের কর্ম্মীদের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ের নিষ্পত্তি করবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন বন্ধু সহ আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম। সেখানে কাজ শেষ হওয়ার পর জাহাজে করে' আমরা ঢাকা থেকে বরিশাল যাত্রা করলাম। সন্ধ্যার দিকে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখি কোলকাতা ও অন্যান্য স্থান থেকে প্রতিনিধিগণ আমাদের আগেই সেখানে এসে গিয়েছেন। তাঁরা যে-সব জাহাজে এসেছিলেন সে-সব জাহাজে বসে তাঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এবং জাহাজ থেকে নামবার আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে' তাঁরা প্রথম সে-সব সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। বরিশালের রাজপথে এবং পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত সহরেই বন্দে মাতরম্ ধ্বনি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আমরা বললাম, এ আদেশ অবৈধ। আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে আমরা আমাদের মতকে অধিকতর শক্ত করে' নিলাম। আইনের দৃষ্টিতে যা' অবৈধ এরূপ এক আদেশ মেনে নিয়ে আমরা কি শেষ পর্য্যন্ত এক স্বেচ্ছাচারী শাসক শক্তির নিকট নতি স্বীকার করব? এতে যে আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে। কিন্তু এ বিষয়ে বরিশালের নেতৃবর্গ কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে এক বোঝাপড়ায় এসেছিলেন। প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা করবার সময় প্রকাশ্য রাজপথে বসে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেবেন না বলে' তাঁরা এক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠল, আমরা কি এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে বাধ্য? প্রতিনিধিদের

মধ্যে যাঁরা ছিলেন তরুণ ও বয়োকনিষ্ঠ তাঁদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। তাঁরা বললেন, প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তাঁরা বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি দেবার পক্ষপাতী। যা হোক এক বোঝাপড়া হ'ল এবং অবিলম্বে সমস্ত দলই তা' মেনে নিল। বলা হ'ল, বরিশালবাসীগণ আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন এবং আমরা তাঁদের অতিথি। যদি সম্ভব হয়, আমাদের এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে তাঁদের সুনাম নষ্ট হয় বা তাঁদের সততা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হ'তে পারে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁরা সে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছেন আমরা তার অমর্য্যাদা করব না। অপর পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারমূলক আদেশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাজপথে বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি তুলে তাঁদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার অধিকারও প্রতিনিধিবর্গের রয়েছে এবং তা' করতে তাঁরা বাধ্য। বরিশালের নেতৃবর্গের প্রতিশ্রুতির ব্যাপকতা ছিল অত্যন্ত সীমিত। প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করবার সময় তাঁরা ধ্বনি দেবেন না বলেই কথা দিয়েছিলেন। তার অতিরিক্ত কিছু নয়। কাজেই সকলের সম্মতি নিয়ে জাহাজে বসেই স্থির হ'ল, বরিশালের নেতাগণ যা' অঙ্গীকার করেছেন তা' মান্য করা হ'বে। অভ্যর্থনার সময় বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি থেকে সকলেই বিরত থাকবেন। কিন্তু তদ্ভিন্ন অপরাপর সকল সময়েই প্রয়োজন মত আমরা ধ্বনি দেব, যেন তার বিরোধী কোন সরকারী আদেশ কোথাও নেই। এ নীতি নির্দ্ধারণের পর অপরাহ্ণে প্রতিনিধিগণ জাহাজ থেকে অবতরণ করলেন।

লাখোটিয়ার জমিদার মিঃ বিহারীলাল রায়ের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আমার আত্মীয়তা ছিল। আমি তাঁর বাড়ীতে উঠলাম। জনসেবক বা পাব্লিকম্যান বলতে যা' বোঝায় তিনি কোনদিনই তা' ছিলেন না। তাঁর জমিদারী ও বৈষয়িক কাজকর্ম্মের মধ্যেই তিনি সর্ব্বদা ডুবে থাকতেন। জনআন্দোলন বা ওরূপ কিছুতে যোগ দেবার মত

তাঁর সময়ও ছিল না, উৎসাহও ছিল না। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ অন্যদের মত তাঁকেও তাঁর স্বতন্ত্র জীবন থেকে টেনে নিয়ে এল এবং তারপর থেকে তিনি বরাবরই স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ—বিরোধী আন্দোলনের এক অত্যুৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তাঁর মত লোক যে কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকবার চেষ্টা করবেন এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের মনের আবেগ তখন এতই প্রবল যে, তিনি সে দুর্ব্বার স্রোতে ভেসে গিয়ে ন্যাশান্যাল পার্টিতে যোগ দিলেন।

১৪ই এপ্রিল শনিবার প্রাদেশিক সম্মেলন আরম্ভ হ'বে। সে দিন সকালে মিঃ বিহারীলাল রায়ের বাড়ীতে, যেখানে আমি ছিলাম সেখানে একটি সম্মেলন হয়ে গেল। সারকুলার-বিরোধী সমিতির প্রতিনিধি সহ সমস্ত নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই সারকুলার-বিরোধী সমিতি গঠিত হয়েছিল। মিঃ শচীন্দ্রপ্রসাদ বোস ছিলেন তার সম্পাদক এবং মিঃ কৃষ্ণকুমার মিত্র তার সভাপতি। বঙ্গীয় সরকার ছাত্রদের সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি বা সারকুলার প্রচার করেছিলেন তার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করাই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। অধিকাংশ সংখ্যক যুবক নিয়ে তাঁরা এক একনিষ্ঠ স্বদেশী কর্ম্মীদল গঠন করেছিলেন এবং স্বদেশীর আদর্শকে এঁরা প্রচুর পরিমাণ সেবা করেছিলেন। সম্মেলনে স্থির হয়েছিল যে, প্রতিনিধিগণ রাজার হাভেলীতে একত্র হবেন, তারপর সেখান থেকে বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে এক শোভাযাত্রা করে' প্রাদেশিক সম্মেলনের সভামণ্ডপ পর্য্যন্ত যাবেন। আশংকা করা হয়েছিল যে, পুলিস তা'তে বাধা দেবে, এমন কি, বল প্রয়োগও করতে পারে। কিন্তু প্রত্যেককেই বিশেষভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, কোন অবস্থাতেই প্রতিনিধিগণ প্রতিআক্রমণ করতে পারবেন না। তাঁরা তাঁদের সঙ্গে লাঠি ত দূরের কথা একটি ছড়ি পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেন না। ব্যারিষ্টার মিঃ বি. সি. চাটার্জ্জী

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি তাঁর ছড়িখানা তাঁর সঙ্গে নিতে পারবেন কি না। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে সরাসরি জবাব দিয়েছিলাম, "না, ছড়িও নয়"। এ নির্দ্দেশ প্রত্যেকেই একান্ত ভাবে পালন করেছিলেন।

স্থির ছিল, বেলা ছুটার সময় শোভাযাত্রা বাহির হ'বে। তার আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে আমি সেখানে উপস্থিত হ'লাম। শোভাযাত্রার সমস্ত আয়োজন সাঙ্গ করে, শোভাযাত্রা বাহির করে' দিলাম। মিঃ এ. রসুল ছিলেন সভাপতি। তাঁর সহধর্ম্মিনী মিসেস্ রসুল ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। তাঁরা উভয়ে গাড়ীতে করে' শোভাযাত্রা চালিয়ে নিয়ে চললেন। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক বাবু মতিলাল ঘোষ, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং আমি ছিলাম শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে। বয়োকনিষ্ঠেরা ছিল শেষের দিকে। বহুসংখ্যক পুলিস দেখা গেল। তাদের সকলের কাছে ছয় ফুট লম্বা লম্বা 'রেগুলেশন ষ্টিক' নামক বড় বড় লাঠি। তাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন অশ্বপৃষ্ঠে স্বয়ং সহকারী পুলিস সুপারিণটেনডেণ্ট। বলপ্রয়োগের এসমস্ত ক্ষমতা প্রদর্শনের কিছুমাত্র কারণ ছিল না। তারপর যা' ঘটেছিল তা' ছাড়া এরূপ প্রস্তুতির অন্য কোন সদুত্তর আর ছিল না।

নির্ব্বিবাদে আমাদের চলে যেতে দেওয়া হ'ল। সারকুলার-বিরোধী সমিতির তরুণ প্রতিনিধিরা যখন হাভেলী থেকে প্রকাশ্য রাজপথে এল তখনই আরম্ভ হ'ল পুলিসের কার্য্যসূচী অনুযায়ী কাজ। পুলিস তাদের উপর আক্রমণ করল। সেই বড় বড় লাঠি দিয়ে পুলিস তাদের প্রহার করতে লাগল। তাদের কাছে যে-সমস্ত বন্দে-মাতরম অঙ্কিত ব্যাজ ছিল পুলিস সে-সমস্ত টেনে ছিঁড়ে দিল। তাদের মধ্যে অনেকেই সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হ'ল। বাবু মনোরঞ্জন গুহ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ স্বদেশী কর্ম্মী ও বক্তা। পরবর্তীকালে এঁকে নির্ব্বাসিত করা হয়েছিল। তাঁর পুত্র চিত্তরঞ্জন

গুহকে পুলিস এক জলাশয়ে ফেলে দিল। সময়মত তাকে যদি সেখান থেকে উদ্ধার করা না যেত তা' হ'লে হয়ত সেদিন তার সলিল সমাধি হ'ত।

এই তরুণদের সেদিন কোনই অপরাধ ছিল না। পূর্ব্ববঙ্গীয় সরকারের নিকট নিতান্ত আপত্তিকর যে বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি, তাও এই তরুণেরা আক্রান্ত হবার আগে উচ্চারণ পর্য্যন্ত করে নি। তাদের একমাত্র অপরাধ ছিল কারও চলাফেরায় কোনরূপ অসুবিধা বা বাধা সৃষ্টি না করে তারা প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে শোভাযাত্রার সঙ্গে যাচ্ছিল। কেবলমাত্র আক্রান্ত হবার পরেই তা'রা আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত করে উচ্চৈঃস্বরে বন্দে-মাতরম ধ্বনি দিতে লাগল। বিনা প্ররোচনায় এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে এর অধিক আক্রমণের কথা কল্পনাই করা যায় না। শোভাযাত্রীদের পক্ষ থেকে যদি বাস্তবিকই কোন অপরাধ হ'ত, তবে তাদের গ্রেপ্তার করে ফেলা যেত। প্রয়োজনবোধে শোভাযাত্রাই ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু তাতে কর্ত্তৃপক্ষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ত না। আমার বলতে দ্বিধা নেই, এবং তৎকালীন অন্যদেরও সেই ধারণাই ছিল যে, এটা ছিল এক পূর্ব্বপরিকল্পিত ব্যবস্থারই অংশ। কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস ছিল, নিয়মিতভাবে এরূপ এক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারলে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সমস্ত আন্দোলন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু এ আশা ছিল দুরাশা। যেমন অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে তেমনি এখানেও দমননীতি বৃথা হ'ল। এতে কেবল গণশক্তি প্রবলতর হ'ল এবং মানুষের সংকল্পকে দৃঢ়তর করল।

যখন পুলিসের এই দৌরাত্ম্য চলছিল তখন আমরা মনের সুখে এগিয়েই চলছিলাম। কি যে হয়েছে বা হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমরা তখনো কিছু জানতে পারি নি। মিঃ ললিতমোহন ঘোষাল নামে

কোলকাতার একজন প্রতিনিধি বাহুবিস্তার ক'রে আমাদের দিকে ছুটে এলেন। বললেন, "আপনারা কি করছেন? আপনাদের প্রতিনিধি ভাইদের পুলিস পেছনে লাঠিপেটা করছে। আপনাদের আর যাওয়া চলবে না।" আমি তৎক্ষণাৎ পেছনে ফিরলাম। বাবু মতিলাল ঘোষ এবং আরও কয়েকজন আমার অনুসরণ করলেন। আমি যখন আসছি পুলিসের সুপারিণটেনডেণ্ট মিঃ ক্যাম্প-এর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম "আপনি আমার লোকদের প্রহার করছেন কেন? তারা যদি কিছু ক'রে থাকে তজ্জন্য সাজা আমার প্রাপ্য। আমিই এজন্য দায়ী। ইচ্ছা হলে আমায় গ্রেপ্তার করুণ।" পুলিস সুপারিণটেনডেণ্ট সঙ্গেসঙ্গে উত্তর দিলেন, "আপনি আমার বন্দী।" এ সময় মিঃ মতিলাল ঘোষ এগিয়ে এসে বললেন, "আমাকেও গ্রেপ্তার করুন।" মিঃ ক্যাম্প জবাব দিলেন, "কেবল মিঃ ব্যানার্জীকেই গ্রেপ্তার করবার জন্য আমার প্রতি নির্দ্দেশ রয়েছে।" স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল আমার গ্রেপ্তারও পূর্ব্বপরিকল্পনা অনুসারেই হয়েছে। যাক, তা' হ'ল অন্য এক কাহিনী।

আমার গ্রেপ্তারের সঙ্গেসঙ্গে সমস্ত ঘটনার এ অংশটি সমাপ্ত হ'ল। আমি এখন পুলিস হেপাজতে বন্দী। মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু কাছেই ছিলেন। তাঁর দিকে ফিরে বললাম, "আমাকে ছাড়াই আপনারা সম্মেলনের কাজ চালিয়ে যান। একে মুলতুবি বা বন্ধ করবেন না।" আমার এ নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল। উত্তেজনা ও ঘৃণা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু সম্মেলনের কাজ পূর্ব্বের মতই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হ'ল যেন কিছুই হয় নি। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই যে আত্মসংযমের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল তা' আমাদের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা লাভের যোগ্যতার পক্ষে কম পরিচায়ক নয়।

ইতিমধ্যে মিঃ ক্যাম্প আমাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। পথে আমরা একখানা ঠিকা গাড়ী ভাড়া করলাম।

মিঃ বিহারীলাল রায়, মিঃ অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদও আমাদের সঙ্গে গেলেন। আমি তখন মিঃ ক্যাম্প-এর তত্ত্বাবধানে, কাজেই এ দলে তাঁরও থাকা দরকার। কিন্তু গাড়ীতে পাঁচজনের মত স্থান ছিল না। কাব্যবিশারদ তখন গাড়ীর পেছনে সহিসের জায়গাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমাদিগকে মিঃ ইমার্সনের বাড়ীর বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে প্রস্তুত হবার সময় দেবার জন্য আমরা দু'এক মিনিটকাল সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর তাঁর ঘরে যাবার জন্য আমাদের বলা হ'ল। কাব্যবিশারদ যেই মাত্র তাঁর ঘরের চৌকাঠ পার হলেন অমনি মিঃ ইমার্সন বজ্রকণ্ঠে গর্জ্জন করে উঠলেন, "বেরিয়ে যাও"। আমরা কাব্যবিশারদের প্রতি এরূপ ব্যবহারের কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। কাব্যবিশারদ ছিলেন কালীঘাটের পূজারী হালদার পরিবারের লোক। বঙ্গদেশের এক অতি পবিত্র তীর্থের মন্দিরের দেখাশুনা করবার ভার ছিল তাঁদের উপর। বঙ্গভঙ্গের বিরোধী অথবা স্বদেশী সভাসমিতিগুলিতে তিনি যখন যোগ দিতেন তখন সাধারণত তিনি, গোঁড়া হিন্দুর মত সাজপোষাক পরে' যেতেন। যদিও কাব্যবিশারদের অনেক প্রকারের খেয়াল ছিল, তবুও এটিও যে কেবল সেরূপ কোন এক খেয়াল তা' নয়। এর পেছনে কিছু কারণও ছিল। তিনি যে একজন পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণ তাঁর পোষাক দেখে তাই প্রকাশ পেত। তাঁর দলের শক্তি বাড়াবার জন্য স্বভাবতঃই এভাবে তিনি সমস্ত রকম চেষ্টা করতেন। তাঁর গায়ে কোন সার্ট ছিল না। সাধারণ ধুতি চাদর, খালি পায়ে, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত গলায় দিয়ে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

কাব্যবিশারদের এই পোষাক বাস্তবিক পক্ষে মিঃ ইমারসন বা তাঁর আদালতের উদ্দেশে ছিল না। তা' ছিল সম্মেলনের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে। তাঁর পোষাকের এই ক্ষীণতাই ছিল ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্রোধের কারণ। এবং ম্যাজিষ্ট্রেট-সুলভ মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেই তিনি কাব্যবিশারদকে বেরিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন। সে আদেশ অমান্য করবার উপায় কাব্যবিশারদের ছিল না। তবুও তিনি দরজার বাইরে খুব নিকটেই রইলেন যাতে সাময়িকভাবে ন্যায়ালয়ে রূপান্তরিত ম্যাজিষ্ট্রেটের কক্ষের মধ্যে কি হচ্ছে তা' তিনি দেখতে ও শুনতে পারেন।

একজন আসামীর ন্যায় আমি ঘরে প্রবেশ করলাম। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, আমি একজন আইনভঙ্গকারী। আমার পক্ষে এছিল এক আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা। কারণ কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও আমি উচ্চতর আদালতে আসামীরূপে হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু সে পরিবেশ ছিল অধিকতর মর্য্যাদাপূর্ণ। বিনা বাধায় আমার অপর দুই বন্ধু আমার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে' সেখানে যে চেয়ার ছিল তাতে গিয়ে বসলেন। আমিও তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে' একখানি ভাঙ্গা বেতের চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু বসবার উদ্দেশ্যে যেই মাত্র চেয়ারে হাত দিয়েছি, ম্যাজিষ্ট্রেট চিৎকার করে উঠলেন, "তুমি একজন আসামী। তোমার বসার অধিকার নেই। তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।" উত্তরে আমি বললাম, "আমি আপনার বাড়ীতে অপমানিত হতে আসি নি। আমি আপনার কাছ থেকে ভদ্র ব্যবহার এবং সুবিবেচনাই আশা করেছিলাম।"

মিঃ ইমার্সন রুষ্ট হলেন। তখনই তিনি আমার বিরুদ্ধে এক অবমাননার মামলা প্রস্তুত করে' আমাকে জবাব দিতে আদেশ দিলেন। আমি বললাম, আমি নির্দ্দোষ এবং আমার বিরুদ্ধে যে

অভিযোগ তার জবাব দেবার জন্য সময় দেওয়া হোক। যখন এ সমস্ত ঘটনা ঘটছিল, তখন সে ঘরের মধ্যে অপর এক ইউরোপীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। পরে আমি জানতে পারি যে, তিনি ছিলেন নোয়াখালির ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লীস্। তিনি আমাকে মাপ চেয়ে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে বললেন। আমি বললাম, "আমি মাপ চাইব কিসের জন্য? আমি কিছুই করি নি যে জন্য আমার মনে হয় আমার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত"। অবমাননার জন্য আমার দু'শত টাকা অর্থদণ্ড হ'ল।

তারপর ফৌজদারী মামলাটি ধরা হ'ল। মিঃ ক্যাম্প নিজে সাক্ষ্য দিলেন। বোধ হয় এ মামলায় তিনি একাই সাক্ষী ছিলেন। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, আমি বিনা লাইসেন্স-এ পরিচালিত এক শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলাম, যে শোভাযাত্রায় যোগ্যকর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা নিষিদ্ধ ধ্বনি দেওয়া হচ্ছিল। আমি বললাম, আমি নির্দ্দোষ। মিঃ ক্যাম্পকে জেরা করবার জন্য ও সাক্ষী ডাকবার জন্য সময় চাইলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট আমার আবেদন অগ্রাহ্য করে' আমাকে আবার দু'শত টাকা অর্থদণ্ড দিলেন। সে সময় আমার সঙ্গে টাকা ছিল না। মিঃ ক্যাম্প আমার সঙ্গে অনবরতই ভদ্র ব্যবহার করছিলেন। টাকা সংগ্রহ করবার জন্য তিনি আমাকে সঙ্গে করে' নিয়ে গেলেন।

জরিমানার টাকা জমা দিয়ে আমি সম্মেলনে ফিরে এলাম। তখন অধিবেশন চলছে। আমার বন্ধুগণকে সঙ্গে করে' প্রবেশ করতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল। সমস্ত শ্রোতা একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বন্দেমাতরম্ বলে ধ্বনি দিতে লাগলেন। অধিবেশনের কাজকর্ম্ম কয়েক মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। তারপর মঞ্চে উঠে আমরা যখন আসন গ্রহণ করলাম তখন আবার সভার কাজ সুরু হ'ল। কিন্তু সে সময় সম্মেলনে কার্য্যসূচী

অনুযায়ী কাজ করবার মত মানসিক অবস্থা কারও ছিল না। যে সমস্ত ঘটনা সেদিন ঘটে গিয়েছিল তা' এত শীঘ্র ভুলে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঘটনাগুলির প্রকৃতিও ছিল এমন যে, তা' বাদ দিয়ে অন্য কিছুতে মনোনিবেশ করারও উপায় ছিল না।

অনতিকাল পরে বাবু মনোরঞ্জন গুহ তাঁর পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহকে সঙ্গে করে' মঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন। চিত্তরঞ্জন গুহের কপালে একটি পটি বাঁধা। উদ্দেশ্য ছিল, পুলিস কিভাবে তাঁর পুত্রের উপর আক্রমণ করেছিল সে কথা মনোরঞ্জন বাবু প্রতিনিধিদের সমক্ষে বিবৃত করবেন। সুবক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। ভাষায় তাঁর জোর ছিল। তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে তিনি ঘটনাটি বিবৃত করলেন। শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরবে সব শুনলেন। পুলিস ছয় ফুট লম্বা লাঠি নিয়ে চিত্তরঞ্জনকে আক্রমণ করে, তারপর তাকে এক জলাশয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। নিতান্ত অসহায় অবস্থাতেও পুলিস ছেলেটিকে প্রহার করতে থাকে। সে কোনরূপ বাধা দানের চেষ্টা না করে' যতবার লাঠির ঘা খেয়েছিল ততবারই বন্দেমাতরম্ বলে' চিৎকার করেছিল। কোনরূপ প্রতিরোধের চেষ্টা না করে' বা কোন প্রশ্ন না তুলে পাশবিক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণের এ ছিল এক চরম চেষ্টা। মঞ্চের উপর পিতা-পুত্র পাশাপাশি দণ্ডায়মান,—পিতা ঘটনার বিবরণ দিয়ে চলেছেন, পুত্রের দেহে আক্রমণের আঘাত তার সাক্ষ্য বহণ করছে—এ দৃশ্য কোনদিন ভোলা যায় না। এ দৃশ্য পরে রং তুলির সাহায্যে পর্দ্দায় রূপায়িত হয়ে ১৯০৬ সালে লর্ড মিণ্টো কোলকাতায় যে প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন সেখানে অতিশয় জনপ্রিয় চিত্ররূপে পরিগণিত হয়েছিল।

অপরাহ্ণে সম্মেলন সাঙ্গ হ'ল। প্রতিনিধিরা বাড়ী ফিরবার পথে প্রকাশ্য রাস্তায় নিষিদ্ধ বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিতে লাগলেন। পুলিস তখন আর কোন বাধা দিল না। বোধ হয় তারা ভেবেছিল যে,

সমস্ত দিন যথেষ্ট কাজ করা হয়েছে। এখন প্রতিনিধিরা যা' ইচ্ছা করুক।

বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গীয় সরকারের পরিসমাপ্তি হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই সরকারের ইতিহাসের দমননীতির সেই মসিলিপ্ত কাহিনীটি সেদিনই শেষ হল না। পরদিন পুনরায় সম্মেলন বসল। সভার কাজকর্ম্ম যথারীতি চলতে লাগল। এমন সময় পুলিসের জেলা সুপারিণটেনডেণ্ট মিঃ ক্যাম্প সভামণ্ডপে প্রবেশ করলেন। তারপর সরাসরি মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়ে সভাপতিকে বললেন যে, সভা শেষ হবার পর ফেরার পথে প্রতিনিধিরা প্রকাশ্য রাজপথে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেবেন না বলে তিনি যদি প্রতিশ্রুতি দিতে না পারেন, তা' হ'লে সভা ভেঙ্গে দিতে হবে। প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শের পর, সভাপতি যখন ওরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করলেন, তখন মিঃ ক্যাম্প ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে সভা ভঙ্গ করে' দেবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের এক আদেশ পড়ে' শুনিয়ে দিলেন। সম্মেলনের উপর দিয়ে এক ঘৃণার স্রোত বয়ে গেল। প্রতিনিধিরা কেহই নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। মিঃ জে. চৌধুরী ও অপর নেতৃবর্গ প্রতিনিধিদের নিকট আবেদন করতে লাগলেন। কর্তৃপক্ষের আদেশ তাঁদের নিকট যত স্বেচ্ছাচারমূলক বলেই মনে হোক তবুও কর্তৃপক্ষের আদেশ মেনে চলবার জন্য তাঁরা প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ করতে লাগলেন। এঅবস্থায় প্রতিনিধিগণ সে অনুরোধ রক্ষা করার সঙ্কল্প করলেন। এত উত্তেজনার মধ্যেও আমাদের জনগণ যে নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা ও তৎপরতার সঙ্গে নেতৃবর্গের পরামর্শ মেনে নেবার অকাট্য প্রমাণ দিয়েছিলেন আমাদের আন্দোলনের সফলতার জন্য তাহাই প্রধানত দায়ী।

প্রতিনিধিবর্গ তাঁদের আসন ত্যাগ করে' সারিবদ্ধভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে' গেলেন এবং সেখানে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি তুলতে

লাগলেন। প্রতি স্তরেই তাঁরা তাঁদের এই ধ্বনির বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। একে একে সকলেই সভামণ্ডপ ত্যাগ করে' গিয়েছেন। কেবল একজন তখনো বসেছিলেন। ইনি সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক মিঃ কৃষ্ণকুমার মিত্র। তাঁর সম্পর্কে আমি ইতিপূর্ব্বেও বলেছি। কথিত আছে, প্রাচীন রোমনগরীতে ব্রেনাস যখন তার বর্ব্বর অনুচরদের সঙ্গে করে' প্রবেশ করেছিল, তখন রোমীয় সেনেটের সদস্যরা কেহই আসন ত্যাগ করে' চলে গেল না। প্রত্যেকে স্ব-স্ব আসনে বসেই ছিল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মিঃ কৃষ্ণকুমার মিত্রও আসন ত্যাগ না করে অনুরূপভাবে বসেই রইলেন। তাঁর চেহারায় তখন এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাব; ক্রোধ এবং ঘৃণায় মুখ রক্তবর্ণ। কর্ত্তৃপক্ষকে অমান্য করে' তার ফল ভোগ করতে তিনি প্রস্তুত। আমরা প্রতিবাদ করে', তর্ক করে', অনুরোধ করে' তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। এবং অবশেষে অনেক কষ্টে তাঁকে সভামণ্ডপ ছেড়ে যেতে সম্মত করালাম।

এই সম্মেলনে পরিদর্শিকা হিসাবে প্রায় তিন শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। দু'টি মাত্র বিকল্প তখন তাঁদের সামনে ছিল। অপরাহ্ণে তাঁদের বাড়ীতে দিয়ে আসবার জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুতরাং হয়ত গাড়ী না আসা পর্য্যন্ত তাঁরা জনশূন্যমণ্ডপে অপেক্ষা করতে পারেন, না হয়. তখনই তাঁরা সেই এপ্রিল মাসের দুপুরের রোদে সঙ্গীহীন অবস্থায় বাড়ী ফিরে যেতে পারেন। তাঁরা শেষোক্ত পন্থাই গ্রহণ করলেন। ভারতীয় মহিলাদের স্বভাব ও মানসিক অবস্থার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাই ধারণা করতে পারবেন বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য সে মহিলারা কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। এক বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব নিয়ে আমরাও সভামণ্ডপ ত্যাগ করলাম। এরূপ এক অস্বাভাবিক আদেশ যে হ'তে পারে তা' আমাদের ধারণার অতীত। এ ছিল এক ক্ষমতা বহির্ভূত আদেশ এবং সমর্থনের সম্পূর্ণ

অযোগ্য। পূর্ব্বদিন পুলিসের অবাধ অবৈধ কারুকর্ম্ম সত্ত্বেও প্রতিনিধিরা যেরূপ শান্তভাবে সমস্ত কিছুই মেনে নিয়েছিল তাতে যে তাদের দিক থেকে কোন প্রকার শান্তিভঙ্গ হ'তে পারে এরূপ আশঙ্কার মধ্যে কোনই যুক্তি ছিল না। আদেশটি নিম্নরূপ ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছিল :—

"যেহেতু পুলিসের রিপোর্ট হইতে দেখা যাইতেছে যে, সহরের বি. এম. কলেজের বিপরীত দিকে এক মণ্ডপে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার সভা ভঙ্গ হইবার পর প্রকাশ্য রাজপথে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবার এবং যোগ্য কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা নিষিদ্ধ এক কোলাহলপূর্ণ শোভাযাত্রার সম্ভাবনা রহিয়াছে, অতএব আমি এতদ্বারা এই আদেশ দিতেছি যে, জনসাধারণ বা কোন ব্যক্তি উক্ত উদ্দেশ্যে উপরোক্ত মণ্ডপে বা অন্যত্র সমবেত হইবেন না এবং রাস্তার উপরেও জমা হইবেন না। অধিকন্তু যেহেতু দেখা যাইতেছে যে, জনতা দ্বারা রাজা বাহাদুরের হাভেলীতে সমবেত হইয়া এক অবৈধ শোভাযাত্রা বাহির করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, অতএব তাহাও নিষিদ্ধ করিয়া আমাদ্বারা এই আদেশ দেওয়া হইল"।

মণ্ডপ থেকে বাহির হয়ে আমাদের অনেকে বার-এর নেতৃস্থানীয় সদস্য বাবু রজনীকান্ত দাসের বাড়ীতে গেলাম। সত্বর সেখানেও এক জনতার সমাবেশ হল। পণ্ডিত কাব্যবিশারদ, মিঃ বিপিনচন্দ্র পাল এবং আমি তাদের কাছে বক্তৃতা দিয়ে স্বদেশীয় প্রতিজ্ঞাতে অবিচল থাকতে ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে তাদিগকে নির্দ্দেশ দিলাম।

———

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বরিশাল সম্মেলনের পরে

স্বদেশীর জন্য যে শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল তা' উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনে তার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই শপথের উদ্দীপনা দিয়েছিলাম আমি। আমি ছিলাম তার উদ্ভাবক। পূর্ব্ব ভারতীয় রেল লাইনের উপর মগরার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে এক স্বদেশী সভায় বক্তৃতা করবার সময় হঠাৎ এটি আমার মাথায় আসে। এক হিন্দুমন্দিরের প্রাঙ্গনে সভা হচ্ছিল। সামনে বিগ্রহ। সর্ব্বত্র ছিল এক ধর্ম্মের পরিবেশ। সে সময় স্বদেশীর ভাবধারা প্রায় এক ধর্ম্মান্দোলনের স্তরে উঠেছে। তা' প্রায় ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল বলা যায়। পূজার জন্য বিদেশী দ্রব্য আনলে পূজারী পূজো করতে অস্বীকার করতেন। বিদেশী বস্ত্র, খাদ্য, বিদেশী চিনি, লবণ প্রভৃতি দ্রব্য প্রায় ধর্ম্মীয় সতর্কতার সঙ্গেই পরিহার করা হ'ত। আমাদের জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে ধর্ম্মের প্রভাব ধর্ম্মীয় সীমার বাইরেও এমনভাবে ছড়িয়ে থাকে যে, আমাদের কাজকর্ম্মের মধ্যেও তার রং পড়ে এবং তা' প্রাধান্য লাভ করে। আমাদের স্বদেশীর প্রবণতার মধ্যেও এমনি করেই ধর্ম্মের ছোঁয়াচ লাগল। আমি যখন ভাষণ দিচ্ছিলাম আমার চোখ তখন মন্দির ও মন্দিরের বিগ্রহের উপর নিবদ্ধ। ধর্ম্মের সঙ্গে স্থানটির যোগাযোগ তখন আমার মনকে ছেয়ে ফেলেছে। হঠাৎ এক আবেগের মুহূর্ত্তে আমি শ্রোতাদের নিকট আবেদন করে' বললাম, তাঁরা যেন এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁদের আরাধ্য দেবতার সামনে শপথ গ্রহণ করেন। আমি শপথ দিতে লাগলাম। সমবেত জনমণ্ডলী একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে সেই শপথবাক্য আবৃত্তি করতে লাগলেন।

আমার ভাষণ এবং সেই শপথ বাক্য ছিল বাংলায় এবং অনেকটা এ প্রকার—

"আমরা সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া এবং তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া আমাদের উত্তরপুরুষদের নামে ও তাঁহার নামে এই শপথ করিতেছি যে, আমরা যথাসম্ভব স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব এবং বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারে বিরত থাকিব। ভগবান আমাদের সহায় হউন।"

তৎপূর্ব্বে আমি কোনদিন এই শপথের কথা চিন্তাও করি নি। স্থানটির পরিবেশই যেন হঠাৎ আমার অন্তরে এই প্রেরণাটি জাগিয়ে দিয়েছিল। যখন প্রায় দশপনর হাজার লোকের সেই বিপুল জনতা এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে এক সুরে আবেগভরে আমার সঙ্গে সঙ্গে শপথবাক্যের সেই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শব্দগুলি পরপর উচ্চারণ করে যেতে লাগল, তখন তার প্রভাব যে কি হয়েছিল তা' বর্ণনার চেয়ে কল্পনা করাই অধিকতর সহজ। যাঁরা সচরাচর আমাদের কাজকর্ম্মের সমালোচনা করতেন তাঁরা কিছুদিন এ বিষয়ে নীরব রইলেন; কিন্তু সহসা এ শপথের প্রভাবের গভীরতা পরিলক্ষিত হতে লাগল। আর তাঁরাও বজ্রনির্ঘোষে তাঁদের সর্ব্বপ্রকার অভিযোগ বর্ষণ করতে লাগলেন। আমরা সেসব শুনলাম। তবুও তা' উপেক্ষা করে' আমাদের গন্তব্যের পথে এগিয়ে চললাম।

পরদিন বরিশালে এক সাহিত্যসভা হবার কথা ছিল। তাতে যোগ দেবার জন্য কোলকাতা থেকে এসেছিলেন ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ সভা বন্ধ ক'রে দিতে হ'ল। তিনি মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে কোলকাতা ফিরে' গেলেন। তারপর দিন বরিশাল থেকে মাইল কয়েক দূরে রহমতপুরে এক বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী সভায় ভাষণ দেবার জন্য আমার আমন্ত্রণ ছিল। এ নিমন্ত্রণ এসেছিল স্থানীয় চক্রবর্ত্তীদের নিকট থেকে। এঁরা ছিলেন এক

প্রাচীন বংশ এবং আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে মিশে গিয়েছিলেন। সকালবেলায় আমাদিগকে পরিপাটীরূপে খাওয়ান হ'ল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে এই দূর গ্রামাঞ্চলেও সমস্ত জাতবিচার ভুলে' আমার ন্যায় এক বিলেত-ফেরত বাঙ্গালীর সঙ্গে সকলে একত্র আহারে বসলেন।

আহার শেষ হবার পর সভা হ'ল। সভা সাঙ্গ হ'লে পর পুলিস এল। তা'রা এসেছিল ঠিকাগাড়ী করে'। তাদের সঙ্গে ছিল রেগুলেশন লাঠি। তবে তাদের আসতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। এসেছিল হাট ভেঙ্গে যাওয়ার পরে। গ্রেপ্তার করবার মত লোকও তখন ছিল না। আর সভাও ছিল না যে রিপোর্ট লিখবে। ইতিমধ্যে পুলিসের গতিবিধি নিয়ে বরিশালের সর্ব্বত্র চাঞ্চল্যকর গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল এবং খবর এসেছিল যে, তা'রা আমাদের ধরবার জন্য রহমতপুরে এসেছে। আমার আত্মীয় মিঃ বিহারীলাল রায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কালবিলম্ব না করে' খবরাখবর করবার জন্য এবং প্রয়োজন হলে আমাদের সাহায্যের জন্য রহমতপুর চলে এলেন। আমাদের ফেরার পথে তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষদের বাড়ীর কাছে লাখুটিয়াতে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ল। আমাদের দেহ অক্ষত ও গায়ের চামড়া গায়ে দেখে তিনি আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের ভিটে, জমি-জমা, সমাধি, তাঁর বাবা, ভাইদের চিতার উপর যে স্মারকস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল সে সমস্ত আমাদের দেখালেন। আমরা যে মিঃ ইমার্সন ও তাঁর পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে দিনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি সে-আনন্দে বিভোর হয়ে আমরা বিহারীবাবুর সঙ্গে বরিশাল ফিরে গেলাম।

এমনি করেই আমার ঘটনাবহুল জীবনের এক অতি চাঞ্চল্যকর অধ্যায়ের অবসান হ'ল। এক ইংরেজ মহিলা এ-সম্পর্কে

আলোচনা ক্রমে আমায় বলেছিলেন, "কর্তৃপক্ষ বরিশালে আপনার জন্য এক জাল পেতেছিল। আপনি জাল কেটে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু তারাই আপনার জালে জড়িয়ে গেল। নীতিগত জয় আপনারই হয়েছিল।" বাস্তবিকপক্ষে সে সময়ের সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে কোন কিছুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়ে, তিনি নিরপেক্ষভাবে সমগ্র বিষয়টি পরিদর্শন করেছিলেন এবং পরিস্থিতিটিকে সঠিকভাবে বিবেচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

একদিন বিশ্রাম করে' আমরা কোলকাতায় ফিরলাম। আমাদের এই প্রত্যাবর্ত্তন কোন কালেই ভুলবার নয়। যেখানেই আমাদের জাহাজ বা ট্রেন থেমেছে সেখানেই দলে দলে মানুষ আমাকে দেখতে ও আমার পায়ের ধুলো নিতে জড় হয়েছে। যে চব্বিশ ঘণ্টা আমি ট্রেনে জাহাজে ছিলাম মুহূর্ত্তের জন্যও আমি ঘুমাবার অথবা বিশ্রাম করবার সুযোগ পাই নি। ভোর বেলা যখন আমাদের ট্রেন শিয়ালদহ ষ্টেশনে এল আমি দেখলাম আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য সেখানে এক বিরাট জনতা উপস্থিত রয়েছে। সারকুলার-বিরোধী সমিতির ছেলেরাও তাদের মাননীয় সভাপতি বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে আমাদের সাথে একই ট্রেনে ছিলেন।

এত প্রত্যুষে কোলকাতা সহর তখনো শয্যা ত্যাগ করে নি। কিন্তু সেই সকালেই আমাদের দেখবার জন্য ও আমাদের বক্তৃতা শুনবার জন্য হাজার হাজার লোক কলেজ স্কোয়ারে এসে মিলিত হয়েছে। ষ্টেশন থেকে আমাদিগকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। মানুষের জীবনে এমনই একটি সময় আসে যখন কেবল মাত্র সেজন্য হলেও মানুষের বেঁচে থাকা প্রয়োজন। আমার পক্ষে এ ছিল তেমনি এক সময়। তৎপূর্ব্বে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে' বক্তৃতা করে করে আমার গলা বসে' গিয়েছিল। কিন্তু সে সময় উৎসাহের আতিশয্যে আমি আবার বক্তৃতা করলাম। সকলকে বললাম স্বদেশীর শপথ নিতে

এবং বঙ্গভঙ্গ যে রদবদল হতে বাধ্য সে-বিশ্বাস নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অবিরাম চালিয়ে যেতে।

সে দিনের বক্তাদের মধ্যে একাগ্রচিত্ত লিয়াকত হোসেনও ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, আমার গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে তিনি সমস্ত দিন উপবাস করেছিলেন। তিনি ছিলেন এক অনন্য সাধারণ লোক। রাজদ্রোহিতার অপরাধে তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। পুলিস ছায়ার মত তাঁর পেছনে পেছনে থাকত। তাঁর জনসাধারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম্মে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ প্রায়ই বিঘ্ন সৃষ্টি করত। তাঁর মতের সঙ্গে অন্যদের মতের মিল হতেও পারে, না হতেও পারে। তবে তিনি ছিলেন নির্ভীক, দ্বিধাহীন। শির নত করা ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ এবং তিনি ছিলেন উদ্দেশ্যের প্রতি একাগ্রতায় অটল। আমার মনে হয় সরকারীমহল তাঁকে সাজ্ঘাতিক গোঁড়া বলে' ধরে' নিয়ে থাকেন। কিন্তু সঙ্কল্পের প্রতি আনুগত্য, দেশের স্বার্থ রক্ষায় অসাধারণ ঐকান্তিকতা, দেশের সেবায় নির্ভীক সাহসিকতায় তাঁর জোড়া মিলে না। তিনি বাঙ্গালী নন। তাঁর বাড়ী বিহার প্রদেশে। আমাদের ভাষাতে তিনি কথাও বলতে পারেন না। তবুও বঙ্গদেশকেই তিনি নিজের দেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাঙ্গালীদিগকে ভালবাসতেন। আমি নিজেই তাঁর কোন কোন মত ও পথ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করতাম। কিন্তু স্বদেশী কর্ম্মী হিসাবে তিনি ছিলেন একজন সেরা ব্যক্তি। আমি তাঁকে সব সময়েই প্রীতির চোখে দেখতাম।

এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে বরিশাল সম্মেলনের সভাপতি মিঃ এ. রসুল সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা দরকার। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর বাড়ীতে থাকা যেদিন সকলের চেয়ে আনন্দের হত, যে দিনটি তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহের জন্য স্থির ছিল, ঠিক তার প্রাক্কালে নিতান্ত অল্প বয়সে মৃত্যুর নির্ম্মম হস্ত তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর জীবন ছিল সম্ভাবনা পূর্ণ এবং জনসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলকর। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর বন্ধু ও ভক্তগণের দুঃখের সীমা ছিল না। এবং তাতে দেশের পক্ষেও এক অশেষ ক্ষতি হয়েছিল। মিঃ রসুল ছিলেন একজন বাঙ্গালী মুসলমান। তাঁর বাড়ী ছিল পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লা জিলায়। তিনি অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও কোলকাতা হাইকোর্ট বার-এর সদস্য ছিলেন। বঙ্গদেশ বিভক্ত করা যখন নিশ্চিতরূপে স্থির হয়ে গেল, তখন যে কয়েকজন মুসলমান তার বিরোধিতা করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমানের একতাকে তিনি বিনা দ্বিধায় সর্ব্বক্ষণ সমর্থন করতেন। বঙ্গদেশ বিভক্ত করাকে তিনি একটি জাতীয় সঙ্কটরূপে গণ্য করতেন। কারণ তিনি মনে করতেন, তাতে হিন্দু-মুসলমানের মনান্তর হবে, বঙ্গভাষা-ভাষীদের সংহতি বিনষ্ট হবে এবং তা' তাদের রাজনৈতিক প্রভাবকে দুর্ব্বল করবে। তাঁর এরূপ মতবাদের দরুণ এক সময় তিনি তাঁর সহধর্ম্মীদের নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সব কিছুই কাটিয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মনে এটুকু সন্তুষ্টি ছিল যে, যে সমস্ত মতবাদ তিনি প্রচার করতেন এবং অবাধে সমর্থন করতেন, তার জয় দেখবার সুযোগ তিনি জীবনে পেয়েছিলেন। তিনি জীবনে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকের নেতৃত্বও লাভ করেছিলেন। মিঃ রসুল কোনদিনই খুব সুস্থ ও সামর্থ্যবান লোক ছিলেন না। তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের সর্ব্বাধিক ঘটনাবহুল সম্মেলনের জন্য তাঁর উদ্বিগ্নতা ও দুশ্চিন্তা তাঁকে জর্জ্জরিত করে ফেলেছিল। তা' সত্ত্বেও তিনি সব কিছুই সহ্য করে নিরবচ্ছিন্ন স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্ব্বসাধারণের কাজের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

কর্ত্তৃপক্ষের বরিশাল সম্মেলন সংক্রান্ত কাজকর্ম্মের ফলে কেবল

বঙ্গদেশে নয়, এ প্রদেশের বাইরেও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এক প্রবল ঘৃণার ঝড় বইতে লাগল। মাদ্রাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে এক বিরাট জনসভা হ'ল। এসপ্ল্যানেডে প্রায় দশ হাজারের উপর লোক খোলা ময়দানে সমবেত হ'ল। প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, "সভা আরম্ভের বহু আগে থেকেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে স্রোতের মত লোক আসতে লাগল।" কোন কোন জাতির ক্রমবিকাশের পক্ষে মন্দ শাসকেরা বিশেষ সহায়ক হয়। এতে নিদ্রিত সিংহের ঘুম ভাঙ্গে, মানুষের প্রাণে উদ্দীপনা আসে এবং জাতীয় ঐক্য পরিপুষ্ট হয়। সর্ব্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিগণ এ সভায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ডাক্তার নায়ারের সমর্থনে সভায় মাননীয় নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুরের এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে বরিশালের কর্ত্তৃপক্ষের কঠোর কার্য্যপ্রণালীর প্রতিবাদ করা হয় এবং তাকে "বৃটিশ প্রজাবর্গের স্বাধীনতার উপর অযথা হস্তক্ষেপ এবং বৈধ সরকারের নীতি সমূহের ধ্বংসের ব্যবস্থা" বলে' তার তীব্র নিন্দা করা হয়। সেই সভা ভারত সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে' এক তারবার্ত্তা প্রেরণ করে। সেই তার বার্ত্তায় এক অতি জনপ্রিয় নেতার গ্রেপ্তার, পুলিস কর্ত্তৃক হাজার হাজার লোকের সম্মেলন বলপ্রয়োগে ভেঙ্গে দেওয়ার বিষয়াদি বর্ণিত হ'ল। এবং সমস্ত উত্তেজনার নিরসন করে' বৃটিশ স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকারের প্রতি মানুষের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে ও অপরাধী কর্ম্মচারীদের শাস্তিবিধান করতে ভারত সচিবকে অনুরোধ করা হয়।

কিন্তু ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কোলকাতায়। এখানেই উঠল তুফান। প্রায় প্রতিদিন কলেজ স্কোয়ারে জনসভা হ'তে লাগল। কোলকাতার অনুসরণে মফস্বলেও কোন মন্থরতা দেখা গেল না। বাস্তবিকপক্ষে বরিশাল পুলিসের ক্রিয়াকলাপের সংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে মানুষকে গভীরভাবে আকুল ও চঞ্চল করে তুলল।

যারা কোনদিন কোন গণআন্দোলনে উৎসাহ প্রদর্শন করত না তারাও স্বদেশীর শপথ গ্রহণ করে তাদের দৈনন্দিন জীবনে তা' পালন করতে লাগল। যাঁরা একান্তে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা নিয়ে থাকতেন তাঁরাও বেরিয়ে এসে আগ্রহের সঙ্গে স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিতে লাগলেন। রায় পশুপতিনাথ বোসের বাড়ীতে এক বিরাট জনসভা হ'ল। ১৬ই অক্টোবরের পর এত বিরাট সভা আর কখনো হয় নি। বাড়ীর চতুর্দ্দিকের খোলা জমিতে কোথাও তিল ধারণের স্থান ছিল না। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে রায় নরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন সর্ব্বাধিক মধ্যপন্থী। তাঁকেই এ সভাতে সভাপতি করা হ'ল। বরিশালের ঘটনা বর্ণনা করে' তিনি বললেন, "বৃটিশ-ভারতের ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া যায় না"। তিনি বললেন, 'মঞ্চ ও সংবাদপত্রই নিরাপদে জনমানসের অসন্তোষ ও উত্তেজনা নিরসনের উপায়। যখনই তাকে বাধা দানের চেষ্টা হয়েছে, তখনই অরাজকতা দেখা দিয়েছে।' তাঁর একথাগুলি যে দৈববাণীর মতই সত্য ছিল পরবর্ত্তী ঘটনা পরম্পরা তারই সাক্ষ্য দিয়েছিল।

অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম অরাজকতা বা বৈপ্লবিক আন্দোলন দেখা দিল। অনেকে কিছুটা আল্‌গা ভাবে এ দুটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করে। বঙ্গভঙ্গ ও বিনা প্ররোচনায় পুলিস কর্তৃক জনতার উপর আক্রমণ ও সম্মেলন ছত্রভঙ্গরূপ আনুষঙ্গিক দমন নীতির ফলে সর্ব্বত্র মানুষের মনে যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, এই অরাজকতা বা বিপ্লববাদ ছিল তারই চরম পরিণতি। বঙ্গদেশকে বিভক্ত করা যে কেবল মাত্র এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল তা নয়, এটি ছিল বৃটিশ শাসনের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক নূতন নীতিরও প্রতীক। তারপরেই হ'ল তার প্রকাশ। স্বদেশীর কর্ম্মীগণ এবং প্রচারকগণ প্রায়ই গ্রেপ্তার ও নির্য্যাতিত হতে

লাগলেন। প্রকাশ্য স্থানে সভাসমিতি নিষিদ্ধ করা হ'ল। শান্তিপূর্ণ অঞ্চলগুলিতেও সামরিক পুলিস মোতায়েন করা হ'ল এবং তারা শান্তিপূর্ণ নাগরিকদিগের উপর আক্রমণ চালাতে লাগল। বরিশাল জিলার বানরীপাড়াতে গুর্খা সৈন্য মোতায়েন হওয়ার ফলে স্থানীয় অধিবাসীরা সে স্থান ছেড়ে চলে যাবার কথা চিন্তা করতে লাগল। যাঁরা ছিলেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন, স্বদেশীর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অজুহাতে তাঁদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহীতার অভিযোগ আনা হ'ল। বরিশাল জিলার সর্ব্বজন স্বীকৃত নেতা বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন এরূপ ব্যক্তিগণের অন্যতম।

প্রতিনিধিগণের উপর আক্রমণ করে' পুলিস যখন বরিশাল সম্মেলন ছত্রভঙ্গ করল, তখন অবস্থা চরম আকার ধারণ করল। তার কিছুকাল পরেই অরাজকতা বা 'এনার্কিক্যাল' আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। মানুষের মনের অবস্থা তখন উত্তেজনায় উদ্দাম হয়ে উঠেছে। সকল দেশেই তরুণেরাই সর্ব্বাধিক ভাবপ্রবণ হয়। বঙ্গদেশের তৎকালীন ঘটনাবলী বৈধনীতির প্রতি তাদের বিশ্বাসকে নাড়িয়ে দিল। তখন চোখের সামনে তা'রা আর কোন আশার আলো দেখতে পেল না। আমার আপন অভিজ্ঞতাভুক্ত এক ঘটনা থেকে আমি বিপ্লব আন্দোলনের জন্মলগ্নও নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছি। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, বঙ্গদেশকে খণ্ডিত করা ও তৎপরবর্ত্তী অনুসৃত নীতিই ছিল এ প্রদেশে বিপ্লব আন্দোলনের মূল কারণ, যদিও দেশের আর্থিক অবস্থা তা'কে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল। বরিশালের সম্মেলন ছত্রভঙ্গ করার পর তা'র আনুষঙ্গিক যথেচ্ছাচারিতা ও পুলিসের হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ এ বিপ্লবকে দ্রুত এগিয়ে আনল। যে সব ঘটনা থেকে আমার এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে তাও আমি অতঃপর বর্ণনা করব।

বরিশালের ঘটনার কয়েকমাস পরে এক অপরাহ্নে দুজন যুবক

আমার ব্যারাকপুরের বাড়ীতে এসে আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আমি ঘরে প্রবেশ করে' আসনে বসতেই তা'রা জানাল যে, বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও আয়াসসাধ্য এবং তা'রা দরজা বন্ধ ক'রে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করল। আমরা তিনজন যখন একান্তে তখন তাদের একজন কথা আরম্ভ করল। এ যুবকটি ছিল এক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থী। সে বলল, "আমরা আপনার কাছে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য এসেছি। আমরা স্যার ব্যামফিলড্ ফুলারকে গুলি করে' হত্যা করার এক পরিকল্পনা করেছি। আপনি এ বিষয়ে কি বলেন?" আমি এরূপ একটি প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তা' ছাড়া প্রস্তাবটি এতই অস্বাভাবিক ছিল যে, আমি কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমরা স্যার ব্যামফিলড্ ফুলারকে হত্যা করতে চাইছ কেন? তিনি কি করেছেন?" যুবকটি আবেগভরে উত্তর দিল, "বানরীপাড়াতে তিনি যে গুর্খা মোতায়েন করেছেন তা'রা আমাদের মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে। আমরা তাঁর উপর তার প্রতিশোধ নেব।" আমি বললাম, "তাতে যে তোমরা ধরা পড়বে আর তোমাদের ফাঁসী হবে।" তারা বলল, "আমরা ধরা না পড়তে চেষ্টা করব এবং প্রয়োজন হ'লে আমাদের নারীজাতির সম্মান রক্ষার্থে সমস্ত দুঃখ কষ্টকে বরণ করব।"

সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, আমার এ অবস্থা থেকে অসুবিধাজনক অবস্থা আর হ'তে পারে না। দুজন যুবক এসেছে তাদের নারীজাতির অপমানের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে। কারণ, তাদের বিশ্বাস, আইনের সাহায্যে তার কোন প্রতিবিধান সম্ভব নয়। এবং আমার কর্ত্তব্য এ উদ্দেশ্য থেকে তাদের নিবৃত্ত করা। সৌভাগ্যবশতঃ সে সময় এক জোর গুজব উঠেছিল যে, স্যার ব্যামফিলড্ ফুলার পদত্যাগ করেছেন। এ গুজবের কিছু

ভিত্তি ছিল বলেই আমি বিশ্বাস করেছিলাম। আমি যুবকদিগকে বললাম, "তোমরা জান যে, স্যার ব্যামফিলড্ ফুলার পদত্যাগ করেছেন? একজন মরা লোককে মেরে কি লাভ হবে? অপর পক্ষে তোমাদের এ-চেষ্টাতে জনস্বার্থই ব্যাহত হবার আশু সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা সকলেই চাই যে, তিনি লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের পদ থেকে অপসারিত হোন। তোমাদের চেষ্টা যদি বিফল হয়, আর চেষ্টা যে সফল হবেই এ কথাই বা কে বলতে পারে, সে ক্ষেত্রে তিনি যে তাঁর পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারপর আবার তাঁর পদে বসে কাজ চালাতে থাকবেন। তোমরা কি তোমাদের দেশের এই ক্ষতিটা করতে চাও?"

বিষয়টি তাতেই মিটে গেল। যুবকেরা তৎক্ষণাৎ তাদের সঙ্কল্পটি পরিত্যাগ করতে সম্মত হ'ল এবং প্রস্তাবটির কথা মন থেকে মুছে ফেলল। বিষয়টিকে আরও শক্ত করে' নেবার জন্য আমি তাদের আমার পায়ে ধরে' (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পায়ে ধরে') শপথ করতে বলে' বললাম যে, তা'রা তাদের সঙ্কল্প ত্যাগ করবে। বিনা দ্বিধাতে তা'রা আমার কথা মত কাজ করল। আমারও দুঃশ্চিন্তা দূর হ'ল। এ ছাড়াও একটা অসুবিধা তখনো ছিল। তা'রা বলল, কালবিলম্ব না করে রাত্রের গাড়ীতে তাদের সেখানে গিয়ে হত্যার জন্য যে-সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা' থামিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তাদের সঙ্গে তখন টাকা ছিল না। শুনে তখনই আমি তাদের টাকা দিয়ে দিলাম। তা'রা যে কে বা কি ছিল আজ পর্য্যন্ত আমি তা' জানি না। আমি তাদের নামও জিজ্ঞাসা করি নি। তবে আমার মনে হয়েছিল আমি তাদের বিশ্বাস করতে পারি। পরে ডাকযোগে টাকাটা আমাকে ফিরিয়ে দিতেও তা'রা ত্রুটি করে নি।

বাতাসে যে সমস্ত কথা শুনা গিয়েছিল, যে-অন্তঃপ্রবাহ গভীরে বয়ে চলেছিল, হয়ত অজ্ঞানতা বশত বঙ্গদেশের যুবকেরা তার মধ্যে

ছিল, কিন্তু উক্ত ঘটনা তাই প্রকট করল। অরাজকতার প্রতি কারও সহানুভূতি থাকতে পারে না। যে নাম দিয়েই তা'র গুরুত্ব কমাবার চেষ্টা হোক অথবা যে উদ্দেশ্যেই তা'কে ক্ষমা করা হোক, খুন চিরকাল খুন ছাড়া আর কিছু নয়। তা' বলে' ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকেরা একথা যেন ভুলে না যান যে, এক প্রশাসনিক কার্য্যের ফলে যেরূপ অবিশ্বাসের আবহাওয়া, নিরাশা ও অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, বিনা লজ্জায় তার উল্লেখ করা কোন বৃটিশ ঐতিহাসিকের পক্ষেই সম্ভব নয়।

কিঞ্চিত বিস্তৃতভাবে আমি যে ঘটনাটির বর্ণনা দিলাম তার অনতিকাল পরেই মেদিনীপুরের সন্নিকটে নরসিংহগড়-এ স্যার এনড ফ্রেজার-এর ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হ'ল। ইনি ছিলেন লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর এবং বঙ্গ-বিভাজনের রচয়িতাদের অন্যতম। একমাত্র একারণেই তিনি জনসাধারণের এত অপ্রিয় হয়েছিলেন যে, এরূপ অপর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা মনেই আসে না। তাঁর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার দৌড় মধ্যপ্রদেশের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বে তিনি ছিলেন পুলিস-কমিশনের সভাপতি। তাতে তাঁর যা' সুপারিশ ছিল সে নিয়ে অনেক নিন্দা ও সমালোচনা হয়েছিল। তিনি যখন বঙ্গদেশে এসেছিলেন তখন বিশেষ সুনাম নিয়ে তিনি এদেশে আসেন নি। প্রাদেশিক প্রশাসনের ফলে তাঁর বিরুদ্ধে লোকের মনে এক স্বাভাবিক প্রতিকূল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ লোকের ধারণা হয়েছিল যে, বঙ্গদেশকে বিভক্ত করবার নির্দ্দেশ দিয়েই তাঁকে এদেশে পাঠান হয়েছিল। সুতরাং বৃটিশ শাসনকালের এক নিতান্ত অপ্রিয় কাজ করবার যন্ত্র হিসাবে মনোনীত হওয়ার ফলে দুর্ভোগ তাঁকেই ভুগতে হয়েছিল।

ঐ সময়ে প্রায় একই দিনে মেদিনীপুরে জিলা সম্মেলনকেও

ধ্বংশ করবার চেষ্টা হয়েছিল। এবং যাদের সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল বলে লোকের গভীর সন্দেহ ছিল, এ কাজটিও তারাই করেছিল। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন মেদিনীপুর জিলার তৎকালীন এক খ্যাতনামা জননায়ক মিঃ কে. বি. দত্ত। তিনি যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন বারবার তাঁকে বাধা দেওয়া হ'তে থাকে। আমি একজন অতিথিরূপে সেখানে নিমন্ত্রিত ছিলাম। এরূপ এক অসাধারণ দৃশ্য দেখে আমি বিস্মিত হলাম। মিঃ দত্ত ও আমি শ্রোতাদের শুভবুদ্ধির সহায়ে সভার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পর সম্মেলনের কাজ পুনরায় চলতে লাগল। কিন্তু আমার পক্ষে এ ঘটনা ছিল এক রহস্য উদ্ঘাটনের সামিল এবং তার একমাস পরে আরও ব্যাপকভাবে যেরূপ একই দৃশ্য সুরাট কংগ্রেসে অভিনীত হয়েছিল তারই অগ্রদূত হিসাবে এটা ভবিষ্যত ঘটনার আভাস। এক মহান নবগঠিত প্রদেশে কর্তৃপক্ষ অশান্তির শক্তিগুলিকে ছেড়ে দিয়েছিল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বৈধ উপায়ের প্রতি মানুষের যে এক বিশ্বাস ছিল তার ভিত্তিও শিথিল হয়ে গেল। উৎসাহী যুবশক্তি হতাশায় ছটফট করতে করতে দেশ সেবার আকুল আগ্রহে তাদের গুরুজনদের দ্বারা কোনরূপে সংযত না হয়ে হিংসা ও অরাজকতার বিপদসংকুল পথে পরিচালিত হতে লাগল।

এরূপ এক তড়িৎপ্রকৃতির আবহাওয়ার মধ্যেই ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে সুরাটে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। প্রথমে অধিবেশন নাগপুরে হবার স্থির ছিল। কিন্তু সেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেওয়ার ফলে বোম্বাই কংগ্রেসের নেতৃবর্গ নাগপুরে অধিবেশন বসান সমীচীন বোধ করলেন না। এ জন্য অধিবেশনের স্থান নাগপুর থেকে সুরাটে পরিবর্ত্তন করা হ'ল। কিন্তু তা'তে আসল রোগ সারল না। পূর্ব্ববঙ্গের কর্ত্তৃপক্ষের অপ্রীতিকর কাজকর্ম্মের ফলে তারই রসে পুষ্ট হয়ে রোগের মূল তখন অনেক গভীরে চলে

গিয়েছে। আমি যখন বক্তৃতা করতে উঠি চারদিক থেকে আপত্তি উঠতে লাগল। কংগ্রেসের একজন প্রাক্তন সভাপতি হিসাবে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্য স্যার রাশবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব করা আমারই কর্ত্তব্য ছিল। ইতিপূর্ব্বে সবার সম্মতি নিয়ে এ কর্ত্তব্যটি আমি বহুবার পালনও করেছি। এবার আর সেরূপ হতে পারল না। মেদিনীপুর সম্মেলনে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম তা' স্মরণ করে' আমার বক্তৃতায় পুনঃ পুনঃ বাধা দেবার চেষ্টা চলতে লাগল। আমার পক্ষে এটি ছিল এক অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা। কারণ, সাধারণত দেখেছি, ভাষণ দেবার জন্য যখনই আমি মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াতাম তখন প্রথম-হর্ষধ্বনি শেষ হওয়ার পর আবার তাহাই হ'ত সমস্ত শ্রোতার নিস্তব্ধ হয়ে থাকবার জন্য সঙ্কেত।

এক শক্তিশালী দল মিঃ তিলককেই সভাপতি পদে বরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা স্যার রাসবিহারী ঘোষকে অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে দিতে সম্মত ছিলেন না। তাঁদের মত ছিল কংগ্রেস ভেঙ্গে যাক আপত্তি নেই, তবুও স্যার রাসবিহারী যেন সভাপতিত্ব না করেন। সেই অনুসারে শেষ অবধি কংগ্রেস ভেঙ্গে গেল। চেয়ার, জুতা, চটি, ইত্যাদি নেতাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হ'ল। মঞ্চের দিকে লোক ছুটে আসতে লাগল। আমি মঞ্চের উপর বসে রইলাম। আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে ঘিরে বসে আমাকে রক্ষা করতে লাগলেন। স্যার ফিরোজ শা মেহেতা ও অন্যান্যদের সঙ্গে আমাকেও পশ্চাতের এক শিবিরে নিয়ে যাওয়া হ'ল এবং তারপর পুলিস গিয়ে, সভামণ্ডপ পরিষ্কার করে' দিল। এমনি করেই কংগ্রেস ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। তারপর থেকে সুরু হ'ল এক ভিন্ন পথে চলা।

আমার প্রতি যে অসম্মানজনক ব্যবহার করা হয়েছিল তা'

দেখে, বঙ্গদেশ থেকে যে-সব প্রতিনিধি গিয়েছিলেন তাঁরা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন এবং অপমানিত বোধ করছিলেন। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তাঁ'রা এক সভা করে আমার প্রতি তাঁদের আস্থা জ্ঞাপন করলেন। নিখিল ভারত প্রতিনিধিমণ্ডলীও এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলেন না। এক সভা অনুষ্ঠিত হল। এবং অনেক বাকবিতণ্ডার পর, কংগ্রেসের এক নিয়মাবলী রচনা করা হল। তার প্রথম ধারার মধ্যে যা' বর্ণিত হল পরবর্ত্তীকালে সেটিই কংগ্রেসের চরম বিশ্বাস বা 'ক্রীড' রূপে প্রচারিত হ'ল। তা'তে বলা হয়েছিল, কংগ্রেসের অভীষ্ট হ'ল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে স্বায়ত্ত শাসন লাভ করা এবং তা' লাভ করবার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র বৈধ পথের আশ্রয় নেওয়া। কংগ্রেসের সদস্য হতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সর্ব্বপ্রথম এই চরম বিশ্বাসকে বাধ্যতামূলক ভাবে ও লিখিত ভাবে স্বীকার করে' নিতে হবে। যাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁরা এই সর্ত্তটি মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁদের সুবুদ্ধির উদয় হয়েছিল। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের জাতীয়দলের সমস্ত উপদল পুনর্মিলিত হ'ল এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেও একটি বোঝাপড়া হবার পর হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দের এক সম্মিলিত সভায় এক সাংবিধানিক সংস্কারের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তা' গ্রহণ করা হ'ল। সে সভাতে আমিই সভাপতিত্ব করেছিলাম।



পঞ্চবিংশ অধ্যায়

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (প্যাসিভ রেজিস্‌টেন্‌স্‌)

জাতীয় দলের সমস্ত পক্ষই এখন ঐক্যবদ্ধ হ'ল। ইসলামের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও কংগ্রেস মঞ্চে এসে তাদের সঙ্গে হাত মিলাল। একত্র কাজ করে' ফল লাভের সম্ভাবনা এর চেয়ে অধিক আর কোন দিন দেখা যায় নি। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি এবং এমন কি, ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যেও যে-বিভাজননীতি ও কর্ম্মপদ্ধতির শিকড় প্রবেশ করে' গিয়েছিল একদিনে তা উৎপাটন করা সম্ভব নয়। সহসা তা' কংগ্রেসের কার্য্যের মধ্যেও ধরা পড়ল। এ যাবৎ শ্রীমতী বেসান্ত থিওসফিক্যাল সোসাইটি ও হিন্দু-শিক্ষা আন্দোলনের কাজকর্ম্মের মধ্যেই ডুবে ছিলেন। ১৯১৪ সালে মাদ্রাজে যখন কংগ্রেস অধিবেশন হয় তখন তিনি এসে কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁর বাকচাতুর্য্য, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, অক্লান্ত কর্ম্মোদ্যম ও সাংগঠনিক ক্ষমতা অল্পদিনের মধ্যেই অনুভূত হ'তে লাগল। জাতীয়তাবাদীদের বিভিন্ন দলকে ঐক্যবদ্ধ করার মধ্যেও তাঁর যথেষ্ট হাত ছিল। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেখাসাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও রক্ষা করতেন।

১৯১৫ সালে বোম্বাইতে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন বসে তখন একটি 'হোমরুল' লীগ গঠন সম্পর্কে আলোচনার জন্য তিনি এক সভা আহ্বান করলেন। এ সংস্থা হোমরুল বা স্বায়ত্ত শাসনের জন্য প্রচার চালাবে—এই ছিল তার উদ্দেশ্য। কিন্তু লোকে মনে করল এরূপ কোন সংস্থা গঠিত হলে একটি সংস্থা আর একটিকে ঢেকে ফেলে' ফলতঃ কংগ্রেসকেই দুর্ব্বল করে' ফেলবে। এজন্য তখন

আর হোমরুল লীগ গঠিত হ'ল না। তবে শ্রীমতী বেসান্ত ও বিষয়টি ছেড়ে দিলেন না এবং তার পরে তাঁর লীগ গঠন করলেন।

যে সমস্ত ঘটনা বিস্মৃতির গহ্বরে লীন হয়ে গেছে সেগুলিকে টেনে আনার ইচ্ছা আমার নেই। তবে আমি বলব যে, একতাবদ্ধ কংগ্রেসের মধ্যে এই লীগই সর্বপ্রথম বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। আমি তা'তে যোগ দিই নি এবং কংগ্রেসের অনেক প্রাক্তন সভাপতিও তা'তে যোগদানে বিরত ছিলেন। তার ফলে আমাকে কিছুটা অপ্রিয়ও হ'তে হয়েছিল। তবে জনসেবার কাজে প্রিয়-অপ্রিয়র কোনই স্থায়িত্ব নেই। তা' ছাড়া আমার যে সমস্ত সহকর্মী আজ লোকান্তরে তাঁদের সঙ্গে একযোগে এবং যাকে আমি দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থ বলে মনে করতাম তা' রক্ষার্থে অপ্রিয়তা অর্জ্জনেও আমি ভীত ছিলাম না। কংগ্রেসকে নির্ম্মাণ করতে আমি সাহায্য করেছিলাম। কংগ্রেস ছিল আমার জীবনেরই অংশ, আমার গর্ব্ব এবং আমার অধিকার। আমার পক্ষে এমন কিছু করা সম্ভব নয় যাতে আমার মতে কংগ্রেসের প্রভাব নষ্ট হ'তে পারে এবং সারা দেশে তার যে এক প্রতিষ্ঠা রয়েছে তা' বিনষ্ট হ'তে পারে।

শ্রীমতী বেসান্ত অন্তরীণ হওয়ার পর হোমরুল লীগে যোগ দেবার জন্য আমার উপর ক্রমাগত চাপ আসতে লাগল। সে সময় আমি ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্যপদপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার এক ভোটদাতা বন্ধু আমাকে লিখে জানালেন যে, আমি যদি হোমরুল লীগে যোগ না দিই, তবে তিনি আমাকে ভোট দেবেন না। তাঁর ভীতি প্রদর্শনের প্রতি আমি ভ্রূক্ষেপও করলাম না। হোমরুল লীগের সম্পাদক আমাকে লিখে জানালেন, আমি যদি লীগে যোগদান করি, তবে আমাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে লীগের কোলকাতা শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হবে, আর সে ক্ষেত্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাকে ইম্পিরিয়্যাল

কাউনসিলেও নির্ব্বাচিত করা হ'বে। আমার জনসেবার কাজে কারও ভ্রুকুটিতে আমি কখনো ভীত হই নি। অথবা কারও মুখের হাসি দেখেও গলে যাই নি। এমন কি, কোন সুযোগ সুবিধা দেবার ক্ষমতা যখন আমার কোন বন্ধু বা কোন সহকর্ম্মীর হাতেও থাকত তখনো আমি একই নীতি অনুসরণ করেছি। কোন ভয় বা লোভের বশবর্ত্তী হয়ে, যা'কে উচিত বলে' বিবেচনা করেছি, তার পথ থেকে বিচ্যুত হই নি।

শ্রীমতী বেসান্তকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম এবং তাঁর জনসেবার জন্য তাঁর প্রশংসাও করতাম। কিন্তু তাঁর অন্তরীণ হওয়া সত্ত্বেও হোম রুল লীগে যোগ দিতে আমার যে আপত্তি ছিল তা' কোন অংশেই হ্রাস হ'ল না। তবে তাঁর প্রতি দুর্ভাগ্যজনক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে চারদিক থেকে যে প্রতিবাদ উঠেছিল আমিও অন্তরের সঙ্গে ও বিনা দ্বিধায় তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। ভারত সভার গৃহে ও টাউন হলে যে দুটি প্রতিবাদ সভা হয়েছিল, উভয় সভাতে আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম এবং তাঁকে অন্তরীণ করে রাখার বিরুদ্ধে হোমরুল লীগের সদস্যদের চেয়েও তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলাম। শ্রীমতী বেসান্ত-এর অন্তরীণ হওয়ার ঘটনাতেই তাঁকে ১৯১৭ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে সভানেত্রী করবার আন্দোলনের সূত্রপাত। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পরে জাতীয়দলের মধ্যে যে ভাঙ্গন ধরেছিল তার প্রথম প্রকাশ হয়েছিল আমার পূর্ব্ববর্ণিত হোমরুল লীগ গঠনে। শ্রীমতী বেসান্তকে কংগ্রেসের সভানেত্রী করবার আন্দোলন ছিল তার দ্বিতীয় প্রকাশ। যে প্রভূত গুণসম্পন্না মহিলা অতুল আগ্রহে মাতৃভূমির সেবায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁকে অন্তরীণ করায় যে-উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল তারই ফলে দেশের সর্ব্বত্র আগুন জ্বলে উঠল। সকলের মনে হয়েছিল, যিনি স্বায়ত্ত শাসনের জন্য প্রবল ভাবে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন, তাঁকে অন্তরীণ করার পশ্চাতে সরকারের উদ্দেশ্য ছিল এই আন্দোলনকেই মারাত্মকভাবে আঘাত করা। প্রাদেশিক

শাসকেরাও প্রায় একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তির ন্যায় একই সুরে আমাদের স্বায়ত্ত শাসনের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে বিদ্রুপাত্মক ও অবজ্ঞাসূচক কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন তা'তে মানুষের ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়ে গণআন্দোলনকে তীব্রতর করেছিল।

একথার মধ্যে কিছুই অতিরঞ্জিত নেই যে, শ্রীমতী বেসান্তকে কংগ্রেস সভানেত্রীর পদে বরণ করবার প্রেরণা সৃষ্টির মূলে ছিল দেশের সরকার। আমলাতন্ত্রের এটিই নিয়ম। জনপ্রিয় শক্তিগুলির সংশ্রব শূন্য হয়ে তাহারা নিজেদের পরিবেশের মধ্যেই বাস করতে থাকে এবং তাদের শক্তি বা ব্যাপকতা সম্বন্ধে পরিমাপ করতে অসমর্থ হয়ে অবশেষে তারই মধ্যে বিলুপ্ত হয়। শ্রীমতী বেসান্তকে অন্তরীণ করলে দেশে কিরূপ উত্তেজনা সৃষ্টি হবে একথা যদি আমলাতন্ত্রীরা কল্পনাও করতে পারত, তা' হলে তা'রা হয়ত তাঁ'র ছায়াও স্পর্শ করত না। মাদ্রাজ সরকারের একজিকিউটিভ কাউনসিলে একজন ভারতীয় সদস্য ছিলেন। সারা জীবন তিনিও ছিলেন একজন আমলাতন্ত্রী। লর্ড মর্লের সংস্কার পরিকল্পনার মধ্যে একটি সর্ত ছিল যে, সরকারের সর্ব্বোচ মন্ত্রণাসভা বা কাউনসিলকে জনমতের সংস্পর্শে রাখতে হবে। উক্ত ভারতীয় সদস্য কাউনসিলে থাকা সত্ত্বেও লর্ড মর্লের উপরোক্ত সর্ত্তটি পালিত হ'তে পারল না। যে ভাবেই হোক কথা হ'ল সরকার ভুল করেছিল। কেবল ভুল নয়, এছিল এক সাঙ্ঘাতিক ভুল। কিছুকাল যাবৎ সরকার এই ভুলেই অটল রইল। কিন্তু মিঃ মণ্টেগু যখন ভারত সচিবের পদে নিযুক্ত হলেন ইণ্ডিয়া অফিসে এক নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'ল। শ্রীমতী বেসান্তকে মুক্তি দেওয়া হ'ল। এতে আবার একবার প্রমাণ হ'ল যে, ভারতে জনমতের শক্তি বৃদ্ধির পথে। মুখ্য না হলেও বঙ্গদেশে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অদ্ভুতভাবে তা'কে আরও স্পষ্ট করে দিল।

শ্রীমতী বেসান্ত-এর অন্তরীণ হওয়ার ঘটনাটি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের

প্রশ্নটিকে আরও সম্মুখে এনে উপস্থিত করল; কার মনের মধ্যে যে এর প্রথম উদ্ভব হয়েছিল তা' বলা শক্ত। সম্ভবত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ধারণাটি মিঃ গান্ধীর নিকট থেকেই প্রথম আসে। যাহাই হোক, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কোলকাতা এলেন এবং এক ঘরোয়া বৈঠকে বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করলেন। তখন আমি হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য রাঁচীতে ছিলাম। সেজন্য বৈঠকে যোগ দিতে পারি নি। আমি শুনেছিলাম বঙ্গদেশে আমার যে সমস্ত বন্ধু ছিলেন তাঁরা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে তখন সম্মত ছিলেন না। কিছুদিনের মধ্যে বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক সভায় বিষয়টি আলোচিত হ'ল। প্রাক্তন সভাপতিদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে সে সভায় আমিই সভাপতি ছিলাম। সেখানে বেশ শক্তিশালী একটি দল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সমর্থক ছিল। কিন্তু আমাদের বঙ্গদেশীয় বন্ধুগণের মধ্যে অধিকাংশই এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতির বিরোধিতা করেছিলেন। অবস্থাটিকে যখন আয়ত্তে আনা কষ্টকর হয়ে পড়ল তখন এক গোপন বৈঠকে আমরা এক পরিকল্পনা স্থির করে নিলাম। যখনই কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পড়তাম তখনই দেখতাম ফেবিয়ানদের নীতি অনুসরণ করে সুফল পাওয়া যেত। আমি বিষয়টি স্থগিত রেখে এ বিষয়ে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির মতামত চেয়ে পাঠানর এক প্রস্তাব দিলাম। এতে প্রচুর সময় পাওয়া যাবে। উত্তেজনাও ততদিনে প্রশমিত হবে। এবং যুক্তি ও সাধারণ বুদ্ধি তখন কার্য্যকর হয়ে উঠবে। দেখা গেল এটি বাস্তবিকই এক সুবুদ্ধির কাজ হয়েছিল।

আমরা যে প্রস্তাবটির খসড়া প্রস্তুত করেছিলাম মিঃ (বর্ত্তমানে স্যার) প্রভাসচন্দ্র মিত্রের উপর তা' উত্থাপনের ভার দেওয়া হল। প্রশ্নটি যেদিন প্রথম আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হয় সেদিন বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। বিতর্কের জন্য আমি সকলকেই পূর্ণ সুযোগ দিতে লাগলাম।

তার ফলে এত দেরী হয়ে গেল যে, সেদিন আর বিতর্ক শেষ করা গেল না। আমি যা ভেবেছিলাম পরদিন তাই হ'ল। বিতর্ক যখন পুনরায় আরম্ভ হ'ল তখন সকলের মন অনেক শান্ত। একের পরে এক বলে' যেতে লাগলেন। মিঃ তিলক প্রস্তাব করলেন, বিষয়টি বিচার করবার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হোক। স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র সুযোগ পেলেন। তিনি তখনি বললেন, বিষয়টি যখন এতই গুরুত্বপূর্ণ তখন এবিষয়ে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির কি মত তা' জানবার জন্য তাদের কাছে বিষয়টি পাঠিয়ে দেওয়া যাক। এজন্য একটি সময়সীমাও নির্দ্ধারণ করে' দেওয়া হ'ল। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মতামত পাঠাতে হবে বলে' স্থির করা হ'ল। প্রস্তাবটি তখন প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমেই গ্রহণ করা হ'ল। পরবর্ত্তী ঘটনা থেকে দেখা গেল যে, এক বিষম সঙ্কট থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। স্বায়ত্ব শাসন সম্পর্কে অচিরে কোন সরকারী ঘোষণা প্রকাশ হবে ভেবেই সমস্ত কাজ করা হ'ল। অক্টোবর মাসে যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসেছিল তার আগে যদি সরকারী ঘোষণাটি করা হ'ত, তা' হলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ধারণার মধ্যে যে উত্তেজনা ও অস্বস্তি ছিল তাও শান্ত হয়ে যেত।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনের কাজ করবার সময় বঙ্গদেশে আমরা অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলাম। আইনসম্মতই হোক আর বেআইনীই হোক সরকারী আইন অমান্য করা যে কত কষ্টকর এবং তার ফলে যে কি পরিমান হিংসাশ্রয়ী পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা' আমাদের অজানা ছিল না। বরিশালে আমরা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতিই গ্রহণ করেছিলাম। সেখানকার ঘটনাবলী, সিরাজগঞ্জে আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের প্রতি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে অকথ্য নির্যাতনের কথা তখনো আমরা ভুলতে পারি নি। আমাদের মনে হ'ল, যে পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক লোক তার জন্য সমস্ত কিছুই সহ্য করতে প্রস্তুত না

হবে এবং জনসাধারণের এক সর্ব্বগ্রাসী আবেগ উদ্দীপনা তার পেছনে না থাকবে সে পর্য্যন্ত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে কিছুই ফল হবে না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করবার কোন কারণ ছিল না। এজন্য বিষয়টি মুলতুবি হয়ে যাওয়াতে আমরা আনন্দিত হলাম। এখন আমরা শান্তভাবে ও সময় নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করতে পারব। এবং আমরা আরও আশা করেছিলাম যে, হয়ত এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যার ফলে এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধনীতি অবলম্বন উচিতও হবে না আর তার প্রয়োজনও হবে না।

ইতিমধ্যে বঙ্গদেশে এমন কতকগুলি অবস্থার সৃষ্টি হ'ল যার ফলে বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠল। শ্রীমতী বেসান্তকে অন্তরীণ করার প্রতিবাদে ভারতসভা গৃহে যে সভার আয়োজন হয়েছিল সে বিষয়ে পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। একটি প্রাথমিক আলোচনাসভা হিসাবে সভাটি তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এজন্য মফস্বলের কোন প্রতিনিধিকে এ সভায় নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নি। এ সমস্ত কারণে স্থির হয় যে, এর পরে সেরিফই টাউন হলে এক সভা আহ্বান করবেন এবং মফস্বলের প্রতিনিধিগণকেও এ সভায় যোগদান করতে অনুরোধ করা হবে। এ উদ্দেশ্যে যথারীতি স্বাক্ষর দিয়ে সেরিফের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করা হ'ল, যাতে তিনি সভাটি আহ্বান করেন। সভার দিন স্থির হওয়ার পর স্যার রাসবিহারী ঘোষকে ঐ সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

হঠাৎ একদিন জানা গেল, সরকার ঐ সভার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। এ সভা ডাকবার জন্য সেরিফের নিকট প্রেরিত পত্রে যে সকল ব্যক্তি স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকজনকে ডেকে মাননীয় মিঃ কুমিং তাঁদের নিকট সরকারী আদেশটি জানিয়ে দিলেন। আশ্চর্য্যজনকভাবে তার মধ্যে একটি কারণ দেখান হয়েছিল যে, এক প্রদেশের সরকারী নির্দ্দেশ অন্য প্রদেশের লোক দ্বারা

সমালোচিত বা নিন্দিত হতে দেওয়া যেতে পারে না। এরূপ আন্তঃ প্রাদেশিক সহায়তার এই নূতন মতবাদের কথা তার পূর্ব্বে কেউ কোনদিন শুনেও নি। যে একথা শুনল সে হাসতে লাগল। বাস্তবিক কারণ যে তা' নয়, তা' যে কেবল একটি অজুহাত মাত্র একথা জানতে কারও বাকী রইল না। অজুহাতটি যে কত অসার তা' সকলের কাছেই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল। সভা বন্ধ করবার এই সরকারী কৈফিয়ত নিয়ে সংবাদ পত্রে যথেষ্ট হাসাহাসি হ'ল! বাস্তবে এতে সরকারের গৌরব কিছুই বাড়ল না, জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষই বেড়ে গেল। এ সময় বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন চলছিল। সেজন্য আমরাও সেখানে ছিলাম। আমরা ফিরে আসবার পর একটি পরামর্শ সভা ডাকবার প্রস্তাব দিয়ে আমি তারবার্ত্তা পাঠালাম। এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম।

আমি কোলকাতায় ফিরে আসার পর দিনই পরামর্শ সভা বসল। অনেকেই তাতে যোগ দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি সেদিনের সভায় উপস্থিত হতে পারলেন না। এবং ভবিষ্যতেও আর কোন জনসমাবেশে তাঁকে আমরা পাব না। সভার মাত্র দুদিন পূর্ব্বে তিনি যখন তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন সে সময় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। এ অবস্থায় আমরা যখন পরামর্শ সভায় বসেছি তখন ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের মন শোকে ভারাক্রান্ত। আমি সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলাম। সভায় উত্তেজনা ছিল প্রচুর। এবং আলোচনা যতই চলতে লাগল তা' ততই বেড়ে চলল। যাঁরাই ভাষণ দিলেন তাঁদের প্রত্যেকেই শপথ নিয়ে বললেন, সরকারী আদেশকে তাঁরা প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত এবং প্রয়োজন হলে তাঁরা কারা বরণও করবেন। একথাও বুঝতে কারও বাকী ছিল না যে, যদি নিষিদ্ধ সভার অনুষ্ঠান করা হয় তা' হলে সভার আহ্বায়কদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষও অবশ্যম্ভাবী।

অনেক বাকবিতণ্ডার পর স্থির হ'ল, আমাদের ভিতর থেকে ছয়জন একত্র বসে এক কার্য্য পদ্ধতি প্রস্তুত করবেন এবং বিনা আপত্তিতে সভা সেটিই গ্রহণ করবে। সভায় যে সমস্ত প্রবীণ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁদের ভিতর থেকেই ছয়জনকে বেছে নেওয়া হ'ল। তাঁরা ছিলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ, বাবু মতিলাল ঘোষ, মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, মিঃ সি. আর. দাস, মিঃ ফজলুল হক এবং আমি। আমরা তখন একটি পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে গিয়ে ঘণ্টাখানেক আলোচনার পর মিলিতভাবেই স্থির করলাম সে সময় লর্ড রোনাল্ডসে ঢাকায় ছিলেন, আমরা সেখানে গিয়ে গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করব। তাঁকে সমস্ত বিষয়টি বুঝিয়ে বলে তাঁর নিষেধাজ্ঞাটি তুলে নেবার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করব। আমরা মনে করলাম সমর্থনের অযোগ্য এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাবার জন্য সরকারকে একটি সুযোগ দেওয়া আমাদের উচিত। যদি সরকার তা' না করে, কেবল তা' হলেই আমরা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথে অগ্রসর হ'ব এবং সরকারী আদেশের বিরোধীতা করে' টাউন হলে সভা করব।

এরূপ সাব্যস্ত ক'রে আমরা পাশের ঘর থেকে পরামর্শ সভায় ফিরে এলাম। আমরা যা' স্থির করেছিলাম তা' সভাতে বুঝিয়ে দেবার ভার ছিল মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর উপর। তিনি তাঁর আইনজ্ঞোচিত শক্তি দিয়ে যথারীতি কৌশলে তাঁর কর্ত্তব্য সম্পাদন করলেন। সব সময় দেখা যায় শ্রোতারা যখন উত্তেজিত হয় তখন কোন বোঝাপড়া বা চিন্তা ভাবনা করে' কাজ করার পরামর্শ তাদের মনঃপুত হয় না। এক্ষেত্রেও তাই হ'ল। তারা আমাদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করতে লাগল। আমরা যা' সাব্যস্ত করেছিলাম শ্রোতাদের অধিকাংশের কাছে তা' গ্রাহ্য হ'ল না। তাদের ইচ্ছা ছিল তারা টাউন হলে সভা করবে এবং তারপরে পুলিস আপত্তি করলে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাবে। বাস্তবিক সংঘর্ষ আরম্ভ হলে তাদের মধ্যে কতজন টিকে থাকত সে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যারা খুব বড় বড় মুখ

করে' বড় বড় কথা বলেছিল বরিশাল সম্মেলনের শোভাযাত্রার উপর পুলিস আক্রমণ সুরু হতেই কি ভাবে তারা দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল সে কথা ও সে সময়ের ঘটনাবলীর কথা আমার মনে আছে। সময়ের পরিবর্ত্তন হয়েছে বটে, তবুও কারারুদ্ধ হবার উত্তেজনা ও সস্তায় নাম কিনবার প্রচণ্ড উন্মাদনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না।

কোন কিছু স্থির না করেই পরামর্শ সভা ভেঙ্গে গেল। কিন্তু আমরা স্থির করলাম যদিও পরামর্শ সভা আমাদিগকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন ক্ষমতা দেয়নি, তবুও আমরা সাক্ষাৎ করতে যাব। বৃথা সময় না কাটিয়ে আমি গভর্ণরের একান্ত-সচিব মিঃ গৌরলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলাম এবং গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য একটি দিন স্থির হ'ল। ঢাকায় লেজিসলেটিভ কাউনসিলের একটি সভা শেষ হবার পরেই আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। লেজিসলেটিভ কাউনসিলের অনেক ভারতীয় সদস্য আমাদের এই প্রতিনিধিমণ্ডলীতে যোগ দেবার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। কিন্তু আমাদের সদস্যসংখ্যা ছয়জনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল বলে অন্যদের গ্রহণ করা সম্ভব হ'ল না। আমার মনে হয়—ব্যবস্থাটি উচিতই হয়েছিল। কারণ আমরা গভর্ণরের সঙ্গে গোপনে যে সমস্ত আলাপ আলোচনা করেছিলাম প্রতিনিধি মণ্ডলীতে অনেক বেশী লোক থাকলে তা' হয়ে উঠত না। ইতিমধ্যে টাউন হলের সভার উপর যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্য না না ধরণের অদ্ভুত অদ্ভুত প্রস্তাবে দেশ ছেয়ে গেল। তার মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সমস্ত ভারতীয় সভ্যগণ কাউনসিলের সভায় যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। ঢাকা যাবার পথে জাহাজে বসে আমরা বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করলাম। এ বিষয়টি নিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করে যখন মিটিয়ে

নেবার চেষ্টা চলছে সে সময় এরূপ কোন ব্যবস্থা নেওয়া খুবই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে। এসবের উল্লেখ করে আমি এ কথাটিই শুধু বলতে চাই যে, সরকারের বিবেচনাহীন কার্য্যকলাপের ফলে মানুষের মন যখন উত্তেজিত হয়ে উঠে তখন চরমপন্থী মতই লোকের নিকট সহজে গ্রাহ্য হয় এবং তাহাই প্রাধান্য লাভ করে।

ঢাকার রাজভবনে লর্ড রোনাল্ডসে প্রতিনিধি মণ্ডলীকে সাদরে গ্রহণ করলেন। এর মধ্যে ছিলেন মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, মিঃ সি. আর. দাস, মিঃ ফজলুল হক, ডাক্তার নীলরতন সরকার, বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় এবং আমি। লর্ড রোনাল্ডসে প্রথমেই জানতে চাইলেন আমাদের মুখপাত্র কে। মিঃ চক্রবর্ত্তী আমার নাম করলেন। শ্রীমতী বেসান্তকে কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্ব্বাচনের বিষয় নিয়ে পরে যে সমস্ত বাদানুবাদ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তখনো পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া সেরূপ কিছুদ্বারা বিষাক্ত হয়ে ওঠে নি।

সমস্ত সরকারী নথিপত্র সহ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই লর্ড রোনাল্ডসে এসে ছিলেন। তিনিই আলোচনা আরম্ভ করলেন। শীঘ্রই দেখা গেল, আন্তপ্রাদেশিক সহায়তার কথা, এই যে এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের শাসকদের কাজকর্ম্মের সমালোচনা করা অন্যায় বলে' বলা হয়েছিল, এরূপ সমস্ত কিছুই ছিল ভিত্তিহীন। টাউন হলের সভা নিষেধের বাস্তব কারণ তিনি অকপটে আমাদের নিকট প্রকাশ করলেন। তা' যে সম্পূর্ণই বিশ্বাসযোগ্য ছিল তা' নয়, তবে তার মধ্যে সত্যতা থাকাও খুবই সম্ভব। সভা নিষেধ করবার প্রকৃত কারণ এই ছিল যে, হোমরুল লীগের এক সভায় (তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনি সেখানে ছিলেন না') এমন সমস্ত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল যাতে সরকারের অসন্তুষ্ট হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। সরকার পক্ষ মনে করেছিল টাউন হলের সভাতেও প্রধানত তারাই থাকবে। একই প্রকারের ভাষা প্রয়োগ করবে এবং অনেক

অধিক সংখ্যক লোকের কাছে তা' বলা হবে। যেখানে বহু যুবকও উপস্থিত থাকবে। এতে যথেষ্ট ক্ষতি হবে। তারপর লর্ড রোনাল্ডসে বিশেষ করে' বললেন, "অন্য প্রদেশে ছাত্রদিগকে জনসভায় যোগ দিতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু আমিত সেরূপ কিছু করি নি।"

উক্ত হোমরুল লীগের সভায় গোয়েন্দাবিভাগের যেসব কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন তাঁদের বিবরণ থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ লর্ড রোনাল্ডসে আমাদের পড়ে শুনাতে লাগলেন। সে সব বিবরণ সত্য, কি, মিথ্যা ছিল তা' বলা সম্ভব নয়। তবে সে সব বিবরণ যদি মোটামুটি ভাবেও সত্য হয় তা' হ'লে সেরূপ ভাষার প্রয়োগ উচিত হয়েছিল বলে একেবারেই বলা চলে না। এক ব্যক্তিকে প্রায়ই দেখা যেত—কর্ত্তৃপক্ষ যত জনসভা করত তিনি তত উৎসাহ দেখাতেন। বিবরণে দেখা গেল উপস্থিত যুবকদের নিকট তিনি অনুশীলন সমিতির নীতি অনুকরণ করে' সহিংস নীতির আশ্রয় নিতে আবেদন করেছিলেন। বিবরণে দেখা যায় তিনি নাকি বলেছিলেন, এদেশে ইংরেজের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, কিন্তু এদেশের সন্তানের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। অথচ এই মুষ্টিমেয় বিদেশীই আমাদের প্রভু। অপর এক বক্তা হোমরুল লীগের সেই সভায় বলেছিলেন, গোয়েন্দা কর্ম্মচারীদের দ্বারা অনুদিত বিবরণে তাঁর আস্থা নেই, সেজন্য তিনি ইংরেজীতেই বলবেন। এতে আমি কোনই দোষ দেখলাম না। এবং সেকথা আমি বললামও। বিশেষত তৎপূর্ব্বেও সে বক্তা একবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন যে, গোয়েন্দা কর্ম্মচারীরা তাঁর বক্তৃতাকে বিকৃত করে রিপোর্ট দিয়েছিল। একথার উত্তরে গভর্ণর বললেন, তার অর্থ ই হ'ল গোয়েন্দা কর্ম্মচারীদের প্রতি তাতে কটাক্ষ পাত হয়েছে। এবং তজ্জন্য সরকারকে স্বভাবতই ভাবতে হবে। যে হেতু দেখা গেছে, বিপ্লবীদলের লোকেরা প্রায়ই গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের বেছে নিয়ে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে।

কথাবার্তার মধ্যে আমি বললাম, টাউন হলের সভায় যে স্যার রাসবিহারী ঘোষ সভাপতিত্ব করবেন তাই ত যথেষ্ট প্রমাণ যে, সভার মধ্যে কোন উত্তেজনা হবে না এবং তার মধ্যে কোন তীব্রতা থাকবে না। লর্ড রোনাল্ডসে বললেন, সে কথা তাঁর জানা ছিল না। বললাম, চেষ্টা করলে অনায়াসেই তা জানতে পারতেন। গভর্ণর অন্যায় কিছু না বলে' বরাবর বেশ খোলাখুলি ভাবেই কথা বলছিলেন। তিনি বললেন যে, আমরা যদি সভায় কোন জ্বালাময়ী ভাষা ব্যবহার করে উত্তেজনা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকবার দায়িত্ব নিই এবং শান্তভাবে সভার কার্য্য সম্পাদন করতে সম্মত থাকি, তা' হলে তিনি তাঁর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবেন। আমরা বললাম, আমরা ওরূপ কোন কথা অবশ্য দিতে পারি না, তবে তাঁর অভিপ্রায়কে রূপ দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারি। তা' ছাড়া যখনই কোন জনসভার আয়োজন করা হয় তখন ধরে নেওয়া যায় যে, সভার উদ্যোক্তারা সুষ্ঠু ও শান্তভাবে সভার কার্য্যাদি পরিচালিত করবে। এ সমস্ত আলোচনার মোট ফল হ'ল এই যে, আমরা যতটুকু আশ্বাস দিয়েছিলাম তার উপর নির্ভর করেই সভার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হ'ল। আমাদের সফলতায় খুশী হ'য়ে আমরা বাড়ী ফিরলাম। তবে এজন্য লোকে আমাদের কিভাবে নেবে সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। বঙ্গদেশে কেউ কোন বড় কাজ সন্দেহাতীত ভাবেও যদি করে লোকে তা' অবাধে স্বীকার ক'রে নিতে চায় না। বঙ্গদেশ বিভাজন যখন আংশিক ভাবে পরিবর্ত্তন করা হয়েছিল এবং যখন আশা করা গিয়েছিল যে, প্রত্যেকে বিনা আপত্তিতে তার প্রশংসা করবে, তখনও একদল লোক বিহারকে বঙ্গদেশ থেকে পৃথক করার দরুণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিল এবং রাজধানী স্থানান্তর করায় তদধিক লোক প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করেছিল। এ সমস্ত কারণে ও বিশেষতঃ সম্মেলনে যে-সব কথাবার্তা হয়েছিল এবং যে

অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে তা' ভেঙ্গে গিয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি সমস্ত প্রকার মন্তব্য ও সমালোচনার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই ছিলাম।

প্রতিনিধিত্ব করার কোন ক্ষমতা আমাদের ছিল কি না, এ নিয়েই প্রথম আপত্তি উঠল। আমাদের এরূপ ক্ষমতার অভাব বলে' যাঁরা আপত্তি করলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি মণ্ডলীরই সদস্য। সদস্য মনোনীত হওয়ার সময় তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। কিন্তু এখন তিনি নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন। কথা আছে, সফলতার ন্যায় সাফল্য অর্জ্জন করতে জগতে আর কিছুই পারে না। নিষেধাজ্ঞার প্রত্যাহারে আমরা যে একটা জয় লাভ করেছি, তার মূল্য সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠে না। জনসাধারণ কোন ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে তাদের স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমিত না হওয়া পর্য্যন্ত বা কলঙ্ক রচনার প্রতি নিজস্ব আসক্তিবশতঃ, সাময়িকভাবে উৎসাহ ও উদ্যমহীনতা দেখায়। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন টিকে না। পরে জনগণ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং সমস্ত কিছুই বিচারবুদ্ধি সহকারে বিবেচনা করে' বুঝতে চেষ্টা করে। কেউ কেউ প্রস্তাব দিলেন, আমাদের উচিত আর একটি পরামর্শসভা ডাকা এবং তাদের কাছে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বলা। আমার তাতে মত ছিল না। কারণ, আমার মনে হয়েছিল আবার সেই ব্যতিব্যস্ত করবার চেষ্টা ও পূর্ব্বে সভায় যে সব ঝগড়াঝাটি হয়েছিল সে সবের পুনরাবৃত্তি হবে। আমি টাউন হলে সভা করার প্রস্তাব দিলাম। আমার মনে হ'ল সে ক্ষেত্রে সভার আয়তন, প্রচার কার্য্য এবং প্রতিনিধিমূলক অবস্থা ইত্যাদির মধ্যে ব্যক্তিগত হীনতা ও মানসিক অবস্থা, এমন কি, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি দোষও চাপা পড়ে যাবে। বাস্তবিক পক্ষে আমার এ ধারণাই ছিল ঠিক।

টাউন হলে এক সভা করা হ'ল। পূর্ব্বে যে সভা নিষিদ্ধ হয়েছিল

এটি সেই সভা। সরকারী কর্তৃপক্ষ যে সভাকে বন্ধ করে দিয়েছিল আমরা তার বিরুদ্ধে যে জয়লাভ করেছি তার গর্ব্বও এ সভায় যুক্ত হ'ল। বৈধনীতি অনুসরণ ক'রে সভা করবার আমাদের যে অধিকার আছে আমরা আমাদের সে অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলাম। স্যার রাসবিহারী ঘোষের অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করবার জন্য আমাকেই নিমন্ত্রণ করা হ'ল এবং আমিও তা' গ্রহণ করলাম। সভায় আমি ছাড়া অন্য কেউ কোন বক্তৃতা করলেন না। সুতরাং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সকলের মত বলে' তাই গৃহীত হ'ল। এ সুযোগে আমি যে প্রতিনিধিমণ্ডলী নিয়ে গিয়েছিলাম সে বিষয়েও সকলকে বুঝিয়ে বললাম। বোধ হয় এ প্রসঙ্গে টাউন হলে আমি যা বলেছিলাম সকলেই তা' অনুমোদন করলেন। তার কিছু কিছু আমি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"এই নিষেধাজ্ঞা যখন আমার হাতে আসে আমি ও আমার বন্ধু বাবু মতিলাল ঘোষ উভয়ে বোম্বাইতে ছিলাম। আমরা শীঘ্রই কোলকাতায় ফিরে আসি। তারপর এক পরামর্শ সভা করা হয় এবং আমরা এক প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠন ক'রে ঢাকায় গিয়ে মাননীয় লর্ড রোনাল্ডসে-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কোন সমিতি বা গণসংস্থার পক্ষ থেকে এই প্রতিনিধিমণ্ডলী কোন প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা লাভ করে নি। তবে বহু সঙ্কট জনক মুহূর্ত্তে মাতৃভূমির সেবাকাজ করতে গিয়ে সমস্ত সংঘর্ষের দুঃখ কষ্ট আমরাই মাথা পেতে নিয়েছি ব'লে আমরা ব্যক্তিগত ভাবেই জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব দাবী করে' প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠন করেছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্যের পবিত্রতা, আমাদের জনসেবার স্মৃতি এবং সর্ব্বোপরি আমাদের প্রতি আমাদের দেশবাসীর যে পূর্ণ আস্থা আছে আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যেই ন্যস্ত রয়েছে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবার ক্ষমতার সনদ। গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে আমরা কোনরূপ কথা দিই নি, এবং তিনিও তা' চান নি। আমরা এটুকুই কেবল বলেছি যে, দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সভার কাজকর্ম্ম

পরিচালনা করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ইচ্ছা করলে তাকেই আপনারা কথা দেওয়া বলে' বলতে পারেন। তবে যে কোন জনসভা করতে গেলেই পরোক্ষ ভাবে এরূপ কথাই দেওয়া হয়। কেন না, আইনত তার প্রয়োজন আছে। আমাদের দিক থেকে আমাদের কথার মধ্যে কোন অনিশ্চয়তা অথবা দ্ব্যর্থবাচকতা ছিল না। এবং আমরা কোন অধিকারও ছেড়ে দিই নি। দেশের বৈধভাবে গঠিত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে মর্য্যাদা ও দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যবহার করেছি। মাননীয় লর্ড রোনাল্ডসেও অনুরূপ ভাবেই আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। বেশ সদয়ভাব ও হৃদ্যতার সঙ্গে তিনি আমাদের গ্রহণ করেছিলেন। এবং যোগ্য রাষ্ট্রপরিচালকের মতই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়ে নেবার প্রবৃত্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর নিষেধাজ্ঞাও তিনি তুলে নিয়েছেন। এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের শাসকের কার্য্যাদির সমালোচনা করতে না পারার যে নীতি তাও বর্জ্জিত হয়েছে। আমরা ঢাকাতে যা-যা করেছি, এই হ'ল তার মোটমাট সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এ কাজের জন্য আমরা কিছু মাত্র লজ্জিত নই। আমরা তাকে সমর্থন করি।"

আমাদের গণআন্দোলনের ইতিহাসে যাকে এক সাঙ্ঘাতিক সঙ্কট মুহূর্ত্ত বলে' আমরা ভীত হয়ে পড়েছিলাম, এ ভাবেই তা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। লক্ষ্যবিষয় যদি ন্যায্য হয়, এক শক্তিশালী গণসমর্থন যদি তার পশ্চাতে থাকে, সংঘর্ষ হলে তার বিরুদ্ধে যে পেষণনীতি চলবে তা' যদি আমাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে' আমাদের জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহকে মন্থর করে না দেয়, তা' হ'লে সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে আমি ভীত নই। বঙ্গদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে যে সরকারী নিপীড়ন আরম্ভ হয়েছিল তাতে আমাদের জনজীবন প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ, এরূপ অত্যাচার ছিল আমাদের সহন ক্ষমতার বাইরে। আমাদের দেশ সেবকদের উপর সর্ব্বপ্রকার

পুলিশের অপ্রতিহত প্রভাব, আমাদের বহু সংখ্যক যুবকের দীর্ঘকালব্যাপী কারাবাস, সকল প্রকার সমিতি বন্ধ করা ইত্যাদির ফলে আমাদের নবজাতক জনজীবনের সাঙ্ঘাতিক অনিষ্ট হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে বাস্তবিক পক্ষে যে-সময়ের কথা বলতে আরম্ভ করেছিলাম বোধ হয় তা' থেকে আমি কিছুটা দূরে চলে এসেছি।

ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়

বঙ্গদেশে বিপ্লবী আন্দোলন

মেদিনীপুর সম্মেলন ও সুরাট কংগ্রেসে পর পর যে সমস্ত ঘটনা ঘটে' গিয়েছিল এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অস্ত্র হিসাবে হিংসা ও অশান্তির পথ অবলম্বন, সুরাট কংগ্রেস ভেঙ্গে যাবার ব্যাপারে যা' বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল, সে সবের মধ্যে নিরপেক্ষ দর্শক মাত্রেই আমাদের জনজীবনের সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে বিপদজনক এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভবের সূচনা লক্ষ্য করেছিলেন। যে অশুভের এই ছিল পূর্ব্বাভাস তা' পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ লাভ করল তার অনতিকাল পরে। ১৯০৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে সকাল বেলা ভয় ও বিস্ময়ের সঙ্গে কোলকাতাবাসীরা সংবাদ পেল পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় বিহারের মজঃফরপুরে দুজন ইউরোপীয় মহিলার উপর বোমা দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছে। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার শিকারদ্বয় ছিলেন মজঃফরপুরের খ্যাতনামা উকিল মিঃ পিঙ্গলে কেনেডির স্ত্রী ও তাঁর ষোড়শী কন্যা।

কিন্তু এমনই এক ভাগ্যের বিড়ম্বনা যে, যে-কয়েকজন ইউরোপীয় কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম বোধ করতেন মিঃ পিঙ্গলে কেনেডি ছিলেন তাঁদেরই একজন। একবার তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের এক অধিবেশনে সভাপতিত্বও করেছিলেন। মজঃফরপুরের জিলা জজ মিঃ কিংস্‌ফোর্ডকে উদ্দেশ করেই বোমাটি নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তিনি যখন কোলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন তিনি তরুণ বাঙ্গালী স্বদেশ-কর্ম্মীদিগকে কঠোর দণ্ড দিতেন। এজন্য তিনি অতিশয় অপ্রিয় হয়ে উঠেন। তদ্ভিন্ন একাধিক গণ্যমান্য যুবকের কঠোর দৈহিক শাস্তির বিধান করে তিনি বিশেষভাবে লোকের ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। সাধারণ লোকের ধারণা ছিল তিনি অন্যায় ভাবেই সাজা

দিতেন। তার উপর তিনি যখন দৈহিক সাজার ব্যবস্থা করতে লাগলেন তখন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পড়ল। এ অপমান তরুণ স্বদেশকর্ম্মীদের অসহ্য হয়ে উঠল এবং তারা প্রতিশোধ নেবার জন্য পাগল হয়ে গেল। ষড়যন্ত্রকারীদের নির্দ্দেশ কার্য্যকরী করবার ভার পড়ল ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামে দুজন তরুণের উপর। তারা উভয়েই প্রাণ হারাল। ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়েছিল। অপর জন ধরা পড়বার মুহূর্ত্তে গুলি খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। এছিল প্রচণ্ড এক দুঃখদায়ক ঘটনা—নিষ্ফল, উদ্দেশ্যহীন এবং ভয়ঙ্কর। মাত্র অল্প কয়েক দিনেক মধ্যেই মুরারীপুকুর ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার হ'ল এবং তাদের নেতাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। আপনাদের ভুলের জন্য আমলাতন্ত্রীরা শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। দ্রুত গতিতে একের পর এক দমন নীতির প্রয়োগ করে' দেশের জনজীবনকে নির্জ্জীব ও তার বিকাশকে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে আমলাতন্ত্রীরা দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার প্রয়াস করতে লাগল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হ'ল। জনসভাকে হীনবল করা হ'ল। এবং সরকারের অস্ত্রাগার থেকে এক অতি পুরাতন জীর্ণ অস্ত্র যা' বহুকাল ধরে' অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়েছিল, তা' টেনে এনে দেশসেবকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে' তাদের শায়েস্তা করবার চেষ্টা চলতে লাগল। ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন-এর বলে অনেক লোককে দেশান্তরিত করা হ'ল। এদের মধ্যে কেহ ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণার উৎস এবং সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরের এক সকালে বিস্ময়ের সঙ্গে লোকে জানতে পারল ব্রজমোহন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, বরিশাল জিলার জননেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত, সর্ব্বজনমান্য ও ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা সদস্য কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রসিদ্ধ দেশসেবক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শচীন্দ্র প্রসাদ বসু এবং বিত্তবান ও স্বদেশপ্রেমিক সুবোধ মল্লিক এঁরা সকলেই ১৮১৮ সালের ৩ নং আইনে নির্ব্বাসিত হয়েছেন।

আমার সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আমার নির্ব্বাসনের জন্যও আদেশ প্রস্তুত হয়েই ছিল। তবে শেষ মুহূর্ত্তে তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার এডওয়ার্ড বেকারের হস্তক্ষেপের ফলে সে আদেশ নাকচ হয়ে যায়। স্যার বেকার আমাকে বিশেষ ভাল ভাবেই জানতেন। প্রকৃত ঘটনা যাই হোক, ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এক সন্ধ্যায় আমি আহারে বসব। এমন সময় আমাদের স্বদেশী প্রচারকদের মধ্যে সর্ব্বাধিক বাকপটু ও আমার বিশিষ্ট বন্ধু মৌলবী আবুল হোসেন আমার ব্যারাকপুরের বাড়ীতে ছুটে এলেন। বললেন, গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারীরা আমাকে গ্রেপ্তার করতে আসছে। আমি যেন তার জন্য প্রস্তুত থাকি। আমি বললাম, "বেশ ত, আগে আমি খেয়ে নি। আপনিও বসে' যান।" তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। আমাদের আহার শেষ হ'ল। ঘণ্টা দুই আমরা পুলিশের পথ চেয়ে বসে' রইলাম। কিন্তু তারা এল না। কাজেই আমিও শুতে গেলাম। আর আমার বন্ধু অনেকটা শান্ত মনে কোলকাতা ফিরে গেলেন।

বাস্তবিক পক্ষে আমার অনেক বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকর্ম্মীকে নির্ব্বাসিত করা হয়েছিল, কিন্তু আমাকে নির্ব্বাসিত করা হয়নি। সত্য সত্যই কি আমাকে নির্ব্বাসিত করবার কোন পরিকল্পনা ছিল? কি জানি। মহাকরণের মহাফেজখানা হয়ত একদিন এ রহস্যের উদ্ঘাটন করবে। আমি যখন সরকারের সদস্য ছিলাম ইচ্ছা করলে আমি এ সংবাদ নিতে পারতাম। তবে আমি তা' করিনি। সে যাই হোক, আমার বন্ধু আবুল হোসেন আমায় যে খবর দিয়েছিলেন তার কিছুটার সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। তিনি যে দিন আমাদের বাড়ীতে এসে বলেছিলেন যে, আমাকে নির্ব্বাসিত করা হবে সেদিন বেশ কিছু সংখ্যক পুলিস ও ইউরোপীয় সেনা ব্যারাকপুরে এসেছিল। তাদের উপস্থিতিটাকে এই বলে বুঝাবার চেষ্টা হয়েছিল যে, সে দিন ভাইসরয় লর্ড মিণ্টো ঘোড়দৌড় দেখতে ব্যারাকপুরে এসেছিলেন।

এবং তজ্জন্যই ছিল এই ব্যবস্থা। তবে অন্যান্যবার যখন ঘোড়দৌড় দেখবার জন্য ভাইসরয় ব্যারাকপুরে আসতেন তখন কিন্তু এভাবে পুলিস ও সৈন্য মোতায়েন হ'ত না।

লর্ড মর্লে প্রণীত 'রিকালেকশনস' নামক স্মৃতিচারণ পুস্তক থেকে জানা যায় যে, যদিও তিনি একজন মৌলিক রাষ্ট্রশাসক ছিলেন, তবুও বিনা বিচারে নির্ব্বাসনের নীতিতে তাঁর সমস্ত আত্মাই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এবং স্থানীয় কর্ম্মচারীরাই অনস্বীকার্য্য ভাবে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর চেয়ে অধিক খবর জানত বলেই অবস্থার চাপে পড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি নতি স্বীকার করেছিলেন। তিনি ভাইসরয়'এর একজিকিউটিভ কাউনসিলের কোন-কোন সদস্যের উপর এতই বিরক্ত হয়েছিলেন যে, তিনি লর্ড মিণ্টোর নিকট লিখেছিলেন, "প্রসঙ্গত বলছি, আমরা যখন ১৮১৮ সালের মরচে পড়া তরবারি খানা নামিয়েই নিয়েছি তখন আমার ইচ্ছা আপনি '—' এবং '—' কেও (দুজন সদস্যের নাম) নির্ব্বাসিত করুন। আপনি এ বিষয়ে কি বলেন? আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আপনার সে কাজের সমর্থন করব"। একথাগুলি বলা হয়েছিল কিছুটা আন্তরিকতা নিয়ে আর কিছুটা বিদ্রুপের সুরে। তবে এ সমস্ত নির্ব্বাসনের ব্যাপার নিয়ে লর্ড মর্লে যে কিরূপ বিরক্ত হয়েছিলেন এ থেকে তার এক পরিচ্ছন্ন ধারণা করা যায়। এ দুজন সদস্য যে কে ছিলেন লোকে হয়ত কোনদিন তা' জানতে পারবে না। তবে যতদিন জনমত এ সমস্ত চাকুরীয়াকে সংযত করবার ক্ষমতা আয়ত্ত না করবে ততদিন পর্য্যন্ত এ ধরণের চাকুরের কিছুমাত্র অভাব হবে না। সকল দেশে সকল যুগে দেখা গেছে এটিই হ'ল সরকারী চাকুরেদের খেয়ালখুশী অনুযায়ী চলার একমাত্র ঔষধ।

ভারতের মানুষের স্বভাব বা অবস্থা তার চেয়ে বিশেষ পৃথক নয়। আরামে বসে' তর্ক-বিতর্ক করা হ'ল প্রতিক্রিয়াশীলদেরই

অস্ত্র, যদিও হয়ত একথাটির স্রষ্টা কোন প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি নাও হতে পারে। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিচারের কথা ছেড়ে দিলে, এ কথা বলা যায় যে, ন্যায় পরায়ণতার প্রতি লর্ড মর্লের যে আগ্রহ ছিল তার ফলে তিনি অনেক রক্ষা কবচের জন্য পরামর্শ দিতেন, কিন্তু সে সমূহ সব সময় কার্য্যে পরিণত করা হ'ত না। ১৯০৮ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি লর্ড মিণ্টোকে লিখেছিলেন, "একটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলার তদন্ত যেন তার অনুপস্থিতিতে না করা হয়। এর পক্ষে আমরা যত যুক্তিই দেখাই না কেন, এবং এমনও হতে পারে যে, তাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি বিশেষ কোন অন্যায়ও হবে না, তবুও তার মধ্যে যেন এক নিকৃষ্ট ধরণের ইউরোপীয়, অষ্ট্রীয় ও রুশীয় মনোভাব ফুটে' উঠে।"

১৯১৮ সালের ১৯শে মার্চ ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপনের সময় আমি লর্ড মর্লের 'রিকালেকশনস' পুস্তক থেকে উক্ত ছত্রটি উদ্ধৃত করেছিলাম। আমি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে আটক বন্দীদের ক্ষেত্রে কি লর্ড মর্লের ঐ নির্দ্দেশটি পালন করা হয়েছিল?" ভারপ্রাপ্ত সদস্য তার কোন উত্তর দিতে পারেন নি। তার সরল অর্থ হ'ল এই যে, এই অত্যাবশ্যক রক্ষাকবচটিকে অনুসরণ করা হয় নি। লর্ড মর্লে অনুরূপ সীমানির্দ্ধারক আরও একটি নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। ১৯০৮ সালের ২৩ শে আগষ্ট তারিখে তিনি বলেছিলেন,—

"আমি তাঁকে (জনৈক য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কর্ম্মচারীকে) স্পষ্টভাবে বলেছিলাম যে, একমাত্র যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, তার প্রত্যক্ষ ও সুপরিকল্পিত কাজের ফলে হিংসাত্মক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, সেই ব্যক্তির ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির

নির্ব্বাসন আমি অনুমোদন করব না! আর আমার সে কথাটিই তিনি নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন।”

এক্ষেত্রেও পরিষ্কার দেখা যায়—এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ লর্ড মর্লের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন নি। তা' যদি করতেন, তা' হলে কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু এবং আরও অনেকেই কখনো নির্ব্বাসিত হতেন না। কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন বৈধ উপায়েতে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং তাঁরা কোনদিন কল্পনাও করতেন না যে, তাঁরা এমন কোন কাজ করবেন যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল “হিংসাত্মক বিশৃঙ্খলা” হতে পারে। পুলিসের আক্রমনজনিত সাঙ্ঘাতিক প্ররোচনা সত্ত্বেও তাঁরা প্রতিহিংসার কথা কল্পনা করেন নি। প্রত্যাঘাত না করে পুলিসের আঘাত ও হিংসাত্মক অত্যাচার নীরবে সহ্যই করেছিলেন। এখানেও আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি সেই পুরাতন নিয়মের পুনরাবৃত্তি। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দেখা যেত যে, ‘কোর্ট অব ডাইরেকটারস্’ যা' নির্দ্দেশ দিতেন কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা তা যথাযথ পালন করত না। কোর্ট অব ডাইরেকটারস্ তাদের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু রাজ্যবিস্তার বন্ধ করবার জন্য বারবার নির্দ্দেশ দিয়েছে। কিন্তু লোভ সম্বরণ করতে অসমর্থ হয়ে তারা তাদের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অমান্য করেছে। এবং পরে তাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে। কারণ, তার ফলে কোম্পানীর অংশীদারদের লভ্যাংশ বর্দ্ধিত হয়েছে, তাদের অধিকারভুক্ত অঞ্চল বিস্তার লাভ করেছে এবং তৎসঙ্গে কোম্পানীর মর্য্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সে লোভ আজ আর নেই। সম্ভবত ইণ্ডিয়া অফিসের কোন নির্দ্দেশ সেরূপ তীব্রভাবে অমান্যও করা হয় নি। তবুও অতীত দিনের কর্ম্মচারীদের অস্থিরতা ও নিজেদের খেয়ালখুসী অনুসারে কাজ করার প্রবণতা আজও লোপ পায়নি। বর্ত্তমানে যোগাযোগের সুবিধা

থাকা সত্ত্বেও দশহাজার মাইল দূরে বসে' ভারত সচিবের নিয়ন্ত্রণ করবার যে ক্ষমতা তা' নিতান্তই ক্ষীণ। এবং এমন একটি সময় এসেছে বা শীঘ্রই আসছে যখন ভারতসচিবের সমস্ত দায়িত্ব জনমতদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভারতসরকারের হাতেই ন্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য তা' হ'বে সাম্রাজ্যের অবিভাজ্যতা রক্ষার ব্যবস্থা সাপেক্ষ।

সহজাত প্রবৃত্তি ও বিশ্বাসের দিক থেকে লর্ড মর্লে দমননীতির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু অবস্থার চাপে পড়ে' সে নীতি গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হন। ভারত শাসনের দায়িত্ববাহী মন্ত্রী হিসাবে তা' প্রতিরোধ করার উপায় তাঁর ছিল না। বিপ্লবআন্দোলনও তার যা' শিক্ষা দেবার তা' তাঁকে দিয়েছিল। কোন মানুষই তাদের শান্তি বিপ্লবকারী কোন বিপ্লবে বা আন্দোলনে উৎসাহ প্রকাশ করে না। তাদের সমস্ত সত্ত্বাই থাকে আইন ও শৃঙ্খলার সঙ্গে আবদ্ধ। এ অবস্থায় লর্ড মর্লে এ সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হলেন যে, ভারতে সব কিছু সঠিকভাবে যে চলছে তা' নয়। নিশ্চয় কোথাও গলদ আছে। ভারতে বৈপ্লবিক শক্তির আত্মপ্রকাশের মূলে এমন কিছু কারণ আছে যে-জন্য ভারত সরকারের গঠন প্রণালী এবং ভারতের প্রশাসনই দায়ী। আমার মনে হয়, এ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই তিনি ভারতের নেতৃবর্গের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য এক শাসন সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

সংস্কার যার কাছ থেকেই এসে থাকুক, লর্ড মর্লে তা' সমর্থন করলেন এবং অবিলম্বে তা' কার্য্যে পরিণত করবার জন্য লর্ড মিন্টোর উপর জোর দিতে লাগলেন। তিনি লর্ড মিন্টোর নিকট এ সম্পর্কে যে সমস্ত পত্র প্রেরণ করেছিলেন তা থেকেই তাঁর উৎসাহের প্রবলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। লর্ড মিন্টোর পক্ষেও এটা কম গুণের কথা নয় যে, তিনিও কাল বিলম্ব না করে তাঁর উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশ যথাযথ পালন করেছিলেন। ভাইসরয়-এর একজিকিউটিভ কাউনসিলে ও প্রাদেশিক

একজিকিউটিভ কাউনসিলে একএক জন ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করা এবং লণ্ডনের ইণ্ডিয়া কাউনসিলে এক জন ভারতীয়-সদস্য লওয়া—এসব ছিল লর্ড মর্লেরই চিন্তাপ্রসূত। লর্ড রিপনের ন্যায় ভারতের বন্ধুরা ঘাড় নেড়েছিলেন। এমন কি, রাজা এডওয়ার্ডের ন্যায় সহানুভূতিশীল সম্রাটও কর্ম্মচারীদের চিরাচরিত ও ঐতিহ্যমণ্ডিত ধারণার বিরোধী এক অভিনব পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু লর্ড মর্লে ছিলেন তাঁর শাসননীতিতে দৃঢ়বিশ্বাসী। এই সংস্কারের বিষয়ে তিনি যেরূপ দৃঢ় মনোভাব দেখিয়েছিলেন এরূপ আর কখনো দেখান নি। এমন কি, ইংলণ্ডের রাজার সমর্থন থাকা সত্ত্বেও তিনি লর্ড কিচেনারকে ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত করার বিরুদ্ধে অকল্পনীয় কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন।

মর্লে-মিণ্টো-পরিকল্পনা নামে যে সমস্ত শাসন সংস্কার প্রচলন করা হ'ল তা' অপেক্ষাকৃত অগ্রগতি হিসাবেই ভারতে গ্রাহ্য হ'ল। কেউ ভুলেও মনে করেনি যে, বিশেষ কিছু একটা করা হয়েছে। এই সংস্কারের মধ্যে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল বেসরকারী সদস্যদিগকে কিছু কিছু ক্ষমতা দান। তাঁরা প্রশাসনিক বিষয়াদির উপর প্রস্তাব উত্থাপন করবার ক্ষমতা পেলেন। এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা না থাকলেও আনুষঙ্গিক হিসাবে এখন থেকে তাঁরা সরকারী ব্যবস্থা ও নীতির সমালোচনা করবার সুযোগ পেলেন। যদিও পার্ল্যামেণ্টের জননীস্বরূপা সেই মহান দেশে কি নগণ্যভাবে আরম্ভ করে' পার্ল্যামেণ্টারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তা' লর্ড মর্লে নিশ্চিতই অনুভব করেছিলেন, তথাপি তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে 'হাউস অব কমনস্'-এ বলেছিলেন যে, তিনি যা করেছেন তাকে কোন মতেই পার্ল্যামেণ্টারী প্রতিষ্ঠানের প্রবর্ত্তন বলা চলে না।

বরদান স্বরূপ এই অনুগ্রহের জন্য একদল প্রতিনিধি ভাইসরয়-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এমন কি, কোলকাতায় টাউন হলে একটি জনসভার আয়োজন করবার জন্যও প্রস্তাব এল। আমার হস্তক্ষেপের

ফলেই সে সভা হ'ল না। তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার এডওয়ার্ড বেকারকে আমি বললাম, সে সভায় যদি বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ও তাকে পরিবর্ত্তন করবার সুপারিশ করে' প্রস্তাব উত্থাপন করতে দেওয়া হয়, তবেই আমি তাতে যোগদান করতে পারি। সরকারী মহল থেকে যাঁরা এ সভা ডাকবার জন্য প্রেরণা যোগাচ্ছিলেন তাঁদের নিকট আমার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হ'ল না। এবং তার ফলে সভা করবার ইচ্ছা পরিত্যক্ত হ'ল।

১৯১০ সালে নূতন কাউনসিল গঠিত হ'ল। এবং তার প্রথম অধিবেশনেই ভাইসরয় ঘোষণা করলেন যে, ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশন অনুসারে যে-সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে আটক রাখা হয়েছে, এখন তাঁদের আর ধরে রাখবার কোন প্রয়োজন নেই। এবং যাঁদের সঙ্গে বিপ্লব আন্দোলনের যোগাযোগ নেই তাঁদের সকলকেই মুক্তি দেওয়া হবে। কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত ও অন্যদের নির্ব্বাসিত করা রাজনৈতিক দিক থেকে হয়েছিল এক প্রকাণ্ড ভুল। তাতে সুবিধা কিছুই হয় নি, বরং অনিষ্টই হয়েছে। কোন লোকই ভীত হয় নি, কেবল রাজনৈতিক অস্থিরতা ও উত্তেজনাই বৃদ্ধি পেয়েছে। তার পরেও নির্ব্বাসন কোন কোন ক্ষেত্রে হয়েছে। কিন্তু আগের মত আবেগ ও উদ্দীপনা তাতে সৃষ্টি হয় নি। ১৯০৯ সালের গরমের সময় ইণ্ডিয়া অফিসে লর্ড মর্লের সঙ্গে আমার এক সাক্ষাৎ হয়। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ও বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তকে মুক্তি দেবার জন্য আমি তখন তাঁকে বিশেষভাবে বলি। লর্ড মর্লে আমার কথাগুলি শুনলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। বাস্তবিক পক্ষে সময়টা তখন তার উপযুক্ত ছিল না। স্যার উইলিয়ম কার্জ্জন উইলী তখন সবে মাত্র নিহত হয়েছেন এবং রাজনৈতিক চক্রান্তে লিপ্ত বলে' সন্দেহযুক্ত সকলের বিরুদ্ধেই বিলেতে তখন এক প্রবল ঘৃণার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। শান্ত অবস্থার মধ্যে হ'লে আমার সফল হওয়ার কিছু সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু

১৯০৯ সালের জুলাই মাসে আমার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সে মাসের সেই দুর্দ্দান্ত হিংসাত্মক ঘটনার কথা আমি পরে বলব। তার আগে সংস্কারের পরে গঠিত কাউনসিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমার কতকগুলি ব্যক্তিগত বিষয়ের স্মৃতিচারণা কিছুক্ষণ করা যাক।

১৯০৯ সালের পার্ল্যামেন্টরী আইন অনুসারে রচিত রেগুলেশনে বলা হয়েছিল যে, কোন সরকারী কর্ম্মচারী যদি পদচ্যুত হয়ে থাকেন তা' হলে তিনি লেজিসলেটিভ কাউনসিলে নির্ব্বাচিত হবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। অর্থাৎ সরকারী কর্ম্ম থেকে পদচ্যুতি অযোগ্যতার একটি কারণ ব'লে বর্ণিত হ'ল। পূর্ব্বে প্রচলিত (১৮৯২ সালের আইন অনুসারে রচিত) রেগুলেশনে এরূপ কোন অযোগ্যতার উল্লেখ ছিল না, যদিও আমার মনে হয় এরূপ এক সর্ত্ত অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা হয়েছিল। এই যে নূতন রেগুলেশন, তদনুসারে স্থানীয় এবং ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে সদস্য হবার যোগ্যতা আমার ছিল না। তবে সরকারের প্রধান কর্ত্তা ইচ্ছা করলে এ অযোগ্যতা দূর করতে পারতেন। স্যার এডওয়ার্ড বেকার তখন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর। তিনি আমাকে বিশেষ ভাবেই জানতেন। বছরের পর বছর আমরা উভয়ে জনসেবায় সহকর্ম্মী হিসাবে কাজ করেছি এবং আমরা পরস্পরকে ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা করতেও শিখেছিলাম। কারও নিকট থেকে বিনা প্রস্তাবে নিজ থেকেই, আমার অযোগ্যতা দূর করে' সে মর্ম্মে যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল, তার একখানি নকল আমার নিকট তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এ অবস্থায় আমি কিছুটা অসুবিধায় পড়ে গেলাম। আমি বার বার বলেছিলাম যে, যতদিন বঙ্গভঙ্গ পরিবর্ত্তিত না হবে ততদিন আমি কিছুতেই নিজেকে কাউনসিলে নির্ব্বাচিত হতে দেব না। সংস্কার পরবর্ত্তী কাউনসিল সম্পর্কে যাঁরা বঙ্গদেশের জনমতের নায়ক ছিলেন আমি তাঁদের প্রায়ই বলতাম, "বঙ্গভঙ্গ পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত

আপনারা কিছুতেই হাত দেবেন না"। ১৯০৯ সালের ২৪শে জুন তারিখে ওয়েষ্ট মিনষ্টার প্যালেস হোটেলে স্যার উইলিয়ম ওয়েডাবারণ-এর প্রাতঃরাশের নিমন্ত্রণে স্যার চারলস্ ডিলক্, স্যার হেনরী কটন, মিঃ হিউম, মিঃ রামজে ম্যাকডোন্যাল্ড ও অন্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম,

"লর্ড মর্লে যদি তাঁর ডান হাতে সংস্কারের পরিকল্পনা আর বাম হাতে বঙ্গভঙ্গের পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব নিয়ে বঙ্গদেশের লোকদের ডেকে বলতেন, আপনারা এ দুটির যে কোন একটি বেছে নিন, আমার দেশবাসীরা সংস্কারের পরিকল্পনার জন্য ব্যস্ত না হয়ে সমস্বরে বঙ্গভঙ্গের পরিবর্ত্তনই চেয়ে নিত।"

বঙ্গভঙ্গ একটি "স্থায়ী ব্যবস্থা"—লর্ড মর্লের নিকট থেকে একথা শুনতে শুনতে আমাদের কান পচে গিয়েছিল। আমার সব সময় মনে হ'ত সংস্কার করে' কাউনসিলকে যে পুনর্গঠিত করা হয়েছিল, বঙ্গদেশের নেতৃবর্গ যদি তাতে যোগ না দিতেন, তবেই বঙ্গভঙ্গ করার এক ফলপ্রসূ প্রতিবাদ হ'ত। এভাবে নিজকে বঞ্চিত করবার নীতি যে সকলের নিকট গ্রাহ্য হ'ত না আমি তা' জানতাম। তবে আমার যা' ভাল লেগেছিল আমি তাই বেছে নিয়ে স্পষ্ট ভাষায় তা' বল্লে দিয়েছিলাম। আমার পক্ষে অন্তত কোন অজুহাত দেবার কারণ ছিল না। নিজ সুখ সুবিধার কথা চিন্তা না করে' আমি ত্যাগ স্বীকার করারই সিদ্ধান্ত করে' নিলাম। এভাবে যে অতীতেও আমি অনেক হিতকর কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলাম আমার দেশবাসীরা তা' জানেন। কিন্তু বর্ত্তমান কাজ ছিল আরও শক্ত। বর্ত্তমান আমন্ত্রণ এসেছিল এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে যিনি ছিলেন আমার বন্ধু, যাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল এবং যিনি সহৃদয়তা ও বন্ধুতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। এ অবস্থায় সে আমন্ত্রণ অস্বীকার করা আমার পক্ষে যে কত কষ্টসাধ্য ছিল তা' সহজেই অনুমেয়। শুধুমাত্র প্রাদেশিক গভর্ণর

হিসাবেই যদি তিনি আমাকে এ আমন্ত্রণ জানাতেন তবে আমার মনে তার কোনই প্রভাব পড়ত না। কিন্তু একাজ ছিল একজন বন্ধুর, যিনি চেয়েছিলেন যে, আমি এই সংস্কারের পরিকল্পনা সফল করতে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করি।

সম্প্রসারিত লেজিসলেটিভ কাউনসিলে আমি যদি স্যার এডওয়াড বেকারের সহকর্ম্মী হয়ে কাজ করতে সমর্থ হতাম তবে তা' হ'ত আমার পক্ষে ব্যক্তিগত আনন্দের কথা। কারণ সমস্ত কাজকর্ম্মে তিনি যে কিরূপ উন্নতমনা, তাঁর নিন্দাপরায়ণ সমালোচকদের প্রতিও ক্ষমাশীল এবং বন্ধুগণের প্রতি সদয় ও সহৃদয়তাপূর্ণ ছিলেন তা' আমি জানতাম।

এরূপ অবস্থায় পড়ে' আমি অসুবিধা বোধ করতে লাগলাম। অবশেষে বঙ্গদেশের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে ডেকে এক পরামর্শ সভা করে' তাঁদের নিকট থেকে জানবার চেষ্টা করতে লাগলাম এ পরিস্থিতিতে আমার কি করা কর্ত্তব্য। এই আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মিঃ এ রসুল, বাবু অন্নদাচরণ রায় এবং বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদারও ছিলেন। তাঁরা সকলে একমত হয়ে স্যার এডওয়ার্ড বেকারের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করবার জন্য আমাকে পরামর্শ দিলেন। তাঁরা বললেন, আমি যদি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে নির্ব্বাচনের জন্য দাঁড়াই, তা' হ'লে পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের উপর তাদের সমস্ত বিশ্বাস হারাবে এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পক্ষে তা' হবে এক অপূরণীয় ক্ষতি। পূর্ব্ববঙ্গের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ কাউনসিলে না দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং স্বভাবত তাঁরা আশা করবেন যে, আমরাও সে ভাবেই কাজ করব। আমি তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করলাম। বঙ্গভঙ্গের পরিবর্ত্তন সাধনই ছিল আমার নিকট জনস্বার্থে অন্য সমস্ত কিছুর চেয়ে অধিকতর আবশ্যক ও কাম্য।

এছাড়া আপত্তির আরও এক বিশেষ কারণ ছিল। যে সমস্ত রেগুলেশন গৃহীত হয়েছিল, তার ফলে নরমপন্থীদলের অনেক খ্যাতনামা

ব্যক্তি নির্ব্বাচনে দাঁড়াবার অযোগ্য হয়ে গিয়েছিলেন। আমার সহকর্ম্মীদের যোগ্যতায় যেখানে এরূপভাবে বাধা সৃষ্টি হয়েছে, সে ক্ষেত্রে তাদের বাদ দিয়ে কাউনসিলে প্রবেশ করা আমার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হতে পারে? নরমপন্থীদলের নেতাগণ পরামর্শ করে' এরূপ একটি সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। আমিও তাঁদের সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। আমি স্যার এডওয়ার্ড বেকারকে জানিয়ে দিলাম, তিনি যে এ বিষয়ে ও অন্য বহু বিষয়ে আমার কথা বিবেচনা করেছেন তজ্জন্য আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তবুও তিনি যে অযোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে আমার নাম অপসারিত করে' পুনর্গঠিত কাউনসিলে নির্ব্বাচনের জন্য আমার সুযোগ করে দিয়েছেন আমি সবিনয়ে তা' প্রত্যাখ্যান করছি। এ প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি যে, আমার এই প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও স্যার এডওয়ার্ড বেকার ও আমার মধ্যে যে হৃদ্যতা ছিল কোনদিন তা' অনুমাত্র হ্রাস হয়নি। তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাভিভূত হয়েছিলাম। তাঁর স্মৃতিকে আমি শ্রদ্ধা করি।

———

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

১৯০৯ সালে ইংলণ্ডে গমন

বলতে বলতে আমি বহুদূরে চলে' এসেছি। এবার ১৯০৯ সালে ফিরে যাই। ১৯০৯ সালের জুন মাসে লণ্ডনে ইম্পিরিয়্যাল প্রেস কনফারেন্সের অধিবেশন বসবে। তাতে যোগ দেবার জন্য বছরের প্রথম দিকে আমিও নিমন্ত্রণ পেলাম। সমগ্র সাম্রাজ্যের সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণ সেখানে মিলিত হবেন। য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলির কথা বাদ দিলে, ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে একমাত্র আমিই সেই কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্য নিমন্ত্রিত ছিলাম। তৎকালীন 'দি টাইমস' পত্রিকার কর্ম্মচারীদের অন্যতম ও 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকার প্রাক্তন কর্ম্মচারী মিঃ লোভেট ফ্রেজারই আমায় নিমন্ত্রণ পত্রখানি পাঠিয়ে ছিলেন। এতে আমার প্রতি সম্মানই প্রদর্শন করা হয়েছিল। এবং আমিও তাতে গর্ব বোধ করছিলাম। কিন্তু আমার কতকগুলি অসুবিধা ছিল। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মাবলী অনুসারে রিপন কলেজের পরিচালনা ব্যবস্থাকে গঠিত করা হচ্ছিল। আইন বিভাগের স্বীকৃতি নিয়ে কলেজটি সবে মাত্র এক সঙ্কট কাটিয়ে উঠেছে। এমন দিন গেছে যখন মনে হয়েছে বঙ্গদেশের সর্ব্ববৃহৎ এই আইন বিভাগটির স্বীকৃতি আর রক্ষা করা যাবে না। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি যে, স্যার এডওয়ার্ড বেকারের দৃঢ় হস্তক্ষেপ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা মিটাবার জন্য কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের তৎপরতার ফলেই সে সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়েছে। গোটা ছয়েক ব্যতীত বঙ্গদেশের সমস্ত আইন কলেজেগুলিরও অনুমোদন তখন প্রত্যাহার করা হয়েছিল। কিন্তু রিপন কলেজের আইন বিভাগটিকে কোন প্রকারেই ক্ষুণ্ণ করা হ'ল না।

তা সত্ত্বেও তখনো পর্য্যন্ত আমরা সব বিপদ কাটিয়ে উঠতে

পারি নি। এ অবস্থায় আমি পরামর্শের জন্য স্যার এডওয়ার্ড বেকারের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে লণ্ডনে সাংবাদিকদের কনফারেন্সে যাবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবার পরামর্শ দিয়ে বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে কলেজের যাতে কোন ক্ষতি না হ'তে পারে সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য্য। তাঁর তখন অপ্রতিহত ক্ষমতা। তিনিও আমাকে অনুরূপ এক আশ্বাস দিলেন। এসব পেয়ে বিলেত রওনা হবার পূর্ব্বে আমি কলেজের নিরাপত্তা সম্পর্কে আশ্বস্ত বোধ করলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের এক সভায় উপস্থিত থাকবার জন্য আমি নিমন্ত্রিত হলাম। সিণ্ডিকেটের-সদস্যদের সঙ্গে কলেজের সংগঠন সম্পর্কে আলোচনার পর সব কিছুই সন্তোষজনক ভাবে মিটমাট হয়ে গেল। ভারত থেকে অনুপস্থিত থাকা কালে যে সমস্ত বিষয় আমার উদ্বেগের কারণ হ'ত সে সব থেকে এরূপে মুক্তি পেয়ে মে মাসের মাঝামাঝি আমি বিলেত যাত্রা করতে সমর্থ হলাম।

আমার ভাগ্য আমাকে মস্ত এক পরিব্রাজক করে তুলেছিল। কিন্তু বাড়ী ছেড়ে দূরদেশে যেতে আমার তেমন উৎসাহ হ'ত না। বাড়ীর আরাম ও পরিবেশ আমাকে সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ মোহিত করে' রাখত। ১৮৯৭ সালে ওয়েলবি কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দেবার জন্য বিলেতে গিয়েই আমি লর্ড ওয়েলবিকে অনুরোধ করেছিলাম তিনি যেন যথা সম্ভব সত্বর আমাকে ছেড়ে দেন। তিনি সানুগ্রহে আমার সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। তার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মহারাণীর হীরক জয়ন্তী উৎসব পালিত হ'বে। আমার সহকর্ম্মিগণ সেজন্য থেকে গেলেন। কিন্তু কালবিলম্ব না করে' আমি ভারতে ফিরে এসেছিলাম। জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বরের প্রতি কোনদিন আমার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। আমি বাড়ী ফিরে' এসে আমার কাজকর্ম্মে মন দিতে পেরে' আরাম বোধ করেছিলাম।

১৫ই মে বাড়ী থেকে রওনা হয়ে ৩রা জুন লণ্ডনে পৌছলাম। ট্রেন যখন ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করল তখন প্রায় মধ্য রাত্রি। আমার শ্রদ্ধেয় বহুদিনের বন্ধু মিঃ এইচ. ই. এ. কটন আমাকে ওয়েলডর্ফ হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য একখানি মোটর গাড়ী নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আমার জন্য প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা করছিলেন। অন্যান্য সাংবাদিকগণও সেই হোটেলে ছিলেন। আমাকে ঠিক মত হোটেলে পৌছিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

মিঃ কটনের সম্পর্কে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে তিনি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সভাপতি। এখনকার পরিস্থিতিতে তাঁর এ কর্ত্তব্য অত্যন্ত আয়াসসাধ্য ও উদ্বেগজনক। তবে যেরূপ দক্ষতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি তাঁর কর্ম্ম সম্পাদন করে' যাচ্ছেন তজ্জন্য প্রত্যেকেই তাঁর প্রশংসা করে। ইংরেজদের জনজীবন এবং হাউস অব্ কমনস্-এর সদস্য হিসাবে সে সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও দক্ষতা তাঁর বর্ত্তমান শ্রমসাধ্য কাজের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের প্রাক্তন সভাপতি নবাব স্যার সামসুল হুদার মৃত্যুর পর সে পদের জন্য যখন মিঃ কটনের নাম প্রস্তাব করা হয় আমি সে প্রস্তাব সমর্থন করেছিলাম। তাঁর পিতা ও আমার মধ্যে গত চল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব। আমার জনসেবাময় কর্ম্মজীবনে তাঁর নিকট থেকে আমি বহু সুপরামর্শ পেয়েছি। গত শতাব্দীর নবম দশকের প্রথমের দিকে তিনি ভারত থেকে অবসর গ্রহণ করে' চলে যাওয়ার পর জনসাধারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহে আমাদের মধ্যে পত্র বিনিময় হ'ত। আমি পৌছবার পর দিন সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসল। "ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার সত্ত্বাধিকারী অশীতি বৎসর বয়স্ক অথচ যৌবন সুলভ উৎসাহ উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ লর্ড ব্যারণহ্যাম এবং তৎকালীন ইংরেজদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বাগ্মী লর্ড রোজব্যারি সাংবাদিকদের সম্মানে আয়োজিত এক ভোজসভায় যথোপযুক্ত

বক্তৃতা করে' আমাদের সকলকে অভ্যর্থনা জানালেন। আমি "ডেইলি নিউজ" পত্রিকার মিঃ নেভিনসন ও মিঃ গারডিনারের টেবিলে বসেছিলাম। অনুষ্ঠানটি মোটামুটি ভাবে খুব উপভোগ্য হয়েছিল।

আমাদের আলোচনা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়েছিল। ৭ই জুন সম্মেলনের প্রথম সভা বসল এবং টেলিগ্রামে সংবাদ পাঠাবার শুল্ক কমানোর বিষয়ে আলাপ আলোচনা হ'ল। টেলিগ্রাফে যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা বর্দ্ধিত করা ও ব্যয় হ্রাস করার সুপারিশযুক্ত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে' একটি কমিটি গঠন করা হ'ল। কমিটির সদস্যদের নাম প্রস্তাব করেছিলেন ডক্টর (বর্ত্তমানে স্যার) ষ্ট্যানলি রীড্। নামগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল। প্রস্তাবটি সমর্থন করে' আমি বলেছিলাম যে, ভারতের বাস্তবিক অবস্থা সম্পর্কে, বিশেষতঃ যে-সমস্ত নূতন নূতন অবস্থার উদ্ভব হচ্ছিল সে সম্পর্কে খবরাদি বিলম্ব না করে' বৃটিশ জনসাধারণের গোচরে আনা উচিত। এবং টেলিগ্রাফে সে সংবাদ পাঠাবার ব্যয় হ্রাস হ'লে সে উদ্দেশ্য সফল করা সহজতর হ'বে।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় ছিল, সংবাদপত্র ও সাম্রাজ্য। নৌ-সেনা বিভাগের প্রথম লর্ড মিঃ মেক-কেন্না এদিন সভাপতিত্ব করেছিলেন। প্রধানত নৌ-রক্ষাকে কেন্দ্র করেই এদিনের অধিকাংশ বিতর্ক হয়েছিল। সেদিন কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটির একটি সভা থাকায় আমি সেখানে গিয়ে যোগ দেবার মনস্থ করলাম। এমন সময় বিনা কারণে এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রায় যেন আমাকেই উদ্দেশ করে লর্ড ক্রোমার বললেন, ভারতে যে সন্ত্রাসবাদ দেখা দিয়েছে, ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি কি তাদের দায়িত্ব জ্ঞানহীন প্রচার কার্য্যের দ্বারা তার সহায়তা করছে না? গভীর দুঃখ ও বিস্ময়ের সঙ্গে আমি তাঁর কথাগুলি শুনলাম। আমার মনে হ'ল, কথাগুলি অত্যন্ত অবান্তর। কিন্তু তখন আর পালান যায় না। কথাগুলি ত বাস্তবে প্রায় ব্যক্তিগতভাবে আমাকেই বলা হয়েছে। কারণ তখন ভারতীয়

সংবাদপত্রগুলির একমাত্র প্রতিনিধি আমি। আমার চুপ করে থাকার অর্থ হ'বে আমাদের সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা' সত্য বলে' মেনে নেওয়া। আমি স্থির করলাম এর একটা জবাব আমি দেব। একটু চিন্তা করে' নিয়ে চেয়ারম্যানের নিকট একখানি পত্র পাঠিয়ে আমি জানিয়ে দিলাম যে এ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে ইচ্ছা করি। তৎক্ষণাৎ আমাকে ডাকা হ'ল। আমি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করলাম। এখানে তার সবটাই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:

"এভাবে মাঝখানে এসে বাধা দিতে হচ্ছে বলে' আমি বিশেষ দুঃখিত। এই সম্মেলনে বিবেচ্য বিষয়াদির পরিপ্রেক্ষিতে কথাটি সম্পূর্ণ অবান্তর বলেই আমি মনে করি। তবুও লর্ড ক্রোমার আমাদের আমন্ত্রণ (আমি একে অভিযোগ বলব না) জানিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, বঙ্গদেশে সাম্প্রতিককালে যে সমস্ত সন্ত্রাসমূলক কার্য্যাদি সংঘটিত হচ্ছে সে সমস্ত বাস্তবিক পক্ষে এক শ্রেণীর ভারতীয় সংবাদপত্রের দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রচারের ফল কি না। তাঁর সেই প্রশ্নে আমার একমাত্র উত্তর হ'ল, এক সুদৃঢ়, অকপট, দ্ব্যর্থহীন—"না" (হর্ষধ্বনি; একটি কণ্ঠে "চমৎকার")। ভারতীয়দের সংবাদপত্রে যা কিছুই বলা হয়েছে তার সমস্ত কিছুকেই সমর্থন করবার জন্য আমি এখানে আসি নি। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে যে সমস্ত সাংবাদিক এখানে উপস্থিত আছেন আমি সবিনয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা করব সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে যা' কিছু প্রকাশ হয় তাঁরাও কি তার সব কিছুই সমর্থন করেন? আমরা কি বলতে পারি যে, আমাদের কখনো ভুল হয় না? না, তা' পারি না। আমাদের ভুল হ'তে পারে। সুতরাং বিনা দ্বিধায় আমি বলব যে, কখনো-কখনো ভারতের কোন কোন সংবাদপত্রে যে সমস্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন বিষয় প্রকাশ পেয়েছে আমি তাদের সমর্থন করি না। কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে, এজাতীয় সংবাদপত্রের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য (হর্ষধ্বনি)। তাদের প্রচারের

ক্ষেত্র নিতান্ত সীমিত এবং জনমতের উপর তাদের প্রভাব নেই বললেও চলে। আমাকে আপনারা ভুল বুঝবেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গদেশে যে সমস্ত সন্ত্রাসমূলক ঘটনা ঘটেছে সে সমস্ত কাজ ন্যায্য হয়েছে বলে প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে দাঁড়াই নি। আমি যখন বলি যে, যে সমস্ত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে তজ্জন্য আমরা গভীরভাবে দুঃখিত, তখন আমি বঙ্গদেশের ও ভারতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের অভিমতই প্রকাশ করছি (হর্ষধ্বনি)। আমার ভারতীয় সহকর্ম্মিগণ এবং আমি নিজে আমাদের পত্রিকা স্তম্ভে এ সমস্ত কাজের তীব্র নিন্দা করতে পশ্চাৎপদ হই নি। যে ধর্ম্মবিশ্বাস আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতভাবে সর্ব্বদা অনুরঞ্জিত করে, ঐ সমস্ত হিংসাত্মক কাজ তার সম্পূর্ণ বিরোধী। আপনাদের মনে কোন কষ্ট না দিয়ে আমি বলব এই সন্ত্রাসবাদ প্রাচ্যের সৃষ্টি নয়, এটি পাশ্চাত্যেরই সৃষ্টি। এই বিষবৃক্ষের চারা পাশ্চাত্যজগত থেকে নিয়েই প্রাচ্যে রোপন করা হয়েছে। আমরা আশা করছি লর্ড মর্লের উন্নতিমূলক ও বিরোধ নিবারক চেষ্টার ফলে শীঘ্রই আমাদের দেশ থেকে তা' সমূলে উৎপাটিত হ'বে। যে সমস্ত কারণে এরূপ এক দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার মধ্যে প্রবেশ করতে আমার ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই সমাবেশ যে রাজনৈতিক সম্পর্কমুক্ত সে কথাও আমি ভুলতে পারি না। সুতরাং আমাদের প্রাচ্যরীতি অনুযায়ী আত্মসংযমের দ্বারা আমার সে ইচ্ছাকে আমি দমন করছি (বিপুল হর্ষধ্বনি)। আমরা মনে করি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আমাদের দেশে বৃটিশ শাসনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বরদানতুল্য। কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই যে তা' করা হয়েছে তা' নয়, জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদির প্রচারের যন্ত্র হিসাবেও তার আবশ্যকতা রয়েছে। যে ভাবেই হোক, ভারতীয় সংবাদপত্রের মুক্তিকামিগণ অন্ততঃ সেরূপ আশা আকাঙ্খাই করেছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয় নিয়ে এক প্রতিনিধিমণ্ডলী লর্ড মেটকাফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে, তাদের বক্তব্যের

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমরা ভারতে কেবল আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে, কর আদায় করতে এবং ঘাটতি পূরণ করতে আসি নি। আমাদের উদ্দেশ্য তার চেয়ে অনেক উচ্চ ও মহৎ। পাশ্চাত্যের জ্ঞান, কৃষ্টি ও সভ্যতা আমরা প্রাচ্যে ঢেলে দিয়ে যাব।" আমার দেশবাসীদের পক্ষ থেকে আমি দাবী করতে পারি যে, তাঁরা এই উপহার সরকারের কল্যাণে ও জনকল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। আমি প্রার্থনা করি ইংলণ্ড ও ভারতের এই সুনাম যেন দীর্ঘস্থায়ী হয় (হর্ষধ্বনি)।"

আমার এই বক্তৃতার ফল কি হয়েছিল সে কথা আমার বলে লাভ নেই। আমি যখন বলেছিলাম রাজনৈতিক বাদানুবাদের মধ্যে প্রবেশ না করে' আমি প্রাচ্যজনোচিত আত্মসংযমের চেষ্টা করব, বিপুল হর্ষধ্বনিতে তখন সমস্ত সভাকক্ষ যেন ভেঙ্গে পড়েছিল। ক্যানাডা দেশের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক স্যার হিউজ গ্রেহাম সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর মতে আমার বক্তৃতাটি ছিল একটি "বিতর্ক বক্তৃতার আদর্শ স্বরূপ"। সাংবাদিক সম্মেলনের অপর এক সদস্য মন্তব্য করেছিলেন, "মিঃ ব্যানার্জী লর্ড ক্রোমারের নাক ঘষে দিয়েছেন"। প্রত্যেকেই মনে করেছিলেন যে, এই প্রত্যুত্তরের একটা প্রয়োজন ছিল। আমার পক্ষে আনন্দের বিষয় এই ছিল যে, আমি সাম্রাজ্যের সাংবাদিকদের সেই মহা সমাবেশে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিকে সাফল্যের সহিত সমর্থন করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

প্রতিদিন আমাদের কাজকর্ম্ম সংক্রান্ত সভা বসত এবং তার পরিপূরক হিসাবে ভোজেরও ব্যবস্থা হ'ত। চাকার মত অবিরাম কাজ চলত, তার মধ্যে আবার আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল। কিছু জাহির করা ইংরেজ জাতির স্বভাব বিরুদ্ধ। তবে তারা বাস্তবিকই অতিথি পরায়ণ এবং তাদের অতিথির প্রতি তাদের হৃদ্যতা প্রকাশের এমনই রীতি যে, তাকে ভুল বুঝবার কোনই উপায় থাকে না। শেফিল্ড

ছুরি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। আমরা যখন সেখানে গেলাম, তাঁরা আমাদের প্রত্যেককে এক একখানা করে' ছুরি উপহার দিয়েছিলেন। ডেম্পষ্টার-এ গিয়ে আমরা মোটর গাড়ীর কারখানা দেখলাম। তারপর তার স্মারক হিসাবে আমাদের প্রত্যেককে তাঁরা একএক খানি সুন্দর পকেটবই দিয়েছিলেন। যখন সান্ধ্যভোজ বা মধ্যাহ্নভোজে বসতাম আমাদের মধ্যে অবাধে অন্তরঙ্গতার সঙ্গে এবং খোলাখুলি ভাবে আলাপ আলোচনা হ'ত। অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্‌ সোলস্‌ কলেজে একবার মধ্যাহ্নভোজের জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ করা হয়। সেই ভোজ-সভায় সভাপতি ছিলেন লর্ড কার্জ্জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার রেজিয়াস-প্রফেসর অধ্যাপক গিলবার্ট মারে আমার ঠিক পাশে বসেছিলেন। তিনি লর্ড কার্জ্জন সম্পর্কে বলেছিলেন, "এই যে একজন লোক দেখছেন, ইনি নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়কেও ভাষার অলঙ্কারে অপরূপ করে' তুলতে পারেন"।

বার বছর পরে বিলেতে এসে আমি নানা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলাম। একটি বিষয় যা' আমাকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করেছিল, তা' হ'ল এই যে, লোকে উত্তরোত্তর মদ্যপানাদি বর্জ্জন করছে এবং নিরামিষ ভোজনে আগ্রহী হয়ে উঠছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই ছিল যে, প্রত্যেক সামাজিক আন্দোলনে যেমন হয়, এক্ষেত্রেও তেমনি মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপানের উপরও তার পরোক্ষ প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছিল। যাক, আমি আবার আমার বিবরণ নিয়ে এগিয়ে যাই।

সম্মেলনের চতুর্থ দিনের অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন লর্ড মর্লে। সেদিনের আলোচ্য বিষয় ছিল "সাংবাদিকতা-সাহিত্য।" সে সময় আমি ভাষণ দিয়েছিলাম। মিঃ টি. পি. ও'কোনর, এম. পি., আমার পরে বক্তৃতা করতে উঠে আমার খুব প্রশংসা করেছিলেন। সে সম্মেলনে বোধহয় লর্ড মর্লেই বলেছিলেন, সাহিত্য হ'ল একটি চারুকলা আর সাংবাদিকতা একটি শিল্প। আমাদিগকে

অলডারশটে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেখানে আমরা চোদ্দ হাজার সেনার এক বাহিনী পরিদর্শন করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। লর্ড হলডেইন ছিলেন তখন সমরসচিব। প্রেসপ্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করবার জন্য তিনি লণ্ডন থেকে সেখানে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আমার সংক্ষিপ্ত আলাপের মধ্যে আমি বঙ্গভঙ্গ ও তার ফলে বঙ্গদেশের লোকের মনে যে দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল তার উল্লেখ করেছিলাম। তিনি আমার কথা শুনে এই বলে শেষ করলেন, "মর্লে এটাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন না কেন?" বাস্তবিক পক্ষে আমি তখন বিলেতের যে সমস্ত খ্যাতিমান রাজনৈতিক নেতার সংস্পর্শে এসেছিলাম তাঁদের প্রত্যেককেই এবিষয়ে অনুরূপ ধারণা পোষণ করতে দেখেছি।

আমি যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন এ ধারনা নিয়ে এলাম যে, যে জননেতারই কিছুমাত্র প্রভাব ওদেশে আছে তিনিই বঙ্গভঙ্গকে সুনজরে দেখেন না। তাঁরা সকলেই ছিলেন তার বিরোধী। এবং আমরা যদি আমাদের উদ্দেশ্যে অবিচল থাকতে পারি বঙ্গভঙ্গ কিছুতেই টিকতে পারবে না। লর্ড মর্লের বিশিষ্ট বন্ধু লর্ড কোর্টনীর সঙ্গে ও মিঃ ম্যাক কারনেস-এর সঙ্গে গিয়ে মিঃ উইনষ্টন চার্চিলের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি ছিলেন ভারতের এক একনিষ্ঠ ও সন্দেহাতীত বন্ধু। এক চরম সঙ্কটের মুহূর্তে তিনি যেভাবে ভারতের সেবা করেছিলেন আমরা যথোচিত ভাবে তা' স্বীকার করি নি। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে এই ধারণা হয়েছিল যে, আমাদের অসন্তোষের যে এক বিশেষ কারণ ছিল সে বিষয়ে তাঁদের কোনই সন্দেহ ছিল না। আমাকে তাঁরা কথা দিয়েছিলেন যে, তাঁরা লর্ড মর্লের সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলবেন। ম্যানচেষ্টারে গিয়ে "ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ সি. পি. স্কটের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনিও আমাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখালেন। ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের স্তম্ভে কিছু লিখবার

জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম। কিন্তু তাতে তাঁর একটু অসুবিধা ছিল। কারণ লর্ড মর্লে ছিলেন উদারপন্থিদলের একজন নেতা। সর্ব্বোপরি তিনি ছিলেন ল্যাংক্যাশায়ারের বাসিন্দা।

লণ্ডনে আমাদের কাজ সমাপ্ত করে ১৪ই জুন থেকে আমরা প্রদেশ ভ্রমণ আরম্ভ করলাম। এক বিশেষ ট্রেণে ক'রে আমরা কোভেনট্রিতে গেলাম এবং সেখানে যে মোটরের কারখানা দেখতে গিয়েছিলাম সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সেখান থেকে মোটর যোগে আমরা ওয়ারউইক্ দুর্গে গেলাম। ওয়ারউইকের আর্ল্ ও কাউন্টেস আমাদের এক মধ্যাহ্ন-ভোজে আপ্যায়িত করলেন। এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়ে কাউন্টেস আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর সেই বক্তৃতার মধ্যে ছিল, যিনি অপর এক ব্যক্তিকে রাজপদে বসাবার ক্ষমতা অর্জ্জন করেছিলেন তাঁর মহান নাম ও খ্যাতির সঙ্গে যুক্ত রোমাঞ্চকর ঐতিহ্য এবং এই প্রাচীন দুর্গের উদ্দীপনার ঝনৎকার। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, মধ্যযুগের নানা অস্ত্রসস্ত্র ও সামরিকপ্রতীকশোভিত যেস্থানে বসে আমরা আহার করছিলাম সেই হলে বসেই একদিন ব্যারণেরা পরামর্শ করতেন এবং অপরকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান বীরের নেতৃত্বে সেখান থেকেই তাঁরা তাঁদের সামরিক অভিযানে বেড়িয়ে পড়তেন। নিদাঘ সায়াহ্নের এই মৃত্যুবৎ স্তব্ধতার মধ্যে রাঁচীর এক সহরতলিতে আমার শান্তিপূর্ণ কুটিরে বসে যখন আমি এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করছি তখন সুস্পষ্ট ভাবে আমার মনে পড়ছে, এক রমণীর শুধুমাত্র নারীকণ্ঠের চেয়ে অনেক অধিক সুরেলা কণ্ঠে বারংবার ওয়ারউইক পরিবারের অতীত যশোকীর্ত্তনের কথা, যার প্রকাশভঙ্গিতে শক্তি বা মর্য্যাদার দিক থেকে যাচ্ঞা করবার মত অবশিষ্ট আর কিছুই ছিল না। তাঁর সেই বক্তৃতা আমার অন্তরে মধ্যযুগ, তার যুদ্ধ ও সংঘর্ষের যে রেখা অঙ্কিত করে দিয়েছিল, ঊর্দ্ধে দুর্গের সেই চিত্রপ্রায় অবস্থান, নিয়ে তরুছায়াবেষ্টিত বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল ও

অরণ্যতুল্য রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সেই রেখাকে আরও গভীর করে দিয়েছিল।

ওয়ারউইক দুর্গ থেকে মোটরে করে' আমরা অকসফোর্ডে গেলাম। যাবার পথে মহাকবি সেকস্‌পিয়রের বাড়ীর সামনে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড-অন্-এভন্-এ নামলাম। আমরা সকলে সেই কবিতীর্থে প্রবেশ করলাম। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭১ সালে আমি যখন লণ্ডনে ছাত্র ছিলাম তখন সেকস্‌পিয়রের বাড়ী, স্মৃতিমন্দির, যে ঘরে কবির জন্ম হয়েছিল সেই ঘর এবং ডিকেন্‌স্ ও বায়রণের লিপিগুলি দেখেছিলাম। এখন একমাত্র কবির একখানি নূতন তৈলচিত্র ভিন্ন নূতন আর কিছু দেখবার মত আমার ছিল না। সেই নাট্যকার মহাকবির জন্মস্থানে এখন একটি সেকস্‌পিয়র থিয়েটার নির্ম্মিত হয়েছে। চল্লিশ বছর আগে এটিও ছিল না। স্থানীয় মেয়র তাঁর আনুষ্ঠানিক পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে ঘরের মধ্যে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। আমাদের মধ্য থেকে জনৈক প্রতিনিধি তার একটি যথোচিত উত্তর দিলেন। গৃহসংলগ্ন এক পুষ্পোদ্যানে অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং দশমিনিটের মধ্যেই তা' সম্পন্ন হয়।

তাদের পরলোকগত কৃতী ব্যক্তিদের স্মৃতিরপ্রতি ইংরেজজাতির কি মনোযোগ! সেকস্‌পিয়র আজ যেরূপ বিরাটত্ব ও অমরত্ব লাভ করেছেন জীবদ্দশায় তিনি সেরূপ কিছু ছিলেন না। যোগী হলেও ত নিজ গাঁয়ে সে ভিখ্ পায় না বলে একটি কথা প্রচলিত আছে। অথচ কি শ্রদ্ধা ও সতর্কতার সহিত তাঁর সমকালীনেরা সেকস্‌পিয়রের স্মৃতিকে সযত্নে তখন রক্ষা করেছিলেন। আর এসব বিষয়ে ভারতে তার কি ব্যতিক্রম! আমরা মাটি ও পাথরের দেবতাকে পূজা করি এই বিশ্বাসে যে, তার মধ্যে ভগবানের অধিষ্ঠান হয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত জীবন্ত দেবতা আমাদের সঙ্গে ও আমাদের মধ্যে ঘুরে বেড়ান, দেশের জন্য কাজ করেন, বিপদের সম্মুখে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যান, এমন কি, মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ

করেন, তাঁরা আমাদের হিসাবের মধ্যে কোথাও আসেন না। আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমরা তাঁদের উপর উৎপীড়ন করি এবং নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্য দেশের ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে থাকি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মহাত্মা রামমোহন রায়কে সমাজচ্যুত করেছিলেন। কেবলমাত্র মৃত্যুর হাত যখন সমস্ত ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও তিক্ততা মুছে দিল এবং আমরা যখন রাজাকে ও তাঁর কীর্ত্তিকে রাগবিবর্জ্জিত হয়ে শান্তভাবে যুক্তিদিয়ে বিচার করে' তাঁর কালজয়ী স্থায়িত্ব অনুভব করতে পারলাম, তখনই তাঁর মূল্যায়ন করতে পেরে তৎপরতার সঙ্গে তাঁর জন্মস্থানে তাঁর সম্মানে স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করলাম। যে জাতি তার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে সম্মান করতে জানে না, সে জাতি তাঁদের অনুপযুক্ত এবং শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের আবির্ভাব তাদের মধ্যে হ'তে পারে না।

সেকস্‌পিয়রের জন্মস্থান থেকে আমরা দ্রুত অকসফোর্ডে চলে এলাম। গোধূলির ম্লান আলো তখন চারদিকে ছেয়ে গেছে। সারাদেশ, প্রকৃতিদেবী নিজে এবং মনুষ্যগণ তখন রাত্রির বিশ্রামকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আয়োজনে ব্যস্ত। সমস্তদিন অনেক আনন্দ উপভোগ করা সত্ত্বেও তখন আমরাও ক্লান্তি বোধ করছিলাম। আমি যখন হোটেলে আমার ঘরে প্রবেশ করলাম তখন আমার মনে হ'তে লাগল, এখন এই বিশ্রাম নেবার উপযুক্ত যথেষ্ট কাজ সারাদিন আমি করেছি। আমাদের পরবর্ত্তীদিনের কর্ম্মসূচী ছিল একেবারে ধরাবাঁধা। সবই পূর্ব্বনির্দ্ধারিত। আমাদের দেখাশুনা করবার ভার ছিল স্যার হ্যারী বৃটেনের উপর। আমি তাঁর মত একজন সুদক্ষ ও শক্তিমান সংগঠক খুব কমই দেখেছি। তিনিই ছিলেন আমাদের পরিচালক, উপদেষ্টা ও বন্ধু। দিনরাত্রি অবিশ্রাম কাজ করা সত্ত্বেও তাঁর প্রশান্ত মুখে কেউ এতটুকু উদ্বিগ্নতা বা ক্লান্তির চিহ্ন দেখতে পেত না। সম্মেলনের ব্যবস্থাদি তিনিই করেছিলেন। তা' ছিল তাঁরই চিন্তাপ্রসূত। তিনিই

তাকে সফলতার সঙ্গে সম্পাদনও করেছিলেন। সমস্ত কর্ম্মসূচীর পরিকল্পনা করে' সদাপ্রফুল্ল মুখে এমন বিচক্ষণতা ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে তা' সম্পন্ন করেছিলেন যে, সমগ্র সাম্রাজ্যের সাংবাদিকদের এই ঐতিহাসিক সমাবেশে তিনি সর্ব্বাধিক আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলেন। তারপর থেকে বহু বছর কেটে গেছে। তবুও তাঁর সদয় ব্যবহার ও সেবাপরায়ণতার কথা এখনও সম্মেলনের সদস্যদের মনে অম্লান হয়ে রয়েছে!

কর্ম্মসূচী আমাদের স্থিরই ছিল, তা' আগেই বলেছি। আমরা তদনুযায়ী অগ্রসর হ'তে লাগলাম। দিনের কাজ আরম্ভ করলাম আমাদের হোটেলের প্রায় বিপরীত দিকে নিউকলেজটি দেখতে গিয়ে। আমরা কলেজের বাড়ী, লেক্‌চার রুম, কমন রুম, স্মোকিং রুম, এমন কি, সুরাগারটি পর্য্যন্ত একএক করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করলাম। আদর্শবাদিশিক্ষায় শিক্ষিত আমার ন্যায় এক শিক্ষাবিদের নিকট কলেজগৃহে ধূমপানের ঘর ও সুরাগারের ব্যবস্থা প্রচণ্ড পীড়াদায়ক হয়েছিল। কোন ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরণের কোন ব্যবস্থা থাকে না। আমাদের ছাত্রেরা ধূমপান করবে, এটি আমরা চাই না। আমরা তাতে আপত্তি করি। আর মদ্যপান, এমন কি, সামান্য পরিমাণে হলেও, আমরা আন্তরিক ঘৃণা করি। এ সবকে দুর্নীতি নাও বলা যেতে পারে। হয়ত আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যৌক্তিকতার কিঞ্চিৎ অভাব আছে। তবুও আমাদের শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণার মূলই হ'ল প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি। মানুষের দৈনন্দিন কাজের প্রতিও তখন তাদের ছিল এক বিরাগ ও স্বাত্ত্বিকভাব। দারিদ্র্য, পবিত্রতা, সাংসারিক সুখবিলাসের প্রতি ঘৃণা—এসবই ছিল প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ভিত্তি। আর তদনুসারেই গড়ে উঠেছে ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতা। যদিও বিজাতীয় সভ্যতার দোষত্রুটিগুলির অনুকরণ করতে গিয়ে কোন কোন ব্রাহ্মণও ধূমপান ও মদ্যপান করে' থাকেন, তবুও এদুটি কাজ ব্রাহ্মণদের স্বভাববিরুদ্ধ।

জীবনে আমি ধূমপানে আসক্ত হইনি। আমার পরলোকগত অমায়িকবন্ধু মিঃ টারণবুল তাঁর সঙ্গে ধূমপান করবার জন্য আমাকে প্রায়ই অনুরোধ করতেন। আমি তাঁর সে অনুরোধও কোনদিন রক্ষা করতে পারি নি। অবশেষে একবার তিনি এক ছলনার আশ্রয় নিলেন। প্যারি(স)-এর এক প্রদর্শনী থেকে তিনি অতিশয় সুন্দর একটি সিগারেট হোলডার ক্রয় করে আমাকে উপহার দিলেন। এরূপ এক সদয় ও ভদ্র বন্ধুর নিকট থেকে এই উপহার প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই চমৎকার সিগারেট হোলডারটি পেয়ে আমি ধূমপান আরম্ভ করলাম। কিন্তু বেশীদিন তা' টিকল না। মাত্র চারদিন আমি ধূমপান করেছিলাম। তারপর আমার পক্ষে তা' যেন অসহ্য হয়ে উঠল। আমার শরীরের প্রায় প্রতি লোমকূপ থেকে আমি সিগারেটের দুর্গন্ধ পেতে লাগলাম। চিগারেটের আধারটি আমি তখন সরিয়ে রাখলাম। তারপরে আর কোনদিন তাতে আমি হাত দিই নি। আমার এক ভৃত্যের ছোটখাট চুরি করার স্বভাব ছিল। সে একদিন আমার সিগারেটের আধারটি চুরি করে এ বিপদ থেকে আমায় মুক্ত করল।

অকস্‌ফোর্ডে অল্‌ সোলস্‌ কলেজের গ্রন্থাগারে আমাদের জন্য এক মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য ছিলেন লর্ড কার্জ্জন। কলেজের বাগিচায় তিনি আমাদের অভ্যর্থনা করেন। ভোজসভায় তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে' বক্তৃতা করেছিলেন। তবে সে অনুষ্ঠান বা বক্তৃতায় বিশেষরূপে লক্ষ্য করার মত কিছু ছিল না। অকস্‌ফোর্ড থেকে আমরা গেলাম সেফিল্ড। স্থানীয় মেয়র সেখানে আমাদের আপ্যায়ন করলেন এবং বিশ্ববিখ্যাত অস্ত্রনির্ম্মাণকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ভাইকার্স্ ম্যাকসিম য়্যাণ্ড কোম্পানীটি দেখাতে নিয়ে গেলেন। আমার পক্ষে এবং সম্ভবত অন্য প্রতিনিধিদের পক্ষেও তা' ছিল এক আশ্চর্য্যজনক দ্রষ্টব্য। যতই দেখলাম ততই অবাক হয়ে

গেলাম। সেফিল্ডে প্রস্তাব এল আমি কিছু বলি। আমি আপত্তি করলাম। ম্যানচেষ্টারে কিছু বলবার উদ্দেশ্যে আমি তখন নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করলাম। আমার মনে হয় আমার এ সিদ্ধান্ত নির্ভুলই হয়েছিল।

১৮ই জুন তারিখে আমরা গেলাম ম্যানচেষ্টার। আমার হোটেলের দরজায় মিঃ ছবের নেতৃত্বে আমার ভারতীয় বন্ধুগণ আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মিঃ ছবের বাড়ী ছিল উত্তর ভারতে। তাঁরা আমাকে যখন মালা ও ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন প্রেস কনফারেন্সের অন্য প্রতিনিধিগণ বিস্ময়ের সঙ্গে তা' লক্ষ্য করতে লাগলেন। তাঁদের নিকট এটি ছিল এক নূতন অভিজ্ঞতা। এঁদের মধ্যে 'ডেইলী মেল' পত্রিকার সংবাদদাতা মিঃ ম্যাকেঞ্জীও ছিলেন। তাঁকে দেখে আমি বললাম, "ডেইলী মেলে একেই আপনি আমার অভিষেক বলে বলেছিলেন। ভারতে বন্ধুদের অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রত্যহই লোকে এরূপ করে' থাকে।" তিনি হাসতে লাগলেন। আর আমি হোটেলে প্রবেশ করে' আমার সমস্ত পুষ্পসজ্জা লেডি বৃটেনকে উপহার দেবার জন্য স্যার হ্যারী বৃটেনের হাতে তুলে দিলাম।

ম্যানচেষ্টারের টাউন হলে এক মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন হয়েছিল। লর্ড মেয়র সে সভায় সভাপতি ছিলেন। এখানে বক্তৃতা করবার জন্য আমাকে নির্ব্বাচিত করা হ'ল। 'দি ইম্পিরিয়াল প্রেস'-এর মঙ্গল কামনা করে' তিনি সুরাপানের জন্য আমাদের আহ্বান জানিয়ে সঙ্গে আমার নামটিও জুড়ে দিলেন। আমার সেই বক্তৃতায় সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে' আমি সাম্রাজ্যকে অটুট রাখবার উপায় হিসাবে আমাদের স্বায়ত্ত শাসনের আকাঙ্ক্ষার কথা প্রচার করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, ইংলণ্ডের শত্রুদের সমস্ত চক্রান্ত নিষ্ফল করবার ও সাম্রাজ্যের ঐক্য রক্ষা করবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্বাস তার মধ্যেই নিহিত। তখন যা' পাবার

জন্য আমাদের ছিল এক আকুল আগ্রহ, আজ তা' প্রায় 'সফল হ'তে চলেছে। দায়িত্বশীল সরকার গঠনের সূচনা হয়েছে। যদিও সমস্ত মেঘ এখনো কাটে নি, তবুও আমার মনে হয়, এবং আমি আশা করি, এমন একদিন আসবে যখন ভারতও বৃটিশ কমনওয়েল্‌থের এক সমান অংশীদার হয়ে উঠবে। আমার ভাষনের সর্ব্বশেষ ছত্রে আমি বলেছিলাম—

"ভারত যদি স্বায়ত্ত শাসন উপভোগ করবার সৌভাগ্য লাভ করে, তবে সেই উন্নত, তুষ্ট ও সুখী ভারতই হবে সাম্রাজ্যের এক অতুল সম্পদ এবং সাম্রাজ্যের ঐক্যের সর্ব্বপ্রধান রক্ষক। প্রত্যেকের সমান নাগরিক অধিকার ও কর্ত্তব্যের উপর ভিত্তি করে' এরূপে সংগঠিত সাম্রাজ্য তার বিরোধী যে কোন শক্তিগোষ্ঠির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হ'বে। এবং মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে পরমেশ্বরের অঙ্গুলিসঙ্কেত সদৃশ নৈতিক বলের সার্ব্বভৌমত্বকে অবজ্ঞা করে' যে সমস্ত রাজ্য ও রাজসিংহাসন বাহুবলকেই প্রাধান্য দিয়েছিল, যে সকল উত্থানপতন তাদের ভাগ্যকেও মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়, এই সুসংহত সাম্রাজ্য তাদের প্রতিও নির্ভাবনায় ও প্রশান্তচিত্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সমর্থ হবে"।

এ কথাগুলি আমি বলেছিলাম ১৯০৯ সালে। আর ১৯১৪ সালে আমরা এক অভূতপূর্ব্ব সাম্রাজ্যবিরোধী প্রচণ্ড শক্তিজোঠের মুখোমুখী দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলাম। তখনই আমাদের শাসকেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তন করে ভারতকে যদি সমৃদ্ধিশালী, নিরাপদ ও অসন্তোষহীন করা যায়, তবে তাহাই হবে সাম্রাজ্যের ঐক্য ও শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। এ সত্যটি তাঁরা যদি আরও পূর্ব্বে হৃদয়ঙ্গম করতে ও তদনুযায়ী কাজ করতে সমর্থ হতেন, তা' হ'লে আমাদের জনবল ও ধনবল আরও মুক্তহস্তে সাম্রাজ্যের সেবায় নিয়োজিত হতে পারত।

আমার বক্তৃতা শ্রোতারা খুব হৃদ্যতা ও উৎসাহের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন। যে সব সংবাদ পত্র প্রতিনিধি আমার পাশে বসেছিলেন, বক্তৃতা শেষ করে' আমি আসন গ্রহণ করতেই তাঁরা বললেন, "মিঃ ব্যানার্জ্জী, ভারতে যদি আপনার মত দুশত লোকও থাকে, তা' হলেও আগামী কালের মধ্যেই আপনাদের দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত।" তাঁদের একথার উত্তরে আমি বলেছিলাম, "আমার মত দুশতের দুগুণ লোক ভারতে পাওয়া যাবে"। অনুষ্ঠানের শেষে আমি যখন হল থেকে বের হয়ে যাচ্ছি সে সময় হলের তত্ত্বাবধায়ক আমার দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, "মহাশয়, আপনার নামটি এ বই খানিতে অনুগ্রহ করে' লিখে দেবেন?" এবং আমি যখন লিখতে লাগলাম তিনি আমাকে বললেন, "মহাশয়, আপনাকে একথা বলে রাখি যে, এ হল নির্ম্মাণ হওয়া থেকে আজ পর্য্যন্ত এমন বক্তৃতা এ হলে আর কোনদিন শুনি নি। হয়ত তিনি একটু অতিরিক্ত ভাবেই আমার প্রশংসা করছিলেন। তবে তাঁর কথার মধ্যে যে সহৃদয়তা ও সরলতা ছিল তা' থেকে ভদ্রলোকের মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট আভাস সহজেই পাওয়া যায়।

ম্যানচেষ্টারের যে-সমস্ত সংবাদপত্রপ্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও বক্তৃতার প্রশংসা করে' মন্তব্য করেছিলেন। "ম্যানচেষ্টার কুরিয়ার" নামে রক্ষণশীল দলের মতামত প্রকাশক একখানি পত্রিকা আছে। ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি এ পত্রিকাখানির সহানুভূতি অপেক্ষাকৃত কম। তবুও বক্তৃতা সম্পর্কে তা' লিখেছিল, "প্রেসপ্রতিনিধিদের ম্যানচেষ্টারে আগমনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নাটকীয় ঘটনা এই বক্তৃতা। লর্ড মেয়র ম্যানচেষ্টারের যে সমস্ত নাগরিককে অতিথিদিগকে সংবর্দ্ধনা জানাবার জন্য উপস্থিত থাকতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, এ বক্তৃতা তাঁদের উপর তড়িতের ন্যায় কাজ করেছিল। একজন ভারতবাসী এসে তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের

ভাষায় তাঁদের অন্তরে ঈর্ষা জাগিয়ে অনর্গল বক্তৃতা করে' শ্রোতাদিগকে এমনভাবে তন্ময় করে' রেখেছিলেন যে, তা' কেবলমাত্র যে-ব্যক্তি বাগ্মী হয়েই জন্মেছেন তাঁর পক্ষেই সম্ভব। এরূপ বক্তৃতা শুনবার অভিজ্ঞতা ও তার সুযোগ মানুষের জীবনে একাধিক বার আসে না।"

অনুষ্ঠান শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি ম্যানচেষ্টার ত্যাগ করলাম। পার্ল্যামেণ্টের সদস্য মিঃ (পরে স্যার) উইলিয়ম বাইলস-এর বাড়ীতে লণ্ডনে এক সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণে আমার যোগ দিতে হবে। আসতে আসতে আমার দেরীই হয়ে গেল। তবে ভারতের বন্ধু মিষ্টার ও মিসেস্ বাইলস্-এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে পরম পরিতোষ লাভ করলাম। প্রেসপ্রতিনিধিগণও সেদিনই লণ্ডনে ফিরলেন। ১৯ শে জুন আমরা উইণ্ডসোর দুর্গে গেলাম। মহামান্য রাজা সেদিন টেরিটোরিয়্যাল সেনাদলকে সেখানে পতাকা উপহার দিয়েছিলেন। আমাদের সকলকেই চত্বরে বসতে দেওয়া হয়েছিল। মিঃ আমীর আলীর সঙ্গে সেখানে আমার দেখা হ'ল। সে সময় ভীষণঠাণ্ডা পূবালী হাওয়া চলছিল। মিঃ আমীর আলী ছিলেন উইণ্ডসোর পোষাকে সুসজ্জিত। তাঁর বুকের উপর 'কম্প্যানিয়ান অব দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার'-এর অভিজ্ঞান শোভা পাচ্ছিল। কিন্তু ঠাণ্ডাতে তিনি প্রায় কাঁপছিলেন। আমার নিকট আসার সঙ্গেসঙ্গেই তিনি বললেন, "মিঃ ব্যানার্জী, আপনি বেশ হিসেবী লোক। কেমন ওভার-কোটটি পরেই এসেছেন।" আমি উত্তর দিলাম, "এটি আমি যতদূর সম্ভব কাছেকাছেই রাখি। ইংলণ্ডের আবহাওয়া যা' খেয়ালী! এই এক রকম, দেখতে দেখতে আর এক রকম।" দু'মাসের উপর আমি বিলাতে ছিলাম। কোনদিন সর্দ্দীকাশিতে কষ্ট পাই নি। তা' থেকেই ধারনা করা যায় কি রকম হিসাব করে' আমি চলাফেরা করতাম। আমি একবার লর্ড মিডল্‌টনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। (এঁর অপর নাম মিঃ ব্রড্‌রিক্। ভারতসচিব পদে নিযুক্ত থাকার সময় বঙ্গভঙ্গের

জন্য ইনিই অনুমতি দিয়েছিলেন)। আমি যখন ফিরে আসবার জন্য উঠে দরজার দিকে অগ্রসর হলাম লর্ড মিডল্‌টনও দরজা খুলে দেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে এলেন। আমি আমার ওভারকোটটি যখন পরছিলাম তিনি আমাকে সাহায্য করতে করতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমার ওভার-কোটটির দিকে তাকাতে লাগলেন। তাঁর সেই দৃষ্টির অর্থ বুঝতে আমার দেরী লাগল না। আমি বললাম, "যদিও আজকের দিনটি বেশ পরিষ্কার, তবুও আপনাদের আবহাওয়া বড়ই বিশ্বাসঘাতক। কখন যে কি রূপ নেবে বোঝা কঠিন। আমি ভাবলাম একটু বেশী সতর্ক হওয়ায় দোষ নেই।" লর্ড মিডল্‌টন যেন আমার কথাটি মেনে নিলেন এভাবে হেসে আমি বেরিয়ে আসার পর দরজাখানি বন্ধ ক'রে দিলেন।

উইণ্ডসোর পরিদর্শনের পর আমাদের একদল প্রতিনিধি তারযোগে সংবাদ প্রেরণের সম্পর্কে আলোচনার জন্য মিঃ এসকুইথের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। এঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম। যথারীতি বক্তৃতাদি হ'ল। কিন্তু মিঃ এসকুইথ কোনরকম কথা দিলেন না। প্রেস কনফারেন্সের সদস্যহিসাবে এ অনুষ্ঠানের পর আমি আর কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাই নি।

প্রেসকনফারেন্সের সদস্য হিসাবে আমি যখন বিলাতে গিয়েছিলাম তখন বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে আমি যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম অথবা যে দায়িত্ব আমি ঘাড়ে নিয়েছিলাম, তা' সবই আমার মনে ছিল। আমার ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশন আমার সম্মানে এক সান্ধ্যমিলনের আয়োজন করেছিল। আমার সহকর্ম্মী মিঃ এভারার্ড ডিগবীও তাতে নিমন্ত্রিত ছিলেন। সেখানে আমি যে ভাষণ দিয়েছিলাম তাতে আমি আমার বন্ধুদিগকে এ আশ্বাস দিয়েছিলাম যে, প্রেসকনফারেন্সের সদস্য হিসাবে আমার যা কর্ত্তব্য তার পরেই আমার কর্ত্তব্য হবে বঙ্গভঙ্গকে সংশোধন করবার দিকে মনোনিবেশ করা। তদনুসারে আমি এখন সেদিকেই মনোযোগ

দিলাম। সম্মেলনের সদস্যগণ ইংলণ্ডে তাঁদের কাজ শেষ করে' তখন স্কটল্যাণ্ড পরিভ্রমনে যাবার আয়োজন করছিলেন। আমাকে সম্মেলন থেকে যাবার অনুমতি দেবার জন্য আমি স্যার হ্যারী-বৃটনের নিকট অনুরোধ জানালাম। ওয়ালডর্ফ হোটেল ছেড়ে আমি এবার ক্লেমেণ্টস্ ইন-এ ঘর ভাড়া করলাম। এটি ছিল সাফ্‌রেজিষ্ট আন্দোলনের প্রধান কার্য্যালয়। তবে তার সঙ্গে আমার কোনই সংশ্রব ছিল না। চট্টগ্রামের কেদারনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে আমি এঘরগুলিতে থাকতাম। এ প্রসঙ্গে আমার বলা আবশ্যক যে, লণ্ডনে চলাফেরা করার বিষয়ে আমি তাঁর নিকট থেকে বিশেষভাবে উপকার পেয়েছিলাম। তিনি স্থায়ীভাবেই লণ্ডনে বাস করতেন এবং সেখানে এমন কোন স্থান ছিল না যা' তিনি জানতেন না। আমি যখনই কোথাও যেতাম বা কারও সঙ্গে দেখা করতাম, তিনি সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন।

মিঃ পেরেক-এর সভাপতিত্বে লণ্ডনস্থ ভারতীয়গণের এক কমিটি আমার সম্মানে এক নৈশভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। এ অনুষ্ঠানেই আমি বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম বক্তৃতা করি। ওয়েষ্টমিনষ্টার প্যালেস হোটেলে এ অনুষ্ঠান হয়েছিল। অতিথিদের মধ্যে পার্ল্যামেণ্টের বহু সদস্য ছিলেন। স্যার হেনরী কটন, মিঃ ম্যাকারনেস এবং মিঃ রামজে ম্যাকডোন্যাল্ডও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। এই সমাবেশকে এক হিসাবে অদ্বিতীয় বলা যায়। কারণ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চলের লোকই সেখানে উপস্থিত ছিল। তবে একে কেবলমাত্র ভারতীয়দেরই অনুষ্ঠান বলা ঠিক হবে না। বাস্তবিক পক্ষে, একে আপন দেশের সে যুগের বিষম রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত এক জনসেবীর বক্তৃতা শুনবার জন্য ভারতের ইংরেজ বন্ধুদের সমাবেশ বললেই কথাটি যথার্থ বলা হবে। বঙ্গভঙ্গকে সংশোধন করবার জন্য আমি ও আমার সহকর্ম্মিগণ যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলাম তার প্রতি উপস্থিত সকলেরই আশানুরূপ ও গভীর সহানুভূতি ছিল।

রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য যে অভূতপূর্ব্ব দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছিল সেজন্য সভায় সকলেই ধিক্কার দিতে লাগল। অন্তরীণ করে রাখা অপেক্ষাকৃত কঠোর ব্যবস্থা না হলেও বিনা বিচারে শাস্তি দেওয়া ইংরেজ মাত্রই ঘৃণা করে। যদিও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের অবিরাম অনুরোধে লর্ড মর্লে নির্ব্বাসন ব্যবস্থার অনুমোদন করেছিলেন, তবুও তাঁর "রিকলেকশনস" পুস্তক পাঠে দেখা যায় তাঁর অন্তর থেকে তিনি কোনদিন তা' সমর্থন করেন নি। নিজ মনের মধ্যে তা' মেনে নিতে পারেন নি। সম্প্রতি যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল সে প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম, "এরূপ এক সর্ব্বনেশে অকৃতকার্য্যতার স্বীকারোক্তির অধিক দৃষ্টান্ত আর কখনো দেখা যায় নি। জগতের ইতিহাসে দমননীতি কবেই বা সফল হয়েছে?" আমার কথা শুনে শ্রোতাদের হর্ষধ্বনি বহুক্ষণ যাবৎ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

স্যার হেনরী কটন আমার পরে বক্তৃতা করতে উঠে বললেন, "ভারতে জাতীয় প্রেরণা, স্বদেশপ্রেম ও দেশভক্তির প্রবণতা প্রসারের জন্য কেউ যদি কিছু করে থাকেন তিনি হলেন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।"

মিঃ কেইর হারডি ছিলেন ভারতের একজন বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমরা সকলেই গভীর মর্ম্মাহত হয়েছিলাম। স্যার হেনরী কটনের পর তিনি বক্তৃতা করতে উঠেন। তিনি বলেছিলেন, "যে অতিঅল্পসংখ্যক ব্যক্তির খ্যাতিঅপেক্ষা ব্যক্তিত্ব বহুগুণ বেশী, মিঃ ব্যানার্জী তাঁদেরই একজন।" মিঃ ম্যাকারনেস্ ছিলেন ভারতের অপর এক বন্ধু। তিনি সরকারী কার্য্য গ্রহণ করার পর আমরা তাঁকে হারিয়েছি। তিনি বলেছিলেন, "বক্তৃতাটি বাগ্মিতারও অধিক।—এটিকে একটি রাষ্ট্রশাসননীতিমূলক বক্তৃতার পর্য্যায়ে ফেলা যায়।" পার্লামেণ্টের একজন আইরিশ সদস্য মিঃ সুইফট্ ম্যাকনীল সর্ব্বদাই ভারতের মঙ্গলের জন্য উৎসাহী ছিলেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন সর্ব্বশেষ

বক্তা। তিনি বলেছিলেন, "মিঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ন্যায় একজন নেতা পেয়ে ভারতীয়েরা স্বভাবতই আনন্দিত। অনেক বড় বড় বক্তৃতা আমি শুনেছি। কিন্তু এ সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মিঃ ব্যানার্জী বিচার বুদ্ধি দিয়ে সেগুলি মনোজ্ঞভাবে পরিস্ফুট করে আমার অন্তর যেভাবে স্পর্শ করেছেন, এরূপে অন্য কেউ কোনদিন করেন নি।

পরদিন স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবারণ প্রাতরাশের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ভারতের উন্নতিতে উৎসাহী পার্ল্যামেন্টের বহু সদস্য ও অপরাপর ব্যক্তিও সেখানে নিমন্ত্রিত ছিলেন। স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবারণকে আমরা চিরদিনের মত হারিয়েছি। মিঃ য়্যালেন হিউম, স্যার হেনরী কটন ও স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবারণ—এই তিনজনের দলটি ছিল ভারতের একান্ত বন্ধু। তাঁদের হারানো ভারতের পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি। যে সঙ্কঠের ভিতর দিয়ে এখন আমাদের চলতে হচ্ছে এসময়ে তাঁদের সৎপরামর্শ হ'ত আমাদের এক অমূল্য সম্পদ। শিক্ষিত ভারতের উপর তাঁদের মত প্রভাব অপর কোন ইংরেজের ছিল না। তার কারণ ভারতকে তাঁরা যেভাবে ভালবাসতেন এবং ভারতের উন্নতির জন্য তাঁদের যেরূপ একান্ত আগ্রহ ছিল এরূপ অন্য কারও ছিল না। এদেশকে তাঁরা যেমন ভালবাসতেন তেমনি তাকে নিজের বলে গ্রহণ করে তারই উন্নতিতে তাঁরা আত্মনিবেদন ও জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আমাদের এসময়ের ইতিহাস যেদিন লেখা হ'বে সেদিন জাতির ভবিষ্যৎ ইতিহাস সৃজনে যাঁরা নিরলস অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে এঁদেরও যথাযোগ্য সম্মানের আসন দান করা হবে। আমাদের মহান ব্যক্তিদের সমাধি মন্দিরে এই মহাপ্রাণ ইংরেজগণও আমাদের উত্তরাধিকারীদের সম্মান ও শ্রদ্ধায় বিজড়িত হয়ে থাকবেন। তাঁরা যদি আমাদের নিকট থেকে অপসারিত না হতেন, তা' হলে তাঁদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আমাদের উপর যে সংযমের প্রভাব

বিস্তার করত তার ফলে এখন যে সমস্ত পরস্পরবিরোধী দল সৃষ্টি হয়ে আমাদের মধ্যে বিভেদ নিয়ে এসেছে তার কুফল হতে আমরা মুক্ত হ'তে পারতাম। কিন্তু যা' হবার নয় তা' নিয়ে চিন্তা করা আজ অর্থহীন।

কিছুদিনের মধ্যেই যে নববিধান প্রবর্ত্তিত হবার কথা চলছিল, স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবারণ তার কিছুটা আভাস পেয়েছিলেন। যে অভীষ্ট লাভের জন্য তিনি তাঁর জীবনের শেষাংশ উৎসর্গ করেছিলেন, জীবন সন্ধ্যায় তা' অন্ততঃ আংশিকভাবে হলেও পূর্ণ হতে দেখে তিনি চরম সন্তুষ্টি লাভ করেছিলেন। ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট যে বাণী প্রচার করা হয়েছিল, তা' তিনি শুনেছিলেন। তবে তা' তিনি কেবল শুনেই ছিলেন, কারণ মাত্র অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মিঃ মণ্টেগু যখন ভারতে যাবার আয়োজন করছিলেন, তখন স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবারণের মৃত্যু হয়।

স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবারণের নামের মাধুর্য্য ও তাঁর প্রীতিপূর্ণ স্মৃতির কথা আলোচনা করতে গেলে প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, তা' আমাকে আমার আলোচ্য বিষয় থেকে কিছুটা দূরে নিয়ে এসেছে। স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবারণের বাড়ীতে যে প্রাতরাশের অনুষ্ঠান হয়েছিল তা' খুব সফলতার সঙ্গেই সম্পন্ন হয়েছিল। পার্ল্যামেণ্টের য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সদস্যদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। দৃঢ়তার সহিত অথচ শান্ত ও আকর্ষনীয় করে' তাঁর কিছু বলবার ক্ষমতা, আপন উদ্দেশ্যের প্রতি স্বচ্ছ অকপটতা, ভারত ও ভারতীয়দের সমস্যাদির বিষয়ে গভীর জ্ঞানের মধ্যে অঙ্কুরিত দৃঢ়বিশ্বাসের সর্ব্বগ্রাসী শক্তি, তাঁর আবেদনকে গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্ব্বার করে তুলত।

মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোন্যাল্ড পরলোকগত স্যার চারল্‌স ডিলক্ সহ পার্ল্যামেণ্টের বহু খ্যাতনামা সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমাকে অবশ্য বক্তৃতা করতে হয়েছিল। সত্যিকথা বলতে কি ভোজনের

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করার এই যে ইংরেজী প্রথা (সম্ভবত ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এ প্রথার প্রচলন আছে) আমার মনের সঙ্গে যেন সঙ্গতি রক্ষা করত না।

ভারতে আমরা যখন নিমন্ত্রণ পাই তখন নিমন্ত্রণে যাই খাবার উদ্দেশ্যে এবং পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলে তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে। আহারটাই সেখানে মুখ্য, কথা বলাটা কেবল একটি গৌন অনুষঙ্গ মাত্র। ইংরেজদের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি একটু ভিন্ন প্রকারের। সেগুলিতে সব সময়েই আহারেরও আয়োজন থাকে। সেখানে কথাটিই মুখ্য, আহারটি গৌন। ফলে সান্ধ্যভোজই হোক অথবা মধ্যাহ্নভোজই হোক, যাদের বক্তৃতা দিতে হয় তাদের খাওয়ার সুযোগটি নষ্ট হয়। কেন না, চিন্তা না করে' বক্তৃতা দেওয়া চলে না। কাজেই খাওয়াটা আর উপভোগ করা হয় না। অন্ততঃ প্রাচ্যদেশের লোকের নিকট তাদের এসব অনুষ্ঠান এরকমই মনে হয়। এ সমস্ত বক্তৃতা যে অনেক সময় খুবই হিতকারী হয় সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। লর্ড মেয়র যে "ব্যাঙ্কোয়েট" বা ভোজোৎসবের আয়োজন করেন তাতে যদি বক্তৃতার ব্যবস্থা না থাকে তা' হ'লে তার সমস্ত জাঁকজমকই বৃথা হয়ে যাবে। আর তাতে জনসাধারণের কোনই উৎসাহ থাকবে না। অবশ্য আমার যে রকম মনে হয়েছে তাই আমি বলছি। এটি আমার ব্যক্তিগত অভিমত। এ সমস্ত অনুষ্ঠানে অনেক সময়েই আমাকে বক্তৃতা দিতে হ'ত। আর তখন আমি দেখেছি, আমি খাওয়াটাকে ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পারতাম না। কেউ যেন মনে না করেন যে, বক্তৃতা করাটা তেমন একটা কিছু নয়। বাস্তবিক পক্ষে যে-বক্তৃতা ভেবেচিন্তে প্রস্তুত করে' করা না হয়, সে-বক্তৃতা শোনার অযোগ্য। জগতের সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ডেমস্থেনিস সমস্ত রাত্রি জেগে তাঁর বক্তৃতা প্রস্তুত করতেন এবং সে বক্তৃতা দিয়ে তিনি এথেন্স নগরীর শ্রোতাদের তন্ময় করে দিয়ে তাদের হৃদয় জয় করতেন।

স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ-এর প্রাতরাশ সভাতে আমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম সেখানেও আমি বঙ্গভঙ্গ ও নির্ব্বাসন সমূহের কথা বলেছিলাম।

স্যার চারলস্ ডিলক্, মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোন্যাল্ড এবং স্যার হেনরী কটন একেএকে নির্ব্বাসন সমূহের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। মিঃ এলেন হিউমও সেখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতার অধিকাংশই ছিল তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ ও আমার সম্পর্কে প্রীতিপূর্ণ উল্লেখ। তিনি বলেছিলেন, তিনি তাঁর পুরাতন বন্ধু বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে পুনরায় ইংলণ্ডের উপকূলে অভ্যর্থনা করার অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পেরে অত্যন্ত হৃষ্ট এবং গর্ব্বিত বোধ করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল যেন মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বেই মিঃ মুধোলকার, মিঃ ব্যানার্জী এবং তিনি নিজে উত্তর পশ্চিমের প্লিমাউথ থেকে উত্তর পূর্ব্বে এবারডিন পর্য্যন্ত সমগ্র গ্রেট বৃটেনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভারতের বিষয় নিয়ে সকলের নিকট আবেদন করছেন। সকলকে বলছেন যে, যে-সংস্কারের জন্য তাঁরা সকলে এত বছর ধরে' কাজ করে' চলেছেন, গ্রেট বৃটেনের জনসাধারণও যেন ভারতের সে শাসন সংস্কারের দাবীকে সমর্থন করেন। সেই ভ্রাম্যমানের দিনগুলির কথা তিনি কোনদিন ভুলতে পারবেন না। তাঁর ঐ দিনগুলি ছিল অত্যন্ত আনন্দের। তার কারণ, প্রথমতঃ, তাঁরা যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বাহির হয়েছিলেন, আপাত দৃষ্টিতে তা' সফলই হয়েছিল। যেখানেই তাঁরা গিয়েছেন অসংখ্য লোক তাঁদের অভ্যর্থনা করেছে এবং তাঁদের দাবীকে সমর্থন করে' প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কিন্তু সবার উপর তাঁর বন্ধুর শান্ত স্বভাব, অমায়িক ব্যবহার এবং যে কোন সময় যে কোন বিষয়ে তাঁদের সাহায্য দিতে প্রস্তুত থেকে তিনি যে ভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন, এ সমস্ত বিষয় তাঁদের সেই অভিযানকে চিরদিনের মত স্মরণীয় করে রেখেছে। কার্য্যত তাঁদের যে শেষ সভাটি এবারডিনে হয়েছিল তা' তিনি কোনদিন ভুলতে পারবেন না। সেদিন রাত খুব গভীর

হয়েছিল। ঘরের মধ্যে ছিল এক গুমোট চাপা গরম। কিন্তু বাইরে যখন ঠাণ্ডায় বেড়িয়ে পড়লেন, উত্তরের স্তিমিত জ্যোতি তখন ঝক্‌ঝক্ করছে। (দক্ষিণের গোধূলি-আলোর যে কি অপরূপ শোভা এখানে তা' কল্পনার অতীত।) তাঁরা আত্মহারা হয়ে সেই পাথুরে নগরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। একজন সঙ্গীর সাথে তিনি ও মুধোলকার বড়বড় প্রাদেশিক কেন্দ্রে সভা করে' প্রস্তাব পাশ করলে তাতে শাসন সংস্কারের দাবী কি পর্য্যন্ত ফলপ্রসূ হবে তার সম্ভাবনার বিষয় আলোচনা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের বন্ধু মিঃ ব্যানার্জী কাজ ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। আর ঐ হ'ল তাঁর বৈশিষ্ট্য। কথাটি চাপা দেবার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "অনেক দেরী হয়ে গেল। ভোরে আবার ছুটতে হবে। এর চেয়ে বরং নৈশভোজের কথাটিই এখন ভাবা যাক।" (হাস্য)। মিঃ ব্যানার্জীর এই যে কাজের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহাই, এমন কি, কারাজীবনের কঠোরতার মধ্যে যখন তিনি অন্তরে দগ্ধ হচ্ছিলেন তখনো এবং যেখানে তাঁদের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তিলে তিলে জীবন বিসর্জ্জন করছেন, সেখানেও তাঁকে আপন মহৎকর্ম্মের সংগ্রামে সফলতা এনে দিয়েছিল। (হর্ষ ধ্বনি)। তখন থেকেই তিনি (অর্থাৎ মিঃ হিউম) অবিরত তাঁদের অতিথিদের সংস্পর্শে ছিলেন। তাঁর কর্ম্মদক্ষতা, শান্ত মেজাজ ও বুদ্ধিবিবেচনাদির বিচারেও তাঁকে প্রশংসা করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তিনি যখন তাঁর দেশবাসীদের দোষত্রুটি অথবা তাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় গুণাবলীরও উল্লেখ করেন, তখনও তিনি এমন কিছু লিখেন না বা বলেন না, যার সুযোগ নিয়ে তাঁর বিরোধী পক্ষেরা নির্ব্বাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইংরেজদের নীতিবিরোধী আইনগুলি তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারে। (প্রশংসা ধ্বনি)।

মিঃ এলেন হিউম যে কেবল একজন উত্তম সংগঠনকারী ছিলেন তা' নয়, তিনি একজন অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ব্যক্তিও ছিলেন। বিচক্ষণতা ও

স্কটল্যাণ্ডবাসীদের 'সহজাত ব্যবহারিক বুদ্ধির সঙ্গে তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেত এক সদয় ভাব ও প্রাচ্যপ্রবণতার প্রাচুর্য্যের সংমিশ্রন। তাঁর ভারতীয় বন্ধুগনকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির জন্য তিনি থাকতেন সব সময় উৎকণ্ঠিত। এবং ভারতীয়েরাও প্রচুর শ্রদ্ধা দিয়ে সে ঋণ পরিশোধে যত্নবান থাকত। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের এই প্রাক্তন কর্মচারী শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে যে অসীম উৎসাহ ও গভীর শ্রদ্ধা জাগ্রত করেছিলেন, সে কালের অপর কোন ইংরেজের পক্ষে সেরূপ সম্ভব হয় নি। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, কংগ্রেস আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় যে সমস্ত ইংরেজ তার একনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোক এবং তাঁরা সকলেই চাকরী জীবনের আপন আপন ক্ষেত্রে উচ্চপদে আরোহণ করেছিলেন। লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জনের কত অমূল্য সুযোগই ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোকেরা তখন পেয়েছিলেন, আর তখন ভারতীয় ও ইংরেজ জাতিকে এক সাধারণ নাগরিকতার বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের বন্ধনকে দৃঢ়তর করবার সে সমস্ত সুযোগের কি অপব্যবহারই তাঁরা করেছেন! তবে সুখের কথা এই যে, সে দৃষ্টিভঙ্গির এখন পরিবর্ত্তন হচ্ছে। ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই আশা নিয়ে বসে আছেন যে, তাঁরাও একসময়ে সমান সমান নাগরিক অধিকার ভোগকরার সুযোগ পাবেন এবং তখন বর্ত্তমানের এই ঐক্যের বন্ধন এক নব রূপ নেবে ও দৃঢ়তর হবে।

প্রাতরাশ মিলনটি হয়েছিল ২৪ শে জুন। তারপরে এক সপ্তাহের মধ্যে এক ঘটনার ফলে ভারতে ও বিলেতে এক সাঙ্ঘাতিক আলোড়ন উঠেছিল। ১লা জুলাই রাত্রিতে ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক উৎসবের সভায় ধিঙ্গড়া নামে এক ভারতীয় যুবক ভারতসচিবের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সাহায্যকারী কর্ম্মচারী স্যার উইলিয়াম কার্জ্জন-উইলী ও ডক্টর লালকাকাকে গুলি করে হত্যা করে। যে সময়ে এই

নৃসংস ঘটনা ঘটে ঠিক ঐ সময়েই লর্ড ষ্ট্রাথকোনা ইম্পিরিয়্যাল প্রেস কনফারেন্সের সদস্য হিসাবে আমাদিগকে এক সান্ধ্যভোজে আপ্যায়িত করছিলেন। এ উৎসবে আমিও নিমন্ত্রিত ছিলাম। এবং তাতে যোগ দেবার ইচ্ছাও আমার ছিল। কিন্তু দেরী হওয়ার দরুন আমি সরে পড়লাম এবং "ক্লেমেন্টস ইন"-এ আমার ঘরে চলে গেলাম। কল্যাণসূচক মদ্যপানের জন্য আহ্বান করা হচ্ছিল, বক্তৃতা হচ্ছিল, কিন্তু আমার অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে অন্য সকলকে তাদের ভোজনোত্তর বক্তৃতা উপভোগ করতে দিয়ে আমি চুপিচুপি চলে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু মিঃ কে. এন. দাশগুপ্ত আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, ইম্পিরিয়্যাল ইনিষ্টিটুটে গিয়ে ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানটি কিরূপ হ'ল এক বার দেখে যাওয়া যাক। কিন্তু ক্লান্তিতে আমার চোখে জড়িয়ে আসছিল এবং এরূপ এক উত্তেজনাময় সান্ধ্যমিলনের পরিবর্ত্তে আমার শয্যার প্রতি অধিক আগ্রহ লক্ষ্য করে' বন্ধুরা আশ্চর্য্য বোধ করলেন। আর ঠিক সে সময়েই যে আর এক জায়গায় এক নৃসংস ঘটনা ঘটে গিয়েছে তার কথা ছিল আমার কল্পনারও অতীত।

পরদিন ভোরে ২রা জুলাই তারিখে আমি আমার প্রাতরাশ সবে শেষ করেছি, এমন সময় এক সংবাদপত্র প্রতিনিধি আমার নিকট এসে উপস্থিত হলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম আমাকে এ হত্যার সংবাদ দিলেন। তিনি বললেন, "স্যার উইলিয়াম কার্জ্জন-উইলীর হত্যা বিষয়ে আপনি কি জানেন আমায় বলবেন?" আতঙ্ক ও বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, "স্যার উইলিয়াম কার্জ্জন-উইলীর হত্যা! আমি ত এ বিষয়ে কিছুই জানি না। আপনার কাছেই ত আমি প্রথম শুনছি।" বললাম, "আপনিই ত আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন বলে মনে হচ্ছে।" তিনি যা যা জানতেন সব আমাকে বললেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, —খিঙ্গড়া ব'লে লোকটি কে, তার বিষয়ে আমি কিছু জানি কি না।

উত্তর দিলাম, নাম থেকে মনে হচ্ছে যে, লোকটি বাঙ্গালী নয়। তবে ভারতের কোন্ অঞ্চলের লোক সে কথা বলা শক্ত। একমাত্র এ-বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত স্পষ্ট অভিমত এই যে এ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সারা ভারতে এক তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করবে। এ ছাড়া আমার নিকট থেকে লিখে নেবার মত আর কিছুই সেই সংবাদপত্র প্রতিনিধি পেলেন না। তার একটু পর থেকেই সংবাদ সংগ্রাহকেরা একের পর এক করে' আমার ঘরে আসতে লাগলেন। লিফ্‌টচালক ত বিরক্তই হয়ে উঠল। যে-ক্লেমেণ্টস্ ইন্-এ আমি থাকতাম সেখানে অনেক মহিলা ছিলেন যাঁরা মেয়েদের ভোটাধিকার লাভের জন্য আন্দোলন করছিলেন। তাঁদের দিকে কটাক্ষ করে' লিফ্‌টচালক তার এক বন্ধুকে বলল, "এ মেয়েগুলো ভারী বদ, কিন্তু এই ভারতীয় (অর্থাৎ আমি) দেখছি তাদের চেয়েও খারাপ। আমাদের ভারী জ্বালাতন করছে ত।"

বৈকালেও অনেক দেরী পর্য্যন্ত এ সংবাদদাতাদের আসা যাওয়া চলতে লাগল। তার উপর ভারতীয় ছাত্রেরাও দলেদলে এসে এ বিষয়ে কি করা উচিত সে সম্পর্কে আমার পরামর্শ চাইতে লাগল। কারণ পরিস্থিতি তখন এক অতি গুরুতর অবস্থা ধারণ করেছে। এক ভারতীয় ছাত্র একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী ও তাঁর উদ্ধারে চেষ্টারত এক নিজদেশবাসীকে হত্যা করেছে। এই অকারণ হত্যা কাণ্ডের ফলে ইংরেজ জনসাধারণ অন্তরে প্রচণ্ড এক আঘাত পেল এবং সর্ব্বত্র এক দারুণ ঘৃণা দেখা দিল। এ পরিস্থিতিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতীয় ছাত্রেরা যদি এ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা না করে এবং তারপ্রতি যে তাদের কোনই সমর্থন নেই আর তার সঙ্গে যে তাদের কোনই সংশ্রব নেই সে কথা প্রকাশ না করে, তা' হ'লে জনসাধারণের ঘৃণা যা' কেবল একজন ছাত্রের প্রতি আবদ্ধ রয়েছে, তা' ক্রমশ সারা ছাত্র-সমাজের প্রতি ছড়িয়ে যাবে এবং তাদেরও সেই একই অপরাধে অপরাধী বলে সকলে মনে করতে থাকবে। সুতরাং কাল বিলম্ব না

করে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা স্থির করলাম শীঘ্রই এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করা আবশ্যক। সে সময় মিঃ ডি. সি. ঘোষ ও মিঃ বি. এম. বোস ইংলণ্ডে আইন অধ্যয়ণ করতেন। তাঁরাই এই বিক্ষোভ প্রদর্শন সংগঠন করার নেতৃত্ব নিলেন। নিউ রিফরম্ ক্লাবের নিকট থেকে ঘরগুলি পাওয়া গেল এবং পরদিনই আমার সভাপতিত্বে সেখানে এক সভার ব্যবস্থা করা হ'ল। ভারতীয় ছাত্রদের সৌভাগ্য, আমার কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু তাঁদের সঙ্গে সেদিনই মধ্যাহ্নভোজনের জন্য আমাকে ন্যাশন্যাল লিবার‍্যাল ক্লাবে নিমন্ত্রণ করলেন। স্বভাবতই সেখানে পূর্ব্বরাত্রের হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে আলোচনা হ'ল এবং স্থির হল যে, আমি সংবাদপত্রে একখানা চিঠি লিখব এবং তা' অথবা অন্তত তার মুখ্য সারাংশ দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হ'বে। চিঠিখানার একখানা খসড়া প্রস্তুত করা হ'ল এবং বৈকাল না হতেই আমার স্বাক্ষরযুক্ত হয়ে চিঠিখানা যুক্তরাজ্যের সমস্ত খবরের কাগজে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল কাজেই সেই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রথম পদক্ষেপ তখন এমনি করেই নেওয়া হল।

পরদিন নিউ রিফরম্ ক্লাবে সভা করা হ'ল। যে ঘরে এই সভা হয়েছিল ভারতীয় সভাগৃহের তুলনায় তা' তেমন কিছু বড় ছিল না। তবে যে-সমস্ত শ্রোতায় ঘরটি পূর্ণ হয়েছিল তাদের সকলের মধ্যেই আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা ছিল। বহু সংখ্যক ভারতীয় ছাত্রও সেখানে উপস্থিত ছিল। এবং তাদের মধ্যে মিঃ সাভারকারও ছিল। সভার মূলপ্রস্তাবটির বিরোধিতা করে' সে এক কাণ্ডই সৃষ্টি করল। তবে সভার কাজ অচল করে' দেবার মত কোন ঘটনা তাতে ঘটল না। শান্তভাবেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন হ'ল। আমি যে বক্তৃতা দিলাম বৃটিশ সংবাদপত্রগুলি তা' ভালমনেই গ্রহণ করল। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে, ভারতে এক ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলছে। একথা বলে' তিনি বুঝাবার চেষ্টা করছিলেন

যে, ধিঙ্গড়া তাদেরই একজন। আমি তার প্রতিবাদ করে' তা অস্বীকার করেছিলাম। আমার বক্তৃতার এ অংশটি বৃটিশ সংবাদপত্রগুলি প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারল না। "টাইমস্" পত্রিকা প্রধানমন্ত্রী মিঃ এসকুইথকে সমর্থন করেছিল। ধিঙ্গড়ার বিচারের সময় একথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে, সে একাই নিজের ইচ্ছায় ও আবেগে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত সংগ্রাম চালাচ্ছিল স্যার উইলিয়াম কার্জ্জন-উইলীর হত্যার ফলে তা' পিছিয়ে পড়ল। যে সমস্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে, তা' থেকে আমার মনে এ ধারণা জন্মেছে যে, চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক অপরাধের ফলে রাজনৈতিক অসন্তোষের ব্যাপক প্রচার হয় সত্য কিন্তু তাতে সমাজের রক্ষণশীলদের শক্তিই দৃঢ় হয় এবং অবশেষে তা' রাজনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। আজকাল আমাদের আইনসভাগুলিতে যে বাধাদানের নীতি প্রয়োগ করার প্রবণতা এসেছে তার ফলও তদনুরূপই হ'বে। রুশ ইতিহাসের নিহিলিষ্ট আন্দোলন, পরবর্ত্তী দমননীতির পরিমাণ, বহুদিন ব্যাপী স্বৈরাচারীশক্তিগুলির সঙ্গে বিপ্লবীশক্তিসমূহের সংঘর্ষ ও পরিণামে বলশেভিকবাদের বিজয়, এসকল কথার উল্লেখ আমি করব না। সে সব আমার এই স্মৃতিচারণের পরিধির বহির্ভূত। আমার আশা ছিল আমাদের যে-সমস্ত নেতা নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন অন্তত তাঁদের কয়েকজনের সম্পর্কে লর্ড মর্লে পুনরায় বিবেচনা করে দেখবেন। বিশেষভাবে কৃষ্ণকুমার মিত্র ও অশ্বিনীকুমার দত্তের বিরুদ্ধে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল সেগুলিই আমার মনে ছিল। পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'তে আমি তাঁদের মুক্তি দেবার জন্য বিশেষভাবে বলেছিলাম, কিন্তু তাতে কোনই ফল হ'ল না। যদিও খুব মনোযোগ দিয়ে তিনি আমার কথাগুলি শুনেছিলেন তবুও মিণ্টো-মর্লে সংস্কার পরিকল্পনার প্রবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া হয় নি।

ইতিমধ্যে আমি আমার কাজকর্ম্মের যে একটু সুফল আশা করছিলাম উক্ত হত্যাকাণ্ডের ফলে তাও বন্ধ হয়ে গেল। 'এইট্টি ক্লাব' নামে একটি ক্লাবে বক্তৃতা করবার জন্য এবং তাদের পরবর্ত্তী বিতর্কসভায় যখন ভারতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা হ'বে তাতে অংশ নেবার জন্য আমাকে পূর্ব্বেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এ ক্লাবটি ছিল উদারপন্থী দলের। দিন স্থির করে' তাঁরা সভার সমস্ত আয়োজনও করলেন। সভাও হ'ল, আমি বক্তৃতাও করলাম। তবে সবই হ'ল নিতান্ত এক আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। লেডি কার্জ্জন-উইলীর প্রতি গভীর সমবেদনা-সূচক একটি প্রস্তাব পাশ করা হ'ল। কিন্তু যে-প্রধান বিষয় নিয়ে আমি উদারপন্থীদলের নেতাগণের কাছে বলব বলে' স্থির করে রেখেছিলাম তা' স্পর্শও করা হ'ল না। একটি সুবর্ণ সুযোগ আমাকে হারাতে হ'ল। এর জন্য দায়ী স্যার উইলিয়াম কার্জ্জন-উইলীর হত্যা। সমাপ্তি ভাষণে সভাপতি অবশ্য বলেছিলেন, "ভারতের সাংবিধানিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য যথাসাধ্য করবার ইচ্ছা আমাদের আছে।" তবে এদিকে বাস্তবে কিছু করতে বৃটিশ গণতন্ত্রের দশ বছর সময় লেগেছিল। যুদ্ধ না লাগলে এবং তৎকালীন শক্তিসমূহের চাপ না থাকলে হয়ত সময় আরও বেশী লাগত।

এবারে আমি সর্ব্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছিলাম ক্যাকস্‌টন হলে। সভাপতি ছিলেন স্যার চারল্‌স্ ডিলক্। সে সময় জনসেবা ব্রতীদের অগ্রগণ্য ছিলেম স্যার চারল্‌স্ ডিলক্। তাঁর মতামতের গভীরতা ও গ্রেটবৃটেনের বাইরের রাজনৈতিক অবস্থাদি সম্পর্কে জ্ঞানের জন্য তাঁকে সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধা করত। ভারতের সমস্যাদির বিষয় তাঁর বিশদভাবে জানা ছিল এবং তার আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। আমাদের সভায় তাঁকে সভাপতি হিসাবে পাওয়া আমাদের পক্ষে এক ভাগ্যের কথা। আমি বঙ্গভঙ্গ ও মিণ্টো-মর্লে পরিকল্পনার বিষয়ে বললাম। দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি

দিয়ে পার্ল্যামেণ্ট বাণী দেওয়ার আট বছর পূর্ব্বে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভারত সরকার জরুরী বার্ত্তা পাঠাবার ছ' বছর পূর্ব্বে ১৯০৯ সালে মিণ্টো-মর্লে পরিকল্পনা সম্পর্কে আমি যা' বলেছিলাম, এখানে তার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না। আমি বলেছিলাম—

"মিণ্টো-মর্লে পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও এমন কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় নি, যা' একভাবে বা অন্যভাবে আমরা বারবার না চেয়েছি। তার দেওয়ার মধ্যে প্রাচুর্য্য ত একেবারেই নেই, বরং আমি বলব, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের আশাও পূর্ণ হয় নি। যেমন, আমরা চেয়েছিলাম অর্থের উপর কর্ত্তৃত্ব। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পূর্ত্ত ইত্যাদি অন্তত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বিভাগের উপর সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। আপনারা কি জানেন না যে, প্রতি বছর ওলাউঠা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগে আমার দেশের হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে? চেষ্টা করলে এ রোগগুলি অনায়াসে নিবারণ করা যায়। অর্থ বিভাগের উপর আমাদের যদি ক্ষমতা থাকত অথবা অন্তত স্বাস্থ্য বিভাগের উপরে হলেও আমাদের যদি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তা' হলে আমরা অন্ততঃ কিছু পরিমাণ লোককে কালগ্রাস থেকে রক্ষা করে' বঙ্গদেশ শ্মশানে পরিণত হবার পথে বাধা দিতে পারতাম। আমাদের দেশে শিক্ষার খাতে যে ব্যয় হয় তা' প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আর প্রাথমিক শিক্ষার কথা না তোলাই ভাল। আমরা চাই ব্যয়ের উপর ক্ষমতা এবং তাকে সুনির্দ্দিষ্ট ও কার্য্যকর করবার যোগ্য স্বায়ত্ত শাসন। তা' আমরা পাই নি। সত্যি কথা বলতে গেলে, এই সংস্কার পরিকল্পনাতে জনপ্রতিনিধিরা পেয়েছে এমন একটি ব্যবস্থা যার দ্বারা তারা সরকারের উপর কোন প্রত্যক্ষ চাপ দেবার পরিবর্ত্তে কেবল এক পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে' নৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারবে।"

১৯০৯ সালে ইংলণ্ডে থাকার সময় আমি যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছিলাম তার মধ্যে ছুটি বিষয়ের উপর আমি বিশেষ জোর

দিয়েছিলাম। যথা, বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থার সংশোধন ও ভারতে স্বায়ত্ত শাসনের প্রবর্ত্তন। বৃটিশ জনসাধারণ এ দুটি বিষয়কে যেভাবে গ্রহণ করেছিল, তা' থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, আমাদের এদুটি দাবী পূর্ণ হ'বে। আজ নয়ত কাল বঙ্গভঙ্গের সংশোধন হ'বে। আর সারা ইংলণ্ডে প্রত্যেকের মনেই ধারণা হয়েছিল যে, ভারত কিছু পরিমাণ স্বায়ত্ত শাসনের জন্য অন্তত পাকাপোক্ত হয়ে উঠছে। প্রেসকনফারেন্সের মঙ্গল কামনা করে' সুরাপানের আহ্বানের উত্তরে ম্যানচেষ্টারে আমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম, তা শেষ হবার পর ইম্পিরিয়্যাল প্রেসকনফারেন্সের একাধিক সদস্য, যাঁরা ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ থেকে এসেছিলেন তাঁরা আমাকে বলেছিলেন, "মিঃ ব্যানার্জী, ভারতে যদি আপনার ন্যায় লোক থাকে, তবে অবিলম্বেই আপনাদিগকে স্বায়ত্ত শাসিত সরকার গঠন করতে দেওয়া উচিত।" যুদ্ধ যখন আরম্ভ হ'ল ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করবার শক্তিগুলি প্রবল হয়ে উঠল। বঙ্গভঙ্গের বিরোধী আন্দোলন জাতির জাগরণকে গুরুতর করল। স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্ত্তী দমননীতি ভারতে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তনের দাবীকে অধিকতর দুর্ব্বার ও মুখর করে' তুলল। এ অবস্থায় ভারতের দাবীকে আর অস্বীকার করার উপায় রইল না। ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট যে বাণী প্রচার করা হ'ল প্রায় তার আগের দিন পর্য্যন্ত কোন-কোন প্রদেশের শাসকেরা এই নিষ্ফল দমননীতির দ্বারা ভারতের মুখ চাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। সে-মেজাজ না থাকা সত্ত্বেও রাজা কেন্যুটের মত এ সকল শাসক যে-তরঙ্গ ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছিল তাকে ফিরিয়ে দিতে ব্যর্থ-প্রয়াস পাচ্ছিল। তাদের সমস্ত আঘাত তাদের মস্তকেই প্রত্যাঘাত করে' গণঅভ্যুত্থানকে আরও প্রচণ্ড করে তুলেছিল।

বিলাতে থাকাকালে মিঃ ষ্টিডের বাড়ীতে যে একটি ছোট আকারের ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল তার কথাটি এ প্রসঙ্গে যদি আমি না বলি তা' হ'লে এ যাত্রায় আমার বিলাত ভ্রমনের প্রতি ও আমার নিজের

প্রতি এক অন্যায় করা হবে। এটি ছিল একটি অনাড়ম্বর, শান্ত ও লৌকিকতাবর্জ্জিত অনুষ্ঠান। এখানে কোন বক্তৃতা ছিল না, কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মনীতির বন্ধন ছিল না। প্রত্যেকে মন খুলে' নির্ভয়ে ও দ্বিধাহীন হয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিল। এভাবে মেলামেশা করবার পরিকল্পনাটি ছিল মিঃ ষ্টিডের। তিনিই এর আয়োজন করে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করলেন। এ ভোজসভার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে খোলাখুলিভাবে আলাপ করা। ১৯১২ সালে টাইটনিক জাহাজডুবিতে মিঃ ষ্টিড জলমগ্ন হয়ে প্রাণ হারাণ। সারা ভারত সেই মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা এখনো ভুলতে পারে নি। ভারতে অনেকেই তাঁর সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ও সংযমী। বর্ত্তমানের জঘন্য নীতিগুলিকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করতেন। গঙ্গাতীরের লোকই হোক আর নেভাতীরেরই হোক, মানুষের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি চিরদিনই তাঁর সহানুভূতি ছিল। এ-সমস্ত কারণে তাঁর স্থান ছিল সাধারণ লোকের অনেক উর্দ্ধে এবং এজন্যই তাঁর নাম করলে মানুষ শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করত। বার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে যেরূপ গভীরতম দুঃখের মাত্রাও হ্রাস পায়, এক্ষেত্রেও সেরূপ হয়ত দুঃখ কিছু পরিমাণে লাঘব হয়েছে। তথাপি তাঁর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বা তাঁর মৃত্যুতে মানুষের অন্তরের বেদনার অবসান আজও হয় নি।

আমাদের সেই ভোজসভা সর্ব্বপ্রকারেই ছিল মিঃ ষ্টিডের বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ—ব্যাপকতা ও উপলব্ধিতে উদার এবং বাক্যে ও উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থহীন। এই ক্ষুদ্র সমাবেশেও নিমন্ত্রিত ছিলেন বহু মার্কিনী, ক্যানাডীয় ও আইরিশ ভদ্রলোক। ভারতীয়দের মধ্যে মিঃ বিপিনচন্দ্র পালও উপস্থিত ছিলেন। একটি চাবুক হাতে মিঃ ষ্টিড ঘরে প্রবেশ করলেন। বোধ হয়, আর দুমিনিট পরেই যে কুঠারাঘাত করা হবে এটি তারই প্রতীক। আমার জন্মভূমির পক্ষ থেকে বৃটিশ জনসাধারণকে আমার

অন্তিম বাণী শুনাবার জন্য তিনি আমাকে আহ্বান করলেন। সত্যি বলতে কি, কোন নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও এরূপ এক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ঐতিহাসিক বাণী দিয়ে অদ্ভুত দণ্ড নেবার জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু আমার তখন আর পালাবার পথ ছিল না। চাবুক ত সেখানেই ছিল। আর তা' ছিল এমনই একজন শক্ত লোকের হাতে, যিনি তাঁর লোকদের সহানুভূতি জাগাবার জন্য বা ঘৃণার উদ্রেক করাবার জন্য এ বস্তুটির ব্যবহার জানতেন। কম্পিতবুকে আমি আমার কর্ত্তব্যে অগ্রসর হলাম। তবে তার পেছনে আমি নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে আশা করছিলাম যে, তাঁদের দেশবাসীদের যে বিরাট অংশটি জনমতকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে আমি তার সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা অর্জ্জনে সমর্থ হ'ব।

আমার স্বদেশের পক্ষ থেকে বৃটিশ জনসাধারণের নিকট আমার অন্তিম বাণী দেবার আবেদন শুনে আমার মন অস্থির হয়ে উঠল। আমি আমার মনপ্রাণ তার মধ্যে ঢেলে দিলাম। চাবুকটি ছিল তার কেবল এক বাহ্যিক প্রতীক মাত্র। দেশপ্রেমই ছিল সমস্ত প্রেরণার উৎস। ভারতের মুক্তির প্রতি এক মহান ইংরেজের গভীর প্রীতি লক্ষ্য করে' আমার হৃদয়ের মধ্যেও যেন সেই একই সুর অনুরণিত হয়ে উঠল এবং বোধহয় শ্রোতারাও তার অংশ গ্রহণ করলেন। আমার মনে হয়, তাঁর কথাগুলিই অবিকল তুলে দেওয়া সব চেয়ে ভাল। তাতে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হ'বে। প্রথমতঃ আমি যে বাণী দিয়েছিলাম তা' এবং তৎপরবর্ত্তী ঘটনাগুলির এক সঠিক বিবরণ পাওয়া যাবে; এবং দ্বিতীয়তঃ এক মহাপ্রাণ বিশ্বপ্রেমিক ইংরেজের ভারত ও ভারতবাসীর প্রতি যে প্রেম ছিল তা স্মৃতি হিসাবে রক্ষিত হবে। তিনি বলেছিলেন,—

"মিঃ ব্যানার্জী, আপনাকে যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ত আর আপনি জানতেন যে, জল্লাদদের খড়্গ আর দুমিনিট পরে আপনার শিরচ্ছেদ করবে সে অবস্থায় আপনার মাতৃভূমির জন্য বৃটিশ জনসাধারণের

কাছে সেই শেষ মুহূর্ত্তে আপনি কি বাণী রেখে যেতে ইচ্ছা করতেন ?"

মুহূর্ত্তের জন্যও দ্বিধা না করে' মিঃ ব্যানার্জ্জী উত্তর দিলেন,—

"আমি এই বলতাম : (১) বঙ্গভঙ্গ সংশোধন করুন ; (২) নির্ব্বাসিত দেশপ্রেমিকদিগকে মুক্তি দিন এবং যে-আইন দ্বারা বঙ্গদেশে কোন ব্যক্তিকে সশরীরে আদালতে উপস্থিত করার জন্য 'হেবিয়াস্ করপাস্' নামে যে আইন আছে, তা' বাতিল করা হয়েছে, সে আইনটিকে প্রত্যাহার করুন ; (৩) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে ক্ষমা করুন ; (৪) ভারতবাসীদিগকে তাদের নিজস্ব শুল্কনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দান করুন এবং (৫) ক্যানাডার অনুকরণে ভারতকে সংবিধান দান করুন। এই বলে আমি চরম দণ্ড গ্রহণের জন্য অগ্রসর হতাম।"

তিনি বললেন, "বেশ, এবার তা' হ'লে বিশদ আলোচনার দিকে যাওয়া যাক। আমি ত ভেবেছিলাম, আপনি বঙ্গভঙ্গের বাতিল চাইছিলেন ?"

"আমার ইচ্ছা তাই ছিল কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে, সম্ভবত উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বেই অভিমত প্রকাশ করার দরুন লর্ড মর্লেকে দোষারোপ করা হয়েছে এবং তার ফলে তিনি এখন এমন এক নীতি গ্রহণ করেছেন যে, তা' থেকে পিছিয়ে যেতে তাঁকে আর বলা চলে না। আমি কাজের লোক। সুতরাং বাতিলের দাবীর পরিবর্ত্তে আমি সংশোধনেরই দাবী তুলেছি।"

"কিন্তু আপনি বোধ হয় চাইছেন তার আমূল পরিবর্ত্তন ?"

"একজন লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের অধীনে বঙ্গদেশ থাকতে পারলে এবং ছয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি একজিক্যুটিভ কাউনসিলে দুজন ভারতীয়কে দেখতে পেলেই আমি খুসী হতাম। শেষ পর্য্যন্ত তাতেই আসতে হবে। কারণ বর্ত্তমানে পুরাতন প্রদেশের তুলনায় নূতন প্রদেশ অসম অবস্থায় রয়েছে। তাদের কোন একজিক্যুটিভ কাউনসিল নেই।

পরবর্ত্তী প্রস্তাব ছিল বিহারকে বঙ্গদেশ থেকে পৃথক করে নেওয়া। অনেককাল আগে থেকেই, এমন কি, সরকারী মহলেও এ প্রস্তাবটি সমর্থন পেয়ে আসছিল। ভাষা ও প্রজাতি হিসাবে বিহারের লোকেরা বাঙ্গালীদের থেকে ভিন্ন। বঙ্গদেশ বিভক্ত করবার জন্য কারণ হিসাবে যে সমস্ত প্রশাসনমূলক সুযোগসুবিধার কথা প্রথমাবধি বলা হয়েছিল বঙ্গদেশ থেকে বিহারকে পৃথক করলে সে সব সুযোগসুবিধা পাওয়া যাবে অথচ তাতে কারও জাতিগত মনোভাবেও আঘাত লাগবে না। লর্ড কার্জ্জনের তরবারি দিয়ে এই অস্বাভাবিক ভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে বাঙ্গালীজাতিকে যতদিন থাকতে হবে ততদিন এই উত্তেজনা আর বিশৃঙ্খলাও চলতে থাকবে।"

"এবার নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে ?"

"বিনা অভিযোগে বিনা বিচারে তাঁদের নির্ব্বাসিত করা কখনো উচিত নয়। তাঁদের এখনই বাড়ী ফিরে আসতে দেওয়া উচিত। আমি আশা করি এতে দেরী হবে না। তাঁরা সৎলোক এবং ন্যায় পরায়ণ, তাঁদের নির্ব্বাসিত করার কোন সংগত কারণই থাকতে পারে না।"

"এখন আপনার কর্ম্মসূচীর শেষ দফা সম্বন্ধে কি বলার আছে ?"

"ক্যানাডার সংবিধানের মত একটি সংবিধানই আমাদের চরম লক্ষ্য। তবে বাস্তব কর্ম্মী হিসাবে আমি বলব, তার প্রথম পদক্ষেপ হবে ভারতীয়দের নিকট থেকে রাজস্ব ও শুল্ক আকারে যে অর্থ সংগ্রহ হ'বে তার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার আমাদের লোককে দিতে হবে।"

"একটা আপোষ-মীমাংশার উদ্দেশ্যে আমি এ দুটি বিষয়কে বাদ দেব। তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত্ত বিভাগের জন্য যে ব্যয় হয় তা' নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আমাদের নিশ্চয় থাকা উচিত। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কাজ করতে ১৮৬১ সাল থেকে বলা হচ্ছে, অথচ, অনিচ্ছা বশতই হোক বা অবহেলা করেই হোক সেদিকে তেমন কিছু করা হয় নি। ফলে ভয়ানক ভাবে প্রাণহানি হয়েছে যদিও তা' অনিবার্য্য ছিল না।"

"১৯০৬ সাল থেকে রুশদেশে "ডুামা" নামে যে-ব্যবস্থা পরিষদ চলে' আসছে ভারতেও কি আপনি অনুরূপ কিছু চান?"

"সারা ভারতের প্রতিনিধিদের নিয়ে ভারতের ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাসম্পন্ন, পরিষদের অর্থে যদি বলে থাকেন, তা' হ'লে বলব "হ্যাঁ"। তবে আমি বলব, প্রথমে আমাদের প্রদেশের কোন-কোন বিভাগের ব্যয়ভার নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতাসহ আমাদিগকে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দিন। তারপর তাদের ভিত্তি করে' একটি কেন্দ্রীয় ফেডার্যাল কাউনসিল বা এসেম্বলী গড়ে তুলুন। আমরা তাই চাইছি। এবং আজই হোক আর কালই হোক তাই আমরা পেতে চাই।"

এই হ'ল মিঃ ব্যানার্জীর মাত্রা। এই হ'ল তাঁর কর্ম্মসূচী। সুরেন্দ্রনাথের নামের উচ্চারণের কাছাকাছি ইংরেজী শব্দ হ'ল "সারেণ্ডার নট" অর্থাৎ আত্মসমর্পণ বা পরাজয় নয়। আমার মনে হয় না যে, তাঁর কর্ম্মসূচীর কোন অংশই তিনি ত্যাগ করবেন। "পলমল গেজেটের" ও বার্ক-এর জীবনীকার জন মর্লে হয়ত তাঁর সব দাবীই মেনে নিতেন। তবে লর্ড মর্লের সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। তাঁর কথা স্বতন্ত্র।

মিঃ ষ্টিড যে ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, তদনুসারে এই হ'ল আমরা যেসব কথাবার্ত্তা বলেছিলাম তার সারাংশ। আমার বাণীতে আমি যে সকল প্রস্তাব দিয়েছিলাম তদনুসারে বঙ্গভঙ্গ সংশোধিত হবার তিন বৎসর পূর্ব্বে এবং ১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে মিঃ মণ্টেগু ভারতের জন্য ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস' ঘোষণা করবার আট বৎসর পূর্ব্বে, ১৯০৯ সালে আমি এই কথাগুলি বলেছিলাম। আমার সেই বাণীর এক অংশ ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। জীবনে আমি অনেক স্বপ্ন দেখেছি। তাদের মধ্যে কতকগুলি সফলও হয়েছে। অবশিষ্টগুলিও পূর্ণতা পাবার উদ্দেশ্যে সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে। এদের মধ্যে সমান মর্য্যাদায়, সমান অংশীদার হিসাবে, বৃটিশ কমনওয়েল্থ-এ আমাদের প্রবেশের

অধিকারকে আমি ভবিষ্যতের সুনিশ্চিতদের অন্যতম বলে মনে করি। মিঃ ষ্টিড, 'রিভিউ অব রিভিউ' নামক পত্রিকায় আমার পরিচয় দিয়ে আমার সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে একখানি চিঠি লিখে আমাকে সম্মানিত করেছিলেন। পাঠক-পাঠিকাদের অনুমতি ক্রমে আমি তা' এখানে উদ্ধৃত করছি—

"সাম্রাজ্যের পত্রিকা-সম্পাদকগণ যখন মধ্যাহ্নভোজনে যোগ দেবার জন্য সাটনে লর্ড নর্থক্লিফের ভদ্রাসনে গিয়েছিলেন তখন মিঃ ব্যানার্জীর সঙ্গে আমিও সেই পরম আনন্দদায়ক স্থানে গিয়েছিলাম। তখন তাঁর বুদ্ধির স্বচ্ছতা, ইংরেজী ভাষার উপর অদ্ভুত অধিকার এবং স্বদেশের প্রতি তাঁর গভীর একাগ্রতা লক্ষ্য করে' তাঁর সম্বন্ধে আমার এক অতিশয় উচ্চ ধারণা জন্মে। তাঁর ইংলণ্ড প্রবাসী স্বদেশীয়গণ যখন ওয়েষ্টমিনষ্টার প্যালেস হোটেলে তাঁর সম্মানে এক ভোজোৎসবের আয়োজন করেছিলেন তখন সেখানে আমারও নিমন্ত্রিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে সময় তাঁকে চমৎকার বাকশক্তিসম্পন্ন একজন বাগ্মী, কর্ম্মমুখী—মনোভাবাপন্ন ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন রাষ্ট্রনীতিবিদরূপে দেখতে পেয়ে পরম আনন্দ লাভ করেছিলাম। আমি আমার বাড়ীতে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলান। সেখানে তখন আমার আরও জন বার বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে ছিলেন মার্কিনী, ক্যানাডীয়, আইরিশ ও ভারতবাসী। মিঃ ব্যানার্জী অনুগ্রহ করে তখন বিভিন্ন বিষয়ের উপরে এক সাক্ষাৎকারে সম্মত হন। এই আলোচনার সংক্ষিপ্তসার এই নিবন্ধের মধ্যে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। মিঃ ব্যানার্জী দুবার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। একবার তিনি কারাবরণও করেছিলেন। 'বেঙ্গলী' নামক পত্রিকার সম্পাদনা তিনিই করেন। তাঁর খ্যাতি এতই অধিক যে, শোনা যায় বঙ্গদেশ বিভক্ত করার প্রতিবাদে তাঁকেই একবার বঙ্গদেশে রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করা হয়েছিল। কনফারেন্সে ভারতবাসীদের

পত্রিকাসমূহের তিনিই একমাত্র প্রতিনিধি। অথচ বাকচাতুর্য্যে, শক্তি-সামর্থ্যে, মনের উদারতায় এবং ব্যক্তিগত আকর্ষনীয়তায় সাম্রাজ্যের অপর কোন সম্পাদক তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে সমর্থ হন নি।"

অনেকেরই, এমন কি আমাদের দলে যাঁদের উৎসাহ ছিল অদম্য ; তাঁদেরও, ধারণা হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বিফল হয়েছে। কেবল দুর্লভ এক আশা নিয়ে আমিই তা' চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বাস্তবিক পক্ষে আমি কিন্তু নিরাশ ছিলাম না এবং নিরাশ হবার মত সামান্য কারণও কোনদিন আমার অন্তরে স্থান পায় নি। আমার চিরআশাবাদী মন আমাকে তাতে বরাবর সহায়তাই করেছে। আমার পায়ের তলার মাটি বেশ শক্ত ছিল। বিলেতে যাঁরা ছিলেন জনমতের প্রধান নায়ক, যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার আমার সুযোগ হয়েছিল এবং যাঁদের মধ্যে প্রায় সমস্ত দলেরই লোক ছিলেন, বঙ্গদেশ বিভক্ত করার ব্যাপারে এবং শেষ মুহূর্তে যে-প্রকারে তা' করা হয়েছিল তাতে তাঁদের কাহারও সমর্থন ছিল না। তাঁদের মধ্যে একজন আমায় বলেছিলেন, "মর্লে একে উলটিয়ে দিচ্ছে না কেন ?" প্রকৃত পক্ষে একমাত্র লর্ড মর্লের প্রভাব ও নামের জোরেই তা' তখনো টিকে ছিল। আমার মনে হয়েছিল আর কিছু দিন আন্দোলনটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে বঙ্গভঙ্গ লোপ পাবে। অবিলম্বেই দেখা গেল স্রোত আমাদের অনুকূলে ঘুরে গেল। যারা অপেক্ষা করতে জানে তাদের কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। জনসাধারণের কাজ করতে গেলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দরকার ধৈর্য্য আর শেষ পর্য্যন্ত সব ভাল হবে বলে' আশা পোষণ করা। এটিই আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার সমস্ত শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসার সঙ্গে আমার দেশবাসীগণকে আমি তাহাই দিয়ে যাচ্ছি।

অষ্টবিংশতি অধ্যায়

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন

লর্ড মিণ্টোর পরে ১৯১০ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভাইসরয় নিযুক্ত হলেন। লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে আমার বহুবার দেখা এবং সাক্ষাৎকারও হয়েছিল। তিনি ছিলেন এক অতি উত্তম প্রকৃতির ইংরেজ ভদ্রলোক। মনোবৃত্তি ছিল উদার, কিন্তু নিজ থেকে কিছু করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না বললেই চলে। মর্লে-মিণ্টো পরিকল্পনার প্রণেতাদ্বয়ের অন্যতম বলে' তিনি ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তবে লর্ড মর্লের "রিকালেকশনস" নামক পুস্তক পাঠ করলে বাস্তবিক চালকশক্তি যে কোথায় ছিল সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। ভারতের আইন সভাগুলিতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধি প্রেরণের রীতি প্রচলনের কৃতিত্ব ছিল লর্ড মিণ্টোরই। এই জটাজাল থেকে মুক্ত হতে ভারতের বহু বৎসর সময় লাগবে। একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে বঙ্গদেশকে বিভক্ত করার বিষয় নিয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। কথাবার্ত্তার মধ্যে তাঁর লুকোচুরি ছিল না, যা' বলবার পরিষ্কার ভাষায় তা' ব্যক্ত করতেন। কিন্তু সেই যে "সেটেল্‌ড ফ্যাক্‌ট" বা নিশ্চিত ব্যবস্থা সে বিষয়ে তাঁর কথার কোন নড়চড় ছিল না। তিনি বললেন, "মিঃ ব্যানার্জী, আপনার প্রদেশকে যে ভাবে খণ্ডিত করা হয়েছে আমার দেশকে যদি সেরূপে খণ্ডিত করা হত তা' হলে আপনার মনের যে অবস্থা হয়েছে আমারও তাই হত"। তাঁর মনে যা ছিল তা' আমায় বলেছিলেন; কিন্তু আমাকে কোনরূপ সাহায্য দেবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা যখন আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' বঙ্গভঙ্গ সংশোধন করবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম, তিনি লর্ড মর্লের মতের পুনরুল্লেখ করে বললেন, বঙ্গভঙ্গ একটি 'সেটেল্‌ড ফ্যাক্‌ট' অর্থাৎ এ ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তনীয়।"

আমাদের কোন কোন বন্ধু মনে করেছিলেন যে, এভাবে অনুরোধ করা আমাদের উচিত হয় নি, কারণ ভারত সচিব বারবারই একথা ঘোষণা করেছেন। বিলেতে আমাদের যে সকল বন্ধু ছিলেন, এমন কি, মিঃ ডবল্যু. সি. ব্যানার্জীও, তাঁরা সকলেই ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁদের মত ছিল, বঙ্গদেশ বিভক্ত করার প্রশ্নটি আমাদের পক্ষে ছিল অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং ভাইসরয়-এর কাছে কিছু বলতে গেলে এ বিষয়টিকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। এরূপ একটা সুযোগ পেয়ে সে বিষয়ে কিছু না বলার অর্থ হবে এসময়ের সমস্যাগুলির মধ্যে তাকে অপ্রধান ও খাটো করে দেওয়া। যে ভাবেই হোক, এটি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বঙ্গভঙ্গ সংশোধন করবার জন্য লর্ড মিণ্টো কিছুই করবেন না। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত হবার মত কিছু না থাকলেও, আমরা মনে করেছিলাম যে, হয়ত লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর অনুকূল হবে।

লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন ভারতে এলেন তখন এদেশ সম্বন্ধে তিনি অন্যদের তুলনায় ছিলেন অনভিজ্ঞ। ইংরেজদের জনহিতকর কাজকর্ম্মের সঙ্গে তিনি কখনো যুক্ত ছিলেন না। কূটনীতি ছিল তাঁর ব্যবসা। তিনি যখন ভাইসরয় পদে নিযুক্ত হলেন, ভারতের লোকেরা তাঁর সম্বন্ধে ভালমন্দ সবই কল্পনা করতে লাগলেন। কিন্তু বারটি মাস অতিবাহিত হবার পূর্ব্বেই আমরা অনুভব করতে লাগলাম যে, তিনিও ভারতের ভাইসরয়দের প্রথম সারিতে বেন্টিংক, ক্যানিং ও রিপনের পাশেই তাঁর আসন করে নেবেন।

একজন নূতন ভাইসরয় সরকার পরিচালনার ভার গ্রহণ করবার পর আমরা স্থির করলাম আমরা সমস্ত বিষয় তাঁর গোচরে আনব এবং বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে লোকের যে মনোভাব তাও তাঁকে জানিয়ে দেব। তদনুসারে জানুয়ারী মাসের প্রথমের দিকে এসব বিবেচনার জন্য টাউন হলে একটি জনসভা আহ্বান করলাম। এ সংবাদ প্রচার হবার দু'একদিনের

মধ্যেই লাটভবন থেকে এই মর্ম্মে এক জরুরী আমন্ত্রণ পত্র পেলাম যেন তার পরের দিনই আমি গিয়ে মহামান্য ভাইসরয়-এর সঙ্গে দেখা করি। ইতিপূর্ব্বে এভাবে আমি কখনো তলব পাই নি। তবে এ নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য আমি আন্দাজ করে' নিলাম। আমি মনে করলাম টাউন হলের সভার বিষয়ে সংবাদ জানবার জন্যই আমাকে ডেকেছেন। বাস্তবেও তাই সত্য হ'ল। গতানুগতিক অভিবাদন শেষ হওয়ার পর আমরা টাউন হলে কি জন্য সভা ডাকছি তা' তিনি জানতে চাইলেন! উত্তরে আমি বললাম, "বঙ্গভঙ্গ নিয়ে বঙ্গদেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সে বিষয়ে আপনাকে জানানই তার উদ্দেশ্য"। তিনি বললেন, "জনসভার পরিবর্ত্তে একটি স্মারকলিপি দিয়েই ত তা' করা যায়।" আমি বললাম, "আপনি নিজে যদি সেই স্মারকলিপি দেখেন এবং আমাদের নেতা, জিলার যারা নেতা, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেন, তা' হলে জনসভা ডাকবার আর প্রয়োজন হয় না"। তিনি জানালেন, তাঁর অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করে' তিনি তাই করবেন। আমি বললাম, "মাই লর্ড, সরকারের পদস্থ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে বহুবার আলোচনা হয়েছে এবং তাঁরা তাঁদের মতামতও জানিয়েছেন। এখন কেবল আমাদের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করাই বাকী রয়েছে।" লর্ড হার্ডিঞ্জ সানুগ্রহে আমার কথা মেনে নিলেন। সুতরাং টাউন হলের জনসভাও আর হ'ল না।

প্রধানত ফরিদপুরের 'গ্রাণ্ড ওলডম্যান' শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু অম্বিকা চরণ মজুমদার মহাশয়ের সহায়তায় আমি একখানি স্মারকলিপি প্রস্তুত করে' প্রভাবশালী ও প্রতিনিধিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য জিলার নেতৃবর্গের কাছে তা' প্রেরণ করলাম। তাঁদের আমি অনুরোধ করলাম তাঁরা যেন এই স্মারকলিপির কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখেন যাতে সরকারী আমলাদের প্ররোচনা পেয়ে অন্য কোন পক্ষ কোন প্রতি-আন্দোলন আরম্ভ করতে না পারেন। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তাঁরা আমার এ অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। লিপির বিষয়বস্তু কখনো প্রকাশ

পেল না। তবে রাজশাহী জিলার পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট জানতে পেরেছিলেন যে, একখানি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্মারকলিপি স্বাক্ষরিত হচ্ছে এবং তিনি তার একখানি নকলও চেয়ে পাঠালেন। সে জিলায় স্বাক্ষর সংগ্রহের ভার ছিল বন্ধুবর কিশোরী মোহন চৌধুরীর উপর। তিনি আমার নিকট থেকে পরামর্শ চাইলেন। তার উত্তরে আমি জানিয়ে দিলাম যে, স্মারকলিপিখানি একান্ত গোপন এবং কেবলমাত্র যাঁরা স্বাক্ষর দেবেন তাঁদের ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিকে দেখাবার প্রয়োজন নেই।

বঙ্গদেশের পঁচিশটি জিলার মধ্যে আঠারটি জিলার প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর সহ স্মারকলিপিখানি ১৯১১ সালের জুন মাসের শেষের দিকে দাখিল করা হ'ল। আর বঙ্গভঙ্গকে সংশোধন করবার সুপারিশ করে' ভারত সরকার যে জরুরীপত্র প্রেরণ করেছিলেন তার তারিখ ছিল ১৯১১ সালের ২৫শে আগষ্ট। স্মারকলিপিতে আমরা যে সমস্ত কারণের উল্লেখ করেছিলাম, ভারত সরকার সেগুলিকে বঙ্গভঙ্গ সংশোধনের সংগত কারণ বলে' মেনে নিয়ে জরুরীপত্রের মধ্যে সেগুলির উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।

১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীতে মহামান্য সম্রাটের এক ঘোষণাবলে বঙ্গভঙ্গ সংশোধিত হ'ল। আমি এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই এ বিষয়ে জেনেছিলাম, তবে সংবাদপত্র সমূহ ও জনসাধারণের নিকট থেকে তা' গোপন রাখা হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে সরকারী আমলা ও অন্য যারা এ বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিল, তারা ঘোষণা না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই জানত না এবং এ সংবাদ পাবার পর অনেকে বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েছিল। এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে ঢাকার পরলোকগত নবাব সলিমউল্লা ছিলেন অন্যতম। বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করতে ও পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মতি আদায়ে তিনি ছিলেন সরকারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। তাঁকে শান্ত করবার জন্য জি. সি. আই. ই. উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করা হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত সমন্বয় সাধন বা প্রত্যয় লাভ তাঁর পক্ষে

সম্ভব হয় নি। ভদ্রলোক হিসাবে নবাব ছিলেন অদ্বিতীয়। রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি ছিলেন সংকীর্ণমনা কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন ও বিচক্ষণ। আর তার ফলে তিনি ছিলেন তাঁর সমর্থকদের ও সরকারের শক্তির স্তম্ভ।

ইতিমধ্যে কোলকাতায় লোকে অনেক কিছুই আশা করতে লাগল। দিল্লীতে দরবার হবে, সকলে সেদিকেই চেয়ে রইল। প্রত্যেকেই আশা করতে লাগল একটা কিছু ঘোষণা হবে। রাজা ভারতে এসেছেন। সকলেই ভাবলেন বঙ্গদেশের সমস্ত উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়ে রাজা লোক কল্যাণের জন্য কিছু কাজ করবেন। তবে নিশ্চিত ভাবে কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু আশা একটি বিন্দুর উপরেও একটি পিরামিড নির্ম্মাণ করে। সমস্ত দিন প্রত্যাশী দর্শকেরা 'বেঙ্গলী' পত্রিকা অফিসে ভীড় জমাতে লাগল। দিল্লীর সংবাদের জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলল। সমবেত দর্শকদের মুখে হতাশার চিহ্ন দেখা দিতে লাগল। অপরাহ্নও গড়িয়ে গেল, তবুও বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। সেদিন অত্যন্ত দেরীতে য়্যাসোসিয়েটেড প্রেস দিল্লীর এক সংবাদ পাঠাল। কিন্তু তাতে বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে কোনই সংবাদ ছিল না। আমার সম্পাদকের দপ্তরে আমার বন্ধুরা এসে বসে ছিলেন। দিল্লীর শেষ খবরেও বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে কিছু না থাকার দরুন, যাঁরা এতক্ষণ ছিলেন সংবাদ জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব তাঁরাও নিরাশ হয়ে পড়তে লাগলেন। পরের দিন পত্রিকায় প্রকাশিত হবার জন্য আমি একটি নিবন্ধ বলে যেতে লাগলাম এবং একব্যক্তি তা' লিখে নিতে লাগল। বঙ্গভঙ্গ সংশোধিত না হওয়ায় আমি গভীর দুঃখ প্রকাশ ক'রে আমাদের জনগণকে হতাশ না হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য সে নিবন্ধে অনুরোধ জানালাম।

নিবন্ধটি লিখে নেবার পর আমি তা' দেখে সংশোধন করে' দিয়ে অফিস থেকে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হবার উদ্দেশ্যে নিচে যেতেই

একটি টেলিফোন এল। টেলিফোন ধরে সংবাদ পেলাম বঙ্গভঙ্গ সংশোধিত হয়েছে। 'বেঙ্গলী' পত্রিকা অফিসের সম্মুখে লোকের ভীড় জমে গেল। সংবাদটিও দেখতে-দেখতে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক অফিসের সামনে এসে জমা হ'ল। কলেজ স্কোয়ারে বিরাট এক জনতার সমাবেশ হ'ল। আমার বন্ধুরা আমাকে ধরে এক গাড়ীতে চাপিয়ে এক প্রকার জোর করেই টেনে নিয়ে গেল কলেজ স্কোয়ারে। সেখানে দেখলাম উত্তেজনার বশে সকলে যেন পাগল হয়ে উঠেছে। তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে। বাতি নেই। আমরা একজন আর একজনকে দেখতেই পাচ্ছি না। কিন্তু লোকের আনন্দ কোলাহল আর মাঝে মাঝে নানা প্রকারের প্রশ্ন কানে আসতে লাগল। জনতার ভিতর থেকে একটি প্রশ্ন কানে এল, "রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়ে আপনার মত কি?" তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর দিলাম, "তাতে আমাদের বিশেষ কিছুই আসবে যাবে না।" পরবর্ত্তী ঘটনা থেকে দেখা গেল, বিশেষ না ভেবেচিন্তে যা বলেছিলাম মোটামুটি তা' ঠিকই হয়েছিল।

সমস্ত বাংলাভাষাভাষীদের পুনরায় পূর্ব্বের মত একত্র করে একজাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমি ও আমার বন্ধুগণ ছয় বৎসর যাবৎ যে পরিশ্রম করেছিলাম তা' যে বিফল হয় নি সে কথা চিন্তা করতে করতে প্রফুল্ল চিত্তে আমি সভা থেকে বাড়ী ফিরলাম। একদিকে আমরা ছিলাম নাছোড়বান্দা, অন্যদিকে আমাদের সফলতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত। সমস্ত অবৈধ্য নীতি ও তা' থেকে উদ্ভূত বা তাতে পরিপুষ্ট অসংযত উন্মাদনাকে আমরা ধর্ম্ম পালনের মত একাগ্রতার সঙ্গে পরিহার করেছিলাম। এমন কি, পুলিশ যখন আমাদের উপর আক্রমণ করেছিল তখনো আমরা পাল্টা আক্রমণ করবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করি নি। পুলিশ যতবার আমাদের উপর লাঠির আঘাত করেছিল ততবার আমরা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়েছিলাম এবং পরে প্রতিবিধানের জন্য আইন

অনুসারে আদালতের শরণ নিয়েছিলাম। আমরা গ্রহণ করেছিলাম নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পন্থা। আত্মার শক্তিতে আমাদের বিশ্বাস ছিল। তবে আমাদের অন্তরে এমন কোন ভ্রান্তি ছিল না যে, কেবলমাত্র আত্ম সংযমে সুশিক্ষিত ও জনসেবার কাজে শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্যে এ উপায়ে জাতির সেবা অথবা কোন উপকার সাধিত হতে পারে। বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাসের যে পৃষ্ঠাগুলি অনেক দুঃখজনক ঘটনার ফলে মসীলিপ্ত হয়েছে, তজ্জন্য একমাত্র দায়ী—পরিস্থিতির বিচার না করে কেবল নীতি প্রয়োগের অপচেষ্টা।

দুঃখের বিষয় এই যে, ১৯০৬ সালে এই বঙ্গভঙ্গকে সংশোধন করা হল না। সে সময় হাউস অব কমন-এ বসে মিঃ জন মর্লে বঙ্গভঙ্গ নীতির নিন্দা করে' বলেছিলেন, "এটি এমনই এক ব্যবস্থা যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অধিকাংশের ইচ্ছার সম্পূর্ণ ও নিশ্চিত বিরোধী" এবং সঙ্গে সঙ্গেই একে একটি "অপরিবর্ত্তনীয় ব্যবস্থা" বলেও অভিহিত করেছিলেন। এই ঘোষনার মধ্যে আরম্ভের সঙ্গে উপসংহারের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। তার ফলে সকলেই অধিকতর বিরক্ত হ'ল আর উত্তেজনাও বেড়ে চলল। বঙ্গভঙ্গের সন্ত্রাসবাদভিত্তিক বিপ্লবীআন্দোলনের মূল কারণ বঙ্গভঙ্গ ও তাকে সমর্থন করবার জন্য যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল সেই নীতি। আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে, যখন এই আন্দোলন গুরুতর আকার ধারণ করছিল এবং উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিল তখন যদি বঙ্গভঙ্গ সংশোধিত হ'ত, তা হ'লে বঙ্গদেশের এবং সম্ভবত ভারতেরও ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হ'ত। এবং আমাদের প্রদেশে সন্ত্রাসবাদের চিহ্নমাত্র পাওয়া যেত না। এক্ষেত্রেও উপযুক্ত সময় হেলায় বিনষ্ট হ'ল এবং সংশোধন যখন এল তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। "অনেক দেরী হয়ে গেছে" কথাগুলি বৃটিশ-নীতির রেখায় রেখায় যেন আর একবার লিখিত হয়ে গেল।

যে সমস্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বঙ্গভঙ্গবিরোধী ও স্বদেশী অন্দোলনে

যোগ দিয়েছিলেন এবং দুঃখ কষ্ট বরণ করেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের সম্পর্কে উল্লেখ না করে' আমি বিষয়ান্তরে যেতে পারছি না। তাঁদের মধ্যে কোনকোন ব্যক্তি এখন আর ইহজগতে নেই। এঁদের মধ্যে মিঃ আনন্দমোহন বোস, ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার ও মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্য প্রসঙ্গে অন্যত্র আমি আনন্দমোহন বোস ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু সম্পর্কে লিখেছি। বঙ্গভঙ্গ বিতর্ক আরম্ভ হবার পূর্ব্বে মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী রাজনীতিতে কোন উৎসাহ পেতেন না। তাঁর ছিল প্রচুর অর্থসম্পত্তি এবং শিকার নিয়েই তিনি মেতে থাকতেন। তিনি তার প্রতি যেরূপ গুরুত্ব দিতেন অনেকে আপন আপন ব্যবসাবানিজ্যের প্রতিও সেরূপ গুরুত্ব আরোপ করে না। স্বভাবতই তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী লোক। আর কোন কিছুতে একবার তাঁর আগ্রহ হ'লে তা' লাভ করবার জন্য শ্রম কিম্বা অর্থ ব্যয়ে তিনি কণামাত্রও দ্বিধা করতেন না। যে ব্যবস্থা প্রচলন করতে সরকার নিজে উদগ্রীব, সে ব্যবস্থার প্রতিরোধ করবার জন্য সরকারের বিপক্ষে দাঁড়াতে সেযুগে তাঁর মত অবস্থার লোকের পক্ষে কম সাহস ও মনোবলের প্রয়োজন হ'ত না। আইন সভাতে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া অপেক্ষা তা' ছিল অনেক কঠিন ব্যাপার। লর্ড কার্জ্জন পূর্ব্বাঞ্চল পরিদর্শনে গিয়ে মহারাজার প্রধান কর্ম্মস্থল ময়মনসিংহ জিলায় যান এবং সেখানে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাজসুলভ আতিথেয়তা সহকারে তিনি ভাইসরয়কে আপ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা থেকে মহারাজা এক পা'ও নড়লেন না। অধিকন্তু স্পষ্টভাবে ভাইসরয়কে তিনি তাঁর অভিমত জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এই আচরণ তিনি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করেছিলেন। এমন কি, সরকার যখন দেশময় নিপীড়ন আরম্ভ করেছিল, বঙ্গভঙ্গের বিরোধী আন্দোলনের নেতৃবর্গকে যখন কর্ত্তৃপক্ষ রাজনৈতিক অপরাধী

বলে সন্দেহের চোখে দেখতেন, সেই ঘোর অন্ধকারময় দিনগুলিতেও মহারাজা ছিলেন তাঁর সঙ্কল্পে অটল।

১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট তিনি যে তৎকালে প্রাপ্তিসাধ্য একমাত্র দেশীবস্ত্র অত্যন্ত মোটা কাপড় পরিহিত হয়ে প্রথম বিদেশী পণ্য বর্জ্জন উদ্দেশ্যে আহূত সভায় যোগ দিয়েছিলেন তা' আমার পরিষ্কার মনে আছে। তাঁর লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ীতেই আমাদের অনেক সভা হ'ত এবং আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কল্প গ্রহণ করতাম। বঙ্গদেশ থেকে নির্ব্বাসন ব্যবস্থা আরম্ভ হবার প্রাক্কালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। অনেকে এরূপও আশঙ্কা করেছিলেন যে, তিনি বেঁচে থাকলে হয়ত তাঁর অপরাপর বন্ধু ও সহকর্ম্মীদের ন্যায় তাঁকেও একই দুর্ভোগ ভুগতে হ'ত। তবে এ আশঙ্কার ভিত্তি বোধহয় বিশেষ কিছু ছিল না। পূর্ব্ববঙ্গের জমিদারদের মধ্যে তাঁর শূন্য স্থান তখনো পূর্ণ হয় নি। সাহস, শৌর্য্য, মনোবল ইত্যাদির গুণে তিনি ছিলেন তাঁর শ্রেণীর ব্যক্তিদের অনেক উর্দ্ধে। এবং যে দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন তা' চিরদিন পথপ্রদর্শক ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

বরিশালের বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন আর একজন পূর্ব্ববঙ্গীয় নেতা যিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের মালিক। তাঁর পিতৃদেবের সম্মানে পিতৃভক্তির নিদর্শন হিসাবে তিনি এই স্মৃতিমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের একাগ্রতা ও সংগঠনশক্তির ফলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পূর্ব্ববঙ্গে তথা সমগ্র প্রদেশে সর্ব্বাধিক সফল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম হয়ে উঠেছিল। তাঁর এক সহকর্ম্মী ব্রজমোহন কলেজের বাবু শতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহায়ে সমগ্র জিলাটিকে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের জন্য সংগঠিত করেছিলেন। এই সংস্থাগুলি চমৎকার কাজ করেছিল। বরিশালে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল মিঃ দত্ত দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের অনেক সাহায্য করতে সমর্থ

হয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদের ত্রাণ কার্য্য ও স্বদেশী প্রচার কাজ একই সঙ্গে চলতে থাকে।

তখনকার দিনগুলি ছিল সরকারী আমলা ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদের সময়। সরকারের অসন্তুষ্টি বলতে যত কিছু বোঝায় তার সমস্ত চাপটাই বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ও তাঁর বন্ধুদিগকে সহ্য করতে হয়েছিল। ১৯০৮ সালে মিঃ দত্ত এবং তাঁর বন্ধু ও সহকারী মিঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত হলেন। কেন যে তাঁরা নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন তা' বোধহয় সরকারী গুহ্য বিষয় হিসাবে বহুকাল পর্য্যন্তই অপ্রকাশিত থেকে যাবে। বিনাবিচারে নির্ব্বাসন এমনিতেই সাধারণ আইন ও ন্যায়ের দৃষ্টিতে ঘৃণার যোগ্য। তা' ছাড়াও অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অশ্বিনীকুমার দত্ত গু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যাঁরা কোনদিন কোন অবৈধনীতি কল্পনা পর্য্যন্ত করেন নি বা জীবনে কোন নীতিবিরুদ্ধ কাজের কথা উচ্চারণ পর্য্যন্ত করেন নি, তাঁদের সঙ্গেই আপাতদৃষ্টিতে যাঁরা রাজদ্রোহী বলে গণ্য তাঁদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য যে পুরাতন ও বিস্মৃত এক আইন, তারই প্রয়োগ করে' এরূপ ভাবে ব্যবহার করা হ'ল। সাধারণ লোকের মনে তখন এধারণা হয়েছিল যে, কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন স্বদেশীবাদ দমন করতে ও জনকয়েক প্রধান প্রধান নেতার বিরুদ্ধে এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে' স্বদেশী আন্দোলনের কর্ম্মীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করতে। কিন্তু নিপীড়নে স্বদেশীবাদ মারা পড়ল না। মারা পড়ল প্রধানত বহু স্বদেশী শিল্পোদ্যোগের নিষ্ফলতায় ও বঙ্গভঙ্গের সংশোধনের ফলে তার মূল কারণগুলি অপসারিত হওয়ায়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অপর এক শ্রেষ্ঠ নেতা ঢাকার বাবু আনন্দচন্দ্র রায়ের কথা এবার আলোচনা করা যাক। ঢাকা আইনজীবী সংস্থার অবিসংবাদী নেতা আনন্দচন্দ্র রায় সে সহরের হিন্দু নেতাদের মধ্যে এক

অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। আর তাঁর সমস্ত প্রভাবই তিনি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রগতি ও বঙ্গভঙ্গ সংশোধনের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। বঙ্গদেশ বিভক্ত হ'লে ঢাকা শহর নূতন প্রদেশের রাজধানী হবে এবং তার আনুষঙ্গিক সমস্ত সুযোগ সুবিধা ঢাকার নাগরিকদের সহজ লভ্য হবে। তৎসত্ত্বেও কেবল মাত্র বঙ্গভাষাভাষীদের একত্ব রক্ষার আদর্শ নিয়ে বাবু আনন্দচন্দ্র রায় ও ঢাকার নাগরিকেরা যে ভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে বঙ্গদেশ ভঙ্গ করার বিরোধিতা করেছিলেন, তা' থেকে জনস্বার্থে ঢাকার হিন্দুদের উৎসাহের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আনন্দচন্দ্র রায় ছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অদম্য ব্যক্তিদিগের অন্যতম এবং বঙ্গদেশকে বিভক্তকরার প্রতিরোধ করতে তিনি কোনদিনই দ্বিধা করেন নি। ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু রায় ছিলেন এ শ্রেনীরই অপর একজন নেতা। ময়মনসিংহের আইনজ্ঞদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হিসাবে তাঁর খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তবে সে যুগে জননেতা হওয়ার ফল হ'ত কর্ত্তৃপক্ষের কুনজরে পড়া। অনাথবন্ধুর উপরও ছিল সরকারের বিষ নজর। তিনি নির্ব্বাসিত হন নি। প্রায় হতে-হতেই বেঁচে গিয়েছিলেন। তবে শান্তি রক্ষার জন্য ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১১০ ধারা অনুসারে তাঁকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তাঁর মত মর্য্যাদা সম্পন্ন লোকের পক্ষে এরূপ আদেশ ছিল নিতান্ত অপমানজনক। কিন্তু তাঁর পক্ষে এটি শুধুমাত্র এক মানসিক অসন্তোষের কারণই ছিল না, এজন্য তাঁকে ভুগতেও হয়েছিল। কারণ তৎকালীন নিয়মানুসারে এর জন্য তিনি আইনসভার নির্ব্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াবারও অযোগ্য বলে' গণ্য হয়েছিলেন। এই অযোগ্যতা অপসারণের ক্ষমতা ছিল স্থানীয় সরকারের। কিন্তু তিনি যখন তজ্জন্য সরকারের কাছে আবেদন করলেন তখন সে আবেদনও অগ্রাহ্য হ'ল। সৌভাগ্যবশত 'সাউথ বারো' কমিটির সুপারিশের সাথেসাথে এনিয়ম ও এরূপ আরও অনেক

নিয়ম এখন দূরীভূত হয়েছে এবং প্রশাসকদের স্বেচ্ছানুসারে কার্য্যের ক্ষমতার পরিধি অনেকাংশে হ্রাস করা হয়েছে।

বঙ্গভঙ্গের বিরোধ ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন সে-সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে আর একজন ছিলেন বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার। তিনি ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুরের অধিবাসী। লোকে তাঁকে যথার্থই ফরিদপুরের "গ্র্যাণ্ড ওল্ডম্যান" আখ্যা দিয়েছিল। জ্ঞান-বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য, বাগ্মিতার ক্ষমতা, অবিচল দেশপ্রেম ও দেশভক্তির জন্য তিনি সে সময়ে বঙ্গদেশের নেতৃবর্গের পুরোভাগে স্থান লাভ করেছিলেন। প্রথমে বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপোলিটন ইনিষ্টিট্যুশনে তিনি ছিলেন আমার সহকর্ম্মী। কিন্তু নিতান্ত তরুণ বয়সেই তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন এবং তারপ্রতি তাঁর উৎসাহ কোনদিন হ্রাস পায়নি। কংগ্রেসের জন্মাবধিই তিনি তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৬ সালে এক স্মরণীয় কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। সর্ব্বসাধারণের রাজনৈতিক অগ্রগতির উপায় হিসাবে লক্ষ্ণৌ কনভেনশনে হিন্দু-মুসলমানের একতার যে প্রস্তাব হয়েছিল, তা' চূড়ান্ত ভাবে এই অধিবেশনে গৃহীত হয়েছিল।

বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার পর অম্বিকাচরণ মজুমদার এতই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, একবার তিনি আমায় বলেছিলেন—তা' যদি সংশোধন না হয় তা' হলে তিনি তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় করে' পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে বসবাস করবেন। এবং তাঁর জন্য ২৪ পরগণা জিলায় কিছু জমি ক্রয় করতে আমাকে একান্ত অনুরোধ করেছিলেন। ফরিদপুরে স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তিনিই নিয়ন্ত্রণ করতেন। এজন্য যখনই প্রয়োজন হ'ত পরামর্শ দিতে ও সক্রিয় ভাবে সাহায্য করতে সর্ব্বদাই তিনি প্রস্তুত থাকতেন। সেখানে তাঁর এত প্রভাব ছিল যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন খুব জোর চলছে তখন

লেফটেন্যান্ট গভর্ণর একবার ফরিদপুর গিয়ে দেখলেন রেলষ্টেশনে একজন শ্রমিকও নেই। অবশেষে প্রদেশের শাসকের মালপত্র বহন করবার জন্য পুলিশের অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করতে হয়েছিল।

একজন খ্যাতনামা লেখক বলেছেন, মানুষের পারিবারিক স্নেহমমতাই ক্রমশ সমাজে বিস্তৃতি লাভ করে। এবং শান্ত গ্রামীন জীবনের গৃহের পবিত্রতার মধ্যেই দেশপ্রেমের মূল নিবদ্ধ। তাঁর নিজ জিলা ফরিদপুর অম্বিকাচরণ মজুমদারকে তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারক বলে চিরদিন মনে রাখবে। বহু বৎসর পর্য্যন্ত তিনি ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা, উৎসাহ ও চেষ্টার ফলে সে শহরে জল সরবরাহের কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। ফরিদপুর কলেজ নামে যে-কলেজটি সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে, তাও তাঁর অবিচল স্বদেশপ্রেম জনসেবা, বাস্তবিক কিছু সম্পাদন করবার ক্ষমতা ও যে সমস্ত লোকের মধ্যে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ও যাঁদের সঙ্গে তিনি বসবাস করেছিলেন তাদের প্রতি তাঁর অনুরাগের অপর এক স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে। অসুখে শয্যাগত, শোকতাপে জর্জ্জরিত, গৃহ অন্ধকার—এরূপ অবস্থাতেও তিনি ছিলেন নির্ব্বিকার। জনসেবার সঙ্কল্পে তিনি ছিলেন অটল। এবং মাঝেমাঝে যখনই প্রয়োজন হ'ত এই "জ্ঞানবৃদ্ধ" তাঁর যৌবনের দিনগুলির কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলে যেতেন। শাসন সংস্কার পরিকল্পনা নিয়ে জাতীয় দলের দুই পক্ষের মধ্যে যখন বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তখনো অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের মনে কোন সংশয় বা আশংকা ছিল না। নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই তিনি সারা জীবন যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছেন, সে সমস্ত নরমপন্থী বন্ধুদের সঙ্গেই তিনি ভাগ্য পরীক্ষা করবার মনস্থ করেছিলেন।

ঊনত্রিংশতি অধ্যায়

ইম্পিরিয়্যাল কাউন্সিলে কাজকর্ম্ম

বঙ্গভঙ্গ সংশোধিত হওয়ার পর লেজিসলেটিভ কাউনসিলে যোগ দিতে আমার যে আপত্তি ছিল তা' দূর হয়ে গেল। ১৯১৩ সালের প্রথমের দিকে আমি ইম্পিরিয়্যাল ও বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে নির্ব্বাচন প্রার্থী হয়ে দাঁড়াই। সর্ব্বাধিক ভোট পেয়ে উভয় ক্ষেত্রেই আমি জয় লাভ করি, তবে সেজন্য আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। অনেক ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম করতে হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের বিরোধী অভিযান আমি তখন সবে শেষ করেছি। সর্ব্বত্র বেশ টানাপোড়েন চলছে। অনেক শত্রু তখন আমার জুটে গেছে। অনেককে অনেক কটু কথা আমায় বলতে হয়েছে। আমি যাতে ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কানসিলে নির্ব্বাচনের জন্য অযোগ্য হই সেজন্য ঐ সমস্ত লোককে এখন আনা হ'ল। লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার এডওয়ার্ড বেকার বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে যেতে আমার যা' অযোগ্যতা ছিল সে সমস্ত অপসারিত করে' দিলেন। প্রায় চল্লিশবছর পূর্ব্বে আমাকে সিভিল সার্ভিস থেকে পদচ্যুত করার ফলে উপরের কাউনসিলে যেতে আমার যে বাধা ছিল এখনও তা' পূর্ব্ববৎ রয়ে গেল। লর্ড হার্ডিঞ্জের জীবনের উপর যে নৃশংস আক্রমন হয়েছিল তার দরুণ অসুস্থ হয়ে তিনি তখন দেরাদুনে ছিলেন। একজিকিউটিভ কাউনসিলের সিনিয়র মেম্বর স্যার গাই ফ্লিটউড উইলসনের উপর সরকার পরিচালনার ভার ছিল। তিনি ছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন। আমার উক্ত অযোগ্যতার বিষয় বিবেচনার ভার পড়ল তাঁর এবং তাঁর সহকর্ম্মীদের উপর। অনুসন্ধান আরম্ভ হল। কোলকাতার ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরী থেকে

'বেঙ্গলী' পত্রিকার অনেকগুলি ভল্যুম চেয়ে নেওয়া হ'ল। এবং তার মধ্যে কোথাও রাজদ্রোহের কোন গন্ধ পাওয়া যায় কি না খুব সতর্কতার সঙ্গে তার খোঁজ করা হ'ল।

ইতিমধ্যে নির্ব্বাচনে বিলম্ব হওয়ার দরুণ বঙ্গদেশের গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল অধীর হয়ে পড়ছিলেন। বহু ইউরোপীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীসহ আমার বন্ধুদের ভয় হচ্ছিল যে, ভারত সরকার আমাকে অযোগ্য করে' রেখে হয়ত আবার এক উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে। এরূপ কোন সিদ্ধান্ত যে বাস্তবিকই হাস্যকর হবে তাতে কারও সন্দেহ ছিল না। কারণ বঙ্গদেশের আইনসভাতে নির্ব্বাচিত হবার যোগ্যতা যদি আমার থাকে তবে ভারতের আইন সভাতে নির্ব্বাচিত হবার যোগ্যতা না থাকার মধ্যে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। লর্ড কারমাইকেল সহ প্রত্যেকেই মনে করল এরূপ যদি করা হয় তবে তা' এক বিরাট ভুল করা হবে। সৌভাগ্যবশত ভারত সরকার সুবিবেচকের মতই কাজ করল এবং বিরাট ভুল করা থেকে নিস্তার পেল। নির্ব্বাচিত হবার পর প্রথম সাক্ষাতেই লর্ড হার্ডিঞ্জ আমাকে বললেন, "মিঃ ব্যানার্জী, আমার জন্যই আপনি আমার কাউনসিলে স্থান পেলেন"। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু বিষয়টির গভীরে যাবার চেষ্টা থেকে বিরত থাকলাম। গেলে মনে হ'ত আমি যেন সরকারী গোপন তথ্যগুলি খুঁচিয়ে বাহির করবার চেষ্টা করছি।

১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্য হলাম। এবং তার পরের মাসেই ফৌজদারী বিচার বিভাগের প্রশাসন কাজে বিচার বিভাগীয় কাজ এবং প্রশাসনিক কাজকে পরস্পর থেকে পৃথক করে' দেবার জন্য সুপারিশ করে' এক প্রস্তাব করলাম। বিষয়টি নিয়ে বহুকাল যাবৎ জনসাধারণের মধ্যে আলোচনা চলছিল। সুতরাং আমার প্রস্তাবের মধ্যে বিশেষ কিছু নূতনত্ব ছিল না। এ বিষয় নিয়ে যে গণআন্দোলন হয়েছিল তার উদ্যোক্তাদের মধ্যে যাঁর

নাম এর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত থাকবে তিনি হ'লেন স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ। তিনি ছিলেন সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ ফৌজদারী আইন ব্যবসায়ী। প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কাজ এক সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে যে কি পর্য্যন্ত ক্ষতি হয় সে কথা তিনি বিশেষরূপে অনুভব করেছিলেন। এ বিষয় নিয়ে তার সমস্ত দোষ ত্রুটির উল্লেখ করে' এবং তা' সংস্কার করবার জন্য অনুরোধ করে' তিনি ভারত সচিবের কাছে যে এক বিবৃতি পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে লর্ড হবহাউস, বঙ্গদেশের পরলোকগত প্রধান বিচারপতি স্যার রিচার্ড গার্থ, বোম্বাই হাইকোর্টের পরলোকগত বিচারপতি স্যার রেমণ্ড ওয়েষ্ট, বঙ্গদেশের বোর্ড অব রেভেনিউ-এর পরলোকগত মেম্বর মিঃ হারবার্ট রেনোল্ড ও আরও অনেকের স্বাক্ষর ছিল।

১৯০৮ সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সদস্য স্যার হারভে এডামসন ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে তাঁর আসন থেকে ঘোষণা করলেন যে, ভারত সরকার এবিষয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ও সতর্কতার সঙ্গে সংস্কার প্রবর্ত্তনের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেছেন। তারপর থেকে পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়েছে। অথচ এ যাবৎ কিছুই করা হয় নি। সে দিক থেকে আমার এ প্রস্তাব সময়োপযোগীই ছিল। এবং আরও বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, প্রত্যেক বেসরকারী ভারতীয় সদস্যই তাকে সমর্থন করেছিলেন। তবে সরকারী সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের ভোটে আমার সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়। অথচ আমার এপ্রস্তাবের সমর্থকদের মধ্যে সরকারী সদস্যও যে ছিল তাও স্পষ্টভাবেই বুঝা গিয়েছিল। সেদিনের বিতর্কের সময় ভাইসরয়-এর অনুপস্থিতিবশত স্যার গাই ফ্লিটউড বিতর্কের বৈঠকে সভাপতিত্ব করছিলেন। বিতর্ক শেষ হওয়ার পর তিনি আমার নিকটে এসে বললেন, "মিঃ ব্যানার্জী, আমার যদি দুটি ভোট থাকত—একটি সরকারী ও অন্যটি আমার নিজস্ব—তা' হ'লে আমার নিজস্ব ভোটটি আমি আপনার পক্ষেই দিতাম"।

প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হওয়া সত্ত্বেও তা' সমর্থন করে' ভারত সরকার ভারত সচিবের কাছে এক জরুরী বার্ত্তা প্রেরণ করেছিলেন বলে আমি শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু এখানে অর্থব্যয়ের এক প্রশ্ন জড়িত ছিল। এজন্য ইণ্ডিয়া কাউনসিলের লৌহদস্তানা অতিক্রম না করে' তার উপায় ছিল না। এখানে তা অগ্রাহ্য হল। যে ভাবেই হোক এ প্রথার বিলোপ একদিন হবেই। শাসন সংস্কার পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে গিয়ে বঙ্গীয় সরকার এদুটিকে পৃথক করবার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। বর্ত্তমানে তা' বিবেচনা করে' দেখা হচ্ছে। অবশ্য অর্থের প্রশ্নই এখানেও বাধা সৃষ্টি করছে।

অপরাপর যে সব বিষয়ের উপর আমি প্রস্তাব এনেছিলাম তার মধ্যে ছিল, মুদ্রাযন্ত্র আইনের প্রশ্ন, শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কে বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের সুপারিশ, অন্তরীণ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে পরামর্শদাতা কমিটি নিয়োগের বিষয় এবং সব শেষে মনটেগু চেমস্‌ফোর্ড পরিকল্পনায় শাসন সংস্কার প্রস্তাব। আমি মুদ্রাযন্ত্র আইন প্রত্যাহার না করে' তার সংশোধনের উপর জোর দিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম যে, ব্যবহারিক রাজনীতির দিক থেকে বিচার করলে তা' প্রত্যাহারের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। নিরাপত্তার জন্য সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে সব ব্যবস্থাকে 'কমরেড' মামলায় প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেনকিস্‌ মরীচিকা বলে অভিহিত করেছিলেন। আমি সে সমস্ত প্রতিশ্রুতিকে অলীক বলে প্রমাণ করার পরিবর্ত্তে কার্য্যকরী করবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। ভোটের সময় দেখা গিয়েছিল ভারতীয় বেসরকারী সদস্যগণ প্রায় সকলেই একমত হয়েছিলেন, কিন্তু সরকারী সংখ্যাধিক্যে এ প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হয়েছিল। অবশ্য তদপেক্ষা সুফল আমি কিছু আশাও করি নি। তবে আমি ভেবেছিলাম হয়ত এই বিতর্কের ফলে মুদ্রাযন্ত্র আইনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা জনমতের অনুকূলে কোন আপোষ মীমাংসার পথ ধরেই চলবে। আমার সে

আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে বলে' আমি বলতে পারি না। যেমন বিতর্কের পূর্ব্বে তেমনি তার পরেও মুদ্রাযন্ত্র আইনের প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগত সরব অভিযোগ চলতে লাগল। বেসরকারী ভারতীয় সদস্যদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রভাবও সরকারী নীতিকে সংশোধন করতে পারল না।

মর্লে-মিণ্টো কাউনসিলগুলি ছিল পরামর্শদাতা সভা মাত্র। শেষ পর্য্যন্ত তারা সে প্রকারই রয়ে গিয়েছিল। এমন কি, ভারতীয় জনমত যখন সর্ব্বসম্মত হয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা' প্রকাশ করেছিল তখনো তাতে বিশেষ ফল হয় নি। যতদূর মনে পড়ে কেবল তুবার মাত্র সরকারী ভোটদাতারা বেসরকারী মতের চাপে নতি স্বীকার করেছিল। একবার নতি স্বীকার করেছিল যখন প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক সংগঠন সম্পর্কিত একটি বিল মুলতুবী করবার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। আর একবার করেছিল ডাক ও তার অফিসের কেরাণী ও অধস্তন কর্ম্মচারীদের অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করবার সময়। তবে এ প্রস্তাবগুলির মধ্যে বিশেষ কোন সরকারী নীতির প্রশ্ন জড়িত ছিল না।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার জনগণের চোখের সামনেই ছিল। স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অনেক সংস্কারের ব্যবস্থাও আমাদের সামনেই রয়েছে। তবে তাতে রয়েছে সুদূর প্রসারী পরিবর্ত্তন ও প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রশ্ন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধানে একটি ক্ষুদ্রাকার পরিবর্ত্তন দেখা যায় যা' ১৯১৬ সালের মার্চ্চ মাসে ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে একটি প্রস্তাব আকারে উত্থাপন করে' আমিই প্রথম পরামর্শ দিয়েছিলাম। তাতে আমি সুপারিশ করেছিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্ত শাসিত হবে এবং ভাইসরয়ের পরিবর্ত্তে প্রাদেশিক গভর্ণরই হবেন তার আচার্য্য। এভাবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মত স্থানীয় সরকারের প্রধানের সঙ্গে একই প্রকারের সম্বন্ধে সংযুক্ত করে দিয়েছিলাম। সরকারের পক্ষ থেকে স্যার শঙ্করণ নায়ার আমার এ প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিলেন।

অন্তত ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে সার শঙ্করণ নায়ারকে কৃতী বলা যায়। বিচারাসন থেকে এনে তাঁকে ভাইসরয়-এর একজিকিউটিভ কাউনসিলে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। শিক্ষা সমস্যা বা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সঙ্গে তাঁর কোন সক্রিয় পরিচয় ছিল না। তা সত্ত্বেও সে সব বিষয় নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি বিচক্ষণতা, বিচারশক্তি ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। আবার তিনি এ সত্যটিই প্রমাণ করলেন যে, জীবনের যে কোন ক্ষেত্র থেকেই আমাদের উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে নেওয়া হোক, দেখা যাবে তারা উচ্চতম প্রশাসনিক পদেরও উপযুক্ত। সমস্ত স্বাধীন দেশেরই একই অভিজ্ঞতা। ভারতেও পুনরায় তাহাই হয়েছে। স্যার শঙ্করণ শিক্ষাবিদ্ ছিলেন না। অথচ যে বিহার বিশ্ববিদ্যালয় আইন এক নূতন ক্ষেত্রে এত দ্রুত অগ্রসর হয়েছে, তজ্জন্যও আমরা স্যার শঙ্করণ নায়ারের নিকটই ঋণী। পাঞ্জাবের হাঙ্গামা নিয়ে সহকর্ম্মীদের সঙ্গে মতদ্বৈধতা হওয়ার পর তিনি পদত্যাগ করেন। সেই বিবাদের মধ্যেও সারবস্তু কিছু থাকুক বা না থাকুক, তাঁর পদত্যাগ থেকে একটি কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আদর্শের জন্য উচ্চপদস্থ ভারতীয়েরা তৎপরতার সঙ্গে পদত্যাগও করতে পারে। শোনা যায় লর্ড সিংহ যখন ভাইসরয়-এর একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্য তখন মিন্টোর সময়ে যে প্রেস বিল উপস্থিত করা হয়েছিল তজ্জন্য তিনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছিলেন। পুলিশের এক ডেপুটি সুপারিণটেনডেন্টকে হত্যার বিষয় নিয়ে যে এক অসুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা' জটিলতর হয়ে পড়তে পারে বিবেচনা করে' তিনি তাঁর পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করেন। আমি নিজে জানি যে, একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যপদ গ্রহণ অনেকের পক্ষেই ছিল এক স্বার্থত্যাগ স্বরূপ।

তবে আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু করতে পেরেছি মনে করে যখন গর্ব্ব বোধ করছিলাম, তখন যাঁরা এক সময় আমার সহকর্ম্মী

ছিলেন, তাঁরা আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলেন। তাঁরা ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সমিতির এক সভা ডেকে আমার বিরুদ্ধে এক নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করতেও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু একটি মূলতুবী প্রস্তাবের ফলে আমি কোন প্রকারে রক্ষা পাই। তারপর আর কোনদিন তা' হয় নি। যে সংস্কারের জন্য প্রস্তাব করায় আমার সহকর্ম্মিগণ আমার নিন্দা করেছিলেন আজ তাহাই বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। বঙ্গদেশের গভর্ণর এখন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য। এবং তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নি।

ভারতে জনসেবার এই হ'ল পুরস্কার। তবে এও ছিল, আরও যা' আসছে তার প্রথম আস্বাদ মাত্র। যে লোকটির একমাত্র অপরাধ এই ছিল যে, সে নবজাত জনপ্রিয়তার বিলীয়মান ধূমের পশ্চাতে ধাবিত না হয়ে কর্ত্তব্যকেই সাদরে বরণ করে নিয়েছিল, তাকে নিন্দা করবার মত কঠোর ভাষা সেদিন ছিল দুষ্প্রাপ্য। ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের আমার যে সব বন্ধু আমার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা তা' করেছিলেন কিছুটা আবেগের বশে আর কিছুটা ব্যবহারিক ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে'। আচার্য্য পদ থেকে ভাইসরয়-এর অপসারণ তাঁদের মনঃপূত ছিল না। তা' ছিল একটি মর্য্যাদার বিষয়। তদ্ভিন্ন, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারত সরকার প্রচুর টাকা দান হিসাবে দিয়েছিলেন। আমার বন্ধুদের আশঙ্কা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ভাইসরয়-এর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিন্ন হলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই অনুদানও বহুল পরিমাণে হ্রাস হয়ে যেতে পারে। মর্য্যাদার প্রশ্ন নিয়ে আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলাম না। অর্থের বিষয়টিই ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তবে তা' বেশীদিন টিকে থাকা মোটেই সম্ভব ছিল না। কারণ কোন প্রশাসনিক ব্যাপারেই কোন বিশেষ ব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না।

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিষয়ে আমি ছিলাম বরাবরই বিশেষ

উৎসাহী। ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসে লর্ড রিপণ যখন এ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তার পূর্ব্বেও আমি রাজনৈতিক অগ্রগতির উপায় হিসাবে এর জন্য আন্দোলন করেছিলাম। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর থেকেও আমি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম এবং তা' কার্য্যকরী করার বিষয়ে সহায়তা করেছি। সুতরাং যখন ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে গেলাম তখন আমার মনে হয়েছিল, আমার সেখানে যাবার সুযোগ নিয়ে তাকে আরও প্রসারিত করা আমার কর্ত্তব্য। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সরকারের উদাসীনতা ও অবহেলার দরুণই স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। কারণ এর অগ্রগতির অর্থ ই ছিল আমলাতন্ত্রীদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আমলাতন্ত্রীরা অত্যন্ত ক্ষমতালোভী। তা' হ্রাস করতে গেলেই তারা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। লর্ড মর্লে একবার তাঁর এক জরুরী বার্ত্তার মধ্যে বলেছিলেন যে, স্থানীয় সংস্থাগুলির জনপ্রিয় সদস্যদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা এতই সামান্য ছিল যে, তাঁরা তাঁদের কাজে কিছুমাত্র উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। ১৯১৪ সালের মার্চ্চ মাসে আমি জিলাবোর্ড ও লোক্যালবোর্ডের সভাপতি যাতে নির্ব্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক প্রদেশে যাতে একটি করে' লোক্যাল গভর্ণমেন্ট বোর্ড গঠন করা হয় সে মর্ম্মে সুপারিশ করে' এক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। সরকার পক্ষ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এ ছাড়া আর কিই বা আশা করা যায়। তবে আমার পক্ষে এটুকু সন্তোষের কারণ ছিল যে, পরবর্ত্তী কয়েক বছরের মধ্যে সরকারপক্ষ ধীরে ধীরে আমার মতগুলিই গ্রহণ করেছিলেন। ১৯১৮ সালের মে মাসের ১৮ই তারিখে ভারত সরকার এক প্রস্তাব পাশ করে গ্রামীন বোর্ডগুলির চেয়ারম্যানদের নির্ব্বাচনের জন্য যথা সম্ভব ব্যবস্থা করতে স্থানীয় সরকারগুলিকে অনুরোধ করলেন। তখন থেকে বঙ্গদেশের সমস্ত জিলা ও লোক্যাল বোর্ডগুলিও

এই অধিকার ভোগ করে' আসছে। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে এই আন্দোলনকে অগ্রসর করে' দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। ১৯১৯ সালে নরমপন্থীদলের প্রতিনিধিমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে আমি যখন ইংলণ্ডে যাই তখন যুক্তরাজ্যের স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থাগুলির পরিচালনাদির বিষয়ে অনুসন্ধান করে' ভারতীয় পরিস্থিতিতে তা' কি পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা সম্ভব তা' নির্ণয় করবার জন্য ভারতসচিব এক কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন এবং তিনি আমাকেও সে কমিটির সদস্যদলভুক্ত করেন। আমাদের স্থানীয় সংস্থাগুলির কাজ যাতে আরও উন্নত মানের হয় এবং আরও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অধিকতর অগ্রসর হতে পারে, সেজন্য ইংরেজদের দৃষ্টান্ত যথা সম্ভব অনুসরণ করে প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে' লোক্যাল গভর্ণমেণ্ট বোর্ড স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। আমার বিবৃতিতেও আমি একথাই তুলে ধরেছিলাম। আমি শুনেছি আসাম ও মধ্যপ্রদেশ সরকার আমার এই সুপারিশ মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করেছেন। তবে বঙ্গীয় সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারেরা তা' করেন নি।

পুনর্গঠিত বেঙ্গল কাউনসিলে মিঃ ডি. সি. ঘোষ এ প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে আমার সমস্ত সহানুভূতিও তাঁর প্রতি ছিল। কিন্তু অর্থের অনটনে সে পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। হয়ত অধিকতর উপযুক্ত সময়ে ক্রমপ্রগতিশীল অনুকরণে আমরাও বঙ্গদেশে একটি গভর্ণমেণ্ট বোর্ড স্থাপন করে' আমাদের প্রচেষ্টাকে সংহত ও একত্র করে আমাদের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রচেষ্টার সাফল্যের উপযোগী প্রেরণা ও উৎসাহের সঞ্চার করতে পারব।

দেশ ভেদে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও অবিরাম যে পরিবর্ত্তন চলছে তার সীমার কথা বাদ দিলে দেখা যাবে, প্রত্যেক দেশেই তাদের গণপরিষদগুলি হ'ল তাদের নাগরিকদের সকল প্রকার অধিকারের রক্ষক। প্রত্যেক সরকারেরই যে কতকগুলি দায়িত্ব আছে এবং কোন সরকারই যে তা'

ত্যাগ করতে পারে না, সে-সব অসুবিধার কথা বিচার না করে এই গণপরিষদগুলি অনেক সময় চরমে চলে যায়। তবে তা সত্ত্বেও তাদের নির্দ্দেশ ও পরামর্শ খুবই হিতকর হয়ে থাকে। এমন কি, অত্যন্ত চরম ভাবে হলেও এই গণপরিষদের মাধ্যমেই জনমত সরকারের কাণে এসে পৌছায়। আর সরকারের ব্রত ও প্রধান লক্ষ্য বস্তুই হ'ল, শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন, সকলের প্রতি সমভাবে ন্যায় বিচার, জনকল্যাণ ও দেশের নিরাপত্তা। ১৯১৮ সালে ইংলণ্ডের তৎকালীন এক আইনের অনুরূপ আইন দ্বারা বঙ্গদেশে বহু লোককে অন্তরীণ করা হয়। সর্ব্বত্র অত্যন্ত উত্তেজনা দেখা দিল। সরকার এমন এক নীতি অবলম্বন করলেন যার ফলে গোপনীয়তা বর্দ্ধিত হ'ল এবং প্রকৃত ন্যায় বিচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী রক্ষক যে তথ্য প্রকাশ, তাও বন্ধ করা হ'ল। আর তারই ফল স্বরূপ সরকারী ভুলভ্রান্তি উত্তেজনাকে আরও প্রবল করে তুলল। সিন্ধুবালা মামলায় সরকার এক সাঙ্ঘাতিক ভুল করল। অবশ্য সরকারের এরূপ ভুল কেবল যে একটি তা' নয়। বাঁকুড়া জিলায় সিন্ধুবালা নামে দুজন স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁদের একজনের বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগ থাকায় তাঁর খোঁজ হতে লাগল। অবশেষে জট্ ছাড়াবার উদ্দেশ্যে পুলিশ দুজনকেই গ্রেপ্তার করে' প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে তাঁদের হাঁটিয়ে হাজতে নিয়ে গেল। এঁরা দুজনেই ছিলেন পর্দ্দানসীন এবং দেশের সামাজিক নিয়ম অনুসারে তাঁরা খোলাখুলি ভাবে পথে চলাফেরা করতেন না। অবস্থা চরম আকার ধারণ করল তখন, যখন বার তের দিন জেল হাজতে আটক থাকার পর তাঁরা উভয়েই মুক্তি পেলেন। তার কারণ, দেখা গেল তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কণামাত্রও কোন প্রমাণ ছিল না। সরকারী কাজের মধ্যে এই হ'ল সর্ব্বাধিক দুঃখের বিষয়। এর চেয়ে প্রচণ্ডতর ভুল আর কি হ'তে পারে? যে কোন পুলিশ কর্ম্মচারীদের থেকে এই পুলিশ কর্ম্মচারীগণ কোন অংশেই ভাল বা মন্দ ছিল না। এক্ষেত্রে তারা হয়েছিল এমন এক পুরাতন ও

পরিত্যক্ত প্রথার শিকার, যার কথা অতীতের “ষ্টার চেম্বার” দিনগুলির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং যার সমস্ত কর্ম্মশক্তিটি কেবল মাত্র গোপনীয়তাকেই কেন্দ্র করে তার চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। সমস্ত বঙ্গদেশ উত্তেজনার বশে জ্বলে উঠল। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদিগকে যে টেনে নিয়ে বিশ্রী ভাবে অপমান করা হ'ল, তাদের প্রতি যে অকারণে কয়েদীর ন্যায় ব্যবহার করা হ'ল, তাদের সামাজিক অবস্থা বা মর্য্যাদা যে তাদিগকে এই অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হল না, আর এ সবই যে আইনের এক আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখে তার প্রকৃত তথ্যাদি প্রকাশ না করে গোপন করা হ'ল, এ সমস্ত কারণে সারা বঙ্গদেশ তীব্র ক্রোধে ও ঘৃণায় আকুল হয়ে উঠল। আমার মনে হ'ল এ সময় আমার উচিত আমার প্রদেশের জনসাধারণের মনোভাব যে কি, তা এই কাউনসিল থেকে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করা। অন্তরীণদের বিষয়, ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে নির্ব্বাসিতদের বিষয় ও অনুরূপ আইনসমূহ নিয়ে কাজকর্ম্ম করার বিষয়ে বিচার বিবেচনার জন্য আমি একটি পরামর্শদাতা কমিটি নিযুক্ত করবার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করলাম। আমার সে প্রস্তাবের বিষয় বস্তু ছিল নিম্নরূপ—

“প্রত্যেক প্রদেশের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া বিবৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সংখ্যক ভারতীয়সহ একটি কমিটি নিযুক্ত করিবার জন্য এই কাউনসিল সপারিষদ গভর্ণর জেনার‍্যালের নিকট সুপারিশ করিতেছে। যথা—

(১) ভারতরক্ষা আইনে অন্তরীণদের ঘটনা সমূহ ;

(২) ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন ও অনুরূপ রেগুলেশন অনুসারে মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে আটক রাখার ঘটনা সমূহ ;

(৩) অতঃপর যে সমস্ত ব্যক্তি উপরোক্ত আইন ও রেগুলেশনের আওতায় আসিবে, তাহাদের ঘটনাসমূহ ;

উপরোক্ত বন্দীদিগের স্বাস্থ্য, ভাতা, আটক থাকিবার স্থান এবং

অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে সুপারিশ করিবার ক্ষমতাও এই কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে।"

প্রস্তাবটির উপর বিতর্ক আরম্ভ হবার পূর্ব্বে হোমমেম্বর স্যার উইলিয়ম ভিনসেন্ট-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার আমার এক সুযোগ হয়। এটি আমার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এবং বোধ হয় এতে সরকারেরও সুবিধা হয়েছিল। এভাবে আলোচনায় আমাদের উভয় পক্ষের কোথায় মতৈক্য ছিল আর কোথায় মতানৈক্য ছিল তাও পরিষ্কার হয়ে গেল। এবং তারপর প্রয়োজন হলে পরস্পরের গলাও টিপে ধরতে পারবে। সরকারের পক্ষ সমর্থন করেই হোমমেম্বর উত্তর দিলেন। তবে তার মধ্যেও একটি সহানুভূতির সুর ছিল। মোটামুটি ভাবে তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করে এক পরামর্শদাতা কমিটি নিযুক্ত করতে স্বীকৃত হলেন। এতদিন ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলি ক্রমশ চরমপন্থীদের প্রতি ঝুঁকে পড়ছিল। হোমমেম্বর এই বিশেষ সুবিধা দিতে স্বীকৃত হবার ফলে সংবাদ পত্রগুলি আনন্দিত হয়ে তাকে স্বাগত জানাল। বিচারপতি ব্রীচক্রফ্‌ট ও স্বর্গীয় স্যার নারায়ণ চন্দ্রভারকর কমিটির সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমি শুনেছিলাম বঙ্গদেশের একশ রাজবন্দীর মধ্যে ছয়জনকে মুক্তি দেবার জন্য কমিটি সুপারিশ করেছিল। এ কমিটির নিয়োগ ও তার শ্রম জনমতকে কিছু পরিমাণে শান্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। তা' হলেও অন্তরীণ রাখার বিষয়টি জনমত স্বীকার করে নিতে পারল না, তবে তার বিরুদ্ধে পূর্ব্বে যে কঠোরতার সৃষ্টি হয়েছিল এখন তা সামান্য শিথিল হল মাত্র।

রাওলাট য়্যাক্ট নিয়ে ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে যে বিতর্ক হয়েছিল, তার উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এটি ছিল এক দমনমূলক ব্যবস্থা এবং দেশের সাধারণ ফৌজদারী আইনের ব্যতিক্রম। দেশের সর্ব্বত্র তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠতে লাগল। কাউনসিলের অভ্যন্তরেও তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল। হোমমেম্বর

স্যার উইলিয়াম ভিনসেণ্ট বিষয়টি ঘরোয়াভাবে আলোচনার উদ্দেশ্যে মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, ডক্টর তেজবাহাদুর সপরু ও আমাকে এক কনফারেন্সে আমন্ত্রণ জানালেন। আমরা প্রত্যেকেই বিলটির বিরোধিতা করলাম। স্যার উইলিয়াম সাময়িকভাবে তাকে আইনে পরিণত করতে স্বীকৃত হ'লেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও বিলটি সমর্থন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। কাউনসিলে আমি খুব জোরের সঙ্গেই তার বিরোধিতা করলাম এবং সরকারকে সতর্ক করে' দিয়ে বললাম যে, এটি তাদের পক্ষে হবে এক সাঙ্ঘাতিক পদক্ষেপ যার ফলে প্রচণ্ড এক উত্তেজনা যে সৃষ্টি হবে তা' সুনিশ্চিত। আমাদের আপত্তিতে কোনই ফল হ'ল না। বিলটি পাশ হয়ে আইনে পরিণত হ'ল। কিন্তু সে আইন কোনদিন কার্য্যকর করা হ'ল না। ছেঁড়া চিঠির মতই অবহেলিত হয়ে রইল। তবে আমরা যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম তা' অক্ষরে অক্ষরেই ফলেছিল। আর এই রাওলাট আইন থেকেই হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের জন্ম।

১৯১১ সালের ২৫শে আগষ্ট যে এক জরুরী বার্ত্তা প্রেরণ করা হয়েছিল তা' বাস্তবিকই স্মরণীয়। আমাদের ইতিহাসে তা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার মধ্যে বঙ্গভঙ্গের সংশোধনের জন্য সুপারিশ ছিল। এবং তদতিরিক্তও কিছু ছিল। বরদানস্বরূপ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিশ্রুতিও ছিল তার মধ্যে। তারপরে আমাদের যতগুলি প্রাদেশিক কনফারেন্স হয়েছিল তার সবগুলিতেই এই প্রতিশ্রুতিকে অবিলম্বে রূপ দেবার জন্য বিশেষ জোর দিয়ে অনুরোধ করা হয়েছিল। আমি লেজিসলেটিভ কাউনসিলে বিষয়টি তুলেছিলাম। সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অঙ্গ হিসাবে আমি প্রদেশগুলির অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর জোর দিয়েছিলাম। অর্থমন্ত্রী স্যার উইলিয়াম মায়ার আমার এই মতের বিরোধিতা করে' বলেছিলেন যে, আমি নাকি "একজন অস্থির

আদর্শবাদী"। প্রত্যুত্তরে আমি বলেছিলাম, আমি যে আদর্শবাদী সে কথা সত্য। তবে আমি অস্থিরও নই, আর ব্যবহারিকবুদ্ধিহীনও নই। বরং আমার বহু আদর্শই পূর্ণ হয়েছে অথবা পূর্ণ হতে চলেছে। তখনকার ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ যিনি সেই জরুরী বার্ত্তা প্রণয়ন করেছিলেন, একবার কথা প্রসঙ্গে আমায় বলেছিলেন, "মিঃ ব্যানার্জী, দশ বছরের মধ্যেই আপনারা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন পাবেন।" বস্তুত তার বহু আগেই আমরা তার সূচনা দেখতে পেয়েছিলাম।

১৯১৬ সালের নির্ব্বাচনে ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের আসনটি আমার হাত ছাড়া হয়। মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও মিঃ সীতানাথ রায় তাতে জয়লাভ করেছিলেন। আমি আমার সাধারণ দেশসেবার কাজে ফিরে গেলাম। গত চল্লিশ বছর ধরে কাউনসিলের বাইরে আমি ত তাই করেছি। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। বঙ্গদেশ থেকে সৈন্যদলে যোগ দেবার জন্য আবেদন হ'ল। সাম্রাজ্যের এই বিপদের মুহূর্ত্তে আমাদের দেশের উত্তম শ্রেণীর লোকদিগকে সেনাদলে ভর্তি হয়ে সাম্রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করতে অনুরোধ করে' আমি নগরে নগরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমি ত্রিশের অধিক সভায় এ সম্পর্কে বক্তৃতা করেছিলাম। তখন আমার প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে, আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হ'ল স্ব-রাজ এবং আত্ম-রক্ষা তারই অর্থবাচক। আমরা যদি সাম্রাজ্যের নাগরিকতার সুযোগ সুবিধা পেতে অভিলাষী হই, তা' হ'লে তার দায়িত্বও আমাদের বহন করতে হ'বে। আর এই দায়িত্বের মধ্যে প্রধান হ'ল সাম্রাজ্যের রক্ষার জন্য যুদ্ধে যোগ দেওয়া। আমার এই আবেদন সকলের অন্তর স্পর্শ করল। এবং এজন্য যে অসংখ্য সভা হয়েছিল তার একটিতেও কেউ কোনদিন কোন আপত্তি করে নি। অসহযোগ তখনো মাথা তোলে নি। যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আজ বিস্তারিত ভাবে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, সে সময়ে তার চিহ্নমাত্র ছিল না।

সেনাদলে ভর্ত্তির ব্যাপারে যে সব সভা হয়েছিল তা' থেকে আমার এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল। আমি দেখলাম জনসেবার কাজে এবারই সর্ব্বপ্রথম একই মঞ্চে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমি ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীগণ একই উদ্দেশ্যে আবেদন জানালাম। এবং তাঁরা আমার সঙ্গে এমন ভদ্র ব্যবহার করলেন যে, আমি তার জন্য প্রস্তুতও হ'তে পারি নি। বঙ্গদেশের ভদ্রসম্প্রদায়গুলি থেকে আমরা প্রায় ছয় হাজারের উপর লোককে নূতন সৈনিক হিসাবে ভর্ত্তি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। প্রায়ই বলা হয়, এসকল সৈনিকের মধ্যে সব সময় আশানুরূপ গুণ দেখা যেত না। তবে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রায় দেড়শত বছর যাবৎ বঙ্গদেশ সৈনিককার্য্য-কুশলতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়েছিল এবং যুদ্ধের এই অভিজ্ঞতা ছিল তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। আমি নিজে জানি যে, অনেক যুবক এতে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের সৈনিক হবার অভিলাষ চরিতার্থ করবার জন্য তারা এমনকি, পিতামাতার পবিত্র কর্তৃত্বের পর্য্যন্ত বিরোধিতা করেছিল! ঠিক পথে চললে বঙ্গদেশে নূতন সৈনিকের অভাব হবার কিছুমাত্র কারণ নেই। আঞ্চলিক সেনাদলে যোগ দেবার জন্য বঙ্গদেশে যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় নি তা' অত্যন্ত দুঃখ ও নৈরাশ্যজনক। এটি ছিল এমনই এক আন্দোলন যাতে বঙ্গদেশসহ ভারতের জনমতের নেতৃস্থানীয় লোকেরা ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী। ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনী গঠনের ব্যাপারে লেজিসলেটিভ কাউনসিলের ভিতর দিয়ে তৎপরতার সঙ্গে সে কার্য্য সম্পাদন করাতে আমারও হাত ছিল। বঙ্গদেশে যে তা' সফল হয় নি তার প্রধান কারণ, যাদের ভিতর থেকে আঞ্চলিক বাহিনীতে লোক ভর্ত্তি হতে পারত তাদের মধ্যে অসহযোগের প্রভাব প্রবেশ করেছিল। আমি আশা করছি যে, যখন অসহযোগ বন্ধ হয়ে যাবে, তখন আঞ্চলিক বাহিনী সম্পর্কিত আন্দোলনের সুদিন আসবে।

বস্তুত গত কয়েক মাসের মধ্যেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেক পরিবর্ত্তন দেখা গিয়েছে। রাজনৈতিক দিগন্তে অসহযোগের প্রতি যে গভীর ভক্তি প্রাধান্য লাভ করেছিল আজ তা' বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেবল একটি ব্যতীত তার অপর সমস্ত বৈশিষ্ট্যই পরিত্যক্ত হয়েছে। একমাত্র বিদেশী বস্ত্র ভিন্ন অন্য সমস্ত প্রকার বর্জ্জন-আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের নায়কেরা যে বিফল হয়েছেন, এ সমস্ত ঘটনা সে-কথাই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করছে। বিজয়ী-সেনানায়ক যখন নিশ্চিত জয়ের দিকে ছুটে যায় আর তার চারিদিকে সাফল্যের স্মৃতিচিহ্নগুলি ছড়ান থাকে, তখন সে তার কার্য্যসূচী পরিবর্ত্তন, সংশোধন, স্থগিতকরণ বা বর্জ্জনের কথা কখনো চিন্তাও করে না। এটি বাস্তবিক পক্ষে এক বিফলতারই স্বীকৃতি। আত্মপক্ষ সমর্থনের যত প্রকার কৈফিয়তই দেওয়া হোক, আপাত দৃষ্টিতে তা' যত যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হোক অথবা যত বড় নামের সঙ্গেই তা' যুক্ত থাকুক, বিফলতা বিফলতাই থেকে যাবে। কিছুতেই তা' মুছে দেওয়া যাবে না। এর ভাগ্য যে কি হবে তা' প্রত্যেক নিরপেক্ষ দর্শকই জানতেন এবং তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে, এটিই হবে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। বড়বড় নেতাদের ক্ষেত্রে অসহযোগের মূল ছিল প্রবল ও দীপ্ত স্বদেশপ্রেমের মধ্যে প্রোথিত। তার সঙ্গে যোগ ছিল বৃটিশ সরকার ও দেশের প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুর প্রতি এক গভীর ঘৃণা ও বিদ্বেষ। কিন্তু অসহযোগী বিরাট জনতার ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকার, তার কর্ম্মচারী ও যে কোন ইংরেজের প্রতি ঘৃণাই ছিল তাদের অসহযোগের প্রেরণার উৎস। যখন কোন প্রবণতা জনসাধারণকে পেয়ে বসে তখন তা' ক্রমশ বৃদ্ধি পায় ও প্রসার লাভ করে। সরকারের প্রতি ঘৃণা ক্রমে রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক ও অপরাপর প্রতিপক্ষিয় জাতি ও সম্প্রদায়ের উপর দুর্ব্বার গতিতে যে বিস্তৃতি লাভ করে সে বিষয়ে মিঃ গান্ধীই আমার প্রমাণ।

যে ঘৃণার মনোভাব জনমানসে এতদিন সুপ্ত ছিল তাকে তাঁরা জাগ্রত করে' দিয়েছিলেন। আর তাহাই ক্রমশ বিকশিত হয়ে ধ্বংশাত্মক ফল উৎপন্ন করেছিল। অবশ্য হিন্দুমুসলমানের ঐক্যের জন্য মিঃ গান্ধী যে চরম উৎকণ্ঠায় ছিলেন ও একান্ত চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন, আমরা সকলেই তার প্রশংসা করি। তবে এই নিতান্ত দুঃখজনক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষয়ে বিচারবিবেচনা করতে গেলে, অন্তত ইতিহাসের প্রতি যাহাতে অন্যায় না হয়, সে জন্য তাকে লালনপালনে ও পরিপোষণে অসহযোগ আন্দোলনের যে ভূমিকা ছিল তা' যেন আমরা ভুলে না যাই।

ত্রিংশতি অধ্যায়

শাসন সংস্কার ও চরমপন্থী মনোভাবের প্রসার

১৯১৭ সালের ঘটনাবলীর মধ্যে সর্ব্বাধিক চাঞ্চল্যকর ছিল হাউস অব কমনস-এ মিঃ মণ্টেগুর ভারতে ধাপে-ধাপে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করবার ক্ষমতাদানের প্রতিশ্রুতি। জনমানসে এ ঘোষণার মিশ্রফল দেখা দেয়। যারা বৃটিশ সরকারের কথা ও প্রতিশ্রুতিতে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল তারা আশান্বিত হ'ল ; যারা সংশয়াকুল ছিল তাদের মনে সন্দেহ ও ভয়ের সঞ্চার হ'ল এবং যারা অকারণে কিছু বিশ্বাস করে নিতে অনিচ্ছুক ছিল, তাদের মনে অবিশ্বাস দানা বাঁধল। তার পরে এল নাটকীয় ও অভিনব ভাবে বিহ্বলতা সৃজনকারী এক ঘোষণা। মিঃ মণ্টেগু ঘোষণা করলেন যে, তিনি ভারতের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে' ভারতের জনমত নির্ণয়ের জন্য এক প্রতিনিধিমণ্ডলীসহ ভারতে আসবেন। তাঁর একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনই কারণ ছিল না। অতীতের সরকারী কর্ম্মচারীদের নিয়ম থেকে এছিল এক স্মরণীয় ব্যতিক্রম। এমন কি যাঁরা ছিলেন ঘোর সন্দিগ্ধমনা তাঁরাও মনে করতে লাগলেন, এই যে ভারত-সচিব, এর কেবল কথা বলা ছাড়া আরও গুণ আছে। ইনি কাজ করতে চান। য়্যাংলো-ভারতের ইতিহাস খুললে দেখা যাবে তার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অসংখ্য কাহিনী ছড়ান রয়েছে। হয়ত এবার এক নূতন অধ্যায় খোলা হবে।

মিঃ মণ্টেগু নভেম্বর মাসে প্রতিনিধিমণ্ডলীসহ ভারতে এলেন এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তিনি দেশের বহু অঞ্চল পরিদর্শন করলেন। ভারতীয় ও ইউরোপীয় বহু লোকের সাক্ষ্য নিলেন। সাক্ষ্য নেবার সময় একএক দলে দু-তিনজন সাক্ষী থাকত এবং তাদিগকে গুরুতরভাবে জেরা করা হ'ত। আর একাজটিতে

মিঃ মণ্টেগু ছিলেন বিশেষরূপে দক্ষ। মধ্যপ্রদেশের মিঃ আর. এন. মুধোলকার এবং আমার সাক্ষ্য এক সঙ্গেই গ্রহণ করা হয়েছিল। এবং আমাকেও সেই গুরুতর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পরে যখন দ্বৈতশাসনের ধারণাটি দানা বাঁধতে লাগল তখন মিঃ মণ্টেগুর সঙ্গে আরও কথাবার্ত্তা হয়। মিঃ লায়োনেল কুর্টিশ-এর মনেই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম এ ধারণাটির সৃষ্টি হয়েছিল। প্রায় একই সময়ে তিনিও ভারতে আসেন এবং অনেকের সঙ্গে কনফারেন্সে বসে বিষয়টি আলোচনা করছিলেন। এসব আলোচনাসভার কিছুকিছুতে আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম এবং এরূপ একটি সভা দার্জ্জিলিং-এও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মিঃ সি. আর. দাস সহ চরমপন্থী দলের অনেক নেতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবহাওয়া ছিল শান্ত এবং অসহযোগের তখনো জন্ম হয় নি। আমার যতদূর মনে পড়ে তখন দ্বৈতশাসন বা প্রশাসনের কোন কোন বিভাগ লেজিসলেটিভ কাউনসিলের নিকট দায়ী গণনির্ব্বাচিত মন্ত্রীর হাতে ছেড়ে দিতে কেউ কোন গুরুতর আপত্তি তুলে নি। পূর্ণাঙ্গদায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবীর সঙ্গে একটি মাঝামাঝি রফা হিসাবে মিঃ কুর্টিস দ্বৈতশাসনে ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসী। প্রায় ধর্ম্মপ্রচারকদের মত বিশ্বাস নিয়েই তিনি কথা বলতে লাগলেন। বোধহয় তাঁর সম্পর্কেই যথার্থতঃ বলা যায় যে, তিনি এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন। তিনি ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভায় বসে' আলোচনা করলেন। প্রথমে সমস্ত পরিকল্পনাটির বিষয়ে এঁদের মনে এক সন্দেহ ও ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। তাঁদের যা' অভিমত ছিল তা' তৎকালীন সংবাদ পত্রেও প্রকাশ পেল। তাঁদের ব্যক্তব্য ছিল—সরকার প্রথমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে দোষত্রুটি থেকে মুক্ত করে কাজ আরম্ভ করুন। তারপর দায়িত্বশীল সরকার গঠনরূপ ব্যাপক প্রশ্নে হাত দেবেন। মিঃ কুর্টিস ও অন্যদের (লর্ড সিংহ ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন) সঙ্গে আলোচনা চলার সময় ইউরোপীয়রা নিজেদের মত

সংশোধন করলেন। এবং তাঁদের প্রশংসা করে বলতে হবে যে, একবার যখন আপনাদের মত সংশোধন করলেন তখন তাঁরা দ্বিধা-সন্দেহহীন হয়ে ইংরেজদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে নির্ভয়ে তাকে ধরে' রইলেন। আর এখন সেই শাসনসংস্কারের প্রধান সমর্থকদের অন্যতম হ'ল ইউরোপীয় সম্প্রদায়! ভারতের জন্য যা' নির্দ্ধারিত হয়েছে, যথা,—ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে' বৃটিশ কমনওয়েল্থের সমান অংশীদার হবার সুযোগ—তা'কে তাঁরা এখন স্বীকৃতি দেন। বঙ্গদেশের আইন সভায় ইউরোপীয় সদস্যগণ সাধারণত নরমপন্থীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতেন এবং তাঁদের সঙ্গে নরমপন্থীদলের প্রতিনিধিদের সম্পর্কও ছিল বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতাপূর্ণ। আমার মনে পড়ে কেবল একটি ক্ষেত্রেই তাঁদের সঙ্গে তাঁদের হিন্দু সহকর্ম্মীদের গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছিল। আর তা' ছিল কোলকাতা কর্পোরেশনে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন নিয়ে। তাঁরা ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের জন্য এরূপ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা যে বিষয়টিকে তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করবেন, তা' স্বাভাবিক। ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের নিজেদের স্বার্থ যাতে ঠিক ঠিক ও যথোপযুক্ত ভাবে উপস্থাপিত হতে পারে সে উদ্দেশ্যে তাদের জন্য এক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী ছিল। এবং সে অনুসারে ইউরোপীয় সদস্যগণের ধারণা হয়েছিল যে, তাঁদের পক্ষে যখন সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব হিতকর মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষেও তা' হিতকর হবে। তাঁরা এ সত্যটি বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, তাঁদের ও মুসলমান সম্প্রদায়ের অবস্থা সমান নয়। কারণ আজ বা কাল হিন্দু ও মুসলমানেরা সংহত হয়ে একটি রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হবে। আর সেই ভারতীয় জাতীয়তা বিকাশের পথে এই সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা হবে এক বিরাট অন্তরায়।

ইতিমধ্যে এক প্রবল ঝড় উঠবার উপক্রম হ'ল। এবং তার ফলে ভারতীয় রাজনৈতিকদের মধ্যে সাঙ্ঘাতিক ভাঙ্গন দেখা দিল। ১৯১৮

সালের ৮ই জুলাই মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড বিবৃতি প্রকাশ হ'ল। এটিই ছিল সংগ্রামের সঙ্কেত। চরমপন্থী পত্রিকাগুলি ক্রোধে চিৎকার করতে লাগল। এমন কি, যে শ্রীমতী বেসান্ত সেই পরিকল্পনা সম্পর্কে এখন নরমপন্থীদের মতকে পোষণ করেন, তখন তিনি তাঁর বাগ্মিতা ও স্বাভাবিক জোর দিয়ে তা' বর্জ্জন করতেই উপদেশ দিয়েছিলেন। পরিকল্পনাটি যেদিন প্রকাশ হ'ল সেদিন তিনি তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামক পত্রিকায় বজ্রকণ্ঠে বললেন, "এ পরিকল্পনা ইংলণ্ড কর্ত্তৃক প্রদানের ও ভারত কর্ত্তৃক গ্রহণের অযোগ্য"। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐদিনই পনেরজন ভদ্রলোক মিলিতভাবে এক বিবৃতি প্রচার করে' একই প্রকার জোর দিয়ে পরিকল্পনাটির নিন্দা করলেন। তাঁরা বললেন, নীতির দিক থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও মূলগত ভাবে পরিকল্পনাটি এতই ভ্রান্তিমূলক যে, তার সংশোধন বা উৎকর্ষ সাধন কিছুতেই সম্ভব নয়।" তাঁর সোজা ও সরল ভঙ্গিতে পরলোকগত মিঃ তিলকও সেই একই কথা বললেন। মিঃ তিলক মন্তব্য করেছিলেন, "মণ্টেগু পরিকল্পনা গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য"।

এ সমস্ত প্রবল উত্তেজনা ও বিক্ষোভের মধ্যে, বিবৃতিটি বিচার-বিবেচনা করবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন ডাকা হ'ল। এবং আমরা, যারা সেরূপ উগ্র মত পোষণ করতাম না, তখন কি করব তাহাই ভাবতে লাগলাম। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে আমরা যোগ দেব, কি, দেব না—তাহাই ছিল আমাদের চিন্তার বিষয়। পরিশেষে আমরা যোগ না দেওয়ারই সঙ্কল্প করলাম। আমরা দেখলাম এ সমস্ত অস্থিরতাপূর্ণ উগ্র মতই কংগ্রেসের আলোচনার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করবে। সুতরাং অধিবেশনে উপস্থিত থেকে আমাদের সমর্থনের ওজন দিয়ে তাদের মতকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করা আমাদের পক্ষে অনুচিত বলেই আমরা মনে করলাম। তদনুসারে ১৯১৮ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে আমরা নরমপন্থীদলের এক সম্মেলন ডাকলাম। আমাকেই

সেখানে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হ'ল। এটিই ছিল নরমপন্থী দলের সর্ব্বপ্রথম সম্মেলন। তারপর থেকে এখন পর্য্যন্ত তা' বছর বছর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। রাইট অনারেবল মিঃ শাস্ত্রী, অনারেবল স্যার নরসিংহ শর্ম্মা প্রমুখ আমাদের কোন কোন বন্ধু কংগ্রেসকে তাঁদের প্রভাবে প্রভাবিত করবেন এই আশায় কংগ্রেসে যোগ দিতে থাকলেন। কিন্তু ফল কিছুই হ'ল না। কংগ্রেস তখন অভূতপূর্ব্বরূপে উগ্র হয়ে উঠেছে। তারপর থেকে তাঁরাও কংগ্রেসে যোগদানে বিরত হলেন। আমরা ভিন্ন হয়ে গেলাম—সে যে কত কালের জন্য তা' বলা শক্ত।

একটি আপোষ মীমাংসার ভিতর দিয়ে এই বিভেদ রোধ করবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করেও আমরা সফল হতে পারলাম না। আমাদের মধ্যে বিভেদই চিরদিন আমাদের দুর্ব্বলতার ফলপ্রসূ উৎস হয়ে রয়েছে। আবার একটি নূতন বিভেদ যাতে সৃষ্টি না হয় তজ্জন্যই আমরা সচেষ্ট হলাম। কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ণ তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে যুগ্ম-সম্পাদক ও শ্রীমতী বেসান্তের নিকট আমি তার পাঠালাম। মতামতের আদানপ্রদান পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার সহায়ক হতে পারে এবং সে উদ্দেশ্যে অল্প কালের জন্য কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন মূলতুবী রাখবার জন্য আমি তাঁদের অনুরোধ করলাম। তাঁরা সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেন। এবং শেষ মুহূর্ত্তে অধিবেশন আরম্ভ হবার মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে যখন শেষ চেষ্টা করা হ'ল তখন আর সময় ছিল না। যে সময়ে হলে মনের সারা পাওয়া যেত, সে সময় তখন অতিবাহিত হয়ে গেছে।

কংগ্রেসে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকবার যে সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম সময়ে দেখা গেল তা' সুবিবেচকের কাজই হয়েছিল। এবং আমি দাবী করতে পারি যে, আমরা নরমপন্থীরাই পরিকল্পনাটিকে বাঁচিয়েছিলাম। তার বিরোধী জোটটি ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী। ভারতের ইউরোপীয় য়্যাসোসিয়েশন শাসন সংস্কারের সফলতার জন্য এখন একাগ্র

হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু তখন তারা তাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছে। লর্ড সিডেনহ্যাম হাউস-অব-লর্ডস-এও সংবাদপত্রে তার তীব্র নিন্দা করেছিলেন এবং আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তাঁর মতের সমর্থনে মিঃ তিলকের কথা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকা অভিযোগ করেছিলেন যে, ভারতের উগ্রপন্থীরা লর্ড সিডেনহ্যামের ও তাঁর দলের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছিলেন। এতগুলি সাজ্ঘাতিক শক্তিসম্পন্ন বিরোধী সংস্থার মধ্যে কেবলমাত্র ভারতের নরমপন্থীদলের নিকট থেকে প্রকৃত ও ক্রমাগত সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। তারা যদি কংগ্রেসের ভিতর থাকত, তারা ভেসে যেত। তাদের কণ্ঠস্বর অতি তুচ্ছ এক সংখ্যাল্প দলের স্বর বলে গণ্য হত এবং তাতে ফল কিছুই হ'ত না। বৃটিশ গণতন্ত্র তখন বলত, যে হেতু প্রায় সমস্বরেই শাসন সংস্কার পরিকল্পনাটি গ্রহণে আপত্তি উঠেছে তখন, "বেশ ত, তোমরা যদি না চাও, আমরাও একে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেব।" এবং সে ক্ষেত্রে তার স্থান নেবার জন্য অপর কোন পরিকল্পনা না থাকার ফলে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের সম্ভাবনা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী হয়ে যেত। বৃটিশ সরকার সঠিকভাবে কোন কথা না বলার দরুণ আমাদের অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পেল। তার কারণ, তখন লর্ড কার্জ্জন বৃটিশ মন্ত্রীমণ্ডলীর একজন সদস্য হয়েছেন এবং তাঁর পরামর্শ অনুসারেই যে তাঁদের ভারত সম্পর্কিত নীতি নির্দ্ধারিত হবে তারই সম্ভাবনা অধিক ছিল। বিলটি পার্ল্যামেণ্টে উপস্থাপিত হবার পূর্ব্বে তার মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করে দেখবার জন্য হাউস-অব-লর্ডস ও হাউস-অব-কমনস্ উভয় সভার এক যুক্ত কমিটি নিযুক্ত করবার যখন এক প্রস্তাব উঠল, তখন আমাদের উৎকণ্ঠা আরও গভীর হ'ল। এমন সময় যখন একের পর এক অসুবিধা পুঞ্জীভূত হতে লাগল তখন এই পরিকল্পনাকে রক্ষা করতে হ'লে তার সমর্থনে আমাদের পক্ষ থেকে এক সুনির্দ্দিষ্ট নীতি গ্রহণ অপরিহার্য্য হল। প্রয়োজনবোধে

কংগ্রেস থেকে যদি পৃথকও হয়ে যেতে হয় তা' হলেও এরূপ একটি নীতি গ্রহণ করতে নরমপন্থীদল মনস্থ করল। এর মূল্য যে অত্যন্ত অধিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তবুও দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রারম্ভিক স্তরের দ্রুত প্রবর্ত্তন করে তাকে কার্যকর করতে হলে এ মূল্য দেওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না। সে মূল্যের পরিমাণ যে কত তা' আমরা হিসাব করলাম এবং তা' দেবারও সঙ্কল্প করলাম। আমাদের অনেকের কাছে, এবং বিশেষভাবে আমার কাছে, কংগ্রেসের সঙ্গে এই বিচ্ছেদ ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা আমাদের রক্ত দিয়ে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলাম। তাকে যত্ন করে শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে ভালমন্দ বিচারে দক্ষ করে তুলেছিলাম। আর যখন আমাদের সারা জীবনের শ্রম সার্থক হবার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল তখন আমাদের জাতীয় ঐক্যের এই পবিত্র মন্দির দুঃখ নিবারক বিচার বুদ্ধি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সংঘর্ষ, বিবাদ ও মতভেদের ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে টলমল করতে লাগল। সরে যাওয়া ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর ছিল না। কংগ্রেসকে যাঁরা অধিকার করে বসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের মতের মৌলিক পার্থক্য ছিল। এবং তা' ছিল ভারতের স্বায়ত্ত শাসনের মত এক মৌলিক বিষয় নিয়ে। প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস যত বড়ই হোক, বস্তুত পক্ষে তা' ছিল এক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। সে উদ্দেশ্যটি ছিল—স্বায়ত্ত শাসন লাভ। উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্য উপায়টি পরিত্যাগ করারই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ, সেটিই ছিল ভারতে মধ্যপন্থী বা নরমপন্থী দলের পৃথক এক সত্বা হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষা করবার একমাত্র হেতু।

এখান থেকেই চরমপন্থী ও নরমপন্থী দলগুলি স্ব স্ব মতানুসারে কাজ করবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করতে লাগল। আন্তর্কলহের চাপে হিন্দু যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গেলে পরিবারস্থ লোকের মনে যেমন এক তিক্ততা লেগে থাকে, আমাদের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ হ'ল।

চরমপন্থীগণ তারস্বরে নরমপন্থীদের নিন্দা করতে লাগলেন। সর্ব্বক্ষেত্রে সংযত মনোভাব গ্রহণ করাই ছিল নরমপন্থীদলের ব্রত। এ ক্ষেত্রেও সে কথা তাঁরা ভুললেন না। রাজনৈতিক বিপক্ষ দলীয়রা নরমপন্থীগণকে আমলাতন্ত্রের মিত্রশ্রেণীভুক্ত বলে' প্রকাশ্যে নিন্দা করতে লাগলেন। তাঁদের সভা-সমিতিও চরমপন্থীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেত না। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন প্রশ্ন নিয়ে তাঁদের মত যখন চরমপন্থীদলের মত থেকে ভিন্ন হ'ত, সে সব প্রশ্ন আলোচনার জন্য তাঁরা যে সকল সভা সমিতির অনুষ্ঠান করতেন সেগুলির বৈশিষ্ট্য হ'ত হৈ-হট্টগোলপূর্ণ বিক্ষোভ আর উৎশৃঙ্খলতা। এ সকল বিক্ষোভের সময় অহিংসা ও অসহযোগ প্রায়ই ঘুষোঘুষি ও লাঠিবাজীতে রূপান্তরিত হ'ত। আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড চিৎকারের পর চিৎকার সমানে তার সাথে তাল রেখে চলত। গত চার পাঁচ বছর যাবৎ এসব জনসভায় আমি যেরূপ জঘন্য দৃশ্য লক্ষ্য করেছি, আমার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কালের জনসেবার সমগ্র কর্ম্মজীবনেও সেরূপ কোনদিন লক্ষ্য করি নি। অসহযোগের অন্তর্গত যে স্বরাজ্যদল আত্মার শক্তি প্রয়োগ করে' জয় লাভে ইচ্ছুক, "বিশ্বাসঘাতক", "লজ্জা" ইত্যাদি শব্দ এখন তাঁদের মুখে মুখে। এ সবের মধ্যে আত্মার শক্তির পরিবর্ত্তে পাশবিক শক্তি প্রদর্শনের অংশই ছিল অধিক। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, এ সমস্ত আপত্তিকর ও তদানুষঙ্গিক দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম্মের মধ্যে তরুণদিগকেই টেনে আনা হয়। আমাদের প্রাচীনদের মধ্যে যে সহনশীলতার নীতি ছিল, এখন তা' লোপ পেয়েছে। এবং প্রদেশের যুব সমাজের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর যত কিছু হ'তে পারে সে-সবের ধ্বংসকারী রীতিনীতিকেই উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে।

যাই হোক এই উগ্রপন্থীভাব যে মাত্র সে দিনের ঘটনা একথাটি যেন আমরা ভুলে না যাই। আমাদের বাবা-কাকা ছিলেন ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ফল এবং তাঁরা ছিলেন ইংরাজদের সমর্থক। পাশ্চাত্য

শিক্ষা ও সংস্কৃতির কোন দোষ ত্রুটিই তাঁদের চোখে পড়ত না। তাঁরা তার নূতনত্ব ও অভিনবত্ব দেখেই মোহিত হয়ে থাকতেন। কর্তৃস্থানীয়দের চিরাচরিত ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করে' নিজ নিজ ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করা, প্রচলিত প্রথাকে অবহেলা করে, কর্ত্তব্যকেই প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি বিষয় সুপ্রাচীন রীতিনীতিতে শ্রদ্ধাশীল ও তদ্দারাই পরিচালিত হ'তে অভ্যস্ত প্রাচ্যদেশীয়দের নিকট এক মহাসত্য উদ্ঘাটনের শক্তি ও আকস্মিকতা নিয়ে উপস্থিত হ'ল। স্বর্গীয় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন বঙ্গদেশে ইংরেজী সংস্কৃতির প্রবর্ত্তনের প্রথম দিকের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। অভক্ষ্য ভক্ষণ করবার পর তার ভুক্তাবশিষ্ট কিরূপে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পরিবারের বাড়ীতে নিক্ষেপ করা হ'ত, তাঁর জীবনীতে সে সব কাহিনীর বর্ণনা আছে। আজ অবধি সে কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে কেউ কোন প্রশ্ন তুলে নি। ইংরেজের সব কিছুই তখন উত্তম বলে' বিবেচিত হ'ত। এমন কি, সুরাপানও একটি গুণ বলে' মনে করা হ'ত। ইংরেজেরা যা' করে না তাকেই সন্দেহের চোখে দেখা হ'ত। একথা পরিষ্কার যে, বঙ্গদেশের তৎকালীন যৌবনসুলভ মনোভাবের এটিই ছিল এক পরিবর্ত্তনশীল চেহারা। এবং তার মধ্যেই তার অবনতি ও ধ্বংশের বীজ লুকিয়ে ছিল। যথা সময়ে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এবং তা' হ'ল হঠাৎ আর অতি প্রবল ভাবে। এটিই আমাদিগকে আমাদের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও যুগের পর যুগ অতীতের কালস্রোতের আঘাত সহ্য করে' এবং বর্ত্তমানে মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা স্বরূপ প্রচণ্ড শক্তিসমূহকে প্রতিহত করে' শ্রদ্ধায় সুরক্ষিত যে সকল রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার এখনো দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু এ আন্দোলন কি সফল হবে? সে বিষয়ে আমার গুরুতর সন্দেহ রয়েছে। তার কারণ, এরূপ আন্দোলন, এ সবের যে চিরন্তন সত্য রয়েছে তার এবং অগ্রগতির যে স্বর্গীয়নীতি

এক অদৃশ্য শক্তির অদৃশ্য হাত মানব ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় অঙ্কিত করে রেখেছে তার বিরোধী। তবে এ আন্দোলন সফল হোক বা না হোক বৃটিশ অনুরাগী মনোভাবের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তা' বাস্তবিক পক্ষে বৃটিশ সরকারেরই সৃষ্টি। কেন না কোন বৃটিশ সরকারই সম্পূর্ণরূপে বৃটিশের ঐতিহ্যমুক্ত হ'তে পারে না। ভারতে তাঁরা অনেক কথা অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেগুলি যেমন মহৎ তেমনি হিতকর। নিজেদের দ্বারা শাসিত হবার প্রচুর সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানের তাঁরা স্থাপনা করেছেন। ১৮৩৩ সালে চার্টার আইন প্রণয়ন করে' ভারতীয়দের সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত হবার পথে যে সকল বাধা ছিল সে সব দূর করেছেন। কিন্তু সেই চার্টার আইন কার্য্যত নিস্ফল হয়ে গিয়েছে। ১৮৫৮ সালে মহারাণীর ঘোষনায় বলা হয়েছিল একমাত্র গুণ অনুসারেই যোগ্যতা নির্ণয় করা হবে। এক্ষেত্রেও যত কথা যত প্রতিশ্রুতি প্রায় সবই ভঙ্গ করা হয়েছে। ১৮৮২ সালে স্থানীয় সায়ত্ত শাসন দেওয়া হ'ল। কিন্তু তার মধ্যে যে সব বিধি নিষেধ আরোপিত হ'ল ভারত সচিব হিসাবে লর্ড মর্লেও তার আপত্তি করেছিলেন। ফল কিছুই হ'ল না। সে বদান্যতা কার্য্যত ব্যর্থই হয়ে গেল। তারপর এলেন লর্ড কার্জ্জন ও তাঁর সর্ব্বপ্রকার আপত্তিজনক ব্যবস্থাগুলি, যথা—সরকারী গোপনীয়তা আইন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং সর্ব্বোপরি বঙ্গদেশ বিভাজন। এসবের ফলে মানুষের মনোভাবে এল এক প্রবল পরিবর্ত্তন। নবগঠিত প্রদেশে যে রীতিনীতি প্রচলিত হ'তে লাগল তার ফলে জনমানসে ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ক্রোধ ঘনীভূত হ'তে লাগল। এবং তা' চরমে পৌছিল যখন ১৯০৬ সালে বল প্রয়োগ করে বরিশাল সম্মেলন ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে কেউ যদি বঙ্গদেশের এমন কোন ঘটনার উল্লেখ করতে বলেন, যা বিকাশের ফলে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান উগ্রভাবের উৎপত্তি হয়েছিল তবে আমি বলব, তা' হ'ল ১৯০৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন ছত্রভঙ্গ

করে' দেবার পর বরিশালে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল সেগুলি। তখন বরিশালে বঙ্গদেশের সমবেত নেতৃবর্গের মধ্যে এমন এক উত্থান দেখা দিয়েছিল যা' তৎপূর্ব্বে আমি আর কোন দিন দেখি নি। এমন কি, মিঃ ভূপেন্দ্র নাথ বসুর মত একজন শান্ত প্রকৃতির হিসেবী লোক, যিনি কিছুদিন আগে একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্য হয়েছিলেন, তিনিও এমন ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন যা উনি বা আমি পুনরায় উচ্চারণ করতে পর্য্যন্ত দ্বিধা করব। এ ছিল এক প্রচণ্ড উত্তেজনার সময়। বৈধ উপায়ে আন্দোলনের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের মনে যে বিশ্বাস ছিল সেদিন তাও নড়ে উঠেছিল। যাঁরা ছিলেন বহুদিনের অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ রাজনৈতিক কর্ম্মী তাঁদেরই যদি মনের অবস্থা এরূপ হয়, তবে সে সময় বরিশালে যে-তরুণেরা দলেদলে যোগ দিয়েছিল, তাদের মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এ হ'ল ১৯০৬ সালের ঘটনা। আলিপুর ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে ১৯০৮ সালে। আমি এক তীব্র ঘৃণা নিয়ে বরিশাল থেকে বাড়ী ফিরলাম। শেষ পর্য্যন্ত সব কিছুই ভাল হবে বলে' যে ধারণাটি আমার মনে অটল হয়ে বাসা বেঁধেছিল তাও যেন অনেক পরিমাণে দুর্ব্বল হয়ে পড়ল। আমি এসে প্রথমেই সরকারের সঙ্গে আমার যা' কিছু সম্পর্ক ছিল তা' ছিন্ন করে দিলাম। তখনকার মত আমি হয়ে গেলাম এক অসহযোগী এবং এই মতের প্রথম দিকের প্রবর্ত্তকদের অন্যতম। কোলকাতায় আমি যে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে ও ব্যারাকপুরে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলাম, সে সমস্ত পদ আমি ত্যাগ করলাম। কোন নির্দ্দিষ্ট নীতি বা মত সমর্থন করা আমার এই পদত্যাগের উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল বরিশালের কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা। ১৮৯৯ সালে আমি যখন কোলকাতা কর্পোরেশনের আরও সাতাশজন সদস্য সহ মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের পদ ত্যাগ করেছিলাম, তখনো আমি তাই করেছি। কখনো কখনো এমন

একটি সময় আসে যখন প্রতিবাদ জানাবার জন্য অসহযোগ অপরিহার্য্য। তবে নীতি হিসাবে বিশেষভাবে আশানুরূপ তৎপরতার সঙ্গে না হলেও সরকার যখন প্রগতিশীল পথে কাজ করতে ইচ্ছুক হয় সে সময় আমি অবিরত অসহযোগ নীতিকে একেবারেই সমর্থন করতে পারি না।

শাসন সংস্কার সম্পর্কিত আলোচনার যখন সময় এল তখন আবহাওয়া তপ্ত হয়ে উঠেছে। ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করব বলে' আমি বিজ্ঞপ্তি দিলাম। আমি জানতাম যে, সেখানে নরমপন্থীদের অভিমত ন্যায় সঙ্গত ভাবে আলোচিত হ'বে এবং তা, শাসন সংস্কারের বিষয়টিকে আরও শক্তিশালী করবে। আমার সে আশা বৃথা হল না। ভাইসরয় নিজে সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন এবং বিতর্কও পূর্ণমাত্রায় হ'ল। প্রায় সকল প্রকার দৃষ্টিকোন থেকেই সংস্কারের বিষয় আলোচনা হ'ল এবং প্রস্তাবটি যেরূপ সমর্থন লাভ করল তা' ছিল খুবই সন্তোষজনক। মাত্র দুজন সদস্য ভিন্ন অন্য সকলেই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেন। আমার সে প্রস্তাবের বিষয়গুলি আমি নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

(১) শাসন সংস্কারের জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে তজ্জন্য এই কাউনসিল মহামান্য ভাইসরয় ও ভারত সচিবকে ধন্যবাদ জানাইতেছে। এবং ভারতে ধাপে ধাপে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অগ্রগতির পথে এ প্রস্তাবসমূহ এক সুনির্দ্দিষ্ট পদক্ষেপ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বলিয়া স্বীকৃতি দিতেছে।

(২) সংস্কার সংক্রান্ত বিবৃতি বিচার বিবেচনা করিয়া ভারত সরকারের নিকট সুপারিশ করিবার উদ্দেশ্যে এই কাউনসিলের সমুদয় বেসরকারী সদস্যকে লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করিতে এই কাউনসিল সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলের কাছে সুপারিশ করিতেছে।"

এখানে লক্ষ্য করা যাবে যে প্রস্তাবটি দুই অংশে বিভক্ত ছিল এবং

অংশ দুটিকে পৃথক পৃথক ভাবে রাখা হয়েছিল। উভয় অংশ সম্পর্কে কেবল দুজন সদস্যেরই আপত্তি ছিল। বর্ত্তমানে অসহযোগী দলের একজন খ্যাতনামা সদস্য মিঃ প্যাটেল ছিলেন সে দুজন সদস্যের মধ্যে একজন। তিনি প্রস্তাবটির প্রথম অংশটির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। ভারতে ধাপে ধাপে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অগ্রগতির পথে এ প্রস্তাবসমূহ যে এক সুনির্দ্দিষ্ট পদক্ষেপ সে কথা তিনি মেনে নিলেন না। দুজন ইউরোপীয় সদস্য, বোম্বাই বণিক সভার মিঃ হগ ও বঙ্গীয় বনিক সভার মিঃ আয়রন সাইড, প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশটির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। তবে তাঁরা আমাদের কমিটি মিটিং-এ উপস্থিত থেকে পরামর্শ দিয়ে আমাদের সহায়তা করতেন। যে-সব সভার প্রতিনিধি হয়ে তাঁরা এসেছিলেন তাদের নিকট থেকে নির্দ্দেশ না থাকাই ছিল তাঁদের এই আচরণের হেতু। ইউরোপীয় বণিক সভাগুলি সংস্কার সমূহের প্রতি এখন পূর্ণ সহানুভূতিশীল। কাউনসিল সমূহে তাঁদের প্রতিনিধিগণ তার সাফল্যের জন্য সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে। এ প্রস্তাব প্রসঙ্গে আমি আমার বক্তৃতার একটি অংশ উদ্ধৃত করছি। তা' থেকে সংস্কারগুলির সম্বন্ধে আমার ও নরমপন্থী দলের অভিমত পরিস্ফুট হবে।

"আমার মনে হয় একথা বলা যায় যে, বিবৃতিটি সামগ্রিক ভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, আমাদের শাসক গোষ্ঠির দৃষ্টিভঙ্গীতে যে এক পরিবর্ত্তন এসেছে তা' তার মধ্যে সুপরিস্ফুট। একথাও আমি সাহসের সঙ্গে বলব যে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের সরকারের প্রতি আমাদের আচরণেরও অনুরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমাদের শাসকেরা যদি শান্তি, মৈত্রী ও গণসন্তুটির পথে উল্লেখযোগ্য ভাবে অগ্রসর হয়ে থাকে, আমি নিবেদন করব, সাধারণ বুদ্ধি প্রসূত সুবিবেচনা ও দেশপ্রেম চায় যে, আমাদের দিক থেকে আমরাও সেভাবে অগ্রসর হই। কি ব্যষ্টিগত ক্ষেত্রে, কি সমষ্টিগত ক্ষেত্রে, সকল ক্ষেত্রেই জীবনের

নীতি হ'ল পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে' চলা। এভাবে চলতে পারাই হ'ল জীবন, আর তার বিপরীতই হ'ল মৃত্যু। আমাদের জাতির সুদীর্ঘ বাধাবিঘ্নসঙ্কুল ইতিহাসে এটিই ছিল বেঁচে থাকবার উপযুক্ত নীতি। আমাদের সেই সুপ্রাচীন ও চিরন্তন নীতিকে অনুসরণ করে' এই নবজাত পরিস্থিতিতে আপনাদিগকে মানিয়ে নেওয়া উচিত বলে' আমি মনে করি। এবং, মাননীয় মহোদয়, এ অবসরে একটি ব্যক্তিগত মন্তব্য করতে আমাকে যদি অনুমতি দেওয়া হয়, তবে আমি একথা বলব যে, আমার বিগত পঁয়তাল্লিশ বৎসর ব্যাপী রাজনৈতিক কর্ম্মজীবনে সরকারের বিরোধিতা করাই ছিল আমার একমাত্র নীতি। তা' আমার পক্ষে দোষেরই হয়ে থাকুক আর গুণেরই হয়ে থাকুক, আমি একথা জোর করে' বলতে পারি যে, এমন কোন রাজনৈতিক কর্ম্মী আজ জীবিত নেই, যিনি সরকারের নীতি ও ব্যবস্থা সমূহকে আমার চেয়ে অধিক শ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রতিরোধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু, মাননীয় মহোদয়, একটি পরিবর্ত্তন—আনন্দদায়ক পরিবর্ত্তন—আমাদের শাসকদের স্বপ্নাবিষ্ট মনোভাবের মধ্যে এসেছে। তাঁরা এখন আমাদের প্রতি সহকর্ম্মীভাবে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছেন। উৎসাহ ও তৎপরতার সঙ্গে এই হাত ধরে' নিয়ে বৃটিশ রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে সহযোগিতা করে' বিধাতা আমাদের দেশবাসীদের জন্য যে-ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে' রেখেছেন, সেই মহান অভীষ্ট লাভের পথে এগিয়ে যাবার জন্য আমি আমার স্বদেশবাসীগণকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

মাননীয় মহোদয়, আমরা আমাদের দেশের ইতিহাসের এক মনস্তত্ত্বমূলক মুহূর্ত্তে বাস করছি। পথ যেখানে দ্বিধা বিভক্ত আমরা সেখানে উপনীত। অতঃপর আমাদের পথ হবে ভিন্ন। ভবিষ্যত এখন আমাদের হাতে। আমরা তাকে সফলও করতে পারি, ধ্বংশও করতে পারি। সাহস, বিচারবুদ্ধি, সাম্ভীর্য্য, আত্মসংযম প্রভৃতি গুণাবলী ও তৎসহ আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধানগুণ যে স্বদেশপ্রেম সে

সকল প্রদর্শন করে, দেশের ভবিষ্যতকে সফল করে' তুলবার জন্য আমি আমার দেশবাসীগণের নিকট আবেদন জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস আমার এই আবেদন ব্যর্থ হবে না।"

আমি কেবল একথা বলতে পারি যে, আমার বক্তৃতা পরিষদকক্ষ ভালভাবেই গ্রহন করেছিল এবং ভাইসরয়ও যথাযথ ভাবে তার মর্ম্ম উপলব্ধি করেছিলেন। সেদিন অপরাহ্নে প্রায় পাঁচটার সময় টেলিফোনে সংবাদ দিয়ে ভাইসরয় আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। সংবাদ যখন আসে তখন আমি নিদ্রিত ছিলাম। জাগ্রত হবার পর সংবাদ পেয়ে আমি ভাইসরয় ভবনে যাত্রা করলাম। তাঁর সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ ধরে' আলাপ আলোচনা হ'ল। এত বেলাতে যে আমি নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলাম সে কথা শুনে তিনি বিস্মিত হলেন এবং নম্রস্বরে বললেন, "আপনার মহান প্রচেষ্টার ফলে আপনি নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এত দেরীতে যে আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তা' শুনে আমি বিস্মিত হয়েছি।" তার উত্তরে আমি বলেছিলাম, "আমার যখনই ইচ্ছা হয় তখনই আমি ঘুমাতে পারি। আমি যে স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পেরেছি এটিও তার এক গোপন হেতু"। সমস্ত দিন ব্যাপী কাউনসিলে যে বিতর্ক হয়েছিল সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম। এবং তিনি বললেন যে, আমি যখন কমিটি গঠনের জন্য প্রস্তাব দিয়েছি তখন আমারই সে কমিটির চেয়ারম্যান হওয়া উচিত।

একশ্রেণীর সংবাদপত্র নরমপন্থীদলের ও বিশেষভাবে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করতে লাগল যে, আমি রাজনৈতিক কর্ম্মীজীবনে আমার মত পরিবর্ত্তন করেছি। এবং পূর্ব্বে আমি যা' দিলাম এখন আর তা' নেই। পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মতের পরিবর্ত্তন হলে, তাতে অপরাধই বা কি, আর দোষেরই বা কি? অটলতাই যে সর্ব্বদা নৈতিক উৎকর্ষের প্রমাণ তাও নয়। কখনো কখনো তাতে বোঝা

যেতে পারে যে, ভ্রান্তিকেই যেন ধরে রাখা হয়েছে। প্রগতিশীল মনের উচিত সময় সময় পরিবর্ত্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন ধারণা-গুলিকে বিচার করে দেখা। আমার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে, কোন মৌলিক বিষয়ে আমার মতের কখনো পরিবর্ত্তন হয়নি। তবে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বিষয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী আমিও আমার মতের পরিবর্ত্তন করেছি। আমার লক্ষ্য সর্ব্বদাই এক ও অপরিবর্ত্তনীয়। তাতে উপনীত হবার আবশ্যকীয় প্রণালীও একই রয়েছে। যে সব বিষয় নিতান্ত সাধারণ ও যে সবের কোন গুরুত্ব নেই কেবল সে সবের মধ্যে কিছু কিছু রদবদল হয়েছে। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে স্বায়ত্ত শাসনই সর্ব্বদা আমার লক্ষ্য। আর বৈধ অন্দোলনই তা' লাভ করবার পদ্ধতি। ১৮১৭ সালের ২০শে আগষ্টের ঘোষনার পর আমাকে বিবেচনা করতে হয়েছে আমরা এখন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার পথ ধরে' চলব, না, কি অসহযোগিতার পথে সরকারের সঙ্গে বিরোধিতা ও সংগ্রাম করব। আমার রাজনৈতিক কর্ম্মজীবনের প্রথম দিকের বছরগুলিতে আমাকে কেবল বিরোধিতাই করতে হয়েছে। তা' ছিল কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের কাজ। কোন শিথিলতার স্থান তার মধ্যে ছিল না। কিন্তু সরকার যখন জনসাধারণের দাবী মেনে নেবার আগ্রহ দেখিয়ে এগিয়ে এলেন এবং তজ্জন্য সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন আমার বিরোধিতা তৎপরতার সঙ্গে সহযোগিতায় রূপান্তরিত হ'ল। আমাদের অভীষ্ট যখন এক এবং দায়িত্বশীল সরকার গঠনের কাঠামো নির্ম্মাণের জন্য যখন আমাদের সহযোগিতা চাওয়া হ'ল, তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগল, আমার বিরোধিতা কি এখন আমাদের উভয় পক্ষেরই অভিন্ন ও মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একান্ত ও সক্রিয় সহযোগিতায় রূপান্তরিত হওয়া উচিত নয়? আমরাই যে পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছি সে কথা সত্যি নয়। সরকারের আশা আকাঙ্ক্ষা ও নীতির মধ্যেই এক মৌলিক পরিবর্ত্তন হয়েছে। আমরা তাকে স্বাগত

জানালাম। আমরা সরকারের প্রতি আমাদের আচরণের সংশোধন করলাম এবং স্বায়ত্ত শাসন লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করলাম। যেখানে সহযোগিতা প্রয়োজন সেখানে বিরোধিতাই হত দেশ প্রেমের চরম বিরোধিতা। তদপেক্ষা ক্ষতিকরও তা হ'তে পারত। সেটা হ'ত দেশদ্রোহিতা। এগুলি অত্যন্ত শক্ত কথা সন্দেহ নেই। তবে পরিস্থিতির প্রকৃত বর্ণনা দিতে গেলে এছাড়া গত্যন্তর নেই। কোন কোন লোকের ধারণা হয়েছিল এ সংস্কারগুলি আসলে ছলনা মাত্র। অসতর্ক ও সহজে বিশ্বাসপ্রবণ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার জন্য এক বিরাট প্রবঞ্চনা। এ সমস্ত লোক যদি সংস্কারের বিরোধিতা করেন তাতে বলবার কিছুই থাকে না। এবং সেজন্য তাঁরা যদৃচ্ছাক্রমে উপায়ও অবলম্বন করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের মতের সঙ্গে আমাদের মত মিলছে না বলে' আমাদের গালি দিতে পারেন না। দায়িত্বশীল সরকার গঠনের পথে সংস্কারগুলি যে এক অগ্রগতি তা জেনেও আমরা যদি তার বিরোধিতা করতাম তা' হ'লে সেটা হ'ত আমাদের নীতির প্রতি অবহেলা। আমাদের মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা ছিল না। শাসন সংস্কারগুলি থেকে যা' পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম। তাদের কাছ থেকে কতটুকু লাভ হবে তাও আমাদের অজানা ছিল না। তবে তৎকালীন অবস্থাতে আমাদের মনে হয়েছিল যে, সংস্কারগুলি নিয়ে কাজ করতে করতে হাত পাকিয়ে তারপর অধিকতর ক্ষমতার জন্য চাপ দেওয়াই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হবে। শান্তি ও শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের ক্ষমতা অর্জ্জনের এই ছিল একটি সুযোগ। এর বিকল্প কি আর হ'তে পারত? আমরা অন্তত কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। আমাদের হয়ত এই ক্রমবিকাশমূলক আন্দোলনের পথ ধরতে হ'ত, যার শেষ পরিণতি হ'ত যথা সময়ে পূর্ণতম দায়িত্বশীল সরকার গঠন, অথবা বিপ্লববাদের কর্ম্মসূচী

ধরে' অনিশ্চিত পথে চলা যার মধ্যে ছিল অনন্ত বিপদের সম্ভাবনা ও জয়লাভের অনিশ্চয়তা। বঙ্গদেশে বিপ্লব আন্দোলনের চেষ্টাও বাস্তবিক পক্ষে হয়েছিল। যাঁরা তাতে সাহায্য করেছিলেন দেশের জন্য তাঁদের স্বার্থত্যাগ ও একাগ্রতার তুলনা হয় না। কিন্তু তা' সত্ত্বেও তা' সফল হয় নি। আরও দুঃখের কথা এই যে, যাঁরা ছিলেন সেই নাটকের প্রধান অভিনেতা, তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবীর নিকট মাথা নত করে' শান্ত নাগরিকের জীবন অবলম্বন করেছেন। বর্ত্তমান যুগে যেখানে সুগঠিত ও সুশিক্ষিত সেনাদলের সাহায্য পাওয়া গেছে, কেবলমাত্র সেখানেই বিপ্লবী আন্দোলন সফল হয়েছে। ভারতের বিপ্লবীদের সাহায্য দেবার মত সেই সেনাদল কোথায়? আর যেখানে বিপ্লব সফলও হয়েছে সেখানেও তা পেছনে রেখে গেছে শুধু রক্তের দাগ, ধ্বংশ ও লুণ্ঠনের লোমহর্ষক স্মৃতি চিহ্ন। তা মুছে ফেলে পুনর্নির্ম্মাণ করতে বহু পুরুষ ধরে' পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়েছে। মনস্বী এডমাণ্ড বার্ক বলেছেন, বিপ্লব হ'ল চিন্তাশীল ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের শেষ অবলম্বন। জন্মাবধি কংগ্রেসের মূলনীতি হ'ল ক্রমবিকাশ। অতীতে কংগ্রেস নায়কেরা বারবার ক্রমশ স্বায়ত্ত শাসন দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্টের ঘোষণার মধ্যেও তাহাই বলা হয়েছে। ১৯০২ সালে আমেদাবাদে কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে আমি বলেছিলাম,—

"মহিমান্বিতা জননী স্বরূপা ইংলণ্ডের অধীনস্থ স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যসঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশের অধিকার অপেক্ষা উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা আমাদের নেই।"

এবং আরও বলেছিলাম,—

"আমরা স্বীকার করি যে, অভীষ্টের দিকে আমাদের গতি প্রয়োজন বশতই মন্থর হবে এবং দীর্ঘ দিন ব্যাপী শ্রমসাধ্য প্রস্তুতি ও শিক্ষানবিশির পরই আমরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম হ'ব। তবে একটি আরম্ভ, যে ভাবেই হোক, করতেই হবে।"

মিঃ গোখলে ১৯০০ সালে যখন বারানসী কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন, তখন তিনিও প্রায় সেই একই কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"ভালর জন্যই হোক, কি, মন্দের জন্যই হোক, আমাদের ভাগ্য এখন ইংলণ্ডের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। আর কংগ্রেস একথাও বুঝতে পেরেছে যে, আমরা যত অগ্রগতিই চাই না কেন, সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেই তা' সীমায়িত। এবং সেই অগ্রগতিও কেবলমাত্র ক্রমশই হতে পারে।"

সুতরাং নরমপন্থীদলের দাবী এই যে, আমরাই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতা ও এই মহান প্রতিষ্ঠানের সংগঠকদের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী এবং আমরাই এই প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে' রেখেছি। বাস্তবে যাঁরা ঐ ঐতিহ্যকে পরিহার করে' ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছেন, তাঁরাই বাস্তবিক পক্ষে সাজ্ঘাতিক পরিবর্ত্তন নিয়ে এসেছেন। যে সুপ্রাচীন নীতি পূর্ণ-দায়িত্বশীল সরকার আমাদের দৃষ্টির মধ্যে এনে দিয়েছে এবং যার বলে কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠাতাদের স্বপ্ন আজ সফলতার পথে, সেই সুপ্রাচীন নীতির মধ্যেই আমাদের মূল প্রোথিত রয়েছে।

লেজিসলেটিভ কাউনসিল যে কমিটি নিযুক্ত করেছিল তা' অত্যন্ত অধ্যবসায় ও যত্নের সঙ্গে কাজ করতে লাগল। আমি ছিলাম সে কমিটির চেয়ারম্যান এবং রাইট অনারেবল মিঃ শাস্ত্রী ছিলেন তার সম্পাদক। যথা সময়ে আমরা আমাদের বিবৃতি দাখিল করলাম। তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় আমি এখন যেতে চাই না। পরিকল্পনাটির মূলে ঐকান্তিকতা থাকলেও এবং তা' সম্মুখের দিকে একটি পদক্ষেপ হলেও তাতে আশানুরূপ হ'ল না। বিশেষভাবে একটি বিষয়ে তাই ফুটে উঠল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি কোন দায়িত্বের কথা পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না। আমাদের বিবৃতির মধ্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার উপর আমরা জোর দিয়েছিলাম। আমরা যুগ্ম-কমিটির সামনে যখন সাক্ষ্য দিয়েছিলাম তখন এবং যত স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলাম তার মধ্যেও

এ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম। সেটুকু সুবিধা এযাবৎ পাওয়া যায় নি। কেন যে এমন ভাবে তা' ফেলে রাখা হয়েছে তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রদেশগুলিতে যদি দ্বৈত শাসন কার্য্যকর ও সম্ভবপর হতে পারে, তবে সেনাবিভাগ ও ভারতীয় রাজন্যদের রাজ্যগুলির বিষয়ের মত বিষয়গুলি বাদ দিয়ে কেন্দ্রেও দ্বৈত শাসন প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করা উচিত।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের মধ্যে ফ্র্যানচাইজ কমিটি ও ফাঙ্কশান্‌স কমিটি নামে দুটি কমিটি নিযুক্ত করবার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। ফ্র্যানচাইজ কমিটির কাজ হবে ভোটদান সম্পর্কিত বিষয়, ভোট দাতাদের বিষয়, কাউনসিলে সদস্যদের সংখ্যা, হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিদের পারস্পরিক অনুপাত এবং অনুরূপ বিষয়গুলির বিচার বিবেচনা করা। ফাঙ্কশান্‌স কমিটির কাজ হবে "সংরক্ষিত" বিষয়গুলি ও যে বিষয়গুলি "হস্তান্তর" করা হবে তাদের সম্পর্কে সুপারিশাদি করা। আমাকে ফ্র্যানচাইজ কমিটির সদস্য করা হয়েছিলো। চেয়ারম্যানকে বাদ দিলে এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ছয়, তন্মধ্যে তিনজন ইউরোপীয় ও তিনজন ভারতীয়। ভারতীয় সদস্যগণ ছিলেন,— রাইট অনারেবল মিঃ শাস্ত্রী, ইণ্ডিয়া কাউনসিলের মেম্বর মিঃ আফতাব মহম্মদ ও আমি। ইউরোপীয় সদস্যরা ছিলেন,—স্যার ফ্র্যাঙ্ক স্লাই, স্যার ম্যালকলম হেইলী ও স্যার ম্যালকলম হগ। কমিটি ছোট হলেও তার মধ্যে ইউরোপীয়, ভারতীয়, সরকারী, বেসরকারী সকল প্রকার স্বার্থের প্রতিনিধি স্থান পেয়েছিলেন। সদস্যরা কখনো পরস্পর বিরোধী স্বার্থ ও দৃষ্টি ভঙ্গি এবং কখনো বিপরীতমুখী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তার ফলে স্বভাবতই মতৈক্য বা কার্য্যে সমন্বয় সাধন সব ক্ষেত্রে সহজ হ'ত না। কিন্তু ক্রমাগত যখন কাজ করে' চললাম তখন আমাদের বাধাও ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে লাগল এবং শেষ পর্য্যন্ত আমাদের এমন কোন সমস্যাই দেখা দিত না, যা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমাধান করা না

যেত। এখানে সেখানে মতান্তর হয়ত হ'ত, তবে সাধারণ মতৈক্য ও সমন্বয় ছিল আমাদের সকল আলোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রধানত লর্ড সাউথবারো এবং সকলের মধ্যে আপোসে "দিয়ে-নিয়ে" মীমাংসা করে' নেবার মনোবৃত্তি এক্টুটির ফলে তা' সম্ভব হয়েছিল। চেয়ারম্যান হিসাবে লর্ড সাউথবারো ছিলেন আদর্শ স্থানীয়। তাঁর উদার মন, সহানুভূতিশীল ভাব এবং সহজাত সদ্ব্যবহার সমস্ত বিরোধিতাকেই নিরস্ত করতে পারত। উপায় উদ্ভাবন করতে তিনি ছিলেন অসম্ভব দক্ষ। আমার স্পষ্ট মনে আছে, অত্যন্ত জটিল কোন প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কের পর তিনি এমন কোন এক বা একাধিক শব্দ এনে হাজির করতেন যার ফলে ভিন্ন ভিন্ন মতেরও সমন্বয় হয়ে সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে তিনি একজন চমৎকার ভাইসরয় হ'তে পারতেন। তবে তা' হবার উপায় ছিল না। ভারতে তার স্বাস্থ্য টিকত না। একবার লাহোরে যখন আমাদের মিটিং চলছিল তিনি হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে চেয়ার থেকে পড়ে যান। তখন ধরাধরি করে' তাঁকে বাড়ী নিয়ে যেতে হয়েছিল। আমার অসুবিধা হ'লে অনেক সময় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম এবং তাঁর কাছ থেকে মূল্যবান সহায়তা ও পরামর্শ নিতাম। ইংলণ্ডে থাকাকালে মাঝে মাঝে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। তিনি সব সময় ভারত ও ভারতের লোকদের সম্পর্কে স্নেহসূচক কথা বলতেন এবং আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন।

আমাদের কমিটি ছিল এক ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান কমিটি। বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীতে গিয়ে আমরা সাক্ষ্য গ্রহণ করতাম এবং স্থানীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনাদি করতাম। যেখানেই আমরা গিয়েছি, সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছি। আমাদের বয়কট করবে, আমাদের সম্মুখে সাক্ষ্য দেবে না বা তথ্যাদি আমাদের যোগাবে না, এমন কোন কথা বা ঘটনা কখনো হয় নি। স্থানীয় সরকারের পরামর্শ আমাদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। যেখানেই গিয়েছি সরকারী প্রধান

প্রধান কর্ম্মচারী, কাউনসিলার ও সেক্রেটারীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা করবার আমাদের সুযোগ হ'ত। দুটি সরকার আমাদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিহীন ছিল। তারা হ'ল মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব সরকার। মাদ্রাজ সরকার ছিল সম্প্রদায় ভিত্তিক নির্ব্বাচনের সমর্থক। কোন বৈষম্যহীন সাধারণ নির্ব্বাচক মণ্ডলীতে তাঁদের বিশেষ আপত্তি ছিল। পাঞ্জাব সরকারের ইচ্ছা ছিল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে মাত্র অল্প সংখ্যক সদস্য থাকবে। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে ব্যাপক ভাবে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি পাঠাবার যে সুপারিশ ছিল তাতে পাঞ্জাব সরকারের আপত্তি ছিল। কমিটি এ দু' সরকারের সঙ্গে একমত হতে পারল না। নিজেদের মতে কাজ করে' গেল।

কমিটির বিষয়ে বক্তব্য শেষ করবার পূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার ফ্রাঙ্ক স্লাই সম্পর্কে একটি কথা বলতে চাই। তিনি ছিলেন কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান। অনেক সময় লর্ড সাউথবারোর অনুপস্থিতিতে তিনি আমাদের মিটিং-এ সভাপতিত্ব করতেন। কোন বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝবার ক্ষমতা, কমিটি পরিচালনা ও তার কাজকর্ম্ম বিষয়ে বিচক্ষণতা, অনিচ্ছুক ও বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সাক্ষীদিগকে ফলপ্রসূভাবে জেরা করা ইত্যাদি কারণে তাঁর নিকট থেকে কমিটি অনেক মূল্যবান সাহায্য পেয়েছিল। তাঁর জেরা শুনতে শুনতে অনেক সময় আমার মনে হয়েছে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে না এসে আইন ব্যবসাতে যাওয়াই তাঁর পক্ষে উচিত ছিল। সেটিই ছিল তাঁর উপযুক্ত স্থান। বন্ধুবর আফতাব মহম্মদ ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের এক অদম্য সমর্থক। যদিও জাতির বৃহত্তর স্বার্থ থেকে তিনি কখনো দৃষ্টি ফেরাতেন না, তবুও আমার মনে হ'ত কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি তাঁর স্ব-ধর্ম্মী মুসলমানদের বিশেষ বিশেষ মতকে সমধিক গুরুত্ব দিতেন। মিঃ শাস্ত্রী ছিলেন সাধারণত পক্ষপাতহীন। তবে তিনি যেন সন্দেহ করতেন যে, বঙ্গদেশ একটু অতিরিক্ত ভাবেই সব কিছু নিজের ইচ্ছামত করে।

তিনি কোন কোন সময় রাশ টানতেও চেষ্টা করতেন। সরকারী সদস্যদের সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়েছিল, তাঁরা তুলাদণ্ড সমান রাখতেই সচেষ্ট ছিলেন এবং সামগ্রিক ভাবে পক্ষপাত শূন্য হয়েই সকল স্বার্থের কথা বিচারবিবেচনা করতেন। মোটের উপর আমাদের ছিল একটি সুখী পরিবার। কাজ করে' সুখ পেতাম। আর বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন প্রদেশের শাসকদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়ে প্রচুর আনন্দ লাভ করতাম। এক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজের ভার নিয়ে এক সরকারী কমিটির সদস্যরূপে বসার এই অভিনব পেশাটি আমার পক্ষে ছিল এক নূতন ধরণের শিক্ষা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে খবরের কাগজ পড়ে আমি যা পেতাম না, বসে একমিনিটে আমি তাই পেলাম। সরকারের সঙ্গে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন লোকের কিরূপ যে সম্বন্ধ ছিল তা' এখানে বিশদভাবে দেখবার আমার সুযোগ হয়েছিল। সরকারী দপ্তরের ধূলি ধূসর নথি পত্রের মধ্যে বা, এমন কি, দৈনিক পত্রের অধিকতর প্রাণচঞ্চল ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেও সহজে অনেক কিছু চোখে ধরা পড়ে না। মানুষের সংস্পর্শে এলে চোখের দৃষ্টিশক্তি খুলে যায়। মানুষ থাকে তখন আপনার সামনে। সেই ত মানুষের শাসক। তাকে আপনি দেখতে পান, তার কথা শুনতে পান, তার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করার সুযোগ পান—পুরো মানুষটিই যে সেখানে। দর্শকের মনের উপর সে যা' ছাপ রেখে যায় বাস্তব সত্যের সে চিহ্ন সহজে মুছবার নয়। কলম বা শব্দের মাধ্যমে প্রেরিত সংবাদ কৃত্রিম উপায়ে বা আকস্মিক ভাবে যে আবরণের সৃষ্টি করে তার অন্তরালেও সে ছাপ ঢাকা পড়ে না।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নীতি লিপিবদ্ধ করে' দিয়েছিল। তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলি নিরূপণের ভার ছিল কমিটির উপর। লেজিসলেটিভ কাউনসিলে প্রতিনিধি প্রেরণের বিষয়টি ছিল তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। রিপোর্টের মধ্যে

সম্প্রদায়ভিত্তিক নীতিকে উন্নতিশীল জাতীয় ভাবপূর্ণ নাগরিকত্বের আগ্রহে হস্তক্ষেপ বলে' নিন্দা করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ মর্লে-মিন্টো পরিকল্পনায় সে নীতিই স্বীকৃতি হয়েছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মতি ভিন্ন তা' থেকে ফিরে যাবার উপায় ছিল না। একটি সুবিধা দিতে গিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে মূল্যবান একটি সুযোগ প্রত্যাহার করতে গেলে তা' হ'ত সামঞ্জস্যহীন ও অযৌক্তিক। সম্প্রদায় ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের নীতি গৃহীত হয়ে যাওয়ার পর আমাদের বিবেচ্য বিষয় ছিল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের পারস্পরিক অনুপাত কি হবে। এখানে আমরা ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ কনভেনশন থেকেই পথের নির্দ্দেশ নিলাম। তা' যে ভাবে ছিল সে ভাবেই নিয়ে নেব, না, কি আমাদের ইচ্ছানুসারে তা' সংশোধন করে নেব, কমিটি উৎকণ্ঠার সঙ্গে সে সমস্তই পর্য্যালোচনা করতে লাগল। অবশেষে আমরা প্রধানত লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের পথ ধরে চলবারই সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা যে সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলাম তার মধ্যে যে কত অদ্ভুত প্রকারের বিষয় ছিল তা' সহজেই অনুমান করা যায়। চরমপন্থী কোন পক্ষে কম ছিল না। হিন্দুরা কোন কিছুই ছাড়তে ইচ্ছুক নয়, আর যদিওবা ছাড়ে তাও নগণ্য। মুসলমানেরা আবার চুক্তির মধ্যে যা' ছিল তাকেও ছাড়িয়ে যেতে ছিল একান্ত আগ্রহী। আমরা মনে করলাম উভয় সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত দাবীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লক্ষ্ণৌতে যেরূপ ভাবে সমস্যার সমাধান হয়েছিল তা' গ্রহণ করলেই আমাদের ক্ষেত্রেও এক উৎকৃষ্ট মাঝামাঝি ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দলগত উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের স্বরাজ্য দলপন্থীরা বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করতে আরম্ভ করলেন। স্বরাজ্য দলের প্রস্তাবে হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ ক্ষোভ দেখা দিল কিন্তু মুসলমানেরা উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে তা' বরণ করল। এ বিষয়ে আমি পরে আরও আলোচনা করব। সেই পুণর্ব্বিবেচনার ফলেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এত মতান্তর সৃষ্টি হয়েছে।

এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম বিতর্কমূলক অপর একটি বিষয় নিয়েও ফ্রানচাইজ কমিটিকে বিচার বিবেচনা করতে হয়েছিল। তা' ছিল জমিদারদের জন্য এক বিশেষ ভোটদাতামণ্ডলীর ব্যবস্থা করা। বিশেষ ভোটদাতা মণ্ডলী আমি কোন কালেই সমর্থন করতাম না। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকার সময় আমি কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল-এ সে সব যতদূর সম্ভব কেটে ছোট করে দিয়েছিলাম। এরূপ বিষয়গুলি নীতির দিক থেকে গণতন্ত্রের পরিপন্থী। তাতে কতকগুলি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয় আর সাধারণ ভোটদাতাদের থেকে তাদের প্রাপ্য আসনগুলি ছিনিয়ে নেওয়া হয়। মোটামুটিভাবে কমিটি বোধহয় এনীতি গ্রহণের বিরোধী ছিল। কিন্তু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ছিল অন্য প্রকার। কাজেই তাহাই আমাদের মেনে নিতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে মন্টেগু-চেমসফোর্ড পরিকল্পনার ভিত্তি গণতন্ত্রমূলক হলেও, হুকুম মাফিক এক বিশেষ ভোটদাতা মণ্ডলী শিখ সম্প্রদায়ের জন্যও সৃষ্টি করতে হয়েছিল। যুদ্ধের সময় সেনা বিভাগে তাঁদের অবদান ছিল অসামান্য। বৃটিশ স্বার্থের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এই সামরিক জাতির পৌনঃপুনিক দাবীর কাছে এক কৃতজ্ঞ সরকারকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। রাজনৈতিক নীতিকে ন্যায় ও যৌক্তিকতার উপর নির্ভর করে সব সময়ে যে নির্ণয় করা চলে না, এখানে সে সত্যেরই একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কি প্রকার অবস্থার মধ্যে তাকে কার্য্যে লাগাতে হবে সে কথা বিবেচনা করেই প্রত্যেক নীতি নির্দ্ধারণ করতে হয়।

এব পরে এল নিবাসের প্রশ্ন। ভোটদানের অধিকার কি কেবল নির্ব্বাচন কেন্দ্রের এলাকার মধ্যেই যারা বসবাস করে তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, না, কি প্রদেশের মধ্যে যাদের নিবাস ও যাদের নাম নির্ব্বাচনী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত করা হবে? সরকারী মত ছিল প্রথমটির পক্ষে। ইংরেজদের প্রথা অন্য রকম এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয়দের মতের সঙ্গে তার মিল আছে। প্রকৃত

পক্ষে ভোটদাতা যেখানে বসবাস করে তার ভোটদানের যোগ্যতা যদি তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তা' হলে বাছাই-এর ক্ষেত্র অনেক সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে আইন সভাতে যাবার যোগ্যতম ব্যক্তিও বাদ পড়ে যেতে পারে। তা' ছাড়া আবার দেখা যায় নির্ব্বাচনী কেন্দ্রগুলিও যখন তখন মত পরিবর্ত্তন করে। এরূপ নির্ব্বাচক মণ্ডলী তাদের খেয়ালখুশী অনুসারে অনেক সময় যোগ্যতম ব্যক্তিকেও উপেক্ষা করে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে সংকীর্ণ আবাসিক যোগ্যতার উপর নির্ভর করতে হ'লে তাকে বাদ পড়তে হয়। অপর পক্ষে বলা হল যে, আবাসিক যোগ্যতার বাঁধন শিথিল করলে যে-নির্ব্বাচন কেন্দ্র থেকে কোন ব্যক্তি নির্ব্বাচন-প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবে সে কেন্দ্রের প্রতি সে ব্যক্তির কোনই উৎসাহ থাকবে না, এমন কি, হয়ত সারা প্রদেশের বিষয়েও তার আগ্রহ সামান্যই থাকবে। তাতে কেবল মাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও রাজনৈতিক ফাটকাবাজেরাই আইন সভার আসনগুলি অধিকার করে বসবার সুযোগ পারে। যে কারণেই হোক, স্থানীয় সরকারেরা সাধারণ আবাসিক যোগ্যতাকেই সমর্থন করেছিলেন। এ বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে লর্ড রোনাল্ডসে ও বঙ্গদেশের একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যদের সঙ্গে যে এক তীব্র লড়াই হয়েছিল সে কথা আমার মনে আছে। তাঁরা সকলেই আমার বিরোধিতা করেছিলেন। লর্ড সাউথবারো এবং ভারতীয় সদস্যগণের মত ছিল অন্য প্রকার। শেষ পর্য্যন্ত সেটিই গৃহীত হ'ল। অন্যান্য প্রদেশে আবাসিক যোগ্যতার ব্যবস্থা থাকলেও বঙ্গদেশের নির্ব্বাচনী নিয়মাবলীর মধ্যে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নেই।

সাউথবারো কমিটির সদস্য হিসাবে ১৯১৯ সালে আমি বোম্বাইতে যাই। তবে তার কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা যখন নাগপুরে ছিলাম আমার বন্ধু মিঃ দলভীকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, এলফিনষ্টোন

কলেজের ছাত্রেরা চাঁদা দিয়ে যে দাদাভাই নওরোজীর একটি চিত্র নির্ম্মাণ করিয়েছিল, আমি তার আবরণ-উন্মোচন করব। এখন আমার সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হলটি নিয়ে সেখানেই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছিল। বহু গণ্যমান্য লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং অধ্যক্ষ কোভারণটন সে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন। আমি সেখানে বেশ দীর্ঘ এক ভাষণ দিয়েছিলাম। এই স্মৃতিচারণে তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করার মত স্থান নেই। তবে একটি বিষয় তার মধ্যে ছিল যা' সম্ভবত চিরদিন ভারতীয় রাজনৈতিক কর্ম্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং যা' বর্ত্তমানেও অসহযোগ সম্পর্কিত বিতণ্ডাদির ফলে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। পৃথিবীতে এবং বিশেষ রূপে ভারতে, যেখানে লোক অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও যে দেশের সংবিধান রচনা এখনো শেষ হয় নি, সেখানে আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে অবিরাম এক সংঘর্ষ চলেছে। যতদিন এই আদর্শ ও বাস্তবের কোন যুক্তি সঙ্গত সমন্বয় সাধন না হবে, ততদিন এ সংগ্রাম বংশপরম্পরায় চালাতে হবে। যে যুবসমাজের হাতে ভবিষ্যতকে রক্ষা করার দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে, তাদের পক্ষে প্রশ্নটি অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। পশ্চিম ভারতের বহু যুবক এখানে সমবেত হয়েছিল। তাদের কাছে এবিষয়ে আমি বলেছিলাম,—

"ভদ্রমহোদয়গণ, 'আদর্শবাদ' অতি উত্তম। আমি নিজেও একজন একান্ত আদর্শবাদী। বর্ত্তমানকে নিয়ে আমরা কখনো সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। সংযত ও নিয়ন্ত্রিত অসন্তোষ এক স্বর্গীয় পদার্থ। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক, মহান হোক ও অধিকতর গৌরবময় হোক এটি আমাদের সকলেরই আকুল আকাঙ্ক্ষা। উষার প্রথম আলোর রেখা প্রায় ফুটে উঠেছে। কম্বুরবে ঘোষণা করছে, ভারতে এক নব দিনের জন্ম হ'ল। মুক্তির সেই নবারুণকে প্রণাম করবার জন্য আমরা সকলেই প্রস্তুত হচ্ছি। সুপ্রাচীন এই দেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে তার উত্তাপও তার

আলোক। সুদূর অতীতে এই দেশেরই পবিত্র নদীতীরে বসে' বৈদিক ঋষিগণ উদাত্ত কণ্ঠে বেদমন্ত্র গান করেছেন। তাও ত ছিল এক শিশুপ্রায় আকুল আকাঙ্ক্ষারই প্রথম প্রকাশ। মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই সেই শুভ দিনের আগমন উদ্দেশ্যে দাদাভাই এবং আরও অনেকে প্রভূত পরিশ্রম করে গিয়েছেন। সুতরাং আদর্শকে আমরা যেন কিছুতেই ছোট না করি। তারা আমাদের কল্পনাশক্তিকে প্রভাবিত করে, হৃদয়ে দোলা দিয়ে যায় এবং মহৎ কার্য্যের উৎসকে উদ্দীপিত করে। তবে সেই আদর্শের সঙ্গে যা' কার্য্যত সম্ভব তার এক সামগ্রিক সমন্বয়সাধন একান্তই প্রয়োজন। এ দুয়ের একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে' রাখা কিছুতেই চলবে না। পরিস্থিতি অনুসারে প্রথমে আদর্শকে কার্য্যের সম্ভাব্যতার অধীন করে নিতে হবে। তারপর ধীরে ও অবিচলিত ভাবে পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করে' আদর্শে উপনীত হবার পথে তাকে অগ্রসর করেদিতে হবে। প্রকৃতির রাজ্যে অথবা নৈতিক জগতে মহাপ্রলয় বা ধ্বংস বলে' কিছু নেই। জীবনে ও তার সমস্ত ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশের ধারাই হ'ল চরম নীতি। যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমানের আদর্শ ভবিষ্যতের বাস্তবে পরিণত না হয়, সে পর্য্যন্ত আমাদের পরিবেশকে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে বিকশিত ও উন্নত করে' যেতে হবে। এশিক্ষাও আমরা দাদাভাই নওরোজীর জীবন থেকে লাভ করেছি। কোলকাতার কংগ্রেসমঞ্চ থেকে স্ব-রাজের উল্লেখ করে' তিনি বলেছিলেন যে, আরম্ভ একটা করা দরকার। পরে সেটিই উন্নত হতে হতে স্ব-রাজের পূর্ণাঙ্গআইনসভাতে পরিণত হবে। আরম্ভ করতে হবে, ধাপে ধাপে তাকে উন্নত করতে হবে এবং সবশেষে তাকে স্ব-রাজে পরিণত করতে হবে"।

আমাদের যুগে যাঁরা শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ তাঁরা এশিক্ষাই দিয়েছেন। এবং আমার জীবনে তাহাই আদর্শ হয়ে রয়েছে। যৌবনে তাকে অঙ্কুরিত করেছিলাম, প্রৌঢ় বয়সে তাকে লালনপালন করেছি, এখন জীবনের

শেষ প্রান্তে এসে তাকেই অবলম্বন করে রয়েছি। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা তার প্রতি আমার বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করেছে। টেনিসনের লেখায় যে শিক্ষা পেয়েছি আমি সযত্নে তারই অনুসরণ করি। সে এক মহিমাময় নির্দেশ, ধীরে নিয়মিত ভাবে বিকাশের জন্য নিরলস চেষ্টা চাই। তবে অত্যধিক ত্বরান্বিত করবার চেষ্টাকে পরিহার করতে হবে। তিনি বলেছেন, "অস্বাভাবিক তৎপরতা বিলম্বেরই নামান্তর।"

একত্রিংশতি অধ্যায়

১৯১৯ সালে ইংলণ্ডে নরমপন্থীদলের প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণ

ফ্র্যানচাইজ কমিটির রিপোর্ট যথা সময়ে প্রকাশিত হ'ল। এবার আমরা নরমপন্থীদল থেকে ইংলণ্ডে এক প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণ করবার ব্যবস্থার কাজে মন সংযোগ করলাম। কয়েকমাস পূর্ব্বে যখন নরমপন্থীদলের প্রথম সম্মেলন হয় তখন তাতে সভাপতির অভিভাষণে আমি এরূপ এক প্রস্তাবের উল্লেখ করেছিলাম। শাসন সংস্কারের ইতিহাসে তা' ছিল এক চরম মুহূর্ত্ত। একদিকে লর্ড সিডেনহ্যাম ও ওরূপ অন্য ব্যক্তিরা ভারতের অগ্রগতির পরিপন্থী হয়ে উঠেছিলেনে। অন্যদিকে ভারতীয় উগ্রপন্থীগণ তাঁদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছিলেন। আমাদের নিজেদের দলে যাঁরা এই শাসনসংস্কার দেখে সন্তুষ্ট ছিলেন না তাঁরা আরও সংস্কারের জন্য দাবী তুলেছিলেন। সমস্ত আবহাওয়া অনৈক্য ও মতভেদে দূষিত হয়ে উঠল। আমাদের মনে হ'ল, শাসন সংস্কারের গ্রাহ্য বিষয়গুলির সমর্থনে ও আমাদের প্রয়োজন অনুসারে তাদের প্রসারের দাবীর উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী দল ইংলণ্ডে প্রেরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমাকেই এই দলের প্রধান নিযুক্ত করা হ'ল। এই প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্যে মিঃ শাস্ত্রী, মিঃ সামার্থ, মিঃ চিন্তামণি, মিঃ কামাথ, মিঃ পি. সি. রায়, মিঃ চেম্বারর্স, মিঃ রামচন্দ্র রাও, এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মিঃ কে, সি, রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণও ছিলেন। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু পরে গিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে সকলের আগে গিয়ে পৌঁছলেন মিঃ সামার্থ। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, চরমপন্থীগণও তাঁদের এক প্রতিনিধিমণ্ডলী সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। মিঃ প্যাটেল ছিলেন কংগ্রেস প্রতিনিধিমণ্ডলীর একজন

সদস্য। স্যার ভেলেনটাইন চিরোলের বিরুদ্ধে তাঁর এক মামলার ব্যাপারে মিঃ তিলক তখন ইংলণ্ডেই ছিলেন। তিনি যুক্ত কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তাঁর সাক্ষ্য গৃহীত হবার পূর্ব্বে মিঃ মণ্টেগুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং নূতন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শাসন সংস্কার সম্পর্কিত তাঁর চরমপন্থী মতগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে ততদিনে সংশোধিত হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন আগের শ্রমিক সরকারের সদস্য কর্ণেল ওয়েজউড সহ শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে আমাদের অনেক পরামর্শ সভা হয়েছিল। মিসেস বেশান্ত তাঁদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনিই সেসবের ব্যবস্থাদি করেছিলেন। শাসন সংস্কারগুলি "গ্রহণের অযোগ্য" অথবা "দেখবারও অযোগ্য"—এ সমস্ত মত তখন আর তাঁর ছিল না। তাঁর আর আমাদের মতের মধ্যে মোটামুটি একটা মিল ছিল এবং লণ্ডনে তিনি আমাদের শক্তির এক স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ালেন। লেডি লুটেনের বাসভবনে এক অপরাহ্ন-ভোজসভা হয়েছিল। তিনি, আমি ও অপর দু'এক ব্যক্তি ভারতীয় পরিস্থিতি নিয়ে সেখানে বক্তৃতা করলাম। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল বেশ মনোরম। শাসন সংস্কারের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি সেখানে প্রকাশ করা হয়েছিল। আমি সাক্ষ্য দিতে যাবার পূর্ব্বে লর্ড সাউথবারোর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমরা পরিস্থিতি ও শাসন সংস্কার সম্পর্কে ভবিষ্যতের আশার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলাম। এবং তা' আশাপ্রদ বলেই মনে হ'ল। আলোচনার সময় আমাদের সব চেয়ে যে বড় সাক্ষী তাদিগকে সকলের শেষে দেবার প্রস্তাব করলাম। লর্ড সাউথবারো তাঁদের প্রথমেই দিয়ে একটি অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করবার পক্ষে মত দিলেন। বোধহয় তার মতই ছিল সর্ব্বোত্তম এবং আমরা সে পথই অবলম্বন করেছিলাম। প্রথমে সরকারী সাক্ষীগণকে নেওয়া হয়েছিল। লর্ড মেসটন ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তখন তিনি সবে মাত্র ভারতের অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব মতই ব্যক্ত করলেন।

যুগ্ম-কমিটি যে ঘরে বসত তা' ছিল টেমস্ নদীর উপরে। নীচে দেখা যেত নদী বয়ে চলেছে। দিনের পর দিন বহু সংখ্যক ভারতীয় প্রত্যাশী উৎকণ্ঠিত হয়ে ঘরখানি পূর্ণ করে' রাখতেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মহিলার উপস্থিতিও দেখা যেত। এত বর্ণ, এত পোষাক, এত বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি একই ধারণা নিয়ে ও আশায় উদ্দীপিত হয়ে তৎপূর্ব্বে আর কোনদিন সে ঘরে বোধ হয় সমবেত হয়নি। সমগ্র ভারতটিই যেন ক্ষুদ্র আকারের সে ঘরের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিল। কোন দ্রষ্টব্য স্থান দর্শনের আনন্দ উপভোগের মনোভাব নিয়েই যে তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন তা' নয়। বিষয় বস্তুর প্রতি তাঁদের আকুল উৎসাহই তাঁদের সেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে চলছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা। তাঁরা মনে মনে জানতেন যে, সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে অনাড়ম্বর ও ব্যবসাসুলভ রীতিতে নানা ধারণার সমাবেশ ও ক্রমবিকাশ হ'তে হ'তে হয়ত এমন কোন এক নীতির উদ্ভব হবে, যা যুগের পর যুগ ভারতের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করবে। স্বায়ত্ত শাসনের জন্য ভারতের অযোগ্যতা সম্পর্কে লর্ড সিডেনহ্যাম যা' অভিরুচি বলতে পারেন। চরমপন্থীগণ শাসন সংস্কারকে নিতান্ত তুচ্ছ বলে নিন্দাও করতে পারেন। তবুও স্বায়ত্তশাসনের জন্য আমাদের লোকের মনে যে এক প্রবল একাগ্রতা ও শাসন সংস্কারের প্রতি তাদের যে অসীম উৎসাহ ছিল, যার প্রশংসা নীরব হয়েও মুখর হয়েছিল, তার মধ্যে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য শিক্ষনীয় বিষয়ও এখানে ছিল। এ সমস্ত লোকের মধ্যে ছিলেন বহু আইনজীবী যাঁরা তাঁদের রাজোপম অর্থোপার্জ্জনকে অন্তত সাময়িক ভাবে হলেও স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেছিলেন এবং বহু গোঁড়া হিন্দু যাঁরা যদিও ধর্ম্ম ও সমাজের নামে সমুদ্রযাত্রা থেকে সর্ব্বদাই বিরত থাকতেন, তথাপি তাঁরা পর্য্যন্ত কমিটির মতিগতি লক্ষ্য করবার জন্য ও সাক্ষীগণ কি বলেন শুনবার জন্য দিনের পর দিন দলে দলে সেই কমিটি রুমে গিয়ে উপস্থিত

হতেন। সারা ভারত সেখানে উপস্থিত ছিল এবং বহু দূরে বসেও অনেক আশ্বাস নিয়ে কোটি কোটি লোক নিশ্বাসরুদ্ধ ভাবে অধীর আগ্রহে সেখানকার কার্য্যাবলী লক্ষ্য করে যাচ্ছিল।

চেয়ারম্যান লর্ড সেলবোরণ ছিলেন সমস্ত কিছুর কেন্দ্রবিন্দু এবং সম্মানের আসনটিতে তিনিই ছিলেন অধিষ্ঠিত। শান্ত, মর্য্যাদাপূর্ণ, সকল স্বার্থ ও সাক্ষীদের প্রতি সমভাবে ন্যায়পরায়ণ হয়ে বিচারকার্য্য-সুলভ নিরপেক্ষতার সঙ্গেই তিনি কার্য্য পরিচালনা করে' যাচ্ছিলেন। সত্যি বলতে কি, প্রথমে তাঁকে যখন দেখি তখন তাঁর বিরুদ্ধে আমার মনে এক অমূলক ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণর। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত বিরোধী নীতির জন্য তাঁর নাম শুনলেই যে কোন দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের মনে এক ঘৃণার উদ্রেক হয়। হতে পারে যে, এক স্বায়ত্ত শাসিত সমাজের প্রধান হিসাবে তার নীতি নির্দ্ধারণ বিষয়ে গভর্ণরের বিশেষ করণীয় কিছুই ছিল না। তা' হলেও কোন রাজ্যের নীতি থেকে তার প্রধানকে পৃথক করে' দেখা সহজ নয়। তবে জনমত যুক্তি দিয়ে সব সময় সব কিছু বিচার বিবেচনাও করে না। কেবল তার বিরাট গুরুত্ব দিয়ে সম্মুখে যা' পায় তা ঠেলে নিয়ে যায়। আমার আরও মনে পড়ল যে, যুগ্ম-পার্ল্যামেন্টারী কমিটির প্রস্তাবটি প্রথমে তাঁর নিকট থেকেই পাওয়া গিয়েছিল। তখন আমরা সকলে তার নিন্দা করেছিলাম। বোধ হয় সময় না হতেই আমরা এক বিরুদ্ধমত গ্রহণ করে বসেছিলাম। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু এই যুগ্ম-কমিটি ভারতের স্বার্থ ও শাসন সংস্কারের অনুকূলই হয়েছিল।

চেয়ারম্যানের পরে এ কমিটির মধ্যে বিশেষ আকর্ষনীয় ব্যক্তি ছিলেন মিঃ মন্টেগু। কমিটিটি ছিল তাঁর নিজের। এবং তার প্রকাণ্ড মিটিংগুলিতে কার্য্যধারা নির্দ্ধারণ বিষয়ে তাঁর বিশেষ হাত ছিল। তাঁর জেরার পদ্ধতি ছিল অনুসন্ধান মূলক ও ফলপ্রসূ। তাঁর জেরার চাপে

প্রতিকূল সাক্ষীরা কাতরাতে থাকত। ভারতের জনৈক অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি ও আইনজ্ঞ-সাক্ষী জেরার চাপে একেবারে তুলোধুনো হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, দূরে গ্রামাঞ্চলে থাকার দরুণ তিনি সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রাদি পড়তে পারেন নি। লর্ড সিংহ সকলের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর বাচনভঙ্গি ও ধরণধারণে সুন্দর এক শান্ত ও মর্য্যাদাপূর্ণ ভাব ছিল। তিনি যখন সাক্ষীর জবানবন্দী নিতেন বা তাকে জেরা করতেন, অত্যন্ত বিচক্ষণ আইনজ্ঞের গুণ তার মধ্যে প্রকাশ পেত। সাক্ষীকে তিনি অসন্তুষ্ট করতেন না। তবে অনেক সময় তার ভেতরে যা' কিছু রয়েছে তা' সব বাইরে টেনে এনে ছাড়তেন। লর্ড সিডেনহ্যাম ব্যতীত কমিটির অন্য প্রায় সকলের সাধারণ আচরণই ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। লর্ড মিড্‌লটন দূর থেকে সিডেনহ্যামকেই অনুসরণ করতেন। একবার লর্ড মিডল্‌টনের সঙ্গে আমার দেখা করবার ইচ্ছা হয়েছিল। পরে যখন মনে হ'ল যে, এক হিসাবে কমিটির সদস্যেরা ছিলেন বিচারকেরই অনুরূপ, তাঁদের সম্মুখে যা' সাক্ষী প্রমাণ এসেছে তার উপর নির্ভর করেই তাঁদের মতামত প্রকাশ করতে হবে, তখন আমি আমার সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করলাম।

যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী নেওয়া হয়েছিল তাদের সংখ্যা বেশ বড়ই হয়েছিল। কিছুকাল পরে এক এক দলে একসঙ্গে তিন চার জন করে নিয়ে, তাদের জবানবন্দী নেওয়া হ'ত। সাধারণত সাক্ষী মৌখিক ভাবে তার বিবৃতি দিয়ে যেত, তারপর কমিটির সদস্যগণ সাক্ষীকে তার উপর প্রশ্ন করেকরে পরপর জবানবন্দী নিতেন। আমার বিবৃতির উপর মিঃ মণ্টেগু বা লর্ড সিংহ কোন প্রশ্ন করলেন না। মিঃ স্পুর নামক একজন শ্রমিক সদস্যই কেবল এক নাতিদীর্ঘ জেরা করলেন। পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিল যে, কংগ্রেস প্রতিনিধিমণ্ডলীর কোন ব্যক্তি তাঁকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করে দিয়েছিলেন। দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য এক নির্দিষ্ট সময়

নির্দ্ধারণ করতে হবে বলে কংগ্রেসে আমি কখনো কোন প্রস্তাব এনেছিলাম কি না, সে বিষয়ে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কমিটির সম্মুখে এরূপ কোন সময় নির্দ্ধারণের বিষয়কে আমি যে সমর্থন করি নি এবং তার ফলে আমার আগের মত ও বর্ত্তমান মতের মধ্যে যে সামঞ্জস্যের অভাব আছে এইটা দেখিয়ে আমাকে দায়ী করাই ছিল সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য। উত্তরে আমি বলেছিলাম, "এনেও যদি থাকি, তা' বলে নূতন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার সে মত পরিবর্ত্তনে বাধা কোথায়"? বিষয়টি সেখানেই থেমে গেল। আমার যেদিন জবানবন্দী নেওয়া হয়েছিল লর্ড সিডেনহ্যাম সে দিন উপস্থিত ছিলেন না। কাজেই তাঁর জেরার সুযোগ আমাকে হারাতে হয়েছিল। মিঃ তিলকের জবানবন্দীও হয়েছিল খুব অল্পক্ষণের জন্য। তিনি তাঁর বক্তব্য বললেন। তবে তাঁকে একেবারেই জেরা করা হ'ল না। এটি ছিল খুবই অস্বাভাবিক। বোধ হয় তাতে মিঃ তিলক বেশ নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। কারণ আমাদের মধ্যে মতভেদ যতই থাকুক, আমরা সকলেই ধরে নিয়েছিলাম যে, স্বীয় মতকে বিচারবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সাহায্যে সমর্থন করবার মত ক্ষমতা মিঃ তিলকের যথেষ্ট ছিল। আমার মনে হয় বৃটিশ জনসাধারণ মিঃ তিলককে কোন স্বীকৃতিই দেন নি এবং তিনি মামলাতে পরাজিত হবার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে যে সব ভ্রান্ত ধারণা পূর্ব্বে ছিল তাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু এসেছিলেন অনেক দেরীতে। ফলে তাঁর জবানবন্দী স্বাভাবিক ভাবেই ছোট হয়েছিল। হস্তান্তরিত বিষয়গুলির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য স্বীকৃতি লাভে তাঁর শ্রম ছিল অসামান্য। আমার ধারণা, মোটামুটি হিসাবে বিচার করলে আমাদের প্রতিনিধিমণ্ডলী চমৎকার ভাবেই তাঁদের জবানবন্দী দিয়েছিলেন। আমাদের জবানবন্দী দেওয়া শেষ হয়ে যাবার কয়েকদিন পরে যুগ্ম-কমিটির একজন সদস্য আমাকে বললেন, "আপনারা চমৎকার এক প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু পরে অবস্থার

অবনতি হ'ল"। কার কার সাক্ষ্যের ফলে যে সে প্রভাব নষ্ট হয়েছিল, তাঁদের নামও তিনি বলেছিলেন। তবে তার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দায়িত্বশীলতা প্রবর্ত্তন করার জন্য সকল মতের ভারতীয় সাক্ষীগণ বারংবার যেরূপ জোর দিয়েছিলেন, অপর কোন বিষয়ে তাঁরা সেরূপ দেন নি। কতক পরিমাণ দায়িত্বশীলতাসহ প্রাদেশিক আইনসভা সমূহের কার্য্য পরিচালনা করার ও দায়িত্বশীলতাবিহীন কেন্দ্রীয় আইন সভার কার্য্য পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা এখন আমাদের হয়েছে। এবং তাতে এই মতের যৌক্তিকতার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। দায়িত্ব অর্পিত হ'লে আইনপ্রণয়ন সংস্থাগুলির মধ্যে সর্ব্বদাই এক সংযত ভাবের সঞ্চার হয়। এক সাধারণ সংযত আবহাওয়া সৃষ্টির ফলে, এমন কি, যে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের অধীনে নয় সে সব বিষয়ের উপরেও তার প্রভাব পড়ে। প্রত্যেক আইনসভার মধ্যেই কিছু কিছু অতিরিক্ত গোঁড়া প্রকৃতির লোক থাকতে বাধ্য। এমন কি, তারাও তাদের সহকর্ম্মীদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে কেবল বাধা সৃষ্টি করার ও বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে নিয়মিতরূপে যখন সঙ্ঘবদ্ধ অভিযান চলতে থাকে, তখনই তা' সম্ভব হয়। দুর্ভাগ্যবশত সাম্প্রতিক কালে বঙ্গদেশে ও মধ্যপ্রদেশে এরূপ অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে।

আমার নিজের ধারণা হয়েছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভার বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আজকাল যে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করছে, ভারতীয় সাক্ষীগণের অভিমত যদি গ্রহণ করা হ'ত, তা' হ'লে এ সমস্ত অসুবিধার উৎপত্তিই হ'ত না। আর হলেও তা' অনেক পরিমাণে হ্রাস পেত। এ সুবিধা আজ নয় কাল দিতেই হবে। কথায় বলে, 'তৎপরতার সঙ্গে যে দেয়, তার দেওয়া হয় দ্বিগুণ দেওয়ার সমান'। প্রথম থেকে যদি এ নীতি অনুসরণ করা হ'ত, তবেই সুবিবেচকের কাজ হ'ত। প্রাচীন গ্রীক দেশে সিবাইলের

রূপকথাগুলির মধ্যে যে সত্য নিহিত রয়েছে, সরকারের অগ্রগতির ইচ্ছা সত্ত্বেও তার পদক্ষেপে অতিরিক্ত সতর্কতা ও ভীতির মধ্যে প্রত্যহ তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সাহসকে যদি ব্যক্তির পক্ষে সুগুণ বলে' অভিহিত করা যায়, তবে তার মধ্যে পরিমিত ভাবে সুবুদ্ধি মিশ্রিত হ'লে সরকারের পক্ষে তা' হয় সার্ব্বভৌম আচরণ। ক্যানাডা-সরকারের পুনর্গঠনের জন্য লর্ড ডারহ্যামের প্রস্তাবের মধ্যে বৃটিশ রাষ্ট্রশাসননীতির যে দৃষ্টান্ত রয়েছে, তার সমগ্র ইতিহাসে এরূপ আর ক্বচিত দেখা যায়। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড পরিকল্পনাও, সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে, সে পথেই এক সাহসিকতাপূর্ণ অগ্রগতি।

সাক্ষীগণের জবানবন্দী নেবার সময় একটি বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। ভারত সরকার যে জরুরী বার্ত্তা পাঠিয়েছিল, তার মধ্যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে, হস্তান্তরিত বিভাগগুলির জন্য একটি স্বতন্ত্র অর্থভাণ্ডার থাকা উচিত। লর্ড মেসটন যখন সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তিনিও এ বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। ভারতীয় সাক্ষীগণ সকলেই তাতে আপত্তি করেছিলেন। আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে, যে-বৈষম্য কেবল এক অন্তর্বর্ত্তীকালীন ব্যবস্থা, অর্থভাণ্ডার পৃথক করা হ'লে, তা' এক বাঁধা-ধরা বৈষম্যের সৃষ্টি করবে। আর তার ফলে সমস্ত সংরক্ষিত বিভাগকে হস্তান্তরিত করবার আমাদের যে অভিপ্রায় রয়েছে এবং যা' শাসন সংস্কারেরও মূল উদ্দেশ্য, তা' বিলম্বিত হ'বে। উক্ত বিষয়টি যুগ্ম-কমিটি অগ্রাহ্য করল এবং তা' সংস্কার পরিকল্পনার মধ্যে স্থান পেল না। আমি এ কথা না বলে পারি না যে, এখন তার সমর্থনেই একটি মত সৃষ্টি হচ্ছে। তার কারণ এই যে, পুনর্গঠিত সরকারের এখন অর্থাভাব দেখা দিয়েছে। এবং অনেকের বিশ্বাস, হস্তান্তরিত বিষয়গুলির জন্য পৃথক অর্থভাণ্ডারের ব্যবস্থা থাকলে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যেরূপ রক্ষিত হয়, তদপেক্ষা অধিক সুরক্ষিত হ'তে পারত।

বঙ্গদেশে তার রাজস্বের একটি বিরাট অংশ তার সংরক্ষিত বিভাগ-গুলির জন্য ব্যয় হয়। আর যাকে বলা হয় জাতিগঠন বিভাগ তার ব্যয়ের জন্য অবশিষ্ট থাকে মাত্র চৌত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ শতাংশ। এ রীতি যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সে কথা সত্য। তবে এ প্রদেশের বিভিন্ন দিকে প্রয়োজনীয় বিষয়ের অগ্রগতির পথে তা' গুরুতররূপে হস্তক্ষেপ করেছে। যে সমস্ত বিভাগ প্রয়োজনীয় হলেও জাতীয় উন্নয়নে কেবলমাত্র পরোক্ষ ভাবেই সহায়ক, তাদের জন্য স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, কৃষি, শিল্পোত্যোগ সমস্ত কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থায়ী উন্নতির পক্ষে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা প্রকৃতপক্ষে প্রথমেই দরকার। কিন্তু সঙ্গত কারণেই ভারতীয় দেশপ্রেমিকেরা অভিযোগ করতে পারেন যে, সমস্ত সৌধনির্মাণের উপযুক্ত জাতীয় সম্পদকে কেবল ভিত্তি স্থাপনেই নিঃশেষিত করা হয়ে থাকে। এ বিষয় নিয়ে এতই ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে যে, একবার বঙ্গীয় আইন সভা পুলিশের জন্য বরাদ্দ প্রায় সমস্ত অনুদানই অগ্রাহ্য করে দিয়েছিল। অবশেষে আরও বিবেচনা ও গভর্ণরের সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর তা' প্রত্যর্পণ করা হয়।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচ বছর কাজ চালাবার পর ভারতে একটি পার্ল্যামেণ্টারী কমিশন প্রেরণ করা হবে। সমস্ত বিষয় তাঁদের পর্য্যবেক্ষণের পর পরিকল্পনার আরও সম্প্রসারণ প্রয়োজন কি না, সে বিষয়ে তাঁরা রিপোর্ট দেবেন। পার্ল্যামেন্ট একটি আইনের বলে সেই পাঁচ বছর সময়কে দশবছরে প্রসারিত করাতে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই দশবছর সময়কে এক দীর্ঘকাল ব'লে মনে হ'ল এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময় প্রত্যর্পণ করবার জন্য ভারতীয় পক্ষ থেকে অনুরোধ জানান হ'ল। যুগ্ম কমিটি সে অনুরোধ রক্ষা করলেন না। আমার মনে হয়, সরকারী দৃষ্টি-কোণ থেকেও যদি বিচার করা যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী নির্দ্ধারিত সময়ে স্থির

থাকলেই সেটা সুবুদ্ধির কাজ হ'ত। কারণ, সে ক্ষেত্রে এখন যে অবিলম্বে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দাবী ক'রে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে তা' প্রতিহত করা সহজ হ'ত। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আজ ভারতীয়দের অধিকাংশই এই আন্দোলনের সমর্থক হয়ে উঠেছে। যে মন্থর গতিতে ভারতে সব কিছু অগ্রসর হয় সে তুলনায় পাঁচ বছর সময় খুব অল্প নয়। এবং সে অবস্থায় ভারতের জনমত নাতিদীর্ঘ কালের মধ্যে এক পরিবর্ত্তন হ'বে আশায় বিনা আপত্তিতেই তুষ্ট থাকত। যে-সুপারিশের মধ্যে সত্বর অগ্রগতির আশা দেওয়া হয়েছিল, তা' থেকে বিচ্যুত হওয়া ভুলই হয়েছিল। দ্বৈত শাসন ছিল এক অভিনব প্রচেষ্টা। অনেকের নিকট তা' বিপজ্জনক বলেও মনে হয়েছিল। অল্পকালের মধ্যেই অদূর ভবিষ্যতে যে তা' লোপ পাবে তা' জানতে পারলে জনমত শান্ত হ'ত। কিন্তু তা' হ'ল না। ভারতীয় সাক্ষীগণের আপত্তি সত্ত্বেও পূর্ব্বপ্রস্তাবে নির্দ্ধারিত সময়সূচীকে সংশোধন করা হ'ল।

এটি পরিষ্কার বুঝা গিয়েছিল যে, যুগ্ম কমিটির প্রত্যেক সদস্যের নিকট দ্বৈতশাসনের প্রস্তাবটি গ্রহণ যোগ্য বলে' বোধ হয় নি। এবং বৃটিশ জনমতও তাকে গ্রহণের উপযুক্ত বলে মনে করতে পারছিল না। এক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র প্রতিনিধির সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে কথাবার্ত্তা বলার আমার সুযোগ হয়েছিল। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর কিছুমাত্র বিরূপ মনোভাব ছিল না। অবশ্য সরকারকে বিপদগ্রস্ত করবার ইচ্ছাও তাঁর মোটেই ছিল না। আমি বোধহয় তাঁর মনে এ বিশ্বাস জন্মাতে সমর্থ হয়েছিলাম যে, বিশদভাবে বিবেচনা করে' দেখলে দ্বৈতশাসনের নিয়মটির মধ্যে যে দোষই থাকুক না কেন, ১৯১৭ সালের ২০ আগষ্ট তারিখের ঘোষণার পর তা' থেকে আর পালাবার পথ ছিল না। ভারতে বৃটিশ শাসনের উদ্দেশ্য এবং পরিণতি সম্পর্কে স্থির হয়েছিল যে, তা' হ'বে দায়িত্বশীল, সরকার প্রতিষ্ঠা। এবং এ ঘোষণার

শর্ত্ত অনুসারে বলা হয়েছিল যে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েই তা' লাভ করতে হ'বে। তার সব টুকুই যে এখনই এক সঙ্গে দিতে হ'বে তেমন কোন কথা তাতে ছিল না। লক্ষ্য স্থলে পৌঁছান অবধি এক পা' এক পা' করে ক্রমবিকাশ চলতে থাকবে। কি ভাবে অগ্রসর হওয়া যায় তা' লক্ষ্য করবার জন্য একটা সময়ও নির্দ্দিষ্ট রাখতে হ'বে। আর এই সময়ের মধ্যে নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আইন সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীদের হাতে কোন কোন সরকারীবিভাগ পরিচালনার কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হ'বে। সরকারের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য এরূপেই প্রস্তুত হ'তে হ'বে। হয় এই আংশিক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে, নতুবা দায়িত্বশীল সরকার একেবারেই হবে না। মিঃ মণ্টেগু বৃটিশ সরকারের নামে প্রারম্ভিক হিসাবে প্রথমটির জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কোনরূপ চেষ্টাই না করে, তা' কার্য্যকর করা সম্ভব নয় বলে তা' থেকে বিচ্যুত হওয়া, লর্ড রোণাল্ডসে ও তাঁর সরকারের ভাষায় হবে বিশ্বাসভঙ্গেরই নামান্তর।

বৃটিশ জনগণের মধ্যে যাঁরা মন স্থির করতে অক্ষম ছিলেন তাঁরা এবং কমিটি উভয়ে বোধ হয় এ যুক্তির উপর নির্ভর করেই তাঁদের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। বৃটিশ গণতন্ত্রের নামে কথা দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। এবং তা' থেকে ফিরবার আর পথ ছিল না। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে ওখানে যে দু'একজন ব্যতিক্রম ছিলেন, তাঁদের কথা ছেড়ে দিলে ভারতীয় আমলাতন্ত্র ছিল দ্বৈত শাসনের বিরোধী। পাঁচটি স্থানীয় সরকার তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ ক'রে বার্ত্তা পাঠিয়েছিল। তারা বলেছিল যে, ঐ নীতি অনভিপ্রেত ও উহা কার্য্যকরী করা অসম্ভব। কেবল বঙ্গদেশের ও বিহারের সরকার দুটি এ নীতির সমর্থন করেছিল। এবং যুগ্ম কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় নরমপন্থীদলও তার সমর্থন করেছিল। এটি পেয়ে তাঁরা যে খুব মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বা

সরকারকে আরও উদার করবার চেষ্টা তাঁরা করবেন না তা' নয়; তবে তাঁরা বুঝেছিলেন যে, যতটুকু পাবার প্রতিশ্রুতি তাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের সমর্থন না থাকলে তাও হারাতে হবে। এবং সে ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য চাপা পড়ে যেত।

কিন্তু শান্ত নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে বসে টেমস নদীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যুগ্ম-কমিটি যখন ধীরে সুস্থে আপন কাজ করে চলেছিল, তখন কুশাসন জনিত এক উত্তেজনার ফলে ভারতের শিক্ষিত সমাজ ভীষণ ভাবে আলোড়িত হয়ে উঠছিল। স্যার মাইকেল ও-ডায়ার পাঞ্জাবে যে এক সর্ব্বনাশা নীতি অবলম্বন করেছিলেন এ ছিল তারই ফল। ডক্টর কিচলু ও সত্যপালকে নির্ব্বাসিত করা হলে অমৃতসরে এক গণঅভ্যুত্থান দেখা দেয়। তারপর একে একে আসে শান্তিভঙ্গ, সামরিক আইনগত কার্য্যাবলী এবং জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃসংসতা। এসবের ফলে সমগ্র ভারতে যে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল তা' নির্ব্বাপিত করতে বহু বৎসরের প্রয়োজন হবে। সে আগুন উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে কিছুকালের জন্য মানুষের প্রাণ আকুল করে' তুলল। এবং শাসন সংস্কারকে কু-অভিসন্ধি মূলক বলে চিহ্নিত করতে লাগল। এ সবের আলোচনার জন্য লর্ড চেমসফোর্ড চেয়েছিলেন এক শান্ত পরিবেশ। কিন্তু পাঞ্জাব সরকারের কার্য্যাবলী কেবল পাঞ্জাবেই নয় সমগ্র ভারতে এক দারুণ উত্তেজনা, তিক্ততা ও ক্ষোভপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করল। সে সময় যে সকল প্রতিনিধিমণ্ডলী বিলাতে অবস্থান করছিলেন তাঁদের মধ্যেও এই মনোভাব কমবেশী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। সেখানে এক জনসভার আয়োজন হ'ল। শ্রমিকদলের সদস্যগণও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। মিঃ মণ্টেগুকে গিয়ে ধরা হ'ল। নরমপন্থীদল একাধিকবার তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন। আমরাই বললাম এ বিষয় সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে একটি অনুসন্ধানের

ব্যবস্থা করতে। এবং সেই কমিশনের জন্য ভারতীয় সদস্যদের নামও প্রস্তাব করলাম। ভারতে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে' আমরা আমাদের সাধ্যমত সুপরামর্শ দিয়েছিলাম।

এক্ষেত্রে একমাত্র ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বিষয়ে ছাড়া নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে কোন মতভেদ ছিল না। পাঞ্জাব সরকারের কাজে সারা ভারতে এক তীব্র ঘৃণা দেখা দিয়েছিল। এবং আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে যাঁরা বিলাতে বসবাস করছিলেন তাঁরাও তার অংশীদার হলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতসচিব এ সম্পর্কে যে জরুরীবার্ত্তা পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে তিনি যে পাঞ্জাব সরকারের কার্য্যের সমর্থন করেন নি, সে বিষয়ে পরিষ্কার রূপে কিছু বললেন না, আর তেমন জোর দিয়ে সে কাজের নিন্দাও করলেন না। এ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটল যখন হাউস-অব-লর্ডস'এ এ নিয়ে এক বিতর্ক হয়ে গেল। সময়ে সব কিছুই প্রশমিত হয়। কিন্তু যা' এখনো শুকায় নি এবং পাঞ্জাবের জনমানসের অভ্যন্তরে যে বিষের সঞ্চার হয়েছিল তা' এখনো ওঁত পেতে রয়েছে। আর তার প্রতি সহানুভূতিশীল প্রতিক্রিয়া ভারতের অপরাপর প্রদেশেও বর্ত্তমান। যখনই কোন কারণে পুরাতন স্মৃতি জেগে উঠে তখনই তা' প্রকাশ হয়ে পড়ে। রাজ্যের প্রধান প্রধান বিষয়ে অন্যায় কাজ করলে তাতে যে কি অপরিসীম ক্ষতি হ'তে পারে, সে সম্পর্কে এটি মানব-শাসকদের প্রতি এক গুরুতর সতর্ক বাণী। চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ আদায়ের মত অন্যায় পরিবর্দ্ধিত আকারে ও নিশ্চিতরূপে তার প্রতিশোধ নেয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রনীতিবিদের কর্ত্তব্য এই দেওয়াল-লিখন পাঠ করা এবং তা' থেকে লাভবান হওয়া।

প্রতিনিধিমণ্ডলীর কর্ম্মের নিকটতম গণ্ডির বাইরেও কিছু কাজ ছিল, এবং তাতে আমাকে অংশ গ্রহণ করতে হ'ত। ইংলণ্ডের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করে' তার কি পরিমাণ অংশ ভারতে প্রযুক্ত হ'তে পারে তা'

অনুসন্ধান করবার জন্য ভারতসচিব এক কমিটি গঠন করে' আমাকে তার একজন সদস্য নিযুক্ত করেছিলেন। আমার সহকর্ম্মিগণ সকলেই ছিলেন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোক এবং সে সময়ে তাঁরা ইংলণ্ডে অবসর যাপন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমার ভালই চলতে লাগল। কমিটিতে আমিই ছিলাম একমাত্র বেসরকারী সদস্য। তাঁরা প্রত্যেকেই আমার প্রতি সদয়, ভদ্রভাবাপন্ন ও সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং আমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ২৪-পরগণা জিলার ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লিনড্‌সে, মধ্যপ্রদেশের কমিশনার মিঃ ক্লার্ক এবং আসাম কমিশনের মিঃ য়্যালেন। কমিটির কাজে আমি যে পরিমাণ সময় দিতে ইচ্ছুক ছিলাম প্রতিনিধিমণ্ডলীর কাজের দরুণ তাতে বাধা পড়ছিল। তবে আমি তাঁদের কাজকর্ম্ম সংক্রান্ত অনেকগুলি মিটিং ও আলোচনা সভাতে উপস্থিত ছিলাম। আমি বারমিংহ্যামে গিয়ে সেখানে বিশলক্ষ ষ্টার্লিং ব্যয়ে যে বাড়ী ও রাস্তার ময়লা নিষ্কাশনের এক আশ্চর্য্যজনক পয়ঃপ্রণালীর মুখ নির্ম্মিত হয়েছিল তা' দেখতে গিয়েছিলাম। কলকারখানা দেখতে দেখতে আমরা সমস্ত স্থানটিতে ঘুরে বেড়ালাম কিন্তু কোথাও দুর্গন্ধের কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। মিল অঞ্চলের সেপ্‌টিক ট্যাংকসমূহ থেকে হুগলী নদীতে যে ময়লা নিষ্কাশিত হয় সে সম্পর্কে আমি ভার প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন যে দুষিত পদার্থগুলিকে নির্বিজ করে নেবার যতই চেষ্টা হোক না কেন, তাঁর মতে, তার মধ্যে দূষিত পদার্থ তবুও থেকে যায় এবং তাতে নদীজল দূষিত হতে বাধা। তিনি এ পদ্ধতিটির তীব্র নিন্দা করেছিলেন।

কমিটি যথা সময়ে তার রিপোর্ট দিল। আমার আনুষঙ্গিক মন্তব্য সাপেক্ষে আমি তার মধ্যে স্বাক্ষর দিয়েছিলাম। আমার সেই পরিপূরক মন্তব্যের মধ্যে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে একটি স্থানীয় সরকারী বোর্ড গঠন করবার জন্য আমি বিশেষ জোর দিয়েছিলাম। এই মন্তব্যটি বিভিন্ন

সরকার সমূহের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল, একমাত্র আসাম ও মধ্যপ্রদেশের সরকার ভিন্ন অন্য সকলেই তার বিরোধিতা করেছিল।

লণ্ডনে আমাদের প্রতিনিধিমণ্ডলী যে বিভিন্ন প্রকারের কাজকর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন তা' দেখাবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে আমি আর একটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করব। উপনিবেশসমূহে ভারতীয়দের পদমর্য্যাদা, তাদের প্রতি আচরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা মিঃ মণ্টেগুর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হলাম। ডোমিনিয়নগুলিতে বসবাসকারী ভারতীয়দের অক্লান্ত বন্ধু মিঃ পোলক এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। নামে আমি প্রতিনিধিবর্গের মুখ্য হলেও তিনিই বিবৃতিটি পাঠ করলেন। সেটি রচিতও ছিল তাঁরই। আমাদের ইউরোপীয় বন্ধুদিগের মধ্যে সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত ছিলেন স্যার জন রীস এবং স্যার উইলিয়ম মায়ার। মিঃ মণ্টেগু যে একটি সহানুভূতিসূচক উত্তর দিয়েছিলেন তা' বলাই নিষ্প্রয়োজন।

আমি বিলাতে থাকা কালে সেখানে বসবাসকারী মুসলমানদের খিলাফৎ সম্পর্কিত এক সভায় সভাপতি হবার জন্য আমার নিকট এক অনুরোধ আসে। তার কারণ প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জের ঘোষণা অনুসারে এ বিষয়ে একটি মিটমাট করবার জন্য ভারতীয় মুসলমানেরা যে দাবী তুলেছিলেন, আমি তার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল ছিলাম। আমার এ অভিপ্রায় এখন বেশীর ভাগই পূর্ণ হয়েছে। ভারতের জনমতের সাহায্যে ভারত সরকারের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ও কামাল পাশার সামরিক সাফল্য লাভের ফলেই তা' সম্ভব হয়েছে।

১৯১৯ সালে আমার নিজের কাজ নিয়ে আমাকে প্রায়ই ইণ্ডিয়া অফিসে যেতে হ'ত। আমি দেখলাম আমার তরুণ বয়সে, ১৮৭৪ বা ১৮৯৭ সালে আমি সেখানে যে আবহাওয়া দেখেছিলাম তা' থেকে এখন অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। সেই আমলাতন্ত্রী মন্দিরের বেষ্টনীর মধ্যে গণতন্ত্রের সৌরভে উচ্ছ্বসিত এক সম্পূর্ণ নূতন প্রেরণা যেন আনাগোনা

করছে। রাইটার্স বিল্ডিং-এ আমি যখন মন্ত্রী তার তুলনায় কম হলেও, আমার মনে হ'তে লাগল, যে ভাবেই হোক, এ স্থানটি যেন আমাদেরই নিজস্ব। কর্ম্মচারিগণ ভারতীয় না হলেও ভাবধারায় তা' ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকেই যেন সেবা করবার জন্য ও বাধিত হবার জন্য সেখানে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। গায়ের ময়লা চামড়া তখন আর অযোগ্যতা নয়, বরং ছাড়পত্র হয়ে পড়েছে। আমলাতন্ত্রী চেহারার কঠোরতা লোপ পেয়েছে। এই পরিবর্ত্তন সাধনের কেন্দ্রীভূত এক শক্তি ছিলেন সম্ভবত মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং তাঁহাকে সাহায্য দিয়েছিল মিঃ মণ্টেগুর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর শাসন সংস্কার থেকে উদ্ভুত এক নূতন উৎসাহ। মিঃ বসুর কক্ষখানি ছিল ভারতীয়দের মিলনক্ষেত্র—তাঁদের বৈঠকখানা। যে কোন ভারতীয় কোন প্রয়োজনে হোয়াইটহল অথবা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে গেলেই একবার তাঁর ঘরে গিয়ে পড়তেন। সেখানে মিনিট কয়েক বসে, ঘরে যিনি রয়েছেন তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে লণ্ডন জীবনের ক্লান্তি দূর করতেন। আর সে ব্যক্তিটি ছিলেন পরামর্শ দেওয়া থেকে সাহায্য করা পর্য্যন্ত সকলের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি ছিল অন্যদের তুলনায় অধিক ঘনিষ্ঠ। কিন্তু সাধারণ ভাবে তিনি ছিলেন সমস্ত ভারতীয় সম্প্রদায়ের এবং বিশেষভাবে বাঙ্গালীদের রক্ষক। প্রত্যেকেই সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে যেতেন এবং তিনিও তা' দিতে কখনো কুণ্ঠিত হতেন না।

এভাবে প্রায়ই যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মিঃ কেদারনাথ দাশগুপ্ত। ইনি ছিলেন বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম জিলার অধিবাসী, কিন্তু এখন লণ্ডনেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ইনি নাটক ও আমোদপ্রমোদ ইত্যাদি বিষয়ের ব্যবস্থা করে' প্রাচীন ভারতের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর সঙ্গে বৃটিশ জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দিয়ে থাকেন। লণ্ডন মহানগরীর বিরাট জনজীবনে, তাঁর বৈশিষ্ট্য ও সংগঠন ক্ষমতা হারিয়ে যায়। ভদ্রলোককে লণ্ডন সহরের একটি ভ্রাম্যমান

তথ্যতালিকা বললেও কিছু অত্যুক্তি হয় না। তাঁকে আপনি পথের নাম আর যে বাড়ীতে যেতে ইচ্ছা করেন তার নম্বর বলুন, দেখবেন তিনি আপনাকে সেখানে নিয়ে ঠিক উপস্থিত করেছেন। এবং সম্ভবত তা' এত দ্রুত এবং এত অল্প ব্যয়ে যে, এমন কি, লণ্ডনের সর্ব্বদর্শী যে ট্যাক্সী চালক, তার পক্ষেও তা' সম্ভব নয়। নিজ কাজকর্ম্মে ও অন্যদের সেবায় তিনি সর্ব্বদা তন্ময়। লণ্ডনের বাঙ্গালীদের মধ্যে কেদারনাথ দাশগুপ্ত অত্যন্ত সুপরিচিত। তাঁকে যাঁরা জানেন তাঁদের প্রত্যেকেই তাঁকে ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। যে-কোন নূতন লোক লণ্ডনে এলে তার যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা দেখে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। আর এ পরিস্থিতিতে কেদারনাথ দাশগুপ্ত ছিলেন আমার বন্ধু, পরামর্শদাতা ও পথপ্রদর্শক। হতে পারে আপনি পূর্ব্বে আরও ছয় সাত বার লণ্ডনে ঘুরে গেছেন, তবুও স্থানীয় সরকারের নিরলস কার্য্যপদ্ধতির যন্ত্র গুণে সহরের চেহারার এত দ্রুত পরিবর্ত্তন হয় যে, তার ফলে আপনি সর্ব্বদাই হয়ে পড়েন সহরে একজন নবাগত।

আমি একথাগুলি যখন লিপিবদ্ধ করছিলাম মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু তখন আমাদের মধ্যে ছিলেন। ১৯২৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে সকলেই গভীর শোকাভিভূত হন। আমাদের জনজীবনে যে-স্থান শূন্য হয়ে গেল সে স্থান সহজে পূর্ণ হবার নয়। বিশ্বাসের দৃঢ়তায়, দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতায়, কাজকর্ম্ম পরিচালনার কুশলতায় ও বিচার বুদ্ধিতে তাঁর যুগের জনসেবীদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। নিতান্ত তরুণ বয়সেই তিনি রাজনৈতিক কর্ম্মে যোগ দিয়েছিলেন।

১৮৮৬ সালে যখন কোলকাতায় প্রথম কংগ্রেস অধিবেশন হয়, তখন তিনি কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক দলে ভর্ত্তি হন। যদিও আজকাল স্বরাজ্যদলের কৌশল অনুসারে একজন স্বেচ্ছাসেবককেও প্রতিনিধির স্তরে উন্নীত করে সেরূপ মর্য্যাদা দেওয়া হয়, বাস্তবিক পক্ষে

স্বেচ্ছাসেবকেরা কিন্তু প্রতিনিধি নয়। সিরাজগঞ্জের অধিবেশনেও স্বরাজ্য দলের ভোট বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক স্বেচ্ছাসেবককে প্রতিনিধির পদে উন্নীত করা হয়েছিল। তবে তরুণ স্বেচ্ছাসেবক ভূপেন্দ্রনাথ কংগ্রেসসেবী দলে তখন নূতনতম যোগদানকারী হয়েও তাঁর "নেপস্যাক" থলির মধ্যে যেন তিনি তাঁর ফিল্ড মার্শালের ব্যাটনটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। কারণ, ১৯১৪ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। এরূপে রাজনৈতিক জীবনের ঘূর্ণাবর্ত্তে একবার পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গভীর স্রোতে ভেসে গেলেন এবং আমাদের সমস্ত গণআন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরূপে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনে তিনি ছিলেন একজন কেন্দ্রস্থানীয় ব্যক্তি। ১৯০৬ সালে আমি যখন বরিশালে গ্রেপ্তার হই, তখন সম্মেলন পরিচালনার সমস্ত ভার তাঁর উপর অর্পিত হয়। ১৯০৯ সালে আমি যখন বিলাতে ছিলাম, তখন সরকারী মহলের চাপকে অগ্রাহ্য করে তিনি ৭ই আগষ্টের পণ্যবর্জ্জন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসীলের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। পরবর্ত্তী বৎসরে লর্ড চেমসফোর্ড তাঁকে ইণ্ডিয়া কাউনসিলের একটি শূন্যপদ পূর্ণ করবার জন্য নির্ব্বাচিত করেন। শাসন সংস্কার পরিকল্পনা সম্পর্কিত মিঃ মণ্টেগুর প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে তিনি ভারতে আসেন এবং তার একজন সদস্যহিসাবে বহু কল্যাণকর কাজ করেন। লী-কমিশনের সদস্যরূপে পুনরায় তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে বঙ্গদেশের গভর্ণরের একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যনিযুক্ত হয়েছিলেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সারাজীবন তিনি নরমপন্থী ছিলেন। অনেকের ন্যায় তিনিও অসহযোগকে দেশের সর্ব্বোত্তম স্বার্থের পক্ষে বিপদ জনক বলে মনে করে নিয়মিত ভাবে তার মত ও পথের বিরোধিতা করতেন।

১৯১৯ সালে ইংলণ্ডে নরমপন্থীদলের প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণ

আমি আশা করি বঙ্গদেশ যে তার এই মহান পুত্রের নামের সঙ্গে যুক্ত করে এক স্মৃতি মন্দির নির্ম্মাণ করবে, সেদিন বেশী দূরে নয়। এরূপ এক প্রতিষ্ঠান হবে মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ও জীবিতদের এক প্রেরণার উৎস। শান্তি ও সমন্বয়ের সেই মন্দিরে সমস্ত কলহবিবাদ ভুলে গিয়ে বিদেহী মহাত্মাগণ মিলিত হবেন এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু লাভ করবেন এক সুউচ্চ সম্মানের আসন।

দ্বাত্রিংশত্তি অধ্যায়

আমার ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন ও মন্ত্রিত্ব লাভ

চার মাসের অধিক কাল আমি ভারতে অনুপস্থিত ছিলাম। এসময় আমার উপর যে কার্য্যভার ন্যস্ত হয়েছিল তা' সম্পাদন করতে আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করি। প্রচুর ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে আমরা ডুবে ছিলাম। এবং প্রত্যেকেই যথাশক্তি কাজ করেছি। মাঝে মাঝে হতাশার মধ্যেও আমাদের পড়তে হ'ত। বিশেষ ভাবে একবার আমাদের দলের জনৈক ব্যক্তি দলের সমর্থন না নিয়েই যখন দলের নির্দ্দিষ্ট নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রস্তাবিত নূতন সংবিধানে একটি "সেকেণ্ড চেম্বার" বা দ্বিতীয় কক্ষের ব্যবস্থা রাখবার জন্য আবেদন করেছিলেন তখন আমাদের হতাশার অন্ত ছিল না। তাঁর কাজে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। কোন কোন ব্যক্তি মনে করেছিলেন যে, আমাদের প্রকাশ্য ভাবে বলে দেওয়া উচিত যে, তাঁর একাজে দলের কোন সমর্থন নেই। পরে অবশ্য এধারণা ত্যাগ করা হয়। এবং এবিষয়ে আমরা কিছু না করলেও তাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাউনসিল-অব-এষ্টেট বাস্তবে একটি দ্বিতীয় কক্ষ। সমস্ত কিছু যে ভাবে এগিয়ে চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক সরকারের কার্য্যপরিচালনা যন্ত্রেও একটি "উচ্চ কক্ষ", তার সংযম ও মন্থরতা-সৃজনী প্রভাব বাস্তবিকই অনাবশ্যক কি না তা' বিবেচনা করে' দেখতে হবে। ভারত শাসন আইন সম্পর্কে রিপোর্ট দেবার উদ্দেশ্যে পার্ল্যামেণ্টারী কমিশন যখন ভারতে আসবে তখন এবিষয়েও তাকে ভেবে দেখতে হ'বে।

১৯১৯ সালে যখন বাড়ী ফিরে আসি তখন আমি যে সম্বর্দ্ধনা পাই তার মধ্যে অন্যান্য বারের তুলনায় এবার হৃদ্যতার যথেষ্ট অভাব ছিল।

অন্যান্য সময়ে আমি বিলাতে যা' কাজ করেছিলাম এবারের কাজ ছিল তা' থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এক হিসাবে তাকে সমস্ত পূর্ব্ব প্রচেষ্টার পরিণতিও বলা যেতে পারে। অথচ তা' সত্ত্বেও মানুষের মনে এবার পূর্ব্বের মত কোন প্রভাবই পড়ল না। তার কারণ খুঁজবার জন্য আমাদের বেশী দূরে যাবার প্রয়োজন হবে না। তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার জন্য বৃটিশ জনগণের একান্ত চেষ্টার প্রমাণ থাকলেও অসহযোগ আন্দোলন আমাদের এক শ্রেণীর লোকের মনে বৃটিশ প্রতিশ্রুতির প্রতি এক গভীর অবিশ্বাস সৃষ্টি ক'রে তুলেছিল। আর এই আবহাওয়ার মধ্যেই শাসন সংস্কার পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামতে হয়েছিল। এই অশুভ আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যেই নূতন আইন অনুসারে সাধারণ নির্ব্বাচন হ'ল। অসহযোগের শক্তিগুলি নির্ব্বাচন প্রার্থীদের কাছে মনোনয়ন পত্র দাখিল না করবার জন্য ও ভোট-দাতাদের কাছে ভোটদানে বিরত থাকবার জন্য আবেদন করতে লাগল। ধর্ম্মের ধুয়া তোলা হ'ল। মুসলমান ধর্ম্মের আচার্য্যগণ নির্ব্বাচনপ্রার্থীদিগকে গম্ভীরভাবে বুঝাতে লাগলেন যে, আগামী নির্ব্বাচনের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা অন্যায় ও শাস্ত্রীয় নীতির বিরোধী হবে। ফলে তাঁদের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মনে যে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল তাতে বিস্মিত হবার মত কিছু নেই। একদিন একজন মুসলমান নেতা আমার নিকট এসে উপস্থিত হলেন। তার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি এক সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুসলমান নির্ব্বাচনপ্রার্থীগণের মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ যাতে পিছিয়ে দেওয়া হয় তজ্জন্য লর্ড রোনাল্ডসের নিকট এক আবেদন করতে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন। আমি আবেদন করলাম এবং তা' গ্রাহ্যও হ'ল। অনেক মুসলমান নেতার পক্ষে এভাবে কাউনসিলে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। তা' না হ'লে তাঁরা তা' থেকে বাদ পড়ে যেতেন। এ সময়ের অসহযোগের মন্ত্র ছিল—ত্রিমুখী বর্জ্জন।

কাউনসিল বর্জ্জন ছিল তাদের অন্যতম। কাউনসিলকে পঙ্কিল গণ্য করে' তাকে তাঁরা পরিহার করতেন। হিন্দুদের সম্পর্কে বলতে গেলে একথা বলা যায় যে, যাঁরা অসহযোগকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন কেবল মাত্র তাঁরাই কাউনসিল প্রবেশের বিরোধী ছিলেন। শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক বৃহৎ অংশের উপর এ নীতির বিশেষ প্রভাব ছিল না। তার ফলে গতবারের কাউনসিলে এশ্রেণীর প্রতিনিধি ভাল ভাবেই উপস্থিত ছিলেন। অসহযোগীদের কাউনসিল প্রবেশের সিদ্ধান্ত অনেক পরের ঘটনা। তার কারণ ছিল তাঁদের নীতির নিস্ফলতা। অসহযোগের চরমভক্তদের নিকটেও যখন পরিস্কার হয়ে গেল যে, বর্জ্জননীতি অনুসরণ করে' গঠনমূলক দিক থেকে তাঁদের কোনই লাভ হয় নি বরং ব্যাপক অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁদের সমস্ত কাজ পণ্ড করে' দিয়েছে, এমন কি, তজ্জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের কোন কোন নেতাকে অনুশোচনায় অশ্রু পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করতে হয়েছে, তখনই তাঁরা পুনরায় অসহযোগের নাম করেই তাঁদের অনসৃত পথ ত্যাগের সঙ্কল্প করলেন। ধারণাটির মধ্যে কূটকৌশল ছিল। বটিকাটির বর্ণ যদিও করা হ'ল সোনালী কিন্তু লেবেলটি পুরোণোই রেখে দেওয়া হ'ল। এখনো তার নাম অসহযোগই রইল। তবে তার এমনি ধরণ যে, দলের বেশ এক শক্তিশালী অংশের মতে তা' মূলনীতিটির গোড়া কেটে দিয়ে গেল। স্থির হ'ল কাউনসিলে প্রবেশ করতে হ'বে। তবে তার উদ্দেশ্য হ'বে কাউনসিলের কাজে বাধা সৃষ্টি করে' তাকে ধ্বংশ করা। এ নীতির প্রারম্ভে হ'বে সহযোগ, কার্য্যক্ষেত্রে অসহযোগ এবং ফল শাসনসংস্কার ধ্বংশ।

এ রীতির অনুসরণ করে' বিভিন্ন প্রদেশে পূর্ণোদ্যমে তাঁরা কাজ করতে লাগলেন এবং তাতে সাফল্যও হ'ল বিভিন্ন ধরণের। মধ্যপ্রদেশ ও বঙ্গদেশে ভিন্ন সর্ব্বত্রই তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। মধ্যপ্রদেশে তাঁরা

পূর্ণ সফলতা লাভ করলেন। কিন্তু বঙ্গদেশে কেবল আংশিক ভাবে সফল হলেন। শেষ পর্য্যন্ত কি হ'বে এখন বলা অসম্ভব। ভবিষ্যত ভগবানের হাতে। কিন্তু আমরা জানি এবং সাধারণ অভিজ্ঞতাও তাই বলে যে, যাহারা অভিশাপ দিতে আসে তাহারা প্রায়ই আশীর্ব্বাদ করে' যায়। বিচিত্র পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে অসহযোগের ক্রমবিকাশের শেষ অধ্যায় হয়ত তার অতীতের বিস্ময়কর ঘটনাগুলিকে আবৃত করে দেবে। নিতান্ত অধ্যবসায়ী যে অসহযোগী সেও হয়ত অতি আগ্রহশীল সহযোগীর ভূমিকা নেবে। যে অসহযোগী আজ অতিরিক্ত গোঁড়া, সেও হয়ত সহযোগের ডাকে সেদিন সাড়া দেবে।

শাসন সংক্রান্ত কাজকর্ম্মে আমি যে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলাম, সে কথা বলবার পূর্ব্বে আমি যে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দিগকে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করবার এক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম, সে কথা এখানে বলে' নেওয়া যাক—তা' হ'ল রোটারী ক্লাবের কথা।

শাসন সংস্কারের দোষগুণের সম্পর্কে মতামত যে রকমই হোক, এবং আমিও স্বীকার করি যে, তাতে মত পার্থক্য হবার কারণও হয়ত আছে। একথা কিন্তু প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন যে, তা' ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি বিষয়ে অনেক সহায়ক হয়েছে। শাসনসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সমাজ স্বীকার করে' নিতে বাধ্য হয়েছে যে, সাম্রাজ্যের সম প্রজা হিসাবে ভারতীয়দের মর্য্যাদাও তাদের সমান সমান। ইউরোপীয় সংবাদপত্রগুলিতে যে সমস্ত বিষয় প্রকাশ হয়েছে এবং ইউরোপীয় গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যা' বলেছেন, তা' থেকেও সে কথা প্রমাণ হয়েছে। সামাজিক আচার ব্যবহারের মধ্যেও এখন সেই সুস্থ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। এক নিরুদ্বেগ ও সমতার ভাব ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করছে। ভারতীয়দের দিকেও আমাদের মধ্যে যাঁরা বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁরা অনুভব করছেন যে, ভালর জন্যই হোক আর মন্দের জন্যই হোক—আমি অবশ্য বিশ্বাস করি ভালর জন্য বলে—

ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয়কেই এক সঙ্গেই থাকতে হবে এবং সেজন্য এ পরিস্থিতি থেকে যতটুকু ভাল আদায় করা যায় ততই মঙ্গল। উভয়পক্ষে এরূপ বিশ্বাস যদি চলতে থাকে, তা' হ'লে আমাদের সম্পর্কের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, এবং তাহাতে উভয়েরই সুবিধা হ'বে।

আমার পক্ষে এ পরিস্থিতির একটি ব্যক্তিগত দিকও আছে। তারও উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রাক-সংস্কার যুগে সম্ভবত আমিই ছিলাম একমাত্র ভারতীয়, যে ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী এমন এক মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল, যা' বন্ধুত্বের ঠিক বিপরীত। তাদের সঙ্গে আমার কোন বিবাদ ছিল না, তবুও মনোভাবটি ছিল খুবই স্বাভাবিক। যে-সমস্ত আন্দোলনকারী তখন জীবিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা খোলাখুলি ভাবে এবং বারবার সরকারকে তার ত্রুটির জন্য এবং ইউরোপীয় সমাজকে তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশেষ সুযোগ সুবিধার প্রতি তাদের অতিরিক্ত আসক্তির জন্য তীব্র ভাবে নিন্দা করেছি। তার উপর তখন আমরা পরস্পরকে ভালরূপে জানতামও না। অজ্ঞতা থেকেই ক্রোধ আর ঘৃণার উৎপত্তি হয়। তারপর থেকে সব কিছুরই পরিবর্ত্তন হয়েছে। যতই তাদের নিকটসংস্পর্শে এসেছি, ততই তাদিগকে উত্তমরূপে জেনেছি এবং আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গিরও ততই পরিবর্ত্তন হয়েছে। জনসেবার কাজে ও শাসন সংস্কারের সাহায্য করতে গিয়ে আমরা হয়েছি পরস্পরের সহকর্ম্মী। আর ইউরোপীয় ও ভারতীয় নেতৃবর্গের পারস্পরিক ধারণা এখন শ্রদ্ধা ও সম্মানে রূপান্তরিত হয়েছে।

ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজের গভীরে যখন এই গুরুতর পরিবর্ত্তনগুলি নীরবে রূপ নিচ্ছিল এবং বাইরে প্রকাশ হবার জন্য ছটফট্ করছিল, তখন রোটারী ক্লাবের এক মধ্যাহ্ন-ভোজসভায় যোগ দিয়ে বক্তৃতা করবার জন্য আমি এক নিমন্ত্রণ পেলাম।

এই রোটারী ক্লাব এক বিশ্বব্যাপী সংস্থা এবং কোলকাতাতেও

তাদের একটি বড় রকমের কেন্দ্র রয়েছে। আমার প্রতি তাঁদের এই সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব আমি বিশেষ রূপে উপলব্ধি করলাম। এবং তাঁরা আমাকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করলেন, তা' যে-কোন ভারতীয় সমাবেশে আমি যা' পেয়েছি তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। অনেক নূতন-নূতন মুখ আমার চোখে পড়ল। প্রত্যেকটি মুখেই প্রীতিপূর্ণ ভাব। সমাবেশটি ছিল বৃহৎ এবং উৎসাহে ভরপুর। আমি যখন ভাষণ দিতে উঠি, তখন আমার মনে হ'ল, আমি কেবল একজন ভারতীয়ই নই, আমি একজন উদার মনোভাবাপন্ন রোটারিয়ানও। আমি রয়েছি বন্ধুগণ পরিবেষ্টিত হয়ে, যাঁরা আমার সমস্ত ত্রুটিই উপেক্ষা করবেন। আমার সেই ভাষণের কিছু অংশ আমি এখানে উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি—

"সাম্রাজ্য আপনাদের, কিন্তু তা' আমাদেরও। তা' আপনাদের, কারণ আপনারা তার সৃষ্টি করেছেন। তা' আমাদেরও, কারণ তা' আমাদিগকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেছে। আপনারা তার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী। আমরা সাম্রাজ্যের দত্তক সন্তান-সন্ততি। আপনাদের ও আমাদের মর্য্যাদার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। আমার নিজের পক্ষ থেকে ও আমার মহান দলের পক্ষ থেকে আমি এখানে স্পষ্ট ভাবে বলে দিতে চাই যে নরমপন্থীদলের আমরা বিশ্বাস করি যে, ইংলণ্ড ও ভারতের এই যে সম্পর্ক, এটি বিধাতার বিধান। তার পশ্চাতে রয়েছে তাঁর কোন মহৎ ও পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়। সুতরাং আপনাদের কাছে, ইউরোপীয় সমাজের প্রতিনিধিগণের কাছে, সাম্রাজ্যের অংশীদারগণের কাছে, মানবের মুক্তিকামী বন্ধুগণের কাছে, আমি আবেদন করছি, আপনারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান, আমরা যে-মহান পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছি, যার উপর ইংলণ্ডের সম্মান ও ভারতের ভবিষ্যত নির্ভর করছে তাকে নিশ্চিতরূপে সফল করতে আপনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। আমি নিঃসন্দেহ যে,

আমার এই আবেদন ব্যর্থ হবে না। যে সহৃদয়তার সঙ্গে আপনারা আমাকে অভ্যর্থনা করেছেন তাতে আমার এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। এবং আপনারা যে-অনুগ্রহ ও সহানুভূতি আমার প্রতি প্রকাশ করেছেন তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকট বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ।”

ক্লাব যে আমার বক্তৃতার মর্ম্ম অবধারণ করেছিলেন তার চিহ্ন স্বরূপ তাঁরা আমাকে তাঁদের সম্মানসূচক সদস্য-পদ অর্পণ করেছিলেন এবং আজও আমি সেই পদে অধিষ্ঠিত রয়েছি। যদিও সর্ব্বাগ্রে করণীয় কার্য্যাদির দরুন তার বৈঠকগুলিতে ঘনঘন যোগদানের সুযোগ আমার হয়ে উঠে না, তবুও এরূপ মর্য্যাদাপূর্ণ ও বিশ্বব্যাপী এক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে আমি বিশেষ গর্ব্ব বোধ করি। ভারত ও সাম্রাজ্যের কল্যাণে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় করে’ এই ক্লাব অশেষ উপকার সাধন করেছে।

আমি এখন পুনরায় আমার কাহিনীতে ফিরে আসি। ব্যারাকপুর মহকুমার মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ থেকে আমি বঙ্গীয় আইনসভার নির্ব্বাচনে সদস্যপদপ্রার্থীরূপে দাঁড়ালাম। এবং বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হলাম। নির্ব্বাচিত হবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যে গভর্ণর রোনাল্ডসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আমার পছন্দ অনুসারে যে কোন এক মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করেন। এ সাক্ষাৎকারেই প্রস্তাবটি যে দেওয়া হবে তা’ আশা না করলেও প্রস্তাবটি আমার নিকট সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতও ছিল না। বিষয়টি নিয়ে কানাঘুষা চলছিল এবং প্রায় সকলেই বলাবলি করছিল। আমি প্রস্তাবটি গ্রহণ করলাম এবং শিক্ষা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগটিরই ভার নিতে আগ্রহ প্রকাশ করলাম। সেক্রেটারিয়েটে যেরূপে কাজ বণ্টন করা ছিল তা’ বিচার করে’ এভাবে সংযুক্ত করে’ কোন বিভাগ সৃষ্টি করা যে সম্ভব নয়, লর্ড রোনাল্ডসে আমাকে তা’ দেখিয়ে দিলেন। তাঁর একান্ত সচিব মিঃ গৌরলেকে ডেকে পাঠালেন এবং যেভাবে মন্ত্রীদের মধ্যে বিভাগ বণ্টন

করা হয়েছে তার একখানি ছাপান তালিকা আনিয়ে আমায় দেখালেন, আর বললেন যে, পরে তিনি আমার নিকট তার একখানি নকল পাঠিয়ে দেবেন। চিকিৎসা বিভাগ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমি গভর্ণর সাহেবকে জানালাম যে, অস্থায়ীভাবে আমি এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিষয়ের ভার নিতে পারি। তবে বিষয়টি আরও বিবেচনা করে দেখবার জন্য আমাকে কিছু সময় দিতে আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম। বিলম্ব না করে তিনি আমার অনুরোধটি রক্ষা করতে সম্মত হয়ে আমি যে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ভার নিতে রাজী হয়েছি সেজন্য আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। এ বিভাগের কার্য্যে এতদিন তিনি নিজেই খুব মনোযোগ দিতেন এবং তা' প্রধানতঃ দেখাশুনা করতেন।

কথা প্রসঙ্গে গভর্ণর আমাকে জানালেন যে, তিনি দুজন হিন্দু ও একজন মুসলমান এই তিন জন মন্ত্রী নিযুক্ত করবার সঙ্কল্প করেছেন এবং আমার সহকর্ম্মী হিসাবে অপর হিন্দুমন্ত্রীপদে কাকে নেওয়া উচিত সে বিষয়ে আমার অভিমত জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি বিনা দ্বিধাতে মিঃ পি. সি. মিত্রের নাম প্রস্তাব করলাম। লর্ড রোনাল্ডসে-র তাতে একমাত্র আপত্তি ছিল যে, মিঃ মিত্র শিক্ষাবিদ ছিলেন না। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক স্নাতকই আমাদের শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাবলীর সঙ্গে মোটামুটি ভাবে পরিচিত। এবং মিঃ মিত্র বহু বৎসর যাবৎ সাউথ সুবার্বান স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। এ স্কুলে তখন প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়ান হ'ত এবং তা' ছিল সহরের বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। তাঁর কথাবার্ত্তা শুনে আমার এই ধারণা হয়েছিল যে, তিনি একজন শিক্ষাবিদকে নিযুক্ত করারই পক্ষপাতী ছিলেন এবং কাউনসিলে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদের বাইরের কোন লোকের কথা চিন্তা করছিলেন। আমি তাঁকে দেখিয়ে দিলাম যে, সেরূপ কিছু করলে তা' আইনের উদ্দেশ্য বিরোধী হবে এবং মনে হ'ল তিনি আমার সঙ্গে একমত হলেন।

মন্ত্রীমণ্ডলীর মুসলমান সদস্য সম্পর্কে তিনি আমাকে কিছু বললেন না। তার কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে এক কথাবার্ত্তার সময় তিনি আমাকে ডক্টর আবদুল্লা সুরাবর্দ্দির নাম করে' বলেছিলেন যে, উনি একজন উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মুসলমান। ডঃ সুরাবর্দ্দিকে বঙ্গীয় সরকার ফ্র্যানচাইজ কমিটি দ্বারা নির্ব্বাচিত ব্যক্তি হিসাবে ফ্র্যানচাইজ কমিটির সদস্য নিযুক্ত করেছিলেন। মিঃ পি. সি. মিত্রও অনুরূপ ভাবে ফাঙ্কশন কমিটির সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অপরাপর মুসলমান নেতৃবর্গ যখন খিলাফৎ আন্দোলনের খরস্রোতে দোদুল্যমান এবং সহযোগ ও অসহযোগের মধ্যে পড়ে সংশয়াকুল, তখন নবাব নবাবআলী চৌধুরী স্বনামে একখানি আকর্ষণীয় পুস্তিকা প্রকাশ করে' একজন সুদক্ষ তার্কিকের মত অসহযোগের বিরোধী যুক্তিগুলি বিশ্বাস যোগ্য করে' তার মধ্যে সাজিয়ে দিলেন। এমন সময় এরূপ অবস্থার একজন মুসলমান নেতার নিকট থেকে আসার ফলে তা' যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য। লর্ড রোনাল্ডসে তাঁর মন্ত্রীদের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ থেকে একজন প্রতিনিধির সন্ধানে ছিলেন। এখানে সে অঞ্চলেরই এমন একজন মুসলমান ভদ্রলোকের সন্ধান পাওয়া গেল, সমাজে যাঁর প্রতিষ্ঠা আছে এবং যিনি প্রকাশ্য ভাবেই বলে দিয়েছেন যে, সংস্কারকে রূপায়িত করবার জন্য তিনি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। রাজনৈতিক কর্ম্ম করতে গেলে সাহসের দরকার এবং নবাব সাহেব তাহাই দেখিয়েছেন। কাজেই সংবাদপত্রে আমি যখন পড়লাম যে, নবাব নবাবআলী চৌধুরী মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন, তখন আমি অনুমাত্রও বিস্মিত হলাম না।

আমরা ছিলাম তাঁর হিন্দু সহকর্ম্মী. আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ। সরকারী কাজের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে আমাদের মতের মিল ছিল। সাধারণত আমরা একসঙ্গেই কাজ করতাম এবং পরস্পরের সহায়তা করতাম। আমাদের মধ্যে কোন ধরাবাঁধা

বিধি ব্যবস্থা অথবা প্রতিবেশী প্রদেশের মধ্যে যেমন হয়ে থাকে সেরূপ কোন চুক্তিপত্র ধরণের কিছু ছিল না। আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এতই সন্তোষজনক ছিল যে, ও সবের কোনই প্রয়োজন ছিল না। আমাদের সরকারী কর্ত্তব্য সম্পাদনে পারস্পরিক বিশ্বাসের দ্বারা আমরা সঙ্ঘবদ্ধ ছিলাম। উচ্চ পর্য্যায়ের সরকারী দায়িত্ব পালনের মধ্যে আমাদের এই তাৎক্ষণিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ সঙ্ঘবদ্ধতা থেকে প্রমাণ হয় যে, পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও বিশ্বাস থাকলে সাম্প্রদায়িক শক্তি সমূহের বিচ্ছিন্নকারী প্রভাব দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।

মন্ত্রী হিসাবে যুক্তভাবে কাজ করে' আমরা যে ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করেছিলাম, তা' সত্ত্বেও একটি বিষয়ে আমাদের মধ্যে গুরুতর মতান্তর ঘটেছিল। আর তা' হয়েছিল সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন নিয়ে। নবাব সাহেব ও একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্য স্যার আবদুর রহিম ছিলেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সক্রিয় সমর্থক। এবং আমরা, হিন্দু মন্ত্রীরা ছিলাম তার সম্পূর্ণ বিরোধী। আমাদের মুসলমান সহকর্ম্মিগণ এ বিষয়ে কোন মিটমাট করতে সম্মত ছিলেন না। অপর পক্ষে আমরা আমাদের জাতির ঐতিহ্যপূর্ণ সহনশীলতা নিয়ে এমন কি অনেক গুরুতর বিষয়েও আপোষ মীমাংসার মনোভাব দেখাতে লাগলাম। তবে এই শর্ত্তে যে, আমাদের লক্ষ্য বস্তু যে সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ সাধন, তা' নিকটতর হবে। অনতিপূর্ব্বে নবাব নবাবআলী চৌধুরী ও আমি দুটি বিরোধী শিবির ভুক্ত হয়ে পড়লাম। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতাদের আমি ছিলাম অন্যতম। তিনি ছিলেন বঙ্গভঙ্গের উৎসাহী সমর্থক। বহু বৎসর যাবৎ আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। কিন্তু মন্ত্রিত্বের কাজে আমরা সেই সংঘর্ষের কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত আসতে দিই নি। আমরা সে-সমস্ত ভুলে গিয়ে আমাদের উভয়ের সম্মুখে যে কাজ ছিল তাতে লেগে গেলাম, যাতে সব শেষে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই সমান ভাবে উপকৃত হতে পারে।

তবে একথা গোপন করে লাভ নেই যে, নবাব সাহেবকে মন্ত্রী নিযুক্ত করার পর কোন কোন মহলে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি শিক্ষায় সম্ভবত তাঁদের সমকক্ষ ন'ন, অথচ তাঁদের পরিবর্ত্তে এরূপ এক ব্যক্তি যে এত উচ্চ এক বিশ্বাসের পদ লাভ করেছেন তা' দেখে কোন-কোন মুসলমান নেতা অত্যন্ত দুঃখ বোধ করতে লাগলেন। এরূপ মনোভাব স্বাভাবিক হলেও সম্ভবত তার মধ্যে কোন যুক্তি ছিল না। প্রাচ্যই হোক বা পাশ্চাত্যই হোক, কি উভয়ের সংমিশ্রণই হোক, উচ্চ শিক্ষা থাকলেই যে একজন লোকের প্রশাসনিক ক্ষমতাও আয়ত্ত হয়েছে এরূপ মনে করবার কোন হেতু থাকতে পারে না। রাষ্ট্রশাসন ক্ষমতা এক বিশেষ গুণ। কোন কোন ক্ষেত্রে তা' স্বাভাবিক ভাবেই আয়ত্ত হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা' হয় সাধারণবুদ্ধি, বিচক্ষণতা, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ও ন্যায়ের প্রতি একান্ত অনুরাগের সংমিশ্রণে। ফ্রেডরিক-দি-গ্রেট নাকি কোন স্কুলের শিক্ষককে কখনো কোন প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত করতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার আমাকে বলেছিলেন যে, বঙ্গদেশের প্রথমদিকের জনৈক লেফটেন্যান্ট গভর্ণর কোন স্কুল শিক্ষককে কখনো ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করতেন না এবং পণ্ডিত স্বয়ং বারবার বলাতেই কেবল একটি ক্ষেত্রে তাঁর সেই অনুসৃত নীতির ব্যতিক্রম করতে সম্মত হয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম লোকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নিরক্ষর। মহম্মদ ও আকবর, শিবাজী ও হায়দর আলী, রঞ্জিত সিং ও জং বাহাদুর-এর মত উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও দুর্লভ। শিক্ষাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করা আমাদের উচিত নয়। সঙ্গে সঙ্গে তার বাস্তবিক মূল্য থেকে অধিক মূল্য নির্দ্ধারণের চেষ্টাও অনুচিত। আমার কোন সহকর্ম্মীর প্রশাসনিক ক্ষমতা বিচার করা আমার কাজ নয়। তবে এ বিষয় বিচারের সর্ব্বোত্তম ক্ষমতা যাঁর হস্তে ন্যস্ত, প্রদেশের

সেই গভর্ণর স্বয়ং তাঁর কার্য্যক্ষমতার প্রশংসা করেছেন। অনুরূপ ভাবে তিনি আমার হিন্দু সহকর্ম্মী মিঃ (বর্ত্তমানে স্যার) প্রভাসচন্দ্র মিত্রেরও প্রশংসা করেছেন। যদিও কাউনসিলের জনৈক সদস্য তাঁকে না করে মিঃ মিত্রকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করায় দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং তজ্জন্য আমাকে দোষারোপ করেছিলেন, তবুও মিঃ মিত্রের দক্ষতা বা যোগ্যতা এবং এমন কি, শিক্ষা নিয়েও কেউ কোন দিন কোন প্রশ্ন তুলে নি। অবশ্য আমাকে দোষারোপ করার জন্য কুণ্ঠিত না হয়ে সব শুনেও হাসি মুখে আমি সে সব উড়িয়ে দিয়েছিলাম।

অধিক অগ্রসর হবার আগে লর্ড রোনাল্ডসে-র সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিরূপে আরম্ভ হ'ল সে বিষয়ে কিছু বলা যাক। ঝগড়া-বিবাদ নিয়েই হয়েছিল আমাদের সম্পর্কের সুরু। অন্তত আমার দিক থেকে, ক্রমশ তা' এক প্রীতিকর পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে সেই ভূতপূর্ব্ব গভর্ণরের প্রতি এক বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত শ্রদ্ধায় পরিণত হয়। লিপিবদ্ধ বিষয় টিকেও থাকে, আর মনেও থাকে। লর্ড রোনাল্ডসে তাঁর প্রাচ্যদেশ ভ্রমণের উপর একখানি গ্রন্থ রচনা করে' তন্মধ্যে প্রাচ্যজাতিদের নীতিশাস্ত্রের নিন্দা করেছিলেন। তাঁর এই চিন্তাধারা ছিল লর্ড কার্জ্জন প্রাচ্যজাতি সমূহের চরিত্র সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং যার ফলে আমাদের লোকেরা বিরক্ত হয়ে' স্যার রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে টাউন হলে সভাকরে' তজ্জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, তারই অনুরূপ। সেই মনোবৃত্তি সম্পন্ন একজন শাসককে যখন বঙ্গদেশের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল তখন স্বভাবতই এক ভয়ের উদ্রেক হয়েছিল। জন সংস্থা ও সংবাদপত্রগুলি বিপদের আশংকা করতে লাগলেন। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন বিষয়টিতে হাত দিলে আমি তার পক্ষ থেকে এই নিয়োগ রদ করবার অনুরোধ করে তৎকালীন ভারত সচিব অষ্টেন চেম্বারলেইনের নিকট তার পাঠিয়েছিলাম। ভারতের কোন জনসংস্থার পক্ষে এরূপ এক অভিনব প্রস্তাব প্রেরণের,

ঘটনা ছিল সেই সর্ব্ব প্রথম। কিন্তু মানুষের মনের অবস্থা তখন এমন চরমে উঠেছে যে, আমাদের প্রাদেশিক ব্যাপারে আমাদের ঘরের মধ্যে সেই কার্জ্জননীতির পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনায় আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। অনুরূপ ভাবে আমি আমাদের সেই বিজ্ঞ পরামর্শ দাতা ও লণ্ডনস্থ ভারতীয় জাতীয় মহাসভার বৃটিশ কমিটির কার্য্যপরিচালনার প্রাণস্বরূপ স্যার উইলিয়ম ওয়েডার বারণ-এর নিকটেও তার প্রেরণ করলাম ও পত্র লিখলাম। স্যার উইলিয়ম ভারত সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। এবং যতদূর মনে পড়ে লর্ড রোনাল্ডসে-র সঙ্গেও তিনি স্বয়ং যোগাযোগ স্থাপন করে' এক আশ্বাসবাণী আদায় করেছিলেন। সম্ভবত লর্ড রোনাল্ডসেও ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় সেই আশ্বাস বাণীর পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। এ বিতর্কের অবসান তখন সেখানেই হওয়া উচিত ছিল। তবে প্রত্যেক শিবিরেই কিছু কিছু অতিরিক্ত গোঁড়া লোক থাকে। এবং একবার উত্তেজনার সৃষ্টি হ'লে তখন তাদের সংযত করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সে সময় এমন প্রস্তাবও এসেছিল যে, প্রকাশ্য ভাবে আমাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করা উচিত। পুনঃপুনঃ বুঝিয়ে আমি একাজ থেকে তাদের নিরস্ত করি। পরবর্ত্তী ঘটনাবলী থেকে প্রমাণ হয়েছিল যে, এই নিরস্ত করা বিশেষ সুবিবেচকের মতই কাজ হয়েছিল। আমার সারা জীবনের জনসেবার কাজ থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছিলাম যে, চরমপন্থী ভাবের মাদকতা যতই থাকুক, শেষ পর্য্যন্ত তা' থেকে সুফল বিশেষ পাওয়া যায় না। এডমাণ্ড বার্ক বলেছেন, রাজনৈতিক কাজে দূরদর্শিতা একটি শ্রেষ্ঠ গুণ।

১৯১৭ সালের ৩১ শে মার্চ্চ তারিখে লর্ড কারমাইকেলের কার্য্যকাল শেষ হয় এবং তার পরবর্ত্তী মাসে লর্ড রোনাল্ডসে বঙ্গদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হন। ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখের বাণী তখনো এসে পৌছায় নি। তবে সব ভাবগতিক ও লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছিল এক পরিবর্ত্তন আসার আর বিশেষ বিলম্ব নেই। আসন্ন

ঘটনার ছায়া পূর্ব্বেই লক্ষ্য করা যায়। ভারত সভার প্রতিনিধি মণ্ডলীর মুখপাত্র হিসাবে তাঁর উদ্দেশ্যে আমার এক ভাষণের উত্তর দিতে গিয়ে ১৯১৬ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর তারিখে, তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড বলেছিলেন, "একদিন ভারতকে তার সহোদরা-প্রতিম জাতিসমূহের দ্বারা গঠিত বৃটিশ সাম্রাজ্যে তাদের সঙ্গে সমপর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত রূপে দেখতে পাব বলে, আমি আশা করি। এবং এবিষয়ে আমি আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করি। তার পরে ১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে হাউস-অব-কমনস থেকে যে বাণী প্রচার হবার পর তা' ভারতে এসেছিল, এটি ছিল তারই ভবিষ্যত বাণী। প্রশাসনের মতিগতির পরিবর্ত্তন হচ্ছিল। এবং তখন আমরা ছিলাম এক বিরাট ঘটনার দ্বারদেশে।

ঠিক এমনই একটি সময়ে লর্ড রোনাল্ডসে বঙ্গদেশের গভর্ণর হলেন। তিনি এমনই এক জনপ্রিয় শাসকের স্থলাভিষিক্ত হলেন, যাঁর কার্য্যকাল বৃদ্ধি করা হ'লে বঙ্গদেশবাসীগণ আনন্দিতই হ'ত। প্রকৃতপক্ষে বেশ কিছু সংখ্যক লোক এ উদ্দেশ্যে একটি আবেদন করতেও প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তার পশ্চাতে জনমতও মন্দ ছিল না। লর্ড কারমাইকেল ছিলেন এক অত্যন্ত প্রগতিশীল মৌলিকপন্থী ব্যক্তি এবং ভারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক সহানুভূতি ছিল। যুগ্ম-পার্ল্যামেণ্টারী কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দেবার সময় তিনি তার যথেষ্ঠ প্রমাণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ভাইসরয় এবং ভারত সচিবের সমর্থন পেলে তিনি মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টকেও ছাড়িয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রশাসনিক বলিষ্ঠতার জন্য তাঁর কোন কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেত না। এমন কি, আইন সভায় সভাপতিত্ব করতে করতেও তিনি প্রায়ই নিদ্রিত হয়ে পড়তেন। তবে একথাও স্বীকার্য্য যে, তখন, এমন কি এখনও, কাউনসিলের বক্তৃতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথমে লিখেনিয়ে টাইপ করে পরে কাউনসিলে এনে তা' পড়ে

দেওয়া হ'ত। এবং এধরণের বক্তৃতা শ্রোতাদের গভীর নিদ্রার উদ্রেক করত।

১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে লর্ড কারমাইকেল যখন বঙ্গদেশে আসেন তার অনতিকাল পরে কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনটিকে সংশোধনের অভিপ্রায়ে মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্ম সম্পর্কে দার্জ্জিলিং-এ তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়েছিল। কোলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসাবে মিঃ পেনী যথেষ্ঠ সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন এবং তাঁকে এই বিশেষ কাজের জন্যই নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু লর্ড কারমাইকেলের কার্য্যকালের মধ্যে বিশেষ কিছুই করা হ'ল না। ১৯১৭ সালে একটি সংশোধনী বিল আইন সভায় উপস্থিত করা হ'ল। কিন্তু পরে তা' প্রত্যাহার করা হয়। তার ফলে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত আইনটিকে সংশোধন করা হ'ল না। যে কারণেই হয়ে থাকুক, বঙ্গদেশের রাজনৈতিক অবস্থা যখন বিশৃঙ্খলাময় হয়ে উঠে ছিল, তখন লর্ড কারমাইকেলের ব্যক্তিত্ব তাকে বিশেষ ভাবে প্রশমিত করতে সমর্থ হয়েছিল। তিনি ছিলেন বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত খ্যাতিসম্পন্ন লোকের ব্যক্তিগত বন্ধু। তাঁর সাহস, সরলতা ও ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর সহানুভূতি তাঁদের মোহিত করেছিল। তাঁর মধ্যে স্কচজাতির বিচক্ষণতা ও মুক্তিপ্রেমের সমন্বয় হয়েছিল। আমার মনে আছে এক ব্যক্তিকে তিনি বলেছিলেন, "আমি নিজে যদি বাঙ্গালী হতাম, তা' হ'লে উগ্রপন্থীরা যা' করছেন.আমি যে তা' করতাম না একথা নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি না।" একটি প্রদেশের গভর্ণরের মুখে এরূপ কথা তাঁর বিরোধীদের নিরস্ত করত এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারিগণের মনে যে বিশ্বাসের সূচনা করে' রেখেছিলেন সম্ভবত তাহাই ছিল সরকারের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ।

এরূপ একজন শাসকের পরে এসে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু লর্ড রোনাল্ডসে ও হার মানবার পাত্র ছিলেন না।

তিনি কোলকাতা আসার অনতিকাল পরেই একদিন তাঁর একান্ত সচিব মিঃ গৌরলে-র নিকট থেকে এক পত্র পেয়ে আমি বিস্মিত হলাম। রাজভবনে গিয়ে লর্ড রোনাল্ডসে-র সঙ্গে দেখা করবার জন্য তা' ছিল আমার প্রতি নিমন্ত্রণ। এ ক্ষেত্রে সাধারণ রীতিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। সাধারণ নিয়ম অনুসারে গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হ'লে সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তিকে প্রথমে তাঁর একান্ত সচিবের কাছে পত্র দিতে হয়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যতিক্রম করে' হয় মিঃ গৌরলে-র আপন ইচ্ছায় অথবা স্বয়ং গভর্ণরের ইচ্ছাতে সাক্ষাৎকার স্থির করা হয়েছিল। আমার কাছে যে বার্ত্তাটি পাঠান হয়েছিল, আমার কাছে তা' ছিল এক আদেশ তুল্য। নির্দ্দিষ্ট দিনে যথা সময়ে আমি রাজভবনে উপস্থিত হলাম। অত্যন্ত সদয়ভাবে ও ভদ্রতার সঙ্গে সেখানে আমাকে অভ্যর্থনা করা হল। যতক্ষণ আমাদের সাক্ষাৎকার চলেছিল ততক্ষণ, তৎপূর্ব্বে আমি যে ভারত সচিব ও স্যার উইলিয়ম ওয়েডার বারণ-এর নিকট বার্ত্তা পাঠিয়েছিলাম, সে সম্পর্কে কণামাত্র উল্লেখ করা হল না। বর্ত্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে সব বিষয়ে আমাদের উভয়েরই আগ্রহ ছিল, তা' নিয়েই আলাপ আলোচনা হয়েছিল। এবং আমি যখন বিদায় নিলাম তখন লর্ড রোনাল্ডসে-র সম্পর্কে পূর্ব্বে আমার যে ধারণা ছিল তা' বিশেষরূপেই সংশোধিত হ'য়ে গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎকার ছিল বহু সাক্ষাৎকারের মধ্যে প্রথম। আর তার পরবর্তী সাক্ষাৎকার সমূহও হয়েছিল এ সাক্ষাৎকারের মতই আনন্দদায়ক।

ত্রয়ত্রিংশতি অধ্যায়

মন্ত্রীরূপে আমার কার্য্যাবলী

কিছু আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেই ১৯২১ সালের ৪ঠা জানুয়ারী আমরা মন্ত্রিত্বভার গ্রহণ করলাম। প্রথমে গভর্ণর ও তাঁর পরে একজিকিউটিভ কাউনসিলার ও মন্ত্রীগণ একসঙ্গে শোভাযাত্রা করে আমরা দরবারকক্ষে (থ্রোন রুম-এ) গিয়ে আমাদের অফিসের শপথ নিলাম। তারপর একটি টেবিলের চারদিকে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীপরিষদে বসলাম এবং গভর্ণরই হলেন তার প্রধান। এবার একখানি খাতায় আমরা আমাদের নাম স্বাক্ষর করে' আবার শোভাযাত্রা করে' দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলাম। এই অনুষ্ঠান সাঙ্গ হবার পর আমরা স্ব-স্ব অফিসে গিয়ে ঐকান্তিক ভাবে আমাদের কাজ আরম্ভ করলাম। আমাদের কাজও সহজ ছিল না। আর আমাদের উৎকণ্ঠারও অন্ত ছিল না। আমাদের কাজ, অফিস, পরিবেশ সবই ছিল নূতন। তার পূর্ব্বে কোনদিন আমরা এই আবহাওয়া উপভোগ করি নি। এর মধ্যে উৎসাহ পাবার মত যথেষ্ট কারণ থাকলেও আমাদের কাছে সব অদ্ভুত আর অভিনব বলে' বোধ হচ্ছিল।

এক আইরিশ ভদ্রলোক ছিলেন আমার সচিব। কেল্‌টিক জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হৃদ্যতা ও ভাবপ্রবণতা তাঁর মধ্যে ষোল আনাই ছিল। অফিস সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনের অজানা ও পিচ্ছিল পথে আমাকে সাহায্য করতে ও কোন কোন সময় পরিচালিত করতে তিনি সর্ব্বদাই ছিলেন উদগ্রীব। বলা যায় যে, তিনি যেন আমার চর্ম্মের মধ্যেই প্রবেশ করবার চেষ্টা করছিলেন। ভারতে প্রায় অধিক সংখ্যক ইংরেজের মত তিনিও আমায় নামে জানতেন। তাঁর অফিস সম্পর্কিত শিক্ষা ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত কিছুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাঁকে সতর্ক করে' দিয়েছিল যে, মানুষের বা বস্তুর বাইরের দিকটা জানলেই সব সময় তার

ভিতর দিকটাকে জানা হয় না। যে ব্যক্তি একজন প্রজ্জ্বলিত বিপ্লবী তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হ'লে প্রায়ই দেখা যাবে, সে একজন উৎকৃষ্ট প্রকৃতির ভদ্রলোক এবং সাধারণ বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা সেও প্রভাবিত হয়। কাজেই মিঃ ও-মেলে একবার আমাকে বলে ছিলেন এবং আমিও প্রায়ই দেখতাম, কাউনসিল চেম্বারে সেই একঘেঁয়ে বিতর্ক শুনতে শুনতে আমাদের অনেকে যখন নিদ্রিত হয়ে পড়তেন, তার মধ্যে বসে বসে তিনি আমার প্রকাশিত বর্ক্তৃতাগুচ্ছ এক মনে পড়ে চলেছেন। এভাবে তিনি যে আমাকে কত ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পেরেছিলেন আমি তা' ভাবতেও পারি নি। আর আমি তাঁকে জেনেছিলাম তাঁর নিকট থেকে প্রাপ্ত বিশ্বাসযোগ্য সহায়তার ভিতর দিয়ে। এরূপে আমাদের বেশ চমৎকার ভাবেই চলে যাচ্ছিল। এজন্য তিনি ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে যখন দীর্ঘদিনের অবকাশ ভোগ করতে গেলেন তখনই বাস্তবিক এক বেদনার ভিতর দিয়ে তাঁর নিকট থেকে আমি বিদায় নিয়েছিলাম।

সমস্ত বিভাগটিই ছিল এরূপ উৎসাহে উদ্দীপিত। ডাক্তার বেণ্টলী ছিলেন ময়লাজল নিষ্কাশন ও আবর্জ্জনা দূরীকরণ বিভাগের প্রধান এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ে আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। আমি নিযুক্ত হওয়ার অনতিকাল পরেই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করে' আমাকে তাঁর পূর্ণ সহযোগিতা দেবেন বলে' আশ্বাস দিয়ে গেলেন। আমি তা' সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে' তাঁর উপর নির্ভর করতে পারতাম। জ্ঞান ও প্রচারকোচিত-উৎসাহ সমন্বিত এই উদ্যমশীল ভদ্রলোক অপরাপর বৃটিশ কর্ম্মচারীদের মত লালফিতার উপর নির্ভর করতেন না। এ রীতির ব্যতিক্রম করে' অনেক সময় তিনি অসুবিধাতেও পড়তেন। তবে সে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। আমার মনে হ'ত, সরকারী কাজকর্ম্মে তা' ছিল এক বিশেষ লাভ। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসটি বোধ হয় তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না। অবশ্য অপরপক্ষও তাঁর সঙ্গে

অনুরূপ ব্যবহার করত। তার ফলে মাঝেমাঝে যে সকল অসুবিধার সৃষ্টি হ'ত অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ তার মিটমাট করতেন। ডাক্তার বেন্টলীর প্রেরণার ফলে সমস্ত বিভাগে এক নূতন উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। এবং যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্যমের সঙ্গে তার কাজকর্ম্ম চলত। এত সত্বেও এবিভাগের লোক সংখ্যা হ্রাসের, প্রচারকার্য্য কমাবার এবং একবার ডাক্তার বেন্টলীর পদটাই উঠিয়ে দেবার সুপারিশ করে' যখন-তখন আইন সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করা হ'ত। সে সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাতে বা প্রত্যাহৃত করাতে আমার কোনই অসুবিধা হ'ত না। এসব থেকে কেবল প্রমাণ হ'ত যাঁরা গণপ্রতিনিধি হয়ে জনগণের স্বার্থের রক্ষক হিসাবে আইন সভায় এসেছিলেন তাঁদের অনেকে কিরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে কাজ করতেন।

স্যানিটরী ওয়ার্কস-এর প্রধান ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়র ছিলেন মিঃ ডি. বি. উইলিয়মস্। তিনিও বিশেষ তৎপর হয়ে আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। যখন আমার কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী হ'ত তিনি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে আগ্রহের সঙ্গে তাঁর সমর্থন জানাতেন। নদীর জল সরবরাহ করার বিষয়ে আমি যে পরিকল্পনা দিয়েছিলাম এবং আমার উৎসাহ পেয়ে তাঁর বিভাগ যেরূপে সেকাজে অগ্রসর হয়েছিল তা' এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। শাসনসংস্কারের বহু বৎসর পূর্ব্বেই এই চিন্তাধারাটির সূত্রপাত হয়েছিল। তবে যে কারণে তা' বাদ দেওয়া হয়েছিল তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নদীর ধারেই ছিল আমার বাড়ী। পবিত্র জল মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে যে কত উপকারী আমি ব্যক্তিগত ভাবে তা' জানতাম। আরও গুরুত্বপূর্ণ এই যে, জনমত ক্রমশ তার অভাব ও তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বহনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে লাগল। আমার মনে হ'ল এজন্য আমার অবস্থা, ক্ষমতা ও দায়িত্বের সুযোগ নেওয়া আমার কর্ত্তব্য। হুগলী নদীর বামতীরে অবস্থিত

মিউনিসিপ্যালিটিগুলির জল সরবরাহের পরিকল্পনাসমূহ বিচার করে' দেখবার জন্য প্রথমেই আমি একটি কমিটি নিযুক্ত করলাম। মিঃ উইলিয়মস ছিলেন এ কমিটির প্রধান। এসমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিতে নলকূপ খননের জন্য কমিটি সুপারিশ করল। আমাদের যদি অর্থাভাবের প্রশ্ন না থাকত, তবে অনেক মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলেই এতদিনে তার ব্যবস্থা করা যেত।

মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টটিও ছিল একটি হস্তান্তরিত বিষয়। কিন্তু তাকে নিয়ে আমাকে বেশ কষ্টই পেতে হ'ত। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস বিভাগটির প্রধান ও পদস্থ কর্ম্মচারিদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ ও তাঁদের অনেকের সঙ্গে বেশ সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। যাঁরা সেখানে কাজ করতেন তাঁদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করার মত আমার কিছু ছিল না। বরং তাঁরা ছিলেন আমার ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। আমার সমস্ত অসুবিধার মূলে ছিল আমার কার্য্য নীতি, যে নীতির সঙ্গে আমি ছিলাম জীবনব্যাপী অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। আমি সারাজীবন যা' বিশ্বাস করে' এসেছি, জীবনে প্রধান নীতি বলে' যাকে জেনেছি তাকে মিথ্যা বলে' প্রমাণ না করে' বা ত্যাগ না করে' আমার এই কার্য্যনীতি ত্যাগ করা বা তার সংশোধন করা পর্য্যন্ত সম্ভব ছিল না। আমাদের হাসপাতাল সমূহের পরিচালনার, আমাদের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভের ক্ষতিসাধন ও ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বিভাগটির কর্ম্মকুশলতার কোনরূপ হ্রাস না করে' আমি চেয়েছিলাম বিভাগটিকে যতদূর সম্ভব ভারতীয় দ্বারা পূর্ণ করতে। আমি বিশ্বাস করতাম যে, এতে কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না। এ বিষয়ে লর্ড রোনাল্ডসে ও লর্ড লিটনের যে সমর্থন আমি পেয়েছিলাম তা' আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। এতে তাঁদের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল এবং তাঁদের প্রবল সমর্থন দিয়ে আমাকে সাহায্যও করেছিলেন। আমার বিভাগের কার্য্যোপলক্ষে যে সকল সার্জ্জন-জেনারেলের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম, তাঁরাও যে

আমার নীতির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেছিলেন তাও আমার স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আমার যেটুকু বিচারবুদ্ধি আছে তা' দ্বারা আমি লক্ষ্য করেছি যে, এই বিভাগটিকে ভারতীয় করণের পথে সুনির্দ্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত ভাবে অগ্রসর হবার সময় এসেছে এবং হাসপাতালের কাজের জন্য একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসা ব্যবসায়ী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিতে লাগল। কত দ্রুত গতিতে এবং অগ্রগতির ধাপে ধাপে আমরা আমাদের অভীষ্টের পথে কি ভাবে অগ্রসর হব তা' নিয়েই আলোচনা চলতে লাগল। মতভেদকে বড় করে' দেখার অভিপ্রায় আমাদের কোন পক্ষেরই ছিল না। যেখানে সম্ভব হয়েছে আমরা সহযোগিতা করেছি। যখন প্রয়োজন হয়েছে ভদ্রভাবে ও অকপটে মতদ্বৈধতা করেছি। সর্ব্বপ্রকার গুরুত্বহীন শ্রেণী বা চাকরীর স্বার্থের অনেক উর্দ্ধে ভারতের হিতকে স্থাপিত করে' সেই প্রধান লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য আমরা সকলেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। আমি মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করার পর বঙ্গদেশের সার্জ্জন-জেনারেল মেজর-জেনারেল ডিয়ারের নিকট থেকে আমি যে-পত্র পেয়েছিলাম, তা থেকে আমার সঙ্গে মেডিক্যাল বিভাগের কি প্রকার সম্পর্ক ছিল তা' ধারণা করা যাবে। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।—

২৪৫ নং, লোয়ার সার্কুলার রোড
৬ই জানুয়ারী, ১৯২৪।

প্রিয় স্যার সুরেন্দ্র;

আপনি সর্ব্বদা আমার প্রতি যেইরূপ ধৈর্য্য, সহানুভূতি ও ভদ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সার্জ্জন-জেনারেল হিসাবে আমি আপনার মন্ত্রীর পদ ত্যাগের ফলে আপনার ন্যায় একজন লোকের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করিতে বাধ্য হইয়া দুঃখ প্রকাশ না করিয়া পারি না। অনেক সময়ে হয়ত আমরা সমস্ত বিষয় একই দৃষ্টি-ভঙ্গি দিয়া দেখিতে সমর্থ

হই নাই। তথাপি আমি সর্ব্বদাই মনে করিয়াছি যে, আমরা বিষয় সমূহ খোলাখুলি ভাবে আলাপ আলোচনা করিতে পারিব এবং সাধারণত কোন কোন বিষয়ে একমতও হইতে পারিব। আপনার মত একজন উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, গঠনমূলক, প্রতিভাশালী ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতি-বিদের সঙ্গে যে কার্য্যের সম্পর্ক আমার গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে আমি বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করি। যেই দেশকে আমরা উভয়েই ভালবাসি আপনি দীর্ঘদিন তাহার সেবায় নিয়োজিত থাকুন, ইহাই আমার একান্ত কামনা।

ইতি—

আপনারই একান্ত

বেন. এইচ. ডিয়ারে”

এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, যে তিন বছর আমি মন্ত্রী ছিলাম সে সময় মেজর-জেনারেল ডিয়ারের সঙ্গে আমার যত সংঘর্ষ হয়েছিল অপর কোন সার্জ্জন-জেনারেলের সঙ্গে তত হয় নি। বোধ হয় কোন ইংরেজকে আপনি এক ঘা মারবার পর সে যখন আপনাকে দু'ঘা মারে, তখনই আপনি তার হৃদয় জয় করতে পারবেন। এ রকম ধ্বস্তাধ্বস্তির পরেই বন্ধুত্ব পাকা হয়। আমার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে আমি জেনেছি যে, তার মন পাবার এই হ'ল প্রসস্ত পথ। তাতেই পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।

সে যাই হোক, এরূপ এক বিরাট বিভাগের মধ্যে আমার সারা জীবনের জনমতের সঙ্গে যুক্ত ও তদ্দ্বারা পুষ্ট নূতন নূতন ভাবধারা সঞ্চারিত করবার চেষ্টা ও তার কার্য্য পরিচালনা আমার পক্ষে নিতান্ত সহজ ছিল না। মনে পড়ছে অন্তত একবার এক অস্থায়ী সার্জ্জন-জেনারেল ও আমার মধ্যে বাতাশ বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। বিষয়টি ছিল একজন সিভিল সার্জ্জনের বদলীর ব্যাপার নিয়ে। কোন এক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মতান্তর উপস্থিত হ'লে আমাকেই

তার বিচার করতে হয়। প্রশাসনিক দিক থেকে বিচার করে আমি ম্যাজিস্ট্রেটের মতের সমর্থন করি। এবং আমার মনে হ'ল ওটুকুই যথেষ্ট। সেই সার্জ্জন-জেনারেল কিন্তু নতি স্বীকার করলেন না। আমরা উভয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়তে সম্মত হলেন না। তখন আমি তাঁকে বললাম, "আপনি যদি আমার সঙ্গে এবিষয়ে একমত হ'তে না পারেন, তবে এটি আমার আদেশ বলেই ধরে নিন।" যে মহৎ কর্ম্মের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, তার শৃঙ্খলানীতির অনুসরণে তৎক্ষণাৎ তিনি আমার নির্দ্দেশ মেনে নিলেন। কিন্তু এছিল এক নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী ঘটনা। এবং তারপর আমাদের মনে আর কোন অপ্রীতিকর দাগ লেগে রইল না। আমাদের সম্পর্ক পূর্ব্ববৎ বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে গেল।

আমি কেবল চেষ্টা করেছিলাম একটি বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার আবহাওয়া সৃষ্টি করতে। অফিসে ও অফিসের কর্ম্মচারীদের কাছে আমরা ছিলাম নূতন। এ সবের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোন পরিচয় ছিল না। আমার চেয়ে এদিকে তাদের অভিজ্ঞতা ছিল বেশী। সে তুলনায় তাদের চেয়ে অধিক অভিজ্ঞতা আমার কিছুই ছিল না। আমার কেবল মাত্র এটুকু ছিল যে, পদগৌরবে আমি তাদের প্রধান এবং আমার পেছনে মোটামুটি ভাবে সকলেরই জানা কিছু জনসেবার ইতিহাস আছে। অফিস অনুকূল ছিল। তাদের শুভেচ্ছাকে শক্ত করাই ছিল প্রয়োজন। সর্ব্বদিকেই একটি বিশ্বাসের হাওয়া ছিল। তবে তাকে আরও গভীর ও সুদৃঢ় করতে হ'বে। হারবার্ট স্পেনসারের একখানি বই-এর একটি ছত্র আমার মনে পড়ছে। তাতে তিনি বলেছেন, "তুমি যদি মানুষকে তোমার দিকে টানতে চাও, তুমি তাদের ভালবাস বলে' মনে হ'তে হবে। এবং এরূপ মনে হ'তে হবার শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল, বাস্তবিক ভাবে তাদের ভালবাসা।" আমি আমার অধীনে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত যে-সব কর্ম্মচারী আমার সংস্পর্শে

এসেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের মনেই এ ধারণা সঞ্চার করতে চেষ্টা করেছিলাম যে, আমি তাঁদের বিশ্বাস করি। এবং সে বিশ্বাসের যথাযথ প্রতিদানও আমি পেয়েছিলাম।

তা' ছাড়া আমার মনে এ ধারণাও হয়েছিল যে, এক বিরাট কর্ম্মশালার ঐতিহ্যের মুখোমুখী হয়ে আমি দাঁড়িয়েছি। বহু পুরুষ ধরে' বিচক্ষণ প্রশাসকগণ তার কার্য্যধারা নিয়মশৃঙ্খলা তৈরী ক'রে গেছেন। এ সবকে শ্রদ্ধা করা আমার কর্ত্তব্য। এবং ধীরে ধীরেই সে সব সংশোধন করতে হবে। যে সব ব্যক্তি আমাদের সমালোচনা করতেন তাঁরা এবং এমন কি, আমাদের বন্ধুবর্গও আশা করেছিলেন যে, কার্য্য ভার গ্রহণ করা মাত্রই আমরা মস্ত কিছু করব এবং বিরাট এক পরিবর্ত্তন নিয়ে আসব। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে আমরা কোন সাদা কাগজ সামনে করে' বসি নি যে, যা ইচ্ছা হবে সঙ্গে সঙ্গেই লিখে যেতে পারব। নিজের কোন এক প্রাথমিক নীতিগুচ্ছ সম্বল করেই কোন ব্যক্তি রাজ্যের বিরাট কর্ম্মশালার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারে না। আর প্রশাসনিক কাজের মধ্যে সরাসরি ভাবে তা'কে জুড়েও দিতে পারে না। কাজ যদি শক্ত বা বিতর্কমূলক হয়, তবে তা'কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে নিয়ে আপোষ মীমাংসার ভিতর দিয়ে ও প্রতি ক্ষেত্রে পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিরেখে সেই নীতিগুলির প্রয়োগ করতে হয়। তার ফল সব সময় যে মন্ত্রী বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পক্ষে সন্তোষজনক হয় তা' নয়। জনসাধারণের নিকট তা' হয় আরও কম। যখন প্রগতিশীল কোন ব্যবস্থার কোন অভাগা উদ্যোক্তা সেই ব্যবস্থাকে তার আশা ও আদর্শ থেকে বহুদূরে রয়েছে জেনেও অফিসরূপী বন্দীশালার গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য নীরব থাকতে বাধ্য হয়, তখন আসে হতাশার ভাব এবং নিন্দা হয়ে উঠে অনিবার্য্য। যে সব দেশে বহুকাল যাবৎ পার্ল্যামেণ্টরী ব্যবস্থা চলে আসছে, তারা এ সমস্ত বুঝতে পারে। যেখানে দলীয় সংগঠন ও দলীয় মুখপত্র রয়েছে, সেখানে

জনগণের এক শ্রেণীর সমর্থন সহজেই লাভ করা যায়। সেখানে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে' মন্ত্রীকে বিরুদ্ধ নিন্দার শীতল ও শ্বাসরুদ্ধকারী আবহাওয়ার গ্লানিকর পরিভ্রমণে সময় অতিবাহিত করতে হয় না, যার মধ্যে একমাত্র আপন বিবেকের ভিন্ন অপর কারও প্রশংসার তৃপ্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে তা' হ'ল নামে মাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু সেই হ'ল একমাত্র সান্ত্বনা। একমাত্র আরাম, যা' আমাদের সেই নিরানন্দময় চলার পথে আমরা পেয়ে ছিলাম। আমার পক্ষে আজ তার পরিসমাপ্তি হয়েছে এবং বর্ত্তমান অবস্থা থেকে অতি মাত্রায় পৃথক কোন ব্যবস্থা না হ'লে তার পুনরাবৃত্তি করতেও আমি আর প্রস্তুত নই।

মহাকরণের ভিতরের আবহাওয়া আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রেও তার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে বাধ্য। একজন মন্ত্রী তাঁর অধীনস্থ বিভাগের জন্য মূলনীতিগুলিই কেবল নির্দ্ধারণ করে' দেন। সেগুলি কার্য্যকরী করতে হ'লে আরও বিস্তারিত যে-সমস্ত নিয়মাবলীর প্রয়োজন সে সব প্রস্তুত করেন অফিসের স্থায়ী কর্ম্মচারিগণ। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীতির গঠন ও রূপ নির্ভর করে তারই উপর। বিস্তারিত বিষয়ের বিচার না করে' নিতান্ত আদর্শ নীতিকেও নীতি বলেই গ্রাহ্য করা যায় না। কিন্তু যদিও মহাকরণের অভ্যন্তরে শুভেচ্ছা, সহযোগিতার আগ্রহ, সবই ছিল, তবুও কর্ম্মচারী-চক্রের বাইরে তার প্রতিমূর্ত্তির ছিল ভিন্ন রূপ। দু'একটি ছাড়া বঙ্গদেশের সমস্ত সংবাদপত্র ছিল অসহযোগের প্রেরণায় ভরপুর। এবং মতে ও প্রচারক্ষেত্রে তারা ছিল চরমপন্থী। আমাদের প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল শীতল ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন। শাসন সংস্কার কেবল এক অলীক কল্পনা মাত্র। সে সবের কিছু মাত্র অর্থ হয় না। আমাদিগকে সরকারী কর্ম্মচারী এবং ছলনা আবৃত করবার ও প্রতারণা চিরস্থায়ী করবার জন্য সৃষ্ট এক যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আমলাতন্ত্রী

বলে অভিহিত করা হ'ত। আমাদের প্রতিবাদ, আমরা যে সরকারী কর্ম্মচারী নই সে কথা বুঝাবার চেষ্টা বা ভারত শাসন বিধির স্পষ্ট ভাষার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা সবই বৃথা হ'ল। আমাদের কাজকর্ম্ম যে তাদের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে, তাতেও কোন ফল হল না। আমরা উচ্চ রাজনৈতিক সরকারীপদে অধিষ্ঠিত থেকেই জনসভাদিতে বক্তৃতাদি করতে লাগলাম। সরকারী কর্ম্মচারীরা তা' পারেন না। ভারতসভার সভাপতি এবং কিছু কালের জন্য উত্তর ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদেও থেকে গেলাম। মাত্র সেদিন কেনিয়ার প্রশ্ন নিয়ে বৃটিশ ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের নিন্দা করে' তার অবিবেকোচিত কার্য্যের জন্য ভারত সরকারকে আমি সতর্ক করে' দিয়েছি। কিন্তু কে আমাদের কথা শুনবে ? চরমপন্থী সংবাদপত্রে আমরা "বাদামীরঙের আমলাতন্ত্রীই" রয়ে গেলাম। যারা চোখ থাকতেও দেখবে না, কান থাকতেও শুনবে না, তাদের কাছে বাস্তব ঘটনাই বা কি, আর আর যুক্তিই বা কি ?

আমরা যখন কাজ আরম্ভ করি তখন এই ছিল আবহাওয়া। বার্ক বলেছেন যে, জনসাধারণের মন-মেজাজ যখন বিগড়ে যায় তখন তাকে প্রশমিত করার শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল আপোষ মীমাংসা করা। আমি তাদের খুসী করতে, তাদের সঙ্গে আপোষ করতে সচেষ্ট ছিলাম, তবে যে বিশেষ সফল হয়েছিলাম সে কথা বলতে পারি না। কোন দল যখন বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে কোন একটি নীতির অনুসরণ করে, তখন কোন যুক্তি বা অনুরোধ তাদের কানে যায় না। কিন্তু রাজনৈতিক কর্ম্মীদের অস্ত্রশালায় তা' ছাড়া ত আর কোন অস্ত্র থাকে না। আমিও তা' প্রয়োগ করলাম এবং তা' ছাড়া এক নূতন পথও অবলম্বন করলাম। আমি সংবাদ পত্র সমূহের কাছে আবেদন করলাম তাঁরা যেন জনস্বাস্থ্যের উন্নতির কাজে আমাকে সাহায্য করেন। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে

আমি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে টাউন হলে এক আলোচনা সভায় নিমন্ত্রণ করলাম এবং তার উদ্বোধন ভাষণে বললাম,—

"প্রদেশের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণকে নিমন্ত্রণ করে' এরূপ সভানুষ্ঠানের সরকারী প্রচেষ্টা এই প্রথম।"

তারপর বললাম, "যে গণতান্ত্রিক উৎসাহ ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনমত সংগ্রহ করে' মনোযোগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তৎপ্রতি অগ্রসর হ'তে সরকার উদ্যোগী হয়েছেন, এ হ'ল তারই সূচনা। যে নববিধানের প্রভাত-আলো এদেশে দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে নূতন জনমত সৃষ্টি করে' তাকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত করে' কল্যাণময় ও ফলপ্রসূ পথে এগিয়ে নেওয়াই আপনাদের মহান ব্রত। আপনাদের কর্ম্মক্ষেত্রে এই মহান ব্রতকে সার্থক করে' তুলবার জন্যই আজ আমি এখানে আপনাদের নিমন্ত্রণ করে এনেছি।"

আমার বক্তৃতার পর আলোচনা হ'ল। সংবাদপত্রে তা' নিয়ে মন্তব্য প্রকাশ হ'ল। কিন্তু চরমপন্থীদের মুখপত্রগুলি সহযোগিতার কোন চিহ্নই প্রকাশ করল না।

একই মনোভাব নিয়ে একই উদ্দেশ্যে আমার কার্য্যভার গ্রহণের মাত্র ছ'মাস পরে জনমতের সহযোগিতা কামনা করে' ১৯২১ সালের মার্চ্চ মাসে নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিগণকে নিয়ে কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন সম্পর্কিত একটি বিলের কয়েকটি গুরুতর বিষয়ের উপর আলোচনার জন্য আমি এক সভার আয়োজন করেছিলাম। কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন অনেকদিন পূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল। লর্ড কারমাইকেলের সময় থেকেই বিষয়টি সরকারের মনের মধ্যে ছিল। বাস্তবিক পক্ষে ১৯১৭ সালে একটি বিল আইন সভাতে উত্থাপনও করা হয়েছিল। পরে আবার তা' প্রত্যাহার করা হয়। আমি বিষয়টি হাতে নিয়ে কোলকাতার ও সুযোগ পেলে সমগ্র

প্রদেশের মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থাকে নবপ্রবর্তিত শাসন সংস্কার অনুসারে গঠন করে' তুলবার সঙ্কল্প করলাম। এ নীতি অনুসরণ করে' কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধিত ও বিধিবদ্ধ হবার পর আমি বঙ্গদেশের মিউনিশিপ্যাল ব্যবস্থার সংশোধনের জন্য একটি বিল প্রণয়ন আরম্ভ করলাম। ১৮৮৪ সালের পর থেকে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে' এ ব্যবস্থা চলে' আসছিল এবং ইতিমধ্যে তার বিশেষ পরিবর্ত্তন কেউ করেন নি। এ ক্ষেত্রেও আমি আমার পূর্ব্ব রীতিরই অনুসরণ করলাম। আমি মফস্বল অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিগণকে ডেকে তাঁদের সঙ্গে বসে সংশোধনের বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি আলোচনা করলাম। যতদিন আমি মন্ত্রীপদে ছিলাম ততদিন সমস্ত আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে আমি সমানে এ রীতি অনুসরণ করেছিলাম একথা বলতে পারি।

বরাবরই আমার মনে হ'ত যে, নববিধানে জনগণের সহযোগ আবশ্যক। আমার শক্তিতে যতদূর সম্ভব হ'ত ততটা আমি পাবার চেষ্টা করতাম। যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল, যার সম্পর্কে আমি পূর্ব্বেও বলেছি, তা' না হ'লে আমার চেষ্টার ফল আরও সন্তোষজনক হ'তে পারত। আমার এই নীতি অনুসারে আমি পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের বহু সহর পরিভ্রমণ করি, জিলা বোর্ডের সদস্য ও অন্য অধিবাসীদের সঙ্গে আলোচনা সভায় বসি এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাবলী নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি। কোন কোন ক্ষেত্রে অসহযোগিগণ অসুবিধা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করলে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টার ফলে সে সব ব্যাহত হয়। ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ এমার্সন কোন গোলযোগ যাতে না হতে পারে তা' দেখবার জন্য স্বয়ং ঢাকা থেকে বরিশাল এসেছিলেন এবং অসহযোগের সেই দৃঢ় ঘাঁটিতে কোনই গোলযোগ হয়নি। তাদের প্রচারের ফলে দেশের যুবকেরা অধিক প্রভাবিত হয়েছিল এবং সরকারের নিন্দাতে তারাই ছিল বিশেষ উৎসাহী।

মাত্র পনর বৎসর পূর্ব্বে এই বরিশালেই আমাদের সেই ঐতিহাসিক বরিশাল সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়েছিল। সে সময় বঙ্গভঙ্গ বিরোধের এক খ্যাতনামা বিক্ষোভকারীকে এখানেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই বিক্ষোভের কেন্দ্র ও নায়ক ছিলাম আমি। আমার জয়ধ্বনিতে জনগণ সেদিন গগন বিদীর্ণ করেছিলেন এবং আমার প্রতি তাঁদের সেই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ পাষাণহৃদয়কেও দ্রবীভূত করতে পারত। পনর বৎসর এল আর চলে গেল। আর ইতিমধ্যে অসহযোগ তার কাজ করে গেছে। সরকার ও সরকারের সঙ্গে যুক্ত সকলের বিরুদ্ধে এক তিক্ত মনোভাবের সৃষ্টি করেছে। শাসন সংস্কার এবং তার সমস্ত সত্ত্বা এই মনোভাবকে হ্রাস করতে সমর্থ হয় নি। আমি বরিশালে এসেছিলাম একটি কল্যাণমূলক কাজ নিয়ে। তার মধ্যে রাজনীতির কিছুই ছিল না। আমি এসেছিলাম সরকারের সমস্ত আয়োজন ও সম্বল নিয়ে জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে। কিন্তু এমন যে দুর্লভ বস্তু যার সঙ্গে মানুষের জীবনমরণের সম্পর্ক, তাও যখন সরকার, যে লোকটিকে অনতিকাল পূর্ব্বেও জনগণের মঙ্গলার্থী বলে' বলা হ'ত, এমন একজন মানুষের হাত দিয়ে দিতে অগ্রসর হ'ল, তখন সরকারের সে দান অগ্রাহ্য হ'ল। ভার্জ্জিলের গ্রন্থের এনিয়াসের কথা আমার মনে পড়ে। বলেছে—"গ্রীকেরা হাতে করে উপহার নিয়ে এলেও আমি শঙ্কিত হই"। এ মনোভাব যে সকলের মধ্যেই ছিল তা' নয়। হয়ত সাধারণ ভাবেও সবার মধ্যে ছিল না। তবে স্থানীয় লোকের মনের মধ্যে যে এরূপ একটি ভাব বিরাজ করছিল তা' স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। ১৯১৯ সালে লণ্ডনে থাকতে আমি যখন মিঃ মণ্টেগুকে বলেছিলাম যে, শাসন সংস্কারের জন্য আমাদের দেশের লোকেরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ থাকবে। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "ও বিষয়ে অত নিশ্চিন্ত হবেন না। কারণ, রাজনীতিতে কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই।" এখন সে কথাই আমার মনে পড়ছে। তখন আমি জানতাম না যে,

আমার নিজের ক্ষেত্রেই আমি সে সত্য শীঘ্র উপলব্ধি করতে পারব।

কিন্তু আমার বরিশাল পরিভ্রমণ সম্পর্কে এটিই একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় ছিল না। ভাগ্যের পরিহাসে এক আশাতীত ঘটনা সেখানে ঘটেছিল। ১৯০৬ সালে যখন বরিশাল সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়েছিল তখন মিঃ এমার্সন ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁর আদেশ বলেই আমার গ্রেপ্তার ও অর্থদণ্ড হয়েছিল এবং সম্মেলন ছত্রভঙ্গ করা হয়েছিল। আর এখন বিভাগীয় কমিশনার রূপে তিনিই আমাকে সর্ব্ব প্রকারে সহায়তা করেছিলেন। পূর্ব্বের মানুষটির আজ কি পরিবর্ত্তন।

তিনি ছিলেন একজন আন্তরিকতাপূর্ণ আইরিশ ভদ্রলোক। তাঁর সাহচর্য্যে এসে তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেল। অফিসে তিনি কি প্রকার আচরণ করেন তা' দেখে ভারতে কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে বিচার করা সহজ নয়। অনেক সময় উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে তাঁদের কর্ত্তব্য পালন করতে হয় এবং তার ফলে তাঁদের সম্পর্কে ও তাঁদের প্রকৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে। ১৯০৬ সালে বরিশালে মিঃ এমার্সনের নিকট থেকে বিদায় নেবার সময় তাঁর সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল পরে তাঁকে আরও গভীর ভাবে জানবার পর আমার সে ধারণা সংশোধন করতে হয়েছিল। ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্য হিসাবে আমরা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। তাঁর তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে কিছু আটক-বন্দী ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে তাঁকে তাদের দেখাশুনা করতে হ'ত এবং হয়ত কঠোর সরকারী দৃষ্টি দিয়েই তা' করা হ'ত। মিঃ এমার্সন ছিলেন সেরূপ এক অনমনীয় সরকারী কর্ম্মচারী। কিন্তু সেই বাহ্যিক শীতলতা ও কঠোরতার পশ্চাতে ছিল এক সদয় অন্তঃকরণ, যার মধ্যে বিরাজ করত নির্য্যাতিতদের জন্য করুণা ও তাদের দেশপ্রেম সম্পর্কে এক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, এমন কি, যদি তা' ভ্রান্ত পথগামীও হয়। আমার মনে আছে,

কিরূপ স্পষ্ট ভাষায় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে একবার তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানস্থ এক আটক বন্দীর সততা ও নিঃস্বার্থপরতা সম্বন্ধে আমার কাছে বর্ণনা দিচ্ছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, কাউনসিল চেম্বারে তাঁর এক বক্তৃতা প্রসঙ্গেও প্রকাশ্য ভাবে তিনি তার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে রাওলাট বিল নিয়ে বক্তৃতা করার সময় আমি মিঃ এমার্সনের নাম উল্লেখ করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে ঠাট্টা করে' কিঞ্চিত আমোদ উপভোগ করা। এবং আমরা উভয়ে তা' বাস্তবিকই উপভোগ করেছিলাম। বিলটির মধ্যে কোথাও আসামীকে আপীল করতে দেবার ব্যবস্থা ছিল না। আমার বক্তব্য ছিল যে, আসামীকে আপীল করতে দেবার অধিকার দেওয়া উচিত এবং সে-মর্ম্মে আমি এক সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলাম। আমার যুক্তিকে শক্তিশালী করবার নিমিত্ত আমি বরিশালের ঘটনার উল্লেখ করে' বলেছিলাম যে, সেখানে মিঃ এমার্সন ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট আর আমি আসামী। আমি বললাম, "সেই ম্যাজিষ্ট্রেটই আমাকে ৪০০ টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছিলেন। এখন এ-চেম্বারে, যেখান থেকে আমি বক্তৃতা করছি, তার অতি নিকটেই তিনি বসেন। (মিঃ এমার্সন তখন প্রায় আমার পাশেই বসে ছিলেন। আমি তাঁর দিকে চোখ ফেরালাম)। তাঁর সেই আদেশ হাইকোর্টের বিচারে বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু আপীল করবার ব্যবস্থা যদি না থাকত আর আমার যদি আপীল করবার অধিকার না থাকত, তা' হলে একটি অন্যায়ই করা হ'ত। কিন্তু তার প্রতিকার বা ক্ষতিপূরণের কোনই উপায় থাকত না।" কার সম্পর্কে আমি কথাগুলি বলেছিলাম সে কথা যাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন সে সব সদস্যদের মুখে চাপা হাসি প্রকাশ পেল। সভার শেষে আমি মিঃ এমার্সনের নিকট গিয়ে বললাম, "আশা করি, আপনি কিছু মনে করেন নি"। নিতান্ত ভদ্র ভাবে তিনি উত্তর দিলেন, "মোটেই না; বরং আমি গর্ব্ব বোধ করছিলাম।"

সেই থেকে আমরা উভয়ে খুব অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লাম এবং মন্ত্রী হয়ে আমি যখন ঢাকা গিয়েছিলাম তখম চারদিক থেকে আমি তাঁর প্রশংসা শুনতে লাগলাম। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যানের পদ থেকে মিঃ বম্‌পাস অবসর গ্রহণ করবার পর আমার অধীন উচ্চতম পদগুলির অন্যতম চেয়ারম্যানের পদটি যখন খালি হয়ে গেল এবং ঐ পদ পূরণের যোগ্য পাত্র হিসাবে যখন মিঃ এমার্সনের নাম প্রস্তাবিত হয়ে আমার কাছে এল, আমি তৎক্ষণাৎ সে প্রস্তাব গ্রহণ করে' তাঁকে সে পদে নিযুক্ত করেছিলাম। এ পদে কাজ করতে হলে যেমন কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হ'ত তেমনি তার দায়িত্বও ছিল গুরুতর। কিন্তু আমার মনে হয় মিঃ এমার্সন প্রমাণ করেছেন যে আমার সে নির্ব্বাচন সঙ্গতই হয়েছিল। আমাদের মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশের সমন্বয়ে মিঃ বম্‌পাস যে চমৎকার কাজ আরম্ভ করেছিলেন, সেই একই শক্তি ও দক্ষতা সহ সে কাজ এ যাবৎ চলে এসেছে। এবং যখন প্রতিনিধিদের সম্মেলনে নদীর অপর পারে হাওড়ার জন্য একটি ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গঠনের প্রস্তাব আসে, তখন স্থির হয় যে, কোলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যানকেই নূতন ট্রাষ্টেরও চেয়ারম্যান করা হবে।

আমি যেখানেই পরিভ্রমণে গিয়েছিলাম সেখানেই স্থানীয় অসহযোগিগণ হরতাল পালনের চেষ্টা করেছিলেন। তবে তাঁরা কোথাও বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। ফরিদপুরে এ বিষয় নিয়ে কেউ বিশেষ চিন্তাও করেন নি। কারণ, রুগ্ন শয্যায় শায়িত হয়েও প্রধান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পূর্ব্ববঙ্গের "গ্র্যাণ্ড ওলড্ ম্যান" সুনিয়ন্ত্রিত-ক্রমোন্নতির প্রচারক বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার তখনো জীবিত ছিলেন। অসহযোগীরা উত্তর বঙ্গের দিনাজপুরে লোকজনকে সভা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার বৃথা চেষ্টা করেছিলেন। জনস্বাস্থ্যের প্রতি যে তাঁদের অনাগ্রহ ছিল তা' নয়, তবে সরকার থেকে কিছু গ্রহণ করবেন না বলেই বোধ হয় তাঁরা সঙ্কল্প করেছিলেন। অথচ সরকারী আদালতে আইন ব্যবসা করে

অর্থোপার্জ্জনে তাঁদের আপত্তি ছিল না। সরকারী রেলগাড়ীতে ভ্রমণে তাঁদের আপত্তি ছিল না। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফের ব্যবহারেও তাঁদের আপত্তি ছিল না। কাজেই এ ছিল সুবিধাবাদী অসহযোগ। নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা। আর তারই বহিপ্রকাশ ছিল,—কোন জনসভায় যদি কোন ব্যক্তি তাঁদের নেতাদের মত থেকে ভিন্ন মত প্রচারের সাহস করেন, তবে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা সে সভা পণ্ড করা। আইন সভাতে তাঁদের যাঁরা বন্ধু ছিলেন, তাঁদের ধারণা ছিল যে, এ সমস্ত পরিভ্রমন দ্বারা আমরা সরকারী তহবিল থেকে ভাল রকমের ভাতা পেয়ে থাকি। তা' নিয়ে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে বলা হয়েছিল যে, একমাত্র রেলের ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কিছুই আমরা পাই না। বস্তুত এরূপ ভ্রমণে ব্যক্তিগত কষ্ট, অসুবিধা এবং কিছু ব্যয়ও আমাদের হ'ত। ম্যালেরিয়া সংক্রামিত দিনাজপুরে মশার ভয়ে "নেট ওয়ার্ক" ঘেরা সার্কিট হাউসের একটি ঘরের মধ্যে আমাকে শয়ন করতে হয়েছিল। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমি রক্ষা পাই নি। আমি জ্বরে আক্রান্ত হই এবং তা' থেকে মুক্ত হ'তে আমার বহু মাস সময় লেগেছিল।

আমার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল এমন এক আবহাওয়া সৃষ্টি করা, যাতে স্থানীয় জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যাগুলি নিয়ে আলাপ আলোচনা করে তাদের সমাধান করা যায়। আমি চেয়েছিলাম জনসহযোগ। আমি একথা বলতে পারি যে, আমার এ চেষ্টার ফলে এই নীরস বিষয়েও মানুষের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। আমার ডিপার্টমেণ্টের বিরুদ্ধে যে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করা হয়েছিল তার উত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থনে আমি যে ভাষা ব্যবহার করেছিলাম এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা চলতে পারে। আমি বলেছিলাম,—

"মহাশয়, আমাদের আইন সম্পর্কিত কার্য্যসূচীর আলোচনা থেকে আমাদের বিভাগের কার্য্যকলাপের মধ্যে এসে আমরা কি দেখি? আমার ব্যক্তিগত হিসাবে নয়, নবগঠিত সরকারের পক্ষ থেকেই আমি

বলতে পারি যে, লোক্যালবডিগুলির মধ্যে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা এক নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছি। নূতন প্রাণের সাড়া জাগিয়ে আমরা এক নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি করেছি। বাস্তব কাজ করা অপেক্ষা আবহাওয়া সৃষ্টিতেই আমি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করি। এই আবহাওয়াই চিরস্থায়ী। চিরফলদায়ক। তার গণ্ডীর মধ্যে যারাই আসে তাদের মধ্যে তা' উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চার করে' উন্নতির পথে অগ্রসর হতে শক্তি যোগায়। আমি একথা বলতে পারি যে, মফস্বল অঞ্চলে এরূপ এক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে আমরা সমর্থ হয়েছি। আমার কথা যে সত্য, তার প্রমাণ চান? কেন, মাত্র গত কয়েক মাসের ভিতরেই জল সরবরাহ ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক কাজের জন্য, অসংখ্য বলব না, তবে অনেক, পরিকল্পনা আমাদের এসেছে। তা' থেকে দেখা যায় যে, মফস্বল অঞ্চলে আমাদের দেশবাসিগণ জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমূহের সম্বন্ধে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন। তা' ছাড়া গঙ্গাসাগর মেলার বিষয়ে আমরা কি দেখতে পাই? গত বছরের আগের বছরে প্রায় লক্ষলক্ষ যাত্রী সেখানে গিয়েছিল। তার মধ্যে বিশজন লোক ওলাউঠা রোগে মারা যায়। সে ক্ষেত্রে বর্ত্তমান বছরে মৃত্যুর সংখ্যা মাত্র এক। প্রেরণা দিয়ে দিয়ে আমরা যে প্রভাব সৃষ্টি করেছি, তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হয়ে চব্বিশ পরগণার জিলাবোর্ড সেখানে সমস্ত প্রকার সংক্রমনকেই প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিল। এবার বন্যা বিদ্ধস্ত অঞ্চলের কথায় আসা যাক। সেখানে আমরা কি লক্ষ্য করি? আমার এই বন্ধুবর, রাজশাহীর জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য লোক্যাল বোর্ডগুলি আমাদের কর্ম্মচারীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রোগ প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমগ্র দেশ থেকেই আমরা এরূপ ঘটনার সংবাদ পেয়েছি। ময়মনসিংহের বাজিতপুর ও অন্যান্য অঞ্চলে রোগের সংক্রমন আমরা ব্যাহত করেছি। স্বাস্থ্য বিভাগের সাহায্যে লোক্যালবডিগুলি

আমাদের প্রচার কার্য্য চালিয়ে এদেশের কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করেছে। আমি সে সংখ্যা আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি। ১৯২১ সালে এ প্রদেশে কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৮০,০০০। গত বছরে ছিল ৫০,০০০ মাত্র। আমরা যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছি তার প্রতি লক্ষ্য করুন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রচার চালাবার জন্য, এমন কি, অসহযোগীরাও আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। ডাক্তার বেণ্টলী আজ সকালে আমাকে জানিয়েছেন যে, খিলাফৎ দলের উদ্যোগে কাঁচরাপাড়ায় এক সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে এবং তাঁকে সেখানে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তাঁরা আমাদের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ চেয়েছেন। খিলাফতের লোকেরা এবং অসহযোগীরা আমাদের অর্থাৎ স্বাস্থ্য বিভাগের সাহায্যের জন্য উদগ্রীব। সেই বিভাগের পক্ষে তদপেক্ষা অধিক সফলতা কি আর হতে পারে? এ বিভাগের প্রধানরূপে তজ্জন্য আমি গর্ব্বিত।"

আমার বিভাগের কাজের জন্য জনগণের সহযোগিতা লাভ করাই ছিল আমার নীতির এক প্রধান উদ্দেশ্য। আমি আইন সভাতে বলেছি এবং জনসভাতেও বলেছি যে, কেবল মাত্র জনগণের ও সরকারের যুগ্ম সহযোগিতা দ্বারাই ম্যালেরিয়া নির্ম্মূল করা বা তার প্রকোপ হ্রাস করা সম্ভব। প্রচুর জলের ব্যবস্থা করা ও তার স্রোতের সাহায্যে সমস্ত কিছু ধৌত করার মত প্রধান প্রধান কাজের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। গ্রামাঞ্চলের ময়লা নিষ্কাশন, আবর্জ্জনা পরিষ্কার, স্থানীয়-জলের সরবরাহ সহ জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজগুলি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্যে সম্পন্ন করবার জন্য লোক্যালবডিগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। আমি নিয়মিতভাবে এনীতিরই অনুসরণ করেছি এবং আমাদের বিভাগের ইতিহাসে প্রথম বারের মত প্রচুর পরিমাণ অর্থ ম্যালরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি ও কালাজ্বর এ্যাসোসিয়েশনে অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়েছে। বহুদিন পূর্ব্বে ১৯২১ সালের জুলাই

মাসে, দ্বিতীয়োক্ত সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে, আমি যে এক প্রেস কনফারেন্স ডেকেছিলাম, তাতে প্রথমোক্ত সমিতিটির নাম সুপারিশ করে' কনফারেন্সের অনুকূল দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। এবং ইউনিয়ন, লোক্যাল ও জিলাবোর্ডগুলিকে এসমস্ত স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করেছিলাম। আমার পক্ষে এটি খুবই গর্ব্বের বিষয় যে, আমি এমন এক নীতির প্রবর্ত্তন করেছি, যা' বিকাশ লাভ করলে গ্রামীন স্বাস্থ্যের পক্ষে সুফলপ্রসূ হবে। ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতিগুলি ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করছে। এবং তারা আমাদের গ্রামাঞ্চলের লোকের জন্য এক কল্যাণমূলক কার্য্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে' দিয়েছে, যার ফলে তাদের কেবল যে স্বাস্থ্যেরই উন্নতি হবে তা' নয়, গণচেতনাকেও শক্তিশালী করবে, আর তাদের নাগরিক জীবনকেও উদ্দীপ্ত করবে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান সমূহই জনস্বাস্থ্যের উন্নতির প্রধান সহায়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে আমি সেগুলিকে উদার করে' দিতে ও তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট ছিলাম। লর্ড মর্লে তাঁর এক বার্ত্তায় এই অভিযোগ করেছিলেন যে, লোক্যালবডিগুলি সফল না হবার একটি কারণ এই যে, তাদের হাতে কোন ক্ষমতা নেই। আর তাদের কোন দায়িত্বও নেই। সংবাদ পত্র ও মঞ্চ থেকে আমিও এমতটিই প্রচার করেছিলাম। আমি নিজে যখন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলাম, তখন আমি যেসব বিষয়ের নিন্দা করতাম সেগুলির প্রতিকারে যত্নবান হলাম। লোক্যালবোর্ড সমূহকে সরকারী প্রভাব থেকে মুক্ত করবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বপ্রথমেই আমি নির্দ্দেশ দিলাম যে, বোর্ডদ্বারা নির্ব্বাচিত কোন বে-সরকারী ব্যক্তিকেই বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতে হবে। সেই একই দিকের অপর এক পদক্ষেপ এই ছিল যে, যে কয়েকটি জিলা বোর্ডের নিজেদের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করবার ক্ষমতা ছিল না, তাদিগকেও সে-ক্ষমতা দেওয়া হ'ল। অনেক

মিউনিসিপ্যালিটিও এ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের ক্ষেত্রেও এ অধিকার বিস্তৃত করা হ'ল। লোক্যাল বডিগুলিকে উদার করবার উদ্দেশ্যে এমনি করেই সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে সম্মুখের দিকে পদক্ষেপ করা হ'ল। এ সবই করা হয়েছিল শাসনমূলক আদেশের বলে। কিন্তু আমি তাও ছাড়িয়ে গেলাম। আমি পরপর দুইটি আইনের পরিকল্পনা করেছিলাম এবং তার মধ্যে কেবল একটিকেই আইনে পরিণত করতে পেরেছিলাম। মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানসমূহকে জনপ্রিয় করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। উপরোক্ত পরিকল্পিত আইন দুইটির একটি ছিল কোলকাতার জন্য ও অপরটি ছিল প্রদেশের অবশিষ্ট অংশের জন্য। জোর করে' বলতে পারি যে, দুটি পরিকল্পনাই ছিল প্রগতিশীল এবং দুটিরই মূল ছিল শাসনসংস্কার পরিকল্পনা। ১৯২১ সালে কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল উত্থাপন করে' আমি বলেছিলাম,—

"আমরা এক বিরাট কাজের প্রবেশ পথে এসে দাঁড়িয়েছি। কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল এ-শ্রেণীর একই প্রকার আইন পরিকল্পনাগুলির মধ্যে প্রথম প্রচেষ্টা। এ-আইনের উদ্দেশ্য হবে আমাদের লোক্যাল বডিসমূহকে উদার করে' শাসন সংস্কারের মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সমন্বয় করা।"

আরও বললাম, "বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন ও বঙ্গীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন সংশোধন করে' এ-বিল চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই সরকারের উদ্দেশ্য। শাসন সংস্কারকে সার্থক করে তুলতে হ'লে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের ভিত্তিকে যে সুদৃঢ় করতে হবে, তা' বলা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।"

কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন করতে, বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধনার্থে একটি বিল উত্থাপন করতে ও দু' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন সংশোধনের উদ্দেশ্যে আর একটি ক্ষুদ্র বিল উত্থাপন করতে আমি আমার কার্য্যকালের মধ্যেই

সমর্থ হয়েছিলাম। অধিক অগ্রসর হবার পূর্ব্বে এখানে আমি, বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন যে একটি গুরুতর বিষয়ে বর্ত্তমান আইন থেকে স্বতন্ত্র ভাবে করা হয়েছিল, তার উল্লেখ করব। বর্ত্তমান প্রচলিত আইন অনুসারে একমাত্র কোলকাতা ব্যতীত অন্য সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের এক-তৃতীয়াংশকে সরকার নিযুক্ত করেন। এবং জিলাবোর্ডের সদস্যগণ লোক্যাল গভর্ণমেণ্টের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ ভাবে একজিকিউটিভ আদেশের বলে বিভাগীয় কমিশনার দ্বারা নিযুক্ত হন। আমার পূর্ব্বে লোক্যাল গভর্ণমেণ্টের দ্বারা এ নিয়ন্ত্রণ নামেমাত্র ছিল। আমার মনে হয়েছিল এ নিয়ন্ত্রণকে বাস্তব করতে হ'বে। লোক্যাল গভর্ণমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের প্রতিনিধিরূপী মন্ত্রী যখন আইন সভার নিকট দায়ী, তখন সে দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে হ'লে ঐ সমস্ত পদ পূরণ তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবেই নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। নূতন সংস্কারের ফলেই মন্ত্রীদের এই দায়িত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্ম্মচারীদের সিদ্ধান্তকে আমার অগ্রাহ্য করতে হ'ত। সাধারণত তাঁরা তা' ভাল ভাবে গ্রহণ করেই মেনে নিতেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মতান্তর ও বিরোধও দেখা দিত। আমার দায়িত্ব আমার এই ক্ষমতার ব্যবহারের উপর নির্ভর করত বলে' গভর্ণর সর্ব্বদাই আমার এই ক্ষমতা প্রয়োগের সমর্থন করতেন। একবার শক্ত ভাষা ব্যবহার করে' আমাকে বলতে হয়েছিল যে, নূতন পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করা স্থানীয় কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য এবং সেজন্য তাঁহাদিগকে নিজেদের উপযোগী করে' তুলতে হবে। সাধারণত প্রত্যেকেই এভাবে উপযোগী হয়ে উঠতে প্রস্তুত ছিল। এখানে আমার একথাও বলে রাখা উচিত যে লর্ড রোনাল্ডসে ও লর্ড লিটন উভয়েরই এই মনোভাব ছিল যে, মন্ত্রীগণই সংবিধানগত সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং সে ধারণার পরিপোষকরূপে তাঁরা মন্ত্রীদের কাজে তাঁদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে', তাঁদের উৎসাহ

দিয়ে, তাঁদের সাহায্য করতেন। এ বিষয়ে কখনো কোন গুরুতর মত বিরোধ হয়েছে বলে' আমার মনে পড়ে না। আমি অনুভব করতাম যে, আমার বিভাগে আমি ছিলাম সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং আমার পশ্চাতে ছিল গর্ভর্ণরের ক্ষমতা ও তাঁর সমর্থন। তবে তা' ছিল অর্থদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সময় সময় তা' অতিশয় বিরক্তিকর বলেও বোধ হত। একবার আমার বলতে হয়েছিল যে, আমার বিভাগে অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত হয়েছে কি-না তা' নিয়ে অনুসন্ধান করা অর্থদপ্তরের কাজ মোটেই নয়। তার বিচার করব আমরা এবং অর্থদপ্তর তা' মেনে নিতে বাধ্য। আমাদের প্রস্তাবের অর্থ নৈতিক দিকটাই কেবল তা' বিচার করে' দেখতে পারে। আমি শুনেছিলাম মাদ্রাজ ও অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ অভিযোগ উঠেছিল।

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন সম্পর্কিত বিষয়গুলি আমাকেই তত্ত্বাবধান করতে হ'ত। লোক্যাল গভর্ণমেণ্ট তা' অনুমোদন করতেন। মিঃ বি. এন. শাসমল যখন মেদিনীপুর জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন তখন সে বিষয় নিয়ে আমাদের গুরুতর অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। মিঃ শাসমল ছিলেন একজন বিখ্যাত অসহযোগী। এবং প্রধানত তাঁরই কার্য্যের ফলে মেদিনীপুর জিলার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের বিলোপ সাধন করা হয়। আর এই ইউনিয়ন বোর্ডসমূহই ছিল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতির মৌলিক অংশ। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্রমবিকাশ ও উন্নতির দায়িত্ব ছিল আমার। জিলার মধ্যে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে তাঁর নির্ব্বাচন কি আমার সমর্থন যোগ্য? তা' সমর্থন করা, না করা আইনত ছিল আমারই ইচ্ছাধীন। আমি কি করি না করি দেখবার জন্য সকলের দৃষ্টি আমার প্রতি নিবদ্ধ হ'ল।

অবস্থাটি ছিল অসুবিধাজনক ও অরুচিকর। একটি বিধিবদ্ধ

প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নির্ব্বাচন দ্বারা সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করা একটি গুরুতর ব্যাপার। কিন্তু লোক্যাল গভর্ণমেণ্টের হাতে সে ক্ষমতা যখন রয়েছে তখন উপযুক্ত ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্র কি তার উপযুক্ত? এই ছিল তখন বিচার্য্য বিষয়। এ অবস্থায় আমি এক মধ্যপথ অবলম্বন করলাম যাতে আমি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের স্বার্থও রক্ষা করতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে জিলা বোর্ডের সিদ্ধান্তকেও কার্য্যকর করতে পারি। আমি মিঃ শাসমলকে ডেকে পাঠালাম। আইন সভার সদস্য লেফটেন্যাণ্ট বিজয় প্রসাদ সিংহরায়কে সঙ্গে করে' তিনি এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং তিনি আমাকে কথা দিলেন যে, চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন ও তদনুসারে অপরাপর যে সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে তাদের নীতি ও শর্তগুলি পালন করতে ঐকান্তিক চেষ্টা করবেন। তদ্ভিন্ন আরও জানালেন যে, আগামী কাউনসিল নির্ব্বাচনের পর তিনি ইউনিয়ন বোর্ডগুলি স্থাপনেও সাহায্য করবেন। তার কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে এভাবে নিশ্চিত হওয়ার পর আমার মনে হ'ল, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁর নির্ব্বাচন অনুমোদনে আমার আর কোন বাধা রইল না এবং আমি তাঁকে মেদিনীপুর জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করলাম।

চতুঃত্রিংশতি অধ্যায়

পৌর আইন

আমার মন্ত্রীত্ব কালে পৌর আইন প্রণয়নের মধ্যে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন। অন্যত্র আমি তার ইতিবৃত্ত দিয়েছি এবং দেখিয়েছি যে, একাজ বহুদিন আগেই সম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল। আমি যা' দাবী করছি তা' এই যে আমি পুরাতন সংবিধানগত অংশটি সম্পূর্ণভাবে পুনর্বিবেচনা সহকারে সংশোধন করে' সে স্থানে শাসন সংস্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্যমূলক নূতন আইন সন্নিবেশ করলাম। বাস্তবিক পক্ষে এ আইনের বলে সহরের পৌরশাসন বিষয়ক যাবতীয় কিছুর নিয়ন্ত্রণভার প্রধানত ব্যাপক ভাবে ভোটদানের অধিকার প্রাপ্ত করদাতাগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত করা হ'ল। লক্ষণীয় এই যে, এ সমস্ত সংবিধানগত পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণরূপেই গণদাবী অনুসারে করা হল। তার মধ্যে এমন কতকগুলি আকর্ষনীয় বিষয় আছে যা' সময় সুখকর হ'লে এবং পরিবেশ ভ্রান্তি বা প্রবণতা মুক্ত থাকলে জনগণের নিকট স্বীকৃতি পেত। আজকাল স্বরাজ সম্পর্কে অনেক কিছুই শোনা যায়। আমি বলতে পারি যে, আজ যারা স্বরাজের নামে চীৎকার করছে তারা যখন নিতান্ত শিশু তখনই আমি স্বরাজ পন্থী হয়েছিলাম। ভারতের জননেতাদের মধ্যে আমিই সর্ব্ব প্রথমে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস (ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন) দাবী করেছিলাম, কিন্তু এখানে নূতন আইন দ্বারা গঠিত সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী কোলকাতার পৌর বিষয়ের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে যথার্থ স্বরাজ। একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, পৌর কোলকাতায় যে কর আদায় হয় তার পরিমান সমগ্র বঙ্গদেশের রাজস্বের এক পঞ্চমাংশের সমান। নূতন আইন অনুসারে এই অর্থের নিয়ন্ত্রণের

অধিকার থাকবে গণপ্রতিনিধিদের। কর্পোরেশনের চার-পঞ্চমাংশ সদস্য হবেন করদাতাগণের দ্বারাই নির্বাচিত। এবং এখানে তাঁরাই হবেন সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। তাঁদের চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসার (প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ ভাবে তাঁদের দ্বারাই নির্বাচিত হবেন। মেয়র হবেন "স্পীকার অব দি হাউস" এবং তাঁর চাকরীও হবে গণনির্বাচন সাপেক্ষ। ভোটদানের অধিকারকে ব্যাপক করে', একাধিক ভোটদানের অধিকার বিলোপ ক'রে ও স্ত্রীলোক দিগকেও ভোটদাতাগণের তালিকাভুক্ত করে' কর্পোরেশনের গঠন প্রণালীকে গণতন্ত্র মূলক করা হয়েছে।

এ সবই বিশেষ অগ্রগতির লক্ষণ। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রথার প্রবর্তনের জন্য যে-চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলি নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে আক্রমন করেছিলেন, এ সমস্ত উন্নতির জন্য তাঁদের মুখ থেকে একটি প্রশংসা বাক্যও বাহির হয় নি। বাস্তবিক সত্যের চরম অপলাপ করে' তাঁরা একবারও ভাবলেন না যে, প্রথমে আমি যখন বিলটি উত্থাপন করেছিলাম তখন তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি কথাও ছিল না। বরং ১৯১৭ সালে লর্ড সিংহ যে বিল প্রস্তুত করেছিলেন, তার মধ্যেই তাকে স্বীকার করে' নেওয়া হয়েছিল। আমিই ইচ্ছা করে' তা' বাদ দিয়েছিলাম। আমি তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছিলাম। মিউনিসিপ্যাল আইনের মধ্যে যাতে তাকে স্থায়ী করা না যায়, সে উদ্দেশ্যে অবশেষে তাকে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করতে আমি সম্মত হয়েছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 'নেমেসিস্' তাকে ছাড়তে পারল না। স্বরাজ্যদল এক হিন্দু-মুসলমান চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। তাঁরা প্রস্তাব করলেন যে, এই সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপক করে' বঙ্গদেশে যে একশষোলটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে তাদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। তাঁরা চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য। অথচ বোধ হয় ভেবেছিলেন যে,

মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগহীন করে' প্রকৃত পক্ষে তাদের ভোটদানের অধিকারের ক্ষেত্রে তাদের বিচ্ছিন্ন করে' পরস্পরের সহযোগিতা থেকে তাদের বঞ্চিত করতে পারলেই তা' সহজ সভ্য হবে। কর্পোরেশনের চাকরীর ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক নীতির ভিত্তিতে লোক নিযুক্ত করে তাঁরা তাঁদের কাজ আরম্ভ করেছেন। যে কোন দেশভক্ত ভারতবাসী ভারতের জাতীয়তা গঠনের পক্ষে মারাত্মক অন্তরায় বলে এ প্রথাকে তীব্র নিন্দা করে।

সে যাই হোক, আমার জীবনের একটি স্বপ্ন কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ভিতর দিয়ে সফল হয়েছে। ১৯২১ সালে যখন আমি এটি উত্থাপন করি তখন বলেছিলাম,—

"১৮৯৯ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর এই ছিল আমার শেষ কথা। বিশ বছর এসেছে ও চলে গেছে। সেদিন আমি এই আশা প্রকাশ করেছিলাম এবং ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম যে, যে-নগরে আমার জন্ম হয়েছিল অদূর ভবিষ্যতে সে নগরে এমন একটি সময় আসবে, যখন বরদানরূপে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের আশীর্ব্বাদ তার উপর বর্ষিত হবে। আজ সে-সময় উপস্থিত হয়েছে। আমার জীবদ্দশাতেই তা' দেখবার আমার সুযোগ হ'ল। এবং আমি নত জানু হয়ে ভগবানকে তজ্জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমার এবার যেতে হবে বলে আমি চিৎকার করব না। কারণ, আমার মনে হয় আমার জীবনের কাজ এখনো শেষ হয় নি। কিন্তু আমি একথা বলব যে, আমার যে বিশ্বাস ছিল এবং যার অনির্ব্বাণ শিখা এখনো আমার মধ্যে সমুজ্জ্বল, আজকের এই কার্য্যাবলী তারই সত্যতা প্রমাণ করেছে। আমার এই বিশ্বাস আমার কোটিকোটি দেশবাসীর অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে' তাঁদের হৃদয়ে ধৈর্য্যের সঙ্গে, বৈধভাবে, শান্তিতে ও বর্ত্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কোন প্রকার গোলযোগ সৃষ্টি না করে, আমাদের সম্রাট ও যুক্তরাজ্যের পার্ল্যামেন্ট যে-স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং মানবজাতির বিকাশের পথে বিধাতার বিধানে

যা' আমাদের জন্য আমাদের ভাগ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে, তা' লাভ করবার জন্য কর্ম্ম প্রেরণার সঞ্চার করুক, এই আমার কামনা।"

এ বিল গ্রহণের প্রস্তাব করবার সময় আমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম তার উপসংহারটি এখানে আমি উদ্ধৃত করছি,—

"এই বিল আমার পক্ষে এক ব্যক্তিগত সান্ত্বনা ও গর্ব্বের বিষয়। আমার নিকট এর অর্থ হল আমার জীবনের একটি স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ১৮৯৯ সাল থেকে আমি এই আশা নিয়ে বসেছিলাম যে, আমার জন্মস্থান এই সহরকে মুক্তির পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে পুনর্জীবন লাভ করতে দেখবার সুযোগ আমি পাব। ভগবানকে আমি এই বলে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে, তিনি অনুগ্রহ করে' এ সাধনায় সিদ্ধি লাভে কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহণের সুযোগ আমাকে দিয়েছেন। আমি সমগ্রজীবন যে সমস্ত নীতি প্রচার করেছি, যার উদ্দেশ্যে কাজ করেছি ও যা' অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আমার মনকে ভরে দিয়েছে, আমি সে সমস্ত নীতিকে এ বিলের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছি। সচরাচর আমার বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা অপবাদ ও কলঙ্ক রটনা করা হয় আমার এ বিল তারই যথার্থ প্রতিষেধক। বিতর্কের সময় অনেক কঠোর মন্তব্য আমার প্রতি করা হয়েছে, অনেক আঘাত আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। আমি আশা করি, সে সব আমরা ভুলে যে-মহান কাজ সম্পন্ন করতে আজ আমরা সমর্থ হয়েছি, আসুন অন্য সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে, যাঁরা আমাদের নিন্দা করেছেন তাঁদের ক্ষমা করে', তাঁদের প্রতি সহনশীলতা ও সদয় মনোভাব নিয়ে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমরা এই কক্ষ থেকে বাহির হয়ে পড়ি। (হর্ষ ধ্বনি)। আমি কোলকাতার নাগরিক বৃন্দের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি তাঁরা যেন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে একাজকে সফল করে' তুলেন। একাজ যখন সফল হবে তখন তাঁরা দেখতে পাবেন তা' হয়েছে তাঁদের নাগরিক মনোভাবের এক গৌরবময় কীর্ত্তিস্তম্ভ। যে পূর্ণ

স্বায়ত্তশাসন অধিকার আমাদের সকলেরই কাম্য তা' লাভ করবার যোগ্যতা যে তাঁরা অর্জ্জন করেছেন, তা' হবে তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এবং এই আইন সভা ও পরবর্তী আইন সভাগুলির কঠোর পরিশ্রমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। (হর্ষ ধ্বনি)। কোন দলগত মনোবৃত্তি যেন আমাদের এই মহান উদ্দেশ্যকে বিফল করতে না পারে।"

এ বিলের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সহরতলীর এক বৃহৎ অংশকে কোলকাতার অন্তর্ভুক্ত করে' সহরের প্রসার সাধন করা। আমার নিজ নির্ব্বাচনী কেন্দ্রও ছিল তারই একটি অংশ। এরূপ ক্ষেত্রে তৎপূর্ব্বে যে নীতি অবলম্বন করা হ'ত তার ব্যতিক্রম করে আমি সে সমস্ত অঞ্চলের জন্য এক বিশেষ সুবিধা আদায় করেছিলাম। যে-সকল অঞ্চল তখন সহরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কোলকাতা সহরের সুযোগ সুবিধা ভোগ করার সম্ভাবনা তাদের করদাতাদের কিছুকাল ছিল না। সুতরাং সহরবাসীদের ন্যায় তাদের নিকট থেকেও সমান সমান হারে মিউনিসিপ্যাল কর আদায় করা অন্যায় ও অযৌক্তিক হ'ত। সরকার এ প্রস্তাবের সারবত্তা উপলব্ধি করে' তা' গ্রহণ করলেন। এবং আইন সভাও তাতে তাঁদের মৌন সম্মতি দিয়েছিলেন। প্রথম বছর কোন বর্দ্ধিত হারে কর দেবার তাঁদের প্রয়োজন হয় নি। পরবর্ত্তী চার বছর কর্পোরেশনের ইচ্ছা অনুসারে তাদের জন্য পৃথক পৃথক হারে কর ধার্য্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সহরতলী অঞ্চলকে কোলকাতার অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে আমি এক সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করেছিলাম। প্রথমে যখন বিল প্রস্তুত হয় তখন কেবল মাত্র একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল ভিন্ন অপর কোন অঞ্চল যুক্ত করবার প্রস্তাব তার মধ্যে ছিল না। কারণ, তাতে আমি এক গণতন্ত্র-মূলক নীতির অনুসরণ করে' সঙ্কল্প করেছিলাম যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহরের সীমা কিছুতেই বিস্তৃত করা হবে না। তাদের স্থানীয় প্রশাসন সম্পর্কিত বিষয়ে জনগণের প্রতি কতকগুলি বাকশক্তিহীন

পশুর মত আচরণ করে' তাদের পরিচালিত করা চলতে পারে না। বঙ্গভঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানতাম, জনমতের বিরুদ্ধে সীমা পরিবর্ত্তন করতে গেলে কি প্রকার ক্ষোভের সঞ্চার হয়ে থাকে। কোলকাতা ও সংশ্লিষ্ট পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল সমূহের জনস্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে এ অঞ্চল সমূহকে কোলকাতার সীমার অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য অবিরত দাবী আসতে লাগল। অবশেষে সীমা নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে য়্যাডভোকেট জেনারেলকে সভাপতি করে' ও আর দুজন সদস্যের মধ্যে সন্দেহাতীত ভাবে নিরপেক্ষ একজন ইউরোপীয়কে নিয়ে আমি একটি বাউণ্ডারী-কমিশন নিযুক্ত করবার সঙ্কল্প করলাম। যাঁদের নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়েছিল জনগণ তাঁদিগকে এবং তাঁদের রিপোর্টকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। আমি তাঁদের রিপোর্ট গ্রহণ করলাম এবং আইন সভাতেও তা' গৃহীত হ'ল। আইনসভা কমিশনের রিপোর্টের বহির্ভূত একটি অঞ্চলেরও নাম যুক্ত করে দিল। জনমত ও স্থানীয় লোকের মনোভাব মোটামুটি ভাবে এ অঞ্চলটিকেও যুক্ত করার বিষয় সমর্থন করল। সহরের সীমা বিস্তৃতির প্রশ্ন নিয়ে আইন সভাতে আমি আমার নীতি বুঝিয়ে দিলাম। আমি আশা করেছিলাম যে, ভবিষ্যতে আমার পদে যাঁরা অধিষ্ঠিত হবেন তাঁরা ও তৎকালীন সরকার আমার এ নীতি অনুসরণ করে' কাজ করবেন। আমি বলেছিলাম,—

"আমার মনে হয় যত বছরের পর বছর যাবে, কোলকাতার পৌর সীমাও ততই বিস্তৃত হবে এবং এভাবে বিস্তৃত হতে হতে এক সময়ে ব্যারাকপুর পর্য্যন্ত তার সীমার ভিতর এসে পড়বে। ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম রাস্তাসমূহের অন্যতম যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, তার উভয় পার্শ্বে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিউনিসিপ্যালিটি গড়ে উঠবে। সে সমস্ত বড় বড় প্রতিষ্ঠান ময়লা নিষ্কাশন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও জলসরবরাহের মত বৃহৎ বৃহৎ প্রশ্ন নিয়ে কাজকর্ম্ম করে' তাদেরই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবে এবং লোক্যালবডিসমূহ এ সমস্ত ছোটখাট স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির

তত্ত্বাবধান করবে। ভবিষ্যতের কোলকাতা সম্পর্কে এই হ'ল আমার ধারণা। আমার বিশ্বাস, আমি আজ যে-পদে অধিষ্ঠিত আছি, আগামী দিনে অন্য কোন এক ব্যক্তি এপদে এসে এ স্বপ্নের সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করবেন। যে-হর্ম্য নির্ম্মানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্য আজ আমরা এই সভাকক্ষে মিলিত হয়েছি, বছরের পর বছর সে-হর্ম্য বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হ'তে থাকবে। তবে তা' হবে ধীরে ধীরে ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে।"

মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কে লেখা শেষ করার পূর্ব্বে আমার বোধ হয় জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, এটিই এখন দেশের আইন এবং কোলকাতা পৌর শাসন সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সে অনুসারেই পরিচালিত হয়। একথাও গোপন করা অনাবশ্যক যে, এ আইন অনুসারে পরিচালিত কাজকর্ম্ম লোকে এক মিশ্রমনোভাব নিয়েই লক্ষ্য করছে। যে সকল ব্যক্তি এ সহরের সমৃদ্ধিতে প্রধানত সাহায্য করেছেন এবং এ সহরের উন্নতি অবনতির সঙ্গে যাঁদের স্বার্থ জড়িত, এ আইন তাঁদের মনে এক আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে। এশিয়া মহাদেশে কোলকাতা এক বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্র। বহুদেশের ও বহুজাতির প্রতিনিধিদের স্বার্থ তার সাথে জড়িত। এক বিরাট হিন্দু জন সমষ্টিরও আবাস স্থল এই কোলকাতা। কর্পোরেশনে লোক নিযুক্ত করা বিষয়ে এই প্রথমবার সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসরণ করা স্থির হয়েছে। তার ফলে হিন্দুদের মনেও এক ভীতির সঞ্চার হয়েছে। পৌরশাসনকে রাজনৈতিক সংগ্রামের রণক্ষেত্রে পরিণত করা কিছুতেই উচিত নয়। যদি তা' করা হয় তাতে যথেষ্ট ভয়ের সম্ভাবনা আছে। জন কল্যাণের পরিবর্ত্তে দলের প্রভাব বৃদ্ধিই তখন নাগরিক প্রয়াসের উদ্দেশ্য হয়ে উঠবে। লোকের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, দলস্বার্থ পূরণের অভিপ্রায়ে নূতন আইনের মূল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করা ও তার কল্যাণমূলক বিষয়গুলির অপপ্রয়োগ করা হচ্ছে।

স্বরাজ্য দল কর্পোরেশনের অধিকাংশ আসন অধিকার করেছে এবং অনেকে মনে করে সেগুলি এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করছে। এরূপ হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। পৃথিবীর কোথাও তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু তাকে ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না। মানুষের কাজকর্ম্ম পরিচালনার মধ্যে যা' কিছু সঙ্গত, যা' কিছু ন্যায্য তাই বিজয়ী হয়। সে পথ থেকে বিচ্যুত হ'লে তা' হয় জনস্বার্থের পক্ষে মারাত্মক এবং অবশেষে তা' প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে দলকেই ফিরে আঘাত করে। শক্তি দেওয়া হয় ন্যায়পরায়ণকে। এবং ন্যায্য কর্ম্মের সুবর্ণপথ থেকে যে পর্য্যন্ত সে ভ্রষ্ট না হয় সে পর্য্যন্তই সে শক্তি তার অধিকারে থাকে। এই হ'ল সমস্ত ইতিহাসের শিক্ষা। যারা ক্ষমতাসীন হয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠে তারা এই দেওয়াল লিখনকে অবজ্ঞা করে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও যে কোন মূলীভূত প্রাকৃতিক নিয়মের মত তা' অপ্রতিরোধ্য ভাবে আপনার কাজ করে যায়।

এই নূতন শাসন ব্যবস্থার সর্ব্বপ্রধান ভুল হয়েছিল মিঃ সি. আর. দাসকে মেয়র নিযুক্ত করা। মিঃ দাসের দক্ষতা, কার্য্যকুশলতা ও বিচারবুদ্ধির উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। সেজন্যই তাঁর মত একজন ব্যক্তি যে কি প্রকারে এরূপ বিরাট ভুল করলেন সেটি আমার কাছে অবোধ্য। যাঁরা নিরপেক্ষ দর্শক তাঁদের মনে হবে এসব হ'ল ক্ষমতামত্ততারই কুফল। মেয়র হলেন একজন অত্যন্ত মর্য্যাদাসম্পন্ন ও দায়িত্বশীল কর্ম্মচারী। কর্পোরেশনের কাজ করে করে যিনি এবিষয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং নাগরিক হিসাবে যিনি সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেন তাঁকেই সাধারণত এপদে অধিষ্ঠিত করা হয়। কোন গ্ল্যাডষ্টোন, পামারষ্টোন বা ডিসরেলীকে কখনো এপদ দেওয়া হয় নি। এ পদ হ'ল নগর-সেবকের খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রশংসাসূচক স্বীকৃতির নিদর্শন। মিঃ সি. আর. দাসের সমগ্র জনসেবামূলক কর্ম্মজীবনে কোনদিন তিনি কোন কর্পোরেশনের ত্রিসীমানায় প্রবেশ করেন নি।

৩৭

অথচ যে-হেতু তিনি ক্ষমতাসীন দলের নায়ক সে-হেতু পৌর কর্ম্মে তাঁর সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, হঠাৎ তাঁকেই একদিন মেয়রের আসনে অধিষ্ঠিত করা হ'ল। মিঃ দাস অপেক্ষা যোগ্যতর বহু নাগরিকের প্রতি অবিচার করে' এর চেয়ে অযোগ্য মনোনয়ন আর কি হ'তে পারত? মিঃ সি আর. দাস যে-প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য ডাক দিয়েছেন, সে-প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদগুলি পূরণ করার ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি কি হবে?—দলগত মনোভাব, না-কি ন্যায় বিচার?

কর্পোরেশনের কার্য্যাবলীর নিয়মাবলী প্রনয়ণ ও শাসনকার্য্য পরিচালন এদুটি বিষয়কে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখবার নীতির উপর জনসাধারণ ও কর্পোরেশনবিল প্রণেতাগণ যেরূপ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন অপর কিছুর উপর সেরূপ নয়। কিন্তু মিঃ দাস ও স্বরাজ্য দলের সংখ্যাধিক্য যে নীতিকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বর্জ্জন করেছিলেন আবার সে-নীতিতেই ফিরে গেলেন। কর্পোরেশনের সভাপতির কার্য্য থেকে কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মচারীর কার্য্যকে এবং এদুটি পদকে পরস্পর থেকে পৃথক রাখবার জন্য মিউনিসিপ্যাল আইনের মধ্যে স্পষ্টভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু মিঃ দাস কার্য্যত দুটি পদকে একত্র করে ফেললেন। পদ মর্য্যাদা বলে তিনি হলেন কক্ষের স্পীকারের তুল্য এবং কার্য্যত শাসনকার্য্য পরিচালনারও বাস্তবিক সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি এই যে ব্যবস্থা প্রচলন করলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়রও সে নীতির অনুসরন করলেন। এবং তদনুসারে কোলকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের মধ্যে একজন ফকিরের শবদেহ কবরস্থ করবার পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। এঘটনার ফলে মানুষের মনে এক সাঙ্ঘাতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। হাউস অব কমন্স-এর স্পীকার বিনা অধিকারে অন্যায় ভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করে' বসবেন এমন কথা কেউ কি কখনো শুনেছে? সম্প্রতি কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনার

ফলে এ বিষয়টি শেষ করার পূর্ব্বে আমি আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

মিউনিসিপ্যাল আইনে বলা হয়েছে যে, কমিশনারেরা নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হবার পর তাঁরা প্রথম সভায় মিলিত হয়ে যে পাঁচজন ব্যক্তিকে 'অলডারম্যান' নির্ব্বাচিত করবেন, সে পাঁচজন ব্যক্তিকেই 'অলডারম্যান' নিযুক্ত করা হবে। ইংরেজী প্রথার অনুকরণেই এই নূতন ব্যবস্থাটি করা হয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল কর্পোরেশনের মধ্যে এমন কয়েকজন প্রবীন ব্যক্তির জন্য আসনের ব্যবস্থা করা, যাঁরা নির্ব্বাচনের ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক হবেন না, অথচ যাঁদের পরামর্শ কর্পোরেশনের পক্ষে উপকারী হবে এবং যাঁদের উপস্থিতিতে কর্পোরেশনের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাবে। বিলের উপর কর্পোরেশন যে রিপোর্ট দিয়েছিল তার মধ্যে সুপারিশ ছিল যে, 'অলডারম্যান'দের মনোনয়ন যেন কেবল মাত্র মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আমিই মনোনয়নের সেই নীতিকে আরও প্রশস্ত করে ব্যবস্থা করে' দিয়েছিলাম যে, কর্পোরেশন যে-কোন ব্যক্তিকে 'অলডারম্যান' নির্ব্বাচিত করতে পারবে। বিষয়টি নিয়ে যখন আলোচনা হয়েছিল, আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে, কর্পোরেশনের প্রস্তাব অনুসারে 'অলডারম্যান' মনোনয়নের ব্যাপারটা যদি কেবল মাত্র কমিশনারদের মধ্যেই সংকীর্ণ করে' রাখতে হয়, তা' হ'লে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁদের ন্যায় অন্যেরা তা' থেকে বাদ পড়ে যাবেন। আমার সহকর্ম্মিগণ আমার মত সমর্থন করলেন। বিলটি উত্থাপনের সময় আমি বললাম,—

"সমাজের মধ্যে চিরকাল এমন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি থাকেন যাঁরা তাঁদের মানসিক প্রকৃতি ও আজীবন অনুসৃত স্বভাবের দরুণ কোন গণনির্ব্বাচনের ঝুঁকি নিতে ও অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে অনিচ্ছুক থাকেন। কিন্তু এঁদের উপস্থিতিতে কর্পোরেশনের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও তাঁদের পরামর্শ তার বিচারবুদ্ধিকে অধিকতর শক্তিশালী করবে।

যেরূপ ব্যক্তির কথা আমি বলছি, ইচ্ছা করলে আমাদের সমাজের ভিতর থেকেই এরূপ লোকের নামও আমি উল্লেখ করতে পারতাম। কিন্তু বিষয়টি এতই স্পষ্ট যে, আমার যুক্তির সমর্থন করবার জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম করার প্রয়োজন হয় না। এ অবস্থায় এ প্রকার লোকদের জন্যও কর্পোরেশনে স্থান হওয়া দরকার। কর্পোরেশনের নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের ন্যায় কোন এক বিশেষ ধরণের সীমিত নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর উপর যদি তাঁদের ন্যায় ব্যক্তিদের নির্ব্বাচনের ভার অর্পিত হয়, তাতেই এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারবে।"

আমি পরিষ্কার জানি যে, আইনের ব্যাখ্যা করবার জন্য আইন-সভায় কি আলোচনা হয়েছিল তার উপর নির্ভর করা চলে না। তবে তা' থেকে আইন প্রণেতাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্তত একটি ধারণা পাওয়া যায়। সে যাই হোক, আমি যে-নীতির উল্লেখ করেছি তার অনুসরণ করাই হ'ল সকল দেশের রীতি। অথচ স্বরাজ্যদল সে-নীতিকেই অবজ্ঞা করল। যে সমস্ত যুবক সহজেই আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত, সম্ভবত যে-হেতু তাঁরা ছিলেন স্বরাজ্যদল ভুক্ত সেজন্য তাঁদিগকেও 'অলডারম্যান' নিযুক্ত করা হ'ল। যোগ্যতর লোকের অভাব ছিল না। এবং তা' করা হ'লে করদাতাদের স্বার্থ রক্ষা হ'ত, আর আইনসভার উদ্দেশ্যও অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হত। তবে তাতে আমি নিরাশ হই নি। এক মাঘে কখনো শীত যায় না। গণতন্ত্রকৃত কোলকাতা এক অভিনব প্রতিষ্ঠান। যে-সমস্ত পরিবেশ গণতন্ত্রের সাফল্যের পরিপোষক তাদের ক্রমশ সৃষ্টি করতে হবে। সে সব এখন প্রস্তুতির পথে। সে সমস্ত পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে। গণবিবেক যখন জাগ্রত হবে, তখন তার অপ্রতিরোধ্য শক্তির প্রভাবে গণতন্ত্রের মুখোসাবৃত আধুনিক কালের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থায় সুসজ্জিত সাময়িক এই স্বৈরাচারিতার অন্যায় ক্রিয়াকলাপ

সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কোন প্রবঞ্চনা, মিথ্যাপ্রচার অথবা বাকচাতুর্য্যই তখন তাকে বাধা দিতে বা ধ্বংস করতে সক্ষম হবে না। কোলকাতার কার্য্য পরিচালনায় গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠ। তা'কে বহু ঝড়ঝাপটার সম্মুখীন হ'তে হবে। তবুও তা' সবকিছু কাটিয়ে উঠবে। এক ক্ষীয়মান স্বৈরাচারিতার মন্থর প্রভাবে অবরুদ্ধ হয়ে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে শৈশবে সে যে সংগ্রাম করছে, তার ফলে তার স্নায়ু দৃঢ়তর হবে এবং তাকে ভবিষ্যৎ সাফল্য লাভের যোগ্য করে' তুলবে। এ সাফল্যের উদ্দেশ্য হ'বে কোন দল বা ঘোঁটকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা নয়, তা' হবে মানুষের কর্ম্মের ভিতর দিয়ে মানবকল্যাণে কোলকাতায় নাগরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

১৯২৩ সালের ৭ই মার্চ্চ কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল আইন সভায় পাশ হ'ল। কিন্তু তা' আইনে পরিণত হবার শেষ স্তরে উপস্থিত হবার পূর্ব্বেই বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনটি সংশোধন করবার উদ্দেশ্যে আমি একটি সংশোধনী বিল প্রস্তুত করলাম। ১৯২৩ সালের ১৬ই আগষ্ট আমি তা'কে আইন সভায় উত্থাপন করলাম। গঠনের দিক থেকে তা'কে তৎকালীন আইনের তুলনায় অনেক উন্নতমানের করা হয়েছিল। তার কার্য্যপরিচালনা সম্পর্কিত ব্যবস্থা সমূহ স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে মিউনিসিপ্যালিটির হাতে অনেক ক্ষমতা অর্পণ করেছিল। বাস্তবিক পক্ষে ইংলিশ আইনে 'লোক্যাল গভর্ণমেণ্ট বোর্ড'-এর হাতে যে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার বিধান আছে তার তুলনায় এই সরকারী নিয়ন্ত্রণবিভাগের ক্ষমতার কঠোরতা অনেক কম। যে-ভাবে বিলটিকে আমি আইন সভায় উপস্থিত করেছিলাম, তা' ছিল প্রগতিশীল; কোন বৈপ্লবিক ব্যবস্থা তার মধ্যে ছিল না। তা' ছিল পুরাতন ভিত্তির উপরেই রচিত। তবে তাকে আমরা আরও ব্যাপক এবং আরও উদার করেছিলাম। মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের সমগ্র সংখ্যার মধ্যে নির্ব্বাচিত সদস্যের

সংখ্যা বর্ত্তমান দুই-তৃতীয়াংশ থেকে তিন-চতুর্থাংশ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চার-পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হ'ল। চেয়ারম্যান অথবা সমস্ত কমিশনার মণ্ডলীকেই মনোনয়ন করে' নেবার যে প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, কেবল শিল্পকেন্দ্রের মিউনিসিপ্যালিটিতে ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্রই সে প্রথা বাতিল করা হ'ল। শিল্পকেন্দ্রের প্রান্তভাগে যদি শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কহীন লোকের বসতি থাকে, তবে তাদের জন্যও এক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনী কেন্দ্র সৃষ্টি করে তাদের নিজস্ব নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিকেও মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সমস্ত অভ্যন্তরস্থ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা শিথিল করে' মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত করে' বাহির থেকে তা' ব্যবহারের ব্যবস্থা করাই ছিল সমস্ত বিলটির উদ্দেশ্য। ১৮৮২ সালের মে মাসে লর্ড রিপনের প্রস্তাব ও ১৯০৮ সালের লর্ড মর্লের জরুরীবার্ত্তার এই ছিল মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এসকল ব্যবস্থা প্রগতিশীল হওয়া সত্ত্বেও, আমি লক্ষ্য করেছি, যে হেতু জনস্বার্থের প্রয়োজনে প্রয়োগ করবার জন্য সরকারের হাতে কিছুকিছু নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা রেখে দেওয়া হয়েছে, সে হেতু তাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র দলগুলির মধ্যে এমন সমস্ত অসুবিধাজনক ও সূক্ষ্ম প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে, তখন তা' থেকে দূরে বসে' নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করবার ক্ষমতাসম্পন্ন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। এ সমস্ত সমালোচকেরা ভুলে যান যে, বিলাতে যেখানে জনসাধারণের সকলেই প্রায় একই প্রকৃতির এবং যেখানে স্থানীয় কলহবিবাদ এদেশের তুলনায় অনেক সহজেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়, সে দেশেও এখানকার চেয়ে অধিক ক্ষমতা স্থানীয় সরকারী বোর্ডের হাতে সংরক্ষিত থাকে।

এ ছাড়া আরও এক ধরনের সমালোচনা এবিলের বিরুদ্ধে করা হয়। আইনসভার জনৈক মুসলমান সদস্য এ বিল উত্থাপনে বাধা দিয়ে

বিল সম্পর্কে আপত্তি জানালেন যে, "সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নীতি এবিলের মধ্যে গ্রহন করা হয়নি।" আমি আমার এদোষ স্বীকার করে' নিচ্ছি। এ নীতির সমর্থন করা ও সাম্প্রদায়িক প্রথার পরিপোষক হিন্দু-মুসলমান চুক্তির সহায়ে তাকে বঙ্গদেশের সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলির মধ্যে বিস্তৃত করার ক্ষমতা স্বরাজ্যদলের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ইতিমধ্যে তার উপকারিতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হ'তে না পারায় আমি পুরাতন পথ ধরে' চলবার ও আমাদের স্থানীয় সংস্থাগুলির গঠনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রথা প্রবর্ত্তনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করার সঙ্কল্প করলাম। এসমস্ত মিউনিসিপ্যাল বিলের কথা শেষ করার পূর্ব্বে আমি আমার সচিব মিঃ গুড-এর নিকট থেকে যে মূল্যবান সাহায্য পেয়েছিলাম তার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। মিউনিসিপ্যাল কাজকর্ম্ম বিষয়ে তাঁর ব্যাপক ও অনেক অভিজ্ঞতা ছিল। বহুবৎসর তিনি কোলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং কিছুকাল চেয়ারম্যানও ছিলেন। চব্বিশ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট ও দার্জ্জিলিং-এর ডেপুটি কমিশনার হিসাবে তিনি মফস্বল অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির সঙ্গেও বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। আইনের খুঁটিনাটি ও মিউনিসিপ্যাল কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ে তাঁর যে গভীর জ্ঞান ছিল মিউনিসিপ্যাল বিলসমূহ রচনার পক্ষে তা' আমার বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

পঞ্চত্রিংশতি অধ্যায়

মন্ত্রীরূপে আমার কার্য্যাবলী (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে আমি যে নীতির অনুসরণ করেছিলাম তা' হ'ল আমার অধীন সমগ্র বিভাগটিকে ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় ভারতীয়দেরদ্বারা পূর্ণ করা। আমার প্রশাসনিক আদর্শের মধ্যে কার্য্যদক্ষতাকেই আমি মুখ্য স্থান দিয়েছিলাম। অন্য সব গুণ ও যোগ্যতা যেখানে সমান সেখানে একজন ভারতীয়ের দাবীকেই আমি অগ্রগণ্য মনে করতাম। আমি যে এদিকে বিশেষ কিছু করতে পারতাম তা' নয়। কিন্তু নীতিটি সমানেই ছিল। সময় ও সুযোগ হ'লেই তা স্বীকার করে' নিয়ে সেই অনুসারে কর্ত্তব্য স্থির করতাম। অনেক সময় নানা অসুবিধা এবং এমন কি, বিরোধিতার পর্য্যন্ত সম্মুখীন হ'তে হ'ত। তবে গভর্ণরের সমর্থন থাকাতে আমি সেসব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হতাম। মিঃ এস. এন. মল্লিককে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করার ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, তা' বিশেষ লক্ষণীয়। ১৯২১ সালে কর্পোরেশনের স্থায়ী চেয়ারম্যান মিঃ পেনী ছুটিতে গেলে আমি তাঁর স্থলে মিঃ জে. এন. গুপ্তকে অস্থায়ীভাবে কাজ করবার জন্য নিযুক্ত করলাম। মিঃ গুপ্ত ছিলেন বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার এবং তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সে পদে কাজ করেছিলেন। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই প্রথম একজন ভারতীয়কে সিভিল সার্ভিস থেকে এনে এই উচ্চ পদে নিযুক্ত করা হ'ল।

কিন্তু তদপেক্ষা অধিক ব্যতিক্রম করা হ'ল যখন স্বাস্থ্যের জন্য মিঃ গুপ্তকে ছুটি নিতে হ'ল এবং তাঁর স্থলে নিযুক্ত করবার জন্য অন্য লোকের সন্ধান করতে হ'ল। আমি সাধারণ গণ্ডী ছেড়ে আইনসভার সদস্য ও কর্পোরেশনের বেসরকারী ভাবে নির্ব্বাচিত সদস্য মিঃ সুরেন্দ্র নাথ মল্লিককে এপদে নিযুক্ত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম।

দুদিক থেকে এ বিষয়ে আপত্তি উঠল। প্রথমতঃ, মিঃ মল্লিক আইন সভাতে প্রায়ই সরকারের বিরোধিতা করতেন। তাঁকে এখন এপদে নিযুক্ত করলে তা' কি ঘুষ দিয়ে প্রভাবিত করা বলে গণ্য হবে না? তার উত্তরে আমার বক্তব্য ছিল, "এ সমস্ত বিষয়ে যে-ইংলণ্ডকে আমরা আমাদের আদর্শ বলে গণ্য করি, সেখানেও কি এরূপ করা হয় না? নিশ্চয় হয়। আমার এ উত্তরই ছিল যথেষ্ট। হয়ত আপত্তিকারীদের পক্ষে সেরূপ ছিল না। তা' হলেও, এ নিয়ে আমি আর ভাবি নি।

দ্বিতীয় আপত্তি যা' তোলা হয়েছিল তা' এই যে, মিঃ সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও বিতার্কিক হলেও তিনি মিউনিসিপ্যাল কার্য্য পরিচালনায় ও তার আভ্যন্তরীন কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তার উত্তরে আমি বললাম, "মিঃ লয়েড জর্জ্জ যখন চ্যান্সেলার অব একস্‌চেকার হয়েছিলেন, তখন তিনি ইংলণ্ডের আর্থিক ব্যাপারাদির বিষয়ে কি জানতেন? কর্পোরেশনে স্থায়ী কর্ম্মচারীরা রয়েছেন। মিঃ মল্লিকের যখনই যা' জানবার প্রয়োজন হবে তখন তাঁরাই তা' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যোগাড় করে দেবেন।" কর্পোরেশনের ন্যায় এত বড় একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হতে হলে আসলে যা' দরকার তা' হ'ল দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা, কি নীতি অনুসারে কাজ চালাত হবে তা' নির্ণয়ের এবং সমস্ত কিছু বিশদভাবে জেনে নিয়ে স্থায়ী কর্ম্মচারীদিগকে নির্দ্দেশ দেবার ও পরিচালিত করবার ক্ষমতা। আমার এ মন্তব্যগুলি গভর্ণরের মনঃপূত হ'ল এবং তাঁর পূর্ণ সমর্থন পেয়ে আমি মিঃ মল্লিককে উক্ত পদে নিযুক্ত করলাম।

প্রথমে তাঁকে অস্থায়ী ভাবেই নিযুক্ত করা হয়েছিল, কারণ ভারত সরকারের অনুমোদন পাওয়া ছিল তখনো বাকী। কিন্তু কয়েকমাস পরে এ পদের স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত কর্ম্মচারী মিঃ পেনী নিশ্চিতরূপে পদত্যাগ করার ফলে তাঁর স্থলে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা

অপরিহার্য্য হয় এবং তখন একটু অসুবিধায় পড়তে হ'ল। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পদটি ছিল ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জন্য সংরক্ষিত। সুতরাং তাকে সেই সংরক্ষিত বিষয়ের তালিকা থেকে হস্তান্তরিত বিষয়ের তালিকাভুক্ত করে' দেবার অনুমোদনের জন্য ভারত সরকার ও ভারত সচিবের নিকট আবেদন করতে হ'ল। সে অনুমোদন পেতেও আমার বিশেষ অসুবিধা হ'ল না। বাস্তবিক পক্ষে, যে করেই হোক তাকে সংরক্ষিত বিষয়ের তালিকা থেকে সরিয়ে আনতেই হ'ত। কারণ নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনে সে পদটিকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন পদে বিভক্ত করা হয়েছিল। এবং কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনের উপর ভিত্তি করেই সে পদগুলি পূরণ করা হ'ত।

চেয়ারম্যান হিসাবে মিঃ মল্লিকের সাফল্য তাঁকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করার সকল বাধা দূর করে' দিল! এ প্রদেশের প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের কাজটি ছিল অন্যতম। প্রশাসনের দায়িত্বশীল পদেও যে কাজ করবার যোগ্যতা আমাদের দেশীয়গণের আছে, মিঃ মল্লিক তা' বিশেষভাবে প্রমাণ করলেন। কর্পোরেশনের জেনারেল কমিটি আমাকে ধন্যবাদ জানাল এবং বাস্তবিক পক্ষে মিঃ মল্লিককে নিযুক্ত করায় প্রায় প্রত্যেকেই সন্তোষ প্রকাশ করল! এমন কি, উচ্ছ্বসিত ভাবে না হলেও, চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলিও তার প্রশংসা করেছিল। আমি যে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলাম তা' তারা স্বীকার করেছিল এবং প্রচলিত প্রথার যে এটি একটি ব্যতিক্রম তা' স্বীকার করতেও তা'রা আপত্তি করে নি। তবে আমাদের সকল কাজেই আপত্তি করবার তাদের যে এক সাধারণ নীতি ছিল এটি ছিল তার এক সাময়িক ব্যতিক্রম। তাদের এ মোহ শীঘ্রই কেটে গেল। পুনরায় তা'রা নিজ মূর্ত্তি ধরে' আমার মধ্যে, আমার প্রশাসনের মধ্যে এবং সরকারের মধ্যে যে কোন গুণ নেই, সবই দোষ, তা' প্রচার করতে লাগল।

প্রত্যেকেই মিঃ মল্লিকের প্রশংসা করতে লাগলেন। এখানে ওখানে সর্ব্বত্রই তাঁর সম্মানে প্রমোদ, উৎসব ও ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন হ'তে লাগল। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর যেন জনসাধারণ আবিষ্কার করলেন যে, সকলের অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন একজন নাগরিক ছিলেন, যাঁর মূল্য এতদিন তাঁরা বুঝতে পারেন নি বা যাঁকে এতদিন তাঁরা তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেন নি। প্রাচীন কাল থেকে বহু অভিজ্ঞতা দ্বারা মহাসত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না' বলে যে প্রবাদ বাক্যটি আছে, তাকেও মিথ্যা প্রমাণিত করে' মিঃ মল্লিকের সাউথ সুবার্ব্বান স্কুলস্থ বাসভবনের এক মাইলের মধ্যে জনগণ তাঁদের আনন্দ প্রকাশের আয়োজন করলেন। কিন্তু কি পরিবর্ত্তনই না এখন হয়ে গেছে! মানুষের সেই মনোভাব যেন কোন্ ঘূর্ণিঝড়ে এমন ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে যে, তাকে আজ আর চিনবার পর্য্যন্ত উপায় নেই। কাল যাকে শালগ্রামশিলা বলে পূজা করা হয়েছে আজ তাকে সাধারণ শিলার ন্যায় নির্ম্মমভাবে ধূলায় নিক্ষেপ করা হয়েছে। তাঁর সেই অসাধারণ যোগ্যতা ও কর্ম্মখ্যাতি, প্রশাসনিক কার্য্যের অজানা পথে চলবার মত তাঁর অতুলনীয় ক্ষমতার প্রমাণ দান—সমস্তই বিস্মৃতির অতল গহ্বরে লুপ্ত হয়ে জনগণের মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এবং আইন সভায় তাঁর আসনের জন্য নির্ব্বাচনী দ্বন্দ্বে স্বরাজ্যদলের এক প্রার্থীর নিকট তিনি পরাজিত হলেন। সম্ভবত তার একমাত্র কারণ এই ছিল যে, মাত্র তার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি নবগঠিত বঙ্গীয় সরকারের এক মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছিলেন।

শাসন সংস্কারকে রূপ দেবার চেষ্টা ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে' সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা স্বরাজ্যদলের চোখে ছিল অমার্জ্জনীয় অপরাধ। যুক্তির দিক থেকে বিচার করলে আইনসভার সদস্য হওয়াও অপরাধ, যদিও হয়ত তার গুরুত্ব কিছু কম। কারণ, আইনসভাটিও সরকার নামক যন্ত্রটিরই একটি অংশ, আর আইনসভার সদস্য তারই

একটি অঙ্গ। কিন্তু স্বরাজ্যদলের নীতির মধ্যে যুক্তি, সাধারণ বুদ্ধি, এমন কি, দেশ সেবার প্রয়োজনেও কি উচিত, কি অনুচিত এ সব বিচারের কোনই স্থান ছিল না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শাসন-সংস্কার বিনষ্ট করা ও মন্ত্রীদিগকে গদীচ্যুত করা। হতে পারে মন্ত্রী না থাকলে হস্তান্তরিত বিষয়গুলির প্রশাসনকাজ ব্যাহত হবে। তখন এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে। এবং তার ফলে শাসন সংস্কারও বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তার অর্থ ত এ নয় যে, তখন সরকারও লোপ পাবে। তা'তে পুরাতন আমলাতন্ত্রে ফিরে যাবার সম্ভাবনাই বেশী। তখন তার কঠোরতা নিবারণ করবার জন্য আংশিক গণসরকারেরও কোন অস্তিত্ব থাকবে না। তা' সত্ত্বেও স্বরাজ্যদলের ধারণা ছিল, তাতেই এক বিরাট অপ্রতিরোধ্য চাপের সৃষ্টি হবে যার ফলে অবিলম্বে পূর্ণদায়িত্বশীল সরকার গঠনের অধিকার লাভ হবে। কিন্তু কয়েকদিন পূর্ব্বে হাউস অব লর্ডস্-এ যে-বিতর্ক হয়েছিল এবং তখন বৃটিশ জনগণের যা' মতিগতি ছিল তা' বিবেচনা করলেই বুঝা যেত যে, এ আশা ছিল দুরাশা মাত্র।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে মিঃ সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক যখন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ করলেন, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে আমার পক্ষে তাঁর স্থলে অপর কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করার প্রয়োজন হ'ল। কয়েক মাসের জন্য মাত্র ছিল এ চাকরী। সেজন্য কিছু অসুবিধা হ'তে লাগল। এ চাকরীর উপর ডেপুটি চেয়ারম্যান মিঃ সি. সি. চ্যাটার্জীর দাবী ছিল। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী এবং মিউনিসিপ্যাল কার্য্য পরিচালনার সমস্ত কিছুর সঙ্গে তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিচয় ছিল। চাকরী যখন অস্থায়ী তখন অফিসের প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করতে হ'লে তাঁকেই সে পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করতে হয়। কিন্তু আমি যে নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন করেছিলাম তা' পরিত্যাগ করতেও আমার ইচ্ছা হ'ল না। আমার নীতির প্রয়োজনেই সে পথ ধরেই আমার চলা উচিত বিবেচনা করে গভর্ণরের

সমর্থন নিয়ে রায় হরিধন দত্ত বাহাদুর নামে জনৈক নির্ব্বাচিত কমিশনারকে আমি এ পদে নিযুক্ত করলাম। মিউনিসিপ্যাল কাজকর্ম্ম বিষয়ে তাঁর প্রায় বিশ বছরের অভিজ্ঞতা ছিল। যদিও তাতেও সামান্য আপত্তি দেখা দিয়েছিল শেষ পর্য্যন্ত আমার মতই গ্রাহ্য হয়েছিল।

একথা বলা যেতে পারে যে, আইন সভার সদস্য হিসাবে রায় হরিধন দত্ত বাহাদুর প্রায়ই সরকারের বিরোধিতা করতেন। মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের ক্ষেত্রে একথাটি আরও বিশেষরূপে খাটত। কিন্তু সদুদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা বিরোধিতা করতেন, তাঁরা চরিত্রবান ও যোগ্যতা সম্পন্ন হ'লে তাঁদের উচ্চ পদে নিযুক্ত করবার ক্ষেত্রে আমি কোন বাধাই উঠতে দিতাম না। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, যোগ্যতম ও সর্ব্বাধিক বিচক্ষণ লোককে নিযুক্ত করবার জন্য সরকার ছিল অত্যন্ত উদগ্রীব। তা'তে শাসন সংস্কারের মধ্যে ভাল বলে' কিছুই যাদের চোখে পড়ত না, এমন কি সরকারের সে সব সমালোচকদের উপরেও যে সুস্থ ও নৈতিক প্রভাব পড়বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি।

আমার অধীন সমস্ত বিভাগ যে আমি ভারতীয়দের দ্বারাই পূর্ণ করবার নীতি গ্রহণ করেছিলাম সে কথা কারও নিকট গোপন ছিল না। তবে আমি ছিলাম কায়েমী স্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণ ও জনহিতকর কাজ-এর যেন কোনরূপ ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক। মোটামুটি ভাবে সরকারের অনুমোদন নিয়ে এ নীতি আমি কর্পোরেশনেও প্রয়োগ করেছিলাম। মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টেও এ নীতি প্রয়োগ করেছিলাম, তবে তাতে কিছু কিছু অসুবিধাও হয়েছিল। আমি যখন মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ভার নিয়েছিলাম সে সময় বেশ একটি বড় রকমের প্রশ্ন আমাদের সামনে এসেছিল। ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু জানতে চেয়েছিলেন বঙ্গীয় সরকারের চাকরীতে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের লোকের সংখ্যা সম্বন্ধে মন্ত্রীর মত কি? আমি তার-বার্ত্তা পাঠিয়ে জানিয়ে দিলাম যে, চাকরীতে যত সংখ্যক লোক

আছে তা' থেকে বেশী লোক নিযুক্ত করবার প্রয়োজন নেই এবং বঙ্গদেশে সংরক্ষিত আসনগুলির সংখ্যা বর্দ্ধিত করাও অনাবশ্যক। তবে বিষয়টি আরও বিচার বিবেচনা করে পরে একটি বিবৃতিসহ আমার মত আমি বিশদভাবে জানিয়ে দেব। আমি বিষয়টি নিয়ে সার্জ্জন জেনারেল স্বর্গীয় মেজর-জেনারেল রবিনসন ও দু' একজন বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে' একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করলাম এবং ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির বিচার ও মতামত প্রকাশের জন্য তাঁদের সামনে তা' উপস্থিত করলাম।

ষ্ট্যাণ্ডিং বা স্থায়ী কমিটির কর্ত্তব্য ছিল পরামর্শ দেওয়া। তখন একটি নিয়ম গড়ে উঠেছিল যে, যখন তাদের কাজের পরিধি ও এক্তিয়ারের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ের জন্য প্রয়োজন হত সরকারের সদস্যগণ কমিটির সঙ্গে আলোচনা করতেন। সদস্য বা মন্ত্রীগণ তাঁদের মত গ্রহণ করতে বাধ্য না হলেও সংবিধান বিষয়ক পরামর্শদাতা হিসাবে তাঁদের মতামতকে শ্রদ্ধা করা হত। আইনগত দায়িত্ব না হলেও এটি ছিল তাঁদের এক নৈতিক দায়িত্ব। শাসন সংস্কারকে কার্য্যকর করার ক্ষেত্রে এই স্থায়ী কমিটিগুলির ভূমিকা ছিল বিশেষ উপকারী। মন্ত্রীদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাসমূহকে উদার করে তারা তাদের মধ্যে জনমতের রং লাগাত ও গুরুত্ব সঞ্চার করত। আমার নিজের দায়িত্বে আমি যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলাম তারা তা' আলাপ আলোচনার পর গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরিকল্পনা ছিল এক সতর্ক অথচ সুনিশ্চিত অগ্রগতি এবং নিতান্ত সামান্য ক্ষমতা হাতে রেখে ভারত সচিব তার সমস্তটিই অনুমোদন করেছিলেন।

আমার মন্তব্য পাঠাবার পর এই অনুমোদন আসতে প্রায় দুবছর সময় লেগেছিল। কিন্তু তা' নিয়ে কোন অভিযোগ করা চলে না। কারণ বিষয়টি ছিল যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও জটিলস্বার্থ প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত, তেমনি বহু ডিপার্টমেণ্টের মতামতের সঙ্গে সমন্বয় করে বহু বাধা অতিক্রম করে' তবে তাকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। আমি যে সুপারিশ

করেছিলাম তার সার কথা ছিল ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের জন্য যে চল্লিশটি পদ সংরক্ষিত ছিল তাদের সংখ্যা হ্রাস করে' চব্বিশটি করতে হবে এবং মেডিক্যাল কলেজের পদগুলির মধ্যেও সংরক্ষিত পদের তালিকা থেকে কিছুকিছু সরিয়ে দিতে হবে। মেডিক্যাল বিভাগের প্রধানদের নিকট থেকে এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠল। আমি তার এক উত্তর দিলাম এবং তার মধ্যে আরও বিশদভাবে আমি আমার নীতির ব্যাখ্যা করলাম। আমি বললাম,—

"কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে আমিও সার্জ্জন-জেনারেলের মতই উদগ্রীব। কিন্তু সেই উচ্চস্থান তাকে রক্ষা করতে হ'লে বর্ত্তমানের সঙ্গে সমান তাল রেখেই তা' করা সম্ভব। বর্ত্তমান জনমত হ'ল, অধ্যাপকদের কিছুকিছু পদ স্বাধীন চিকিৎসাবিদদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। তার কারণ, ভারতীয় সমাজে তাঁদের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব দিনদিন বেড়ে চলেছে এবং অচিরে কোলকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায়ে তাঁরাই একাধিপত্য লাভ করতে চলেছেন। সুতরাং সরকারী ও বেসরকারী, সরকারপক্ষের প্রতিনিধি ও জনসাধারণের প্রতিনিধি সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়ে মেডিক্যাল কলেজের এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা করবেন এবং তাকে ভারতের শ্রেষ্ঠতম মেডিক্যাল কলেজ করে গড়ে তুলবেন।"

যে রূপ চমৎকার ভাবে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস তাঁদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছিলেন তজ্জন্য জনগণ ও সরকারের পক্ষ থেকে আমি তাঁদের প্রতি ঋণ স্বীকার করেছিলাম। অপর পক্ষে তাঁরা যে বলতে চেষ্টা করেছিলেন যে, "চাকরীর অবস্থার উপরেই প্রশাসনিক সফলতা সকলের চেয়ে অধিক নির্ভর করে"—সে কথা আমি অস্বীকার করলাম। আমি বললাম,—

"যদি কিছু মনে না করেন, তবে আমি বলব, তার ফলে ক্ষুদ্র দলীয়

মনোভাব ও সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয়ে, প্রশাসনিক সফলতার জন্য অপরিহার্য্যরূপে যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সদয় সহানুভূতির প্রয়োজন, তাকে বিনষ্ট করে।"

এ নীতির অনুবর্ত্তী হয়ে আমি স্যার কৈলাসচন্দ্র বসুকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অনারারী ফিজিসিয়ান ও মেজর হাসান সুরাবর্দ্দিকে অনারারী সার্জ্জন নিযুক্ত করেছিলাম। এ উদ্দেশ্যে তার কয়েকমাস পূর্ব্বেও আমি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করে ডাক্তার ইউ. এন. ব্রহ্মচারী ও ডাক্তার কে. কে. চ্যাটার্জীকে যথাক্রমে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এ্যাডিসান্যাল ফিজিসিয়ান ও সার্জ্জন নিযুক্ত করেছিলাম। মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাসে য়্যাসিসট্যাণ্ট সার্জ্জনের পদে ভারতীয় মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগের ঘটনা এগুলিই প্রথম। এ ঘটনার উল্লেখ করে' সে সময় একখানি নেতৃস্থানীয় ইংরেজী সংবাদ পত্র মন্তব্য করেছিল,—

"যে ভাবেই হোক একথা স্পষ্ট যে, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ভারতের আদর্শকে ভারতীয়দের নিমিত্ত কার্য্যে পরিণত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।"

সাম্রাজ্যের যাঁরা যথার্থ নাগরিক তাঁদের এটিই আদর্শ হওয়া উচিত। ঘর, বাড়ী, প্রদেশ, দেশ এসব ত দেশপ্রেমের আবেগের এক একটি কেন্দ্র বিশেষ। সেই আবেগ তা' থেকে বিকীর্ণ হয়ে সাম্রাজ্যের বৃহৎ ও ব্যাপক স্বার্থগুলিকেও তার প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করে। আর সাম্রাজ্যই বা কি? তাও ত কতকগুলি স্বায়ত্ত শাসিত জাতির রাজ্যপুঞ্জের সমষ্টি মাত্র। সেখানেও প্রত্যেকেই অন্যদের প্রতি কোন অন্যায় না করে' সমস্ত সার্ব্বভৌম গঠনতন্ত্রটিকে ঐক্যবদ্ধ রাখবার প্রতি দৃষ্টি রেখে আপন-আপন বিশেষ স্বার্থকে রক্ষা করতে ব্যস্ত থাকে। আমি যে দলভুক্ত-সে দলের এটিই হ'ল দৃঢ় বিশ্বাস। তা'তে আছে আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের সঙ্গে এক সার্ব্বভৌম একত্ববোধ। আর তা'

থেকেই ভিতরের শান্তি ও বাইরের সমৃদ্ধি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

এই বিষয়টি শেষ করবার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্নের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রশ্নটি তুলেছিলাম বঙ্গদেশে ভারতীয়গণকে মেডিক্যাল সার্ভিসে অফিসার নিয়োগ করা নিয়ে। তখন পর্য্যন্ত এ সমস্ত পদের জন্য ব্যয় ভার বহন করত বঙ্গীয় সরকার আর পদগুলি পূর্ণ করবার কর্তৃত্ব ছিল ভারত সরকারের। আমি জানিয়ে দিলাম যে, এ নিয়ম আমার সংবিধান দত্ত ক্ষমতার বিরোধী। হস্তান্তরিত বিষয়গুলি আমার অধীন এবং তার প্রশাসনের জন্য আইন সভার নিকট আমিই দায়ী। এই প্রশাসন কাজে কর্ম্মীগণ এক বিশেষ উপাদান। তাদের সম্পর্কে শেষ কথা বলার অধিকার যদি আমার না থাকে, তবে তাদের কাজের জন্য আমাকে দায়ী করা চলে না। আমি দাবী করলাম যে, এই পদগুলিতে লোক নিযুক্ত করবার ক্ষমতা আমারই থাকবে। তবে তা' হ'বে ভারত সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ এবং সে বিষয়ে প্রতি ক্ষেত্রেই সরকারকে অবহিত করা হ'বে। আমার এ যুক্তির ন্যায্যতা মেনে নিয়ে আমার দাবী কার্য্যত স্বীকার করে' নেওয়া হয়েছে।

বঙ্গদেশে কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের বিষয়ে মন্ত্রী হিসাবে আমি প্রেরণা যুগিয়ে ছিলাম বলে' দাবী করতে পারি। উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাদের আর্ট কলেজ যথেষ্ট আছে, হয়ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত আছে বলেও বলা চলে। রিপন কলেজ স্থাপন করে' আমি নিজেই ত আন্দোলনে সহায়তা করেছিলাম। কিন্তু সারা প্রদেশে তখন চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেবার চেষ্টা ছিল না বললেই চলে। চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা যে অত্যন্ত ব্যয় বহুল তা'তে কোনই সন্দেহ নেই। প্রারম্ভিক ও পৌনপুনিক উভয়ে মিলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু এ শিক্ষার যে এক আশু প্রয়োজন রয়েছে তাও অস্বীকার করার উপায় নেই।

যখন আমাদের দেশে প্রতি চল্লিশ হাজারেরও উর্দ্ধ সংখ্যক লোকের জন্য মাত্র একজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের ব্যবস্থ্য রয়েছে তখন ইংলণ্ডে প্রতি আঠারশ' লোকের জন্য রয়েছে একজন করে' ওরূপ চিকিৎসক।

অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায় ভারতের জনগণের বদান্যতাকে চিকিৎসাকার্য্য সংক্রান্ত ত্রাণ কার্য্যের প্রসারের জন্য ব্যবহৃত করা হয় না। তা' সত্ত্বেও যদি বলি যে, মানুষের দুঃখদুর্গতির প্রতি আমাদের দেশবাসিগণ নির্ব্বিকার বা জনকল্যাণে তাঁরা দান করেন না, তা' হ'লে তা' অত্যন্ত অন্যায় করা হ'বে। অতীতের রাজোচিত দানগুলির দিকে লক্ষ্য করুন। সেই অর্থের সুদ বা লভ্যাংশ থেকে দরিদ্রকে অন্নদান করা হয়, পণ্ডিতগণকে প্রতিপালন করা হয় এবং নানা ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। জনমতকে এপথে পরিচালিত করে নিয়ে আসতে হ'বে। যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তির দানের ফলে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভের পথ সুগম হয়েছে তাঁদের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা সরকারের কর্ত্তব্য। আমার মনে হয় সাম্প্রতিক কালে এরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্বদা তা' করা হয় নি। এপথে উৎসাহ দানের চেষ্টার অভাবের দরুণই এই অত্যাবশ্যক পথে দানের স্রোত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

অর্থের অনটন সত্ত্বেও আমার সময়ে ময়মনসিংহতে একটি মেডিক্যাল স্কুলের শিলান্যাস হয়। এবং সরকার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, অনুরূপ স্কুল পরপর চট্টগ্রাম, বহরমপুর ও জলপাইগুড়িতেও স্থাপন করা হবে। প্রেরণা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাকে উদ্দীপিত করে' তুলতে হবে। আমি পুনরায় স্বীকার করছি যে, যতদূর পর্য্যন্ত কাজ করা উচিত ছিল ততদূর হয়ে উঠে নি। অসহযোগ সত্ত্বেও সরকার প্রদত্ত সম্মান এখনো লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মফস্বল অঞ্চলে এখনো রাজা একজন বিশেষ ব্যক্তি। রায়বাহাদুরও প্রায় তদ্রূপ। তবে কিঞ্চিৎ কম। এরূপ বিশিষ্টতা দান করলে ধনী ব্যক্তিদের দানের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তদ্ভিন্ন তারা নিশ্চিতরূপেই সরকারের সমর্থক হয়ে উঠে।

তাঁদের বলে কোন লাভ হয় না যে, তাঁদের কাজে সরকার খুব আনন্দিত হয়েছেন। সরকারের সেই আনন্দ কার্য্যত দেখাতে হবে। কেবল কথাতে কিছু হয় না, কাজও করা দরকার।

মন্ত্রীদিগকে আক্রমণ করার একটি পরিচিত পদ্ধতি হ'ল নিষ্কর্মা ব'লে তাদের নিন্দা করা অথবা যে সমস্ত ব্যবস্থার জন্য তারা দায়ী নয় তাও তাদের উপর আরোপ করা। নির্ব্বাসনের নীতির সমর্থক বলে টাউনহলের সভায় মন্ত্রীদিগকে যে আক্রমণ করা হয়েছিল, আমি প্রায়ই তার উল্লেখ করতাম। বাস্তবিক পক্ষে সে বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানতেন না। একজিকিউটিভ সরকারই আপন দায়িত্বে নির্দ্দেশগুলি দিয়েছিলেন। এবং সে ক্ষমতাও সম্পূর্ণভাবে তাঁদের উপরই ন্যস্ত ছিল। এরূপ আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। আসামে শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করে বাড়ী ফিরে যাচ্ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের চাঁদপুর রেল স্টেশনে দলে দলে শ্রমিক আসার ফলে এক সাজ্যাতিক গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ল। বিষয়টি বাস্তবিক পক্ষে আমার এক্তিয়ারভুক্ত বিভাগগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্টহীন হওয়া সত্ত্বেও আমার কোন কোন বন্ধু আমাকে চাঁদপুর যাবার জন্য পরামর্শ দিতে লাগলেন। সরকার থেকে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়াও তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। আমি গিয়ে মিঃ হেনরী হুইলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। বিষয়টির ভার ছিল তখন তাঁরই হাতে। পরে তিনি বিহারে গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নিজেই যখন তখন চাঁদপুর যাচ্ছিলেন, আমার চাঁদপুর যাওয়া তিনি অনাবশ্যক বোধ করলেন। তিনি চাঁদপুরে বহুদিন কাটালেন এবং ফিরে এসে দীর্ঘ বিবৃতি দাখিল করলেন। যাঁরা আমাদের কাজের সমালোচনা করতেন তাঁরা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। আইন সভার এক মিটিং-এ তা' নিয়ে আলোচনা হ'ল। উত্তর বঙ্গের রাজশাহী বিভাগের আইন সভার একজন সদস্য মিঃ কিশোরী মোহন চৌধুরী বিষয়টি সম্পর্কে

কিছুই আমরা করি নি বলে' আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন,—

"জনগণের মধ্যে এত উত্তেজনা সত্ত্বেও যে সকল মন্ত্রী জনগণের প্রতিনিধি তাঁরা আমাদের সমস্ত আশাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সে বিষয়ে কিছু করার প্রয়োজনও বোধ করলেন না। আমরা আশা করেছিলাম তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে সেখানে যাবেন এবং সবকিছু স্বচক্ষে দেখবেন। তা' তাঁরা করেন নি। যদিও অনারেবল হেনরী হুইলারের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, সেখানে শ্রমিকদের দুর্ভোগের অন্ত নেই, তবুও তার মধ্যে তাঁরা তাদের জন্য এক কণাও সাহায্য করেন নি। আমাদের জনপ্রতিনিধিরূপী এই যে মন্ত্রীগণ, তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।"

মাননীয় সদস্য তাঁর আসন গ্রহণ করার সঙ্গেসঙ্গেই আমি দাঁড়িয়ে তাঁর বিবৃতির প্রতিবাদ করলাম। আমি বললাম,—

"মন্ত্রীগণ কিছু করেন নি বলে মাননীয় সদস্য যে বারবার বলে গেলেন আমি তার প্রতিবাদ করছি এবং তার সত্যতা অস্বীকার করছি। তাঁর একথা জানা উচিত ছিল যে, চাঁদপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের নিকট থেকে সেখানে ওলাউঠা আরম্ভ হবার সম্ভাবনার সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মজুরদের পরিচর্য্যার জন্য নয় জন ডাক্তার ও দশহাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আর তা সত্ত্বেও আমার মাননীয় বন্ধুবর বলেন যে, আমরা নাকি কিছুই করি নি। তিনি বোধ হয় মনে করেছেন যে, মিথ্যাকে বার বার আবৃত্তি ক'রে তিনি তা'কে সত্যে পরিণত করতে পারবেন।"

বন্ধুবর কিঞ্চিৎ নরম হয়ে বললেন, "আমি সে খবর জানতাম না।"

এ সম্পর্কে আর একটি ঘটনার উল্লেখ ক'রে আমার স্মৃতিচারণের এ অধ্যায়টি আমি শেষ করব।

১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে উত্তরবঙ্গে এক সাঙঘাতিক বন্যা হ'ল।

বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বহুলোকের প্রাণ হানি হ'ল, ধনসম্পত্তি নষ্ট ও বিধ্বস্ত হ'ল। সে সময় প্রধান সরকারী কর্ম্মস্থল ছিল দার্জ্জিলিং-এ। সরকারের একজন সদস্য হিসাবে আমিও সেখানেই ছিলাম। তা' ছাড়া কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের সিলেক্ট কমিটির মিটিংগুলিও সেখানেই হবে বলে' স্থির হয়েছিল। কয়েকজন বন্ধু তখন দার্জ্জিলিং-এ এসেছিলেন। তাঁরা রেলের লাইন ধরে' যেতে যেতে সেখানে বন্যার ফলে যে সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছিল তা' দেখে এসে বন্যাপীড়িত অঞ্চলে গিয়ে তা' পরিদর্শন করবার জন্য আমাকে চাপ দিতে লাগলেন। চাঁদপুরের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অসুবিধা আমার সামনে এসেছিল, এখানেও তাই হ'ল। কারণ সরকারের যে বিভাগ এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করত তা' ছিল আমার আয়ত্তের বাইরে। আমার খুবই ইচ্ছা হচ্ছিল—আমি বন্যা অঞ্চলে গিয়ে দেখি কিছু করা যায় কি না। আমি যে পর্য্যন্ত জানতে পেরেছিলাম তাতে দেখলাম চিকিৎসা সম্পর্কিত সাহায্য আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবুও আমার মনে হতে লাগল, আমি ব্যক্তিগতভাবে সেখানে উপস্থিত থাকলে সমস্ত কিছুর খবরাখবর করতে পারব এবং আমাদের লোকেরাও কাজে উৎসাহ পাবে। এই মনে করে আমি গভর্ণরের অনুমতির জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে অবিলম্বে তাঁর অনুমতিও নিলাম।

পরদিনই কয়েকজন বন্ধুসহ আমরা ঘটনাস্থলে চলে গেলাম। এই বন্ধুদের মধ্যে তিনজন ছিলেন আইন সভার সদস্য। আমরা ট্রলীযোগে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে প্রায় বিশ মাইল পথ অতিক্রম করলাম। রেল লাইনের উভয় পার্শ্বই জলে ডুবে রয়েছে এবং জলের উপর যেখানে সেখানে মৃত জন্তুজানোয়ারের দেহ ভাসছে। সর্ব্বত্র সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। সে এক বীভৎস করুণ দৃশ্য। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রীড অনুগ্রহ করে' আমাদের সঙ্গে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আমাদিগকে সরবরাহ করলেন।

তার পরদিন আমি দার্জ্জিলিং-এ ফিরে এসে কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের সিলেক্ট কমিটির মিটিং-এ যোগ দেবার জন্য ছুটে গেলাম। এই অত্যধিক খাটুনীতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ক্রমে জ্বর ও পরে ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া দেখা দিল। আমার ডাক্তার বন্ধুগণ এক সময় আমার জন্য বেশ উদ্বিগ্নই হয়ে পড়েছিলেন। সে সময় আমার বন্ধুগণ আমার যা' সেবাযত্ন করেছিলেন তা' আমি কখনো ভুলতে পারব না। ভারতীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে স্যার নীলরতন সরকার তখন ছিলেন সকলের সেরা। তিনি কোলকাতা থেকে দার্জ্জিলিং-এ ছুটে এলেন। তৎকালীন অস্থায়ী সার্জ্জেন জেনারেল কর্ণেল উইলসন, মেজর হাসান সুরাবর্দ্দী এবং মেজর কে. কে. চ্যাটার্জী প্রমুখ চিকিৎসকেরাও অন্যদের সঙ্গে সে সময় আমার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন।

স্যার নীলরতন সরকারের সম্পর্কে এখানে একটা কথা বলে রাখি। জনহিত কর কাজে উৎসাহী হয়ে তিনি যে বিভিন্ন দিকে কাজ করেছেন তার যথেষ্ট প্রমান আছে। তিনি যে কেবল একজন চিকিসকই ছিলেন তা' নয়। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ্, দেশকর্ম্মী, সমাজ সংস্কারক ও শিল্পোদ্যোগী। এরূপ আরও অন্যান্য অনেক গুনসম্পন্ন। অথচ আপন ব্যবসা ক্ষেত্রের অলঙ্কার স্বরূপ এব্যক্তিটি নিজ কর্ম্ম ক্ষেত্রের পরিধি থেকে তাঁর কার্য্যাবলীকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করে' দিয়েছিলেন। তাঁর জীবন থেকে তাঁর দেশবাসীর শিক্ষণীয়ও অনেক কিছু আছে। ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে তিনি চলে গেলেন কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। এই "গুরু গৃহের" তিনি যে এক উজ্জ্বল রত্ন সে কথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। আমার রোগের অবস্থা খারাপই ছিল। তবুও আমার অটুট্ স্বাস্থ্যের ফলে চিকিৎসকদের পক্ষে কাজের অনেক সুবিধা হয়েছিল এবং সৌভাগ্যবশত আমিও সেরে উঠলাম। চুয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধের পক্ষে ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া বাস্তবিকই আশঙ্কার

কারণ। কিন্তু এক শ্রেণীর সংবাদ পত্রের কাছে একজন মন্ত্রীর পক্ষে এরূপ কষ্ট স্বীকারের কোনই মূল্য ছিল না। এতে যে সেই মন্ত্রী প্রায় মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসেছে ত'াতে তাদের মনে আঁচড়ও কাটে নি। সংবাদ পত্রগুলির মন্তব্যের উত্তরে আমার যে সমস্ত বন্ধু আমার সঙ্গে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁরা সংবাদপত্রে নিম্নোক্ত পত্রখানি পাঠিয়েছিলেন,—

ষ্টেটসম্যান পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

গত বুধবার আপনার পত্রিকার মুখ্য নিবন্ধখানি পাঠ করে' ব্যথিত ও বিস্মিত হয়েছি। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রীকে আক্রমণ করেই নিবন্ধখানি লেখা হয়েছে। আমরা আরও অবাক হয়েছি এজন্য যে, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তিনি যত কাজ করেছেন তার প্রশংসায় এ যাবৎ ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকাই ছিল সবার অগ্রণী। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ত্রাণ কার্য্যের ভার ও তার পরিচালনা প্রশাসনিক বিভাগের সংরক্ষিত শাখারই অন্তর্ভুক্ত এবং স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রীর এক্তিয়ার বহির্ভূত। এই প্রধান বিষয়টির প্রতি অবহেলা বশত নিবন্ধ লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি দূষিত হয়েছে। তার ফলে তিনি মোটামুটি ভাবে আর্ত্তত্রাণ সম্বন্ধে সরকারী আচরণের ও বঙ্গীয় সরকারের সংরক্ষিত অর্দ্ধাংশের সঙ্গে হস্তান্তরিত অংশের সম্পর্ক বিষয়ে কতকগুলি ভ্রমাত্মক ও সংকীর্ণ ধারণা পোষণ করে' রয়েছেন।

এ সব কথা ছেড়ে দিয়ে, আমাদের মনে হয়, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বন্যার্ত্ত অঞ্চলে ত্রাণের জন্য যে কি অদ্ভুত কাজ করেছিলেন সে বিষয়ে আপনার পাঠকদিগকে অবহিত করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। মন্ত্রী হিসাবে এ বিষয়টির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তবুও চতুর্দ্দিক থেকে যখন বন্যার্ত্তদের দুঃখ দুর্গতির সংবাদ তাঁর কানে আসতে থাকে তখন তিনি তা'তে বিশেষ বিচলিত হন। সে সময় কোলকাতা

কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের সিলেক্ট কমিটির মিটিং-এ যোগ দেবার জন্য এসেছিলেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ তাঁর নিকট থেকে বন্যাপীড়িতদের ক্ষয়ক্ষতির এক নির্ভর যোগ্য বিবরণ পান। তিনি তখন মাননীয় মিঃ পি. সি. মিত্র, মিঃ এস. আর. দাস, মিঃ মল্লিক ও অপরাপর কয়েকজন বন্ধুকে ডাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অর্থভাণ্ডার গঠন করেন। মন্ত্রীগণ প্রত্যেকে সে ভাণ্ডারে হাজার টাকা করে' দান করেছিলেন। পরের দিনের গাড়ীতে তিনি সান্তাহার যাবার সঙ্কল্প করেন এবং বাস্তবিক পক্ষে যে গিয়েছিলেন সে কথাও আজ আর কারও অবিদিত নেই। ইতিমধ্যে তাঁর নিকট থেকে এক জরুরী তারবার্ত্তা পেয়ে মিঃ কৃষ্ণকুমার মিত্রও চলে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহগামী হবার সৌভাগ্য লাভ করি। সান্তাহারে থাকাকালে তিনি সর্ব্বক্ষণ কিরূপ অক্লান্ত উৎসাহ ও একাগ্রতার সঙ্গে ঘুরাফেরা করে' কর্ত্তব্য পালনে বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন, সে কথা আমরা জানি ও স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি। সকালে পৌছামাত্র প্রথমে তিনি ডাক্তার বেণ্টলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর নিকট শুনে খুশী হন যে, স্বাস্থ্য বিভাগের চৌদ্দজন পদস্থ কর্ম্মচারী প্রথমাবধি বন্যাপীড়িত অঞ্চলে কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ করেছেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ মিঃ কৃষ্ণকুমার মিত্র, বগুড়ার মহকুমা অফিসার ও অন্যান্যদের সঙ্গে করে' ট্রলী যোগে বগুড়ার দিকে যাবার পথে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, সে সমস্ত কর্ম্মচারী জীবজন্তু ও মানুষের ভাসমান মৃতদেহগুলি প্রয়োজন মত প্রোথিত ও দাহ করার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। সেখানে বহু ত্রাণ সমিতির প্রতিনিধির সঙ্গেও তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হয়। প্রাতরাশের পর স্থানীয় কালেক্টর, মিঃ রীড, রাজশাহীর জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ হিমায়েতুদ্দিন, নাটোরের কুমার প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁকে নাটোরের দিকে নিয়ে যান। সরকারী কর্ম্মচারী ও ত্রাণ কর্ম্মীদের মধ্যে এরূপ

চমৎকার ও সংক্রামক উৎসাহ লক্ষ্য করে' স্যার সুরেন্দ্রনাথের বুক গর্ব্বে নেচে উঠে। প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও নিজে ট্রলীতে ভ্রমণ করে' ও অন্যান্য ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে দিন অতিবাহিত করে বুঝতে পারলেন যে, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলি একযোগে কাজ করে' অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে এনেছে। সে সময় নবগঞ্জ মহকুমার সব বড় বড় অঞ্চলে ত্রাণকর্ম্মীর অভাব ছিল। বঙ্গদেশের অপর কৃতীসন্তান মিঃ কৃষ্ণকুমার মিত্রের উপর তার ব্যবস্থার ভার দিয়ে সেদিন অপরাহ্নে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে দার্জ্জিলিং অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি চুয়াত্তর বৎসর বয়সে যা' করেছেন তদপেক্ষা অধিক কিছু করা ওবয়সে আর কারও পক্ষেই সম্ভব হত না। আমাদের মনে হয় লোকহিতকর কর্ত্তব্যজ্ঞানের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্যার সুরেন্দ্রনাথ সেদিন স্থাপন করেছিলেন আজকের ভারতে তদপেক্ষা সুন্দর দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল।

সে যাই হোক, তিনি যখন সান্তাহারে যান তখন সর্দ্দিতে আক্রান্ত ছিলেন। সমস্ত দিন রৌদ্রে ঘোরাফেরার ফলে তা' বৃদ্ধি পায় এবং ফিরে আসবার পর জ্বর ও ব্রঙ্কাইটিশ রোগে শয্যাগত হন। সৌভাগ্যবশত তিনি এখন আরোগ্যের পথে। মহাশয়, বোধ হয় আপনি স্বীকার করবেন যে, যাঁকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে বঙ্গদেশের 'গ্র্যাণ্ড ওলড ম্যান' বলে সম্বোধন করে থাকি তাঁর যোগ্য দৃষ্টান্তই তিনি স্থাপন করেছিলেন।

ভবদীয়,—

সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক,

ডি. সি. ঘোষ, (আইনসভার সদস্য)

ফনীন্দ্রলাল দে, (আইনসভার সদস্য)

বি. সি. চ্যাটার্জী (ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল)

১৮ই অক্টোবর, ১৯২২।

ষড়ত্রিংশত্তি অধ্যায়

দ্বৈতশাসন

বোধ হয় মন্ত্রীহিসাবে আমি যে সকল কাজকর্ম্ম করেছিলাম তার বর্ণনা বিস্তৃত ভাবেই দিয়েছি। কোন ব্যক্তিগত কারণের বশবর্ত্তী হয়ে আমি তা' করিনি। শাসন সংস্কারের যথার্থতা প্রতিপাদন করাই ছিল আমার বাস্তবিক উদ্দেশ্য। এবার কাউনসিল কক্ষের মধ্যেই ধ্বনি তোলা হ'ল যে, শাসন সংস্কার কেবল মাত্র আকাশ কুসুম ছাড়া কিছু নয়। আর দ্বৈত শাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এক হিসাবে বিচার করলে এ হ'ল সেই পুরাতন আক্রমনেরই পুনরাবৃত্তি। সংস্কার পরিকল্পনা প্রকাশ হবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে চরমপন্থী রাজনৈতিক কর্ম্মিগণ তাকে সাঙঘাতিক ভাবে আক্রমণ করেছিলেন। এক অত্যন্ত সঙ্কটময় ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তন করে' তার কার্য্য আরম্ভ করা হয়। মেসটন-বিনির্ণয় সংস্কারকার্য্যকে গুরুতর ভাবে ব্যাহত করতে লাগল। অর্থের অনটন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পোন্নয়নের জন্য কল্যাণমূলক পরিকল্পনার প্রবর্ত্তনে ও প্রসারে বাধা জন্মাতে লাগল। আইন সভার প্রথম অধিবেশনকাল যখন শেষ হ'ল তখন নূতন করে' পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ হ'ল। চিৎকার উঠতে লাগল দ্বৈত শাসন ব্যর্থ হয়েছে। নূতন ব্যবস্থার সারকথা ছিল দ্বৈতশাসন। একবার যদি তা' ব্যর্থ হয়েছে বলে' মেনে নেওয়া যায়, তা' হ'লে শাসন সংস্কারও সেখানেই শেষ হয়ে যাবে। অন্ততঃ পক্ষে যেরূপে তা'কে প্রবর্ত্তিত করা হয়েছে সেরূপে আর রাখা সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে দুটির মধ্যে যে কোন একটি ঘটনা ঘটতে পারে। হয় পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসিত সরকার গঠনের দাবী মেনে নিতে হবে, নয়ত পুনরায় পুরাতন

আমলা তান্ত্রিক নিয়মে ফিরে যেতে হবে। এ দুটির কোন্‌টি করা হবে তা' নির্ভর করবে পার্ল্যামেণ্টের বিবেচনার উপর।

শেষ পর্য্যন্ত পার্ল্যামেণ্ট কি স্থির করবে সে কথা পূর্ব্ব থেকে বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনরূপ গুরুতর প্রশ্ন সম্পর্কে পার্ল্যামেণ্ট ও বৃটিশ গণতন্ত্রের যা' মতামত তা' স্পষ্ট ভাবেই তাঁরা বলেদিয়েছেন। অবশ্য ইচ্ছা করলে তা' তাঁরা পরিবর্ত্তনও করতে পারেন। এবং আমি আশা করি অধিকতর অগ্রগতির পক্ষেই তাঁরা মত দেবেন। তবে ইংরেজ জনগণকে আমরা যতটা বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় না যে, এত দ্রুত তাঁরা মত পরিবর্ত্তন করবেন। যখন তাঁরা পরিবর্ত্তন করেন তখন পুনরায় পুরাতন বেশ ধরে' পুরাতন ঐতিহ্যতেই লেগে থাকেন। ১৬৮৮ সালের মহান বিপ্লবের বেলাতেও তাঁরা তাই করেছিলেন। ১৯১৯ সালের গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া য়্যাকট একটি পার্ল্যামেণ্টের বিধিবদ্ধ আইন। তার ভূমিকার মধ্যে বলা হয়েছে যে, দায়িত্বশীল সরকারই হ'ল বৃটিশ শাসনের উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য। ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপেই তা'কে আয়ত্ত করতে হবে। সে আইনের মধ্যে আরও বলা হয়েছে যে, ১৯২৯ সালের পর এক পার্ল্যামেণ্টরী কমিশন অনুসন্ধান করে' সংবিধানে আর কি-কি পরিবর্ত্তন আনা আবশ্যক সে বিষয়ে সুপারিশ করে' এক বিবৃতি দাখিল করবে। ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট যে বাণী দেওয়া হয়েছিল তাকে কার্য্যকর করার উদ্দেশ্যে এ সমস্ত প্রাথমিক বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

কাজেই দেখা যাবে যে, বৃটিশ পার্ল্যামেণ্ট ও গণতন্ত্র ক্রমেক্রমে ধাপে ধাপে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য বাস্তবিক প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। দশবছর চেষ্টার পরেই তা' পূর্ণভাবে দেওয়া হ'বে। সুতরাং অবিলম্বে পূর্ণদায়িত্বশীল সরকার গঠনের ক্ষমতাদান পার্ল্যামেণ্টের প্রকাশ্য নীতির অন্তর্গত নয়। যাঁরা বাধাদানের কৌশল ও নীতি গ্রহণ করেছেন

তাঁদের চাপে পড়ে কি বৃটিশ পার্ল্যামেণ্ট ও বৃটিশ জনগণ তাড়াহুড়ো ক'রে তাঁদের নীতি পরিবর্ত্তন করবেন ? বৃটিশ পার্ল্যামেণ্টের ঐতিহ্যের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল। ইংরেজদের মত প্রকাশক প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রগুলি কোন কোন আইন সভার কার্য্যে বাধা দানের যে নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করে' বলেছেন যে, তা'তে এই অস্থায়ী ব্যবস্থার মেয়াদ স্বল্পস্থায়ী না হয়ে দীর্ঘস্থায়ী হবারই সম্ভাবনা রয়েছে। কাউনসিলের মধ্যে এভাবে বাধাসৃষ্টির কৌশল যদি বাইরে জনগণকে উত্তেজিত করে' বিপ্লব সৃষ্টির পূর্ব্বাভাস হয়, তা' হ'লে তার মধ্যে এক যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় এবং তা' বোধগম্যও হয়। আর যদি তা' না হয়, তা' হ'লে এসব সম্পূর্ণই বৃথা ও অর্থহীন। তাতে সরকারকে ধ্বংশ করা যাবে না। হয়ত তার মধ্যে সামান্য জন সংযোগ যা' রয়েছে, তা' থেকেও তাকে বঞ্চিত হ'তে হবে। এবং তখন তাকে পুরাতন আমলা তন্ত্রেই ফিরে যেতে হবে, যার উৎপত্তিও সম্ভবত অবিরাম এরূপ নীতি অনুসরণেরই ফল। এ সমস্ত বাধাদানকারী এক স্বেচ্ছাচারী সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন বলে সাময়িক ভাবে আপনাদিগকে নায়ক বলেও জাহির করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যখন চলে যাবেন, তখন তাঁদের দেশবাসীদের জন্য রেখে যাবেন কেবল মাত্র তাঁদেরই অন্যায় ক্রিয়াকলাপের তিক্ত ফল। বঙ্গদেশে ও মধ্যপ্রদেশে বস্তুত তাহাই হয়েছে। কানপুরের মামলাগুলিতে এক বিপ্লবীর যে একখানি পত্র দাখিল করা হয়েছে সংবাদ পত্রে তার বিবৃতি প্রকাশ হয়েছে। বোধহয় পত্রখানি থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

"বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপোষক দল যেখানে নেই, সেখানে আইনসভা বিনষ্ট করবার চেষ্টা সফল হওয়াও দুঃসাধ্য।"

সুতরাং এই বিপ্লবী লেখকের মতে আইন সভা নষ্ট করা আর বিপ্লব একই সঙ্গে পরিচালিত করা আবশ্যক।

দ্বৈতশাসনের উপর এই প্রচণ্ড আক্রমণ চালাতে গিয়ে সংস্কার পরিকল্পনায় যে সব মৌলিক বিষয়ের উপর দ্বৈতশাসন প্রতিষ্ঠিত তাকেও অবজ্ঞা করা হয়েছে। পরিকল্পনার যাঁরা সমর্থক দ্বৈতশাসন সম্পর্কে তাঁদের মনেও বিশেষ কোন মোহ নেই। বরং তাঁদের মধ্যে অনেকেই তার সাফল্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবেই সন্দেহ প্রকাশ করেছে। খুব বেশী হ'লে তা' ছিল এক সাময়িক ব্যবস্থা—এক বিরাট পরীক্ষার সুরু। যুগ্ম পার্ল্যামেণ্টরী কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় আমি ন্যাশন্যাল লিবার‍্যাল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বলেছিলাম, "আমরা যে দ্বৈতশাসনকে সমর্থন করি তার কারণ এ নয় যে, আমরা তা'কে এক আদর্শ পদ্ধতি বলে' জ্ঞান করি। তাকে আমাদের সমর্থনের কারণ হ'ল, আমাদের মনে হয় ১৯১৭ সালের ২০ শে আগষ্টের বাণীকে রূপ দিতে হলে তাই হ'ল একমাত্র সম্ভাব্য পদ্ধতি। প্রথম থেকেই তার মধ্যে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের ব্যবস্থা আছে। ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে তা' দেবার ব্যবস্থা করে দায়িত্বশীল সরকারকে আমাদের দৃষ্টির মধ্যে এনে দেবার ব্যবস্থা তার মধ্যে রয়েছে। এবং এজন্যই আমরা তা' সমর্থন করি।"

আমি লক্ষ্য করেছি যে, এখন দ্বৈতশাসনের উপর যে আক্রমণ চলছে তার সঙ্গে একাধিক ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী এবং উদারপন্থী ও মধ্যপন্থী দলের প্রসিদ্ধ নেতাও যুক্ত আছেন। তাঁদের সঙ্গে মতের মিল না হতে পারে, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্যকে সন্দেহ করা যায় না। প্রথম দর্শনে তাঁরা দ্বৈতশাসনকে সমর্থন করেছিলেন। এখন তাঁরা তার বিরোধী। তাঁদের আক্রমণ আর স্বরাজ্য দলের আক্রমণ এক পর্য্যায়ের নয়। স্বরাজ্যদলের মুখ্য উদ্দেশ্য শাসন সংস্কার বিনষ্ট করা। তার যে পন্থা তাও সর্ব্বপ্রকার বিবেক বর্জ্জিত। পরলোকগত ভারত সচিব লর্ড ওলিভার তাঁর পদমর্য্যাদাবশত সংযম রক্ষা করেও স্বরাজ্য দলের নেতৃবর্গকে ষড়যন্ত্র, উৎকোচ ও অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা বলে

অভিহিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বরাজ্যদলের সংগঠন ক্ষমতার যত প্রশংসাই আমরা করি না কেন, তাঁদের কর্ম্মপদ্ধতিকে আমরা ঐকান্তিক ভাবে নিন্দা না করে' পারি না। তাঁদের রণহুঙ্কারের এই যে অনুরণন তা'কে ও বাকচাতুর্য্যের বৈশিষ্টকে আমাদের বিবেক বুদ্ধির সাহায্যে বিশ্লেষণ করে' দেখা কর্ত্তব্য। ১৯২৩ সালে মন্ত্রীদের বেতনের প্রশ্ন নিয়ে যখন আইন সভায় আলোচনা চলছিল, তখন জনৈক সদস্য মন্ত্রীদের পক্ষে ভোটদানের সঙ্কল্প করেছিলেন। ব্যাপারটি অনুভব করে' স্বরাজ্যদলের এক জনতা তাঁর বাড়ী ঘিরে ফেলল এবং বল প্রয়োগ করে' তাঁকে সেই মিটিং-এ উপস্থিত হয়ে ভোটদানে বিরত হ'তে বাধ্য করল। ভোট দিতে বিরত থাকবার জন্য যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়া হয় তার বিবরণাদি সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়। স্বরাজ্যদলের প্রাধ্যান্য বঙ্গদেশের জনজীবনে নৈতিক অবনতি এনে দিয়েছে। অতীতে তার মধ্যে যে-পবিত্রতা ছিল, এখন তা' লোপ পেয়েছে। জনজীবনের কোন বিষয় নির্দ্ধারণ করবার এখন একমাত্র মান হ'ল বল প্রয়োগ ও প্রতারণা।

তা' হ'লে দ্বৈতশাসন কি এতই নিস্ফল হয়েছে যে, এখনো যা' অবশিষ্ট সময় হাতে আছে তার মধ্যে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে তাকে সংশোধন করবার কিছু মাত্র আশা নেই বলে মনে করতে হবে, আর সে-কারণেই তাকে এখনই পরিত্যাগ করতে হবে? অথবা কি বলতে হবে যে, তা' এতই সাফল্য অর্জ্জন করেছে যে, তাকে আরও অধিক চেষ্টা করে ক্রমে-ক্রমে ধাপে-ধাপে অর্জ্জন করবার অপেক্ষায় বসে' থাকবার আর প্রয়োজন নেই? দ্বিতীয় প্রশ্নটি এখনো কেউ তুলে নি। দ্বৈতশাসনকে এই বলে আক্রমণ করা হয় যে, সমস্ত পরিকল্পনাটির অন্তর্নিহিত দোষের জন্য তা' সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাকে সংশোধন করার আর কোন আশা নেই। বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা আবশ্যক। বঙ্গদেশে দ্বৈতশাসন ব্যর্থ হয়েছে বলে আমি বলতে

পারি না। বরং বলতে পারি যে, যদি আমাদের অর্থাভাব না থাকত এবং অর্থ বিভাগের বিমাতৃসুলভ আচরণ যদি আমাদের কাজে বাধা না ঘটাত তা' হলে দ্বৈতশাসন আরও অধিক সাফল্য অর্জ্জন করত। মেস্টন বিনির্ণয় ও অর্থ-বিভাগ এদুটি একত্রে আমার অধীন বিভাগ সমূহের অনেক কল্যাণমূলক কাজে বাধার সৃষ্টি করেছিল।

কাজগুলির মধ্যে অর্থসম্পর্কিত যে-সমস্ত সমস্যা জড়িত ছিল তা' আলোচনার ক্ষেত্র এখানে নয়। তবে মেসটন বিনির্ণয় যে বঙ্গদেশের প্রতি ভয়ঙ্কর অন্যায় করেছিল তা' না বলে পারা যায় না। তা' বঙ্গদেশকে তার অর্দ্ধেক প্রাপ্য আয়কর থেকে বঞ্চিত করেছিল। পূর্ব্বে এই অর্থ বঙ্গদেশের ভাণ্ডারেই জমা পড়ত। তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের বৈশিষ্ট যে পাটশুল্ক, মেসটন বিনির্ণয়ের ফল স্বরূপ তার সমস্ত অর্থটিই ভারত সরকারের ভাণ্ডারে জমা করা হতে লাগল। আমাদের যদি আরও অধিক টাকা থাকত আর আমরা যদি তা' স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শিল্পোদ্যোগের মত জাতিগঠন সম্পর্কিত বিভাগ সমূহে মুক্ত হস্তে বিতরণ করতে পারতাম, তবে বঙ্গদেশে শাসন সংস্কার ব্যর্থ হয়েছে একথা বলা কারও পক্ষে সহজ হত না। আমি জানি যে, নদীতীরস্থ অনেক মিউনিসিপ্যালিটিতে জল সরবরাহ সম্পর্কে অনেক পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু অর্থের অভাবে তাদের কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। যে সমস্ত নূতন কর ধার্য্য হয়েছিল তা'তে যদি উদ্বৃত্ত থাকত তবে তার উপর নির্ভর করে' আমরা ঋণ করে' জল সরবরাহ ও ম্যালেরিয়া নিবারক কার্য্যে মন দিতে পারতাম। কিন্তু তাতে কোন উদ্বৃত্ত না হওয়ার ফলে তাও সম্ভব হয় নি। এরূপে অর্থের অভাবের দরুণ আমাদের কাজকর্ম্ম সবই সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল।

বিনা অর্থে যেখানে কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল সেখানে দ্বৈতশাসনের ফলে আমাদের কাজে কোন বাধা আসে নি। আইন

প্রণয়নের কাজে ও সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে আমার বিভাগে বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছিল। নিজেদের চেয়ারম্যান নিজেরা নির্ব্বাচনদ্বারা নিযুক্ত করতে পারে এরূপ মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হয়েছিল। মফস্বলের মিউনিসিপ্যালিটির বিধানসমূহ উদার করবার উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় আইন সভায় একটি বিল উত্থাপন করা হয়েছিল। মহকুমার পল্লীঅঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কিত বিষয়গুলি লোক্যাল বোর্ডের হাতে ন্যস্ত। এই বোর্ড গঠনের বিধানগুলিকে ব্যাপক করে দেওয়া হ'ল। এখন তা'রা নিজেদের জন্য বেসরকারী চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করবার ক্ষমতা পেয়েছে। আমি যখন কাজের ভার গ্রহণ করেছিলাম তখন পাঁচখানি জিলাবোর্ডের নিজেদের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করবার ক্ষমতা ছিল না। এই বিশেষ সুবিধা এখন তাদিগকেও দেওয়া হ'ল। কিন্তু আমার সময়ের সর্ব্বাধিক প্রগতিশীল যে মিউনিসিপ্যাল আইনটি রচনা করা হয়েছিল, তা' হ'ল কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন। সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহর কোলকাতার কর্পোরেশন গঠনের বিধানকে সে আইনের সাহায্যে গণতন্ত্রমূলক করা হয়েছিল। যখন এরূপ সুযোগ এসেছে সে অনুসারে অন্যান্য বিভাগেরও অনেক অগ্রগতি করা হয়েছিল। ফলেই ত গাছের পরিচয়। এত ঘটনা থাকতেও সত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে একথা কি বলা সম্ভব যে, যে-সমস্ত বিভাগ আমার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল সে-সমস্ত বিভাগে দ্বৈতশাসন সফল হয় নি ?

আমার মনে হয়,—দ্বৈতশাসনের সফলতা প্রধানত নির্ভর করে যে সচিবালয়ের সাহায্যে তা' নিয়ে কাজ করতে হবে তার আবহাওয়ার উপর, গভর্ণর, সংরক্ষিত-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যগণ এবং বিভিন্ন বিভাগের স্থায়ী কর্ম্মচারীদের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক সহযোগিতার উপরেও তা' নির্ভর করে। প্রথম ও প্রধান প্রেরণার সঙ্কেত আসে গভর্ণরের নিকট থেকে। একজিকিউটিভ কাউনসিলের

সদস্যগণের কর্ত্তব্য তা'তে সহানুভূতি পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া। স্থায়ী কর্ম্মচারীদের উচিত তদনুসারে কাজ করা। সংস্কারের প্রথম থেকেই বঙ্গদেশে এই অবস্থা ও আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। সহানুভূতিশীল আচরণে ও সাহায্য দানে লর্ড রোনাল্ডসে ও লর্ড লিটন উভয়েই ছিলেন রাষ্ট্রশাসন কাজে সুদক্ষ এবং তাঁরা মন্ত্রীদিগকে দ্বিধাহীন হয়ে সমর্থন করে যেতেন। তাঁদের কাজকর্ম্মে তাঁরা ছিলেন সংবিধানগত নৃপতির তুল্য। মন্ত্রী ও সদস্যদের মধ্যে ওঁরা কোনরূপ ভেদ করতেন না। সম্ভবত ইংরেজ জনজীবন সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা তাঁদের এদিকে সাহায্য করেছিল। একজিকিউটিভ কাউনসিলের যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁরাও তাঁদের ক্ষেত্রে নিজেদের ও তাঁদের সহকর্ম্মী মন্ত্রীদের মধ্যে কোনই পার্থক্য করতেন না। সদিচ্ছাই ছিল তখন প্রধান। আর এসঙ্গে ছিল সমমর্য্যাদার ব্যবহারিক স্বীকৃতি।

আলোচনার সময় সরকারী অনেক বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ অপরিহার্য্য হলেও, যে-সরকার এরূপে গঠিত হয়েছিল, মোটামুটি ভাবে তা' ছিল একটি সুখী পরিবারের মত। উত্তেজনাপূর্ণ কলহ বা সংঘর্ষ আমাদের কচিৎ ঘটত। আমাদের নিজেদের মধ্যে যখন আলোচনা হ'ত তখন দ্বৈতশাসনের তথাকথিত দোষ নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের রুচি হ'ত না। আমাদের আলোচনার বৈশিষ্ট্য ছিল আমরা সর্ব্বদাই আপোষ মীমাংসার মনোবৃত্তিকে প্রাধান্য দিতাম এবং এক মধুর যুক্তিপূর্ণতা তার মধ্যে বিরাজ করত। লর্ড লিটনের সময়ে সংরক্ষিত বিষয়ের উপর প্রশ্নাদি আলোচনার জন্য সরকার প্রায়ই সামগ্রিকভাবে একত্র হতেন। এখানে আমাদের কোন দায়িত্ব ছিল না। আমরা কেবল মাত্র আমাদের মতামত প্রকাশ করতে পারতাম। এবং সংরক্ষিত বিষয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করার ভার আমাদের যে-সমস্ত সহকর্ম্মীর উপর ন্যস্ত ছিল তাঁরাও আমাদের মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য ছিলেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা আমাদের সঙ্গে আলোচনা

পর্য্যন্ত করতেন না। যে সকল ব্যবস্থাকে পীড়নের ব্যবস্থা বলা হয়, সে সব ব্যবস্থার জন্য যখন আমাদের দায়ী করা হ'ত তখনই আমরা বিশেষ অসুবিধায় পড়তাম। যুগ্ম পাল্যামেন্টারী কমিটি এসব বিষয়ের সমস্ত দায়িত্ব থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু তা' হ'লে কি হবে? আমাদের যাঁরা সমালোচনা করতেন, তাঁরা এসবের দায়িত্বও আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন। কারণ, তা'তে আমাদিগকে আক্রমণ করার পক্ষে তাঁদের সুবিধা হ'ত। আমাদের মুখ ছিল বন্ধ। জবাব দিতে পারতাম না। বীরত্ব ও বিনয়ের কোন স্থান এসব আক্রমণের মধ্যে ছিল না। আমাদের নীরবতাকে দোষ মেনে নেওয়া বলে প্রচার করা হ'ত। এবং আমাদের বিরুদ্ধে দুর্ণাম করার অভিযান দ্রুত অগ্রসর হ'তে থাকত।

একজিকিউটিভ সরকারের যে-কাজের জন্য অন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে কোন আলোচনা হ'ত না এবং যাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে একজিকিউটিভ সরকার বাধ্যও ছিল না, আমার মনে আছে এরূপ এক কাজের জন্য মন্ত্রীদিগকে দায়ী করে' টাউন হলের এক সভায় তাঁদের আক্রমণ করা হয়েছিল। শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাপন্ন বলে পরিচিত কোন কোন বক্তার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এতদূর পর্য্যন্ত গিয়েছিল যে, তাঁরা আমাদের পদত্যাগ পর্য্যন্ত দাবী করেছিলেন। তাঁরা ভুলেই গিয়েছিলেন যে, আমাদের পদত্যাগে বাধ্য করবার জন্য স্বতন্ত্র আইনের ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বপালনের কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছি বলে' দোষী সাব্যস্ত করে' আইন সভাতে আমাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে তবেই আমাদিগকে পদত্যাগে বাধ্য করা যায়। সে সভার বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, একজিকিউটিভ কাউন্সিলের যে সদস্যগণ সেই আলোচ্য আদেশটি দিয়েছিলেন, কর্ম্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণের দাবী তাঁদের বিরুদ্ধে করা হ'ল না, করা হ'ল মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যাঁদের সঙ্গে সে আদেশের কোনই সম্পর্ক ছিল না। ভারতে যে সব

মন্ত্রীর হাতে রাজ্যের প্রধান প্রধান কার্য্যের ভার ন্যস্ত থাকে, তাঁদের প্রতি নিরপেক্ষ ন্যায় বিচারের এই হ'ল নমুনা।

যাঁরা অনায়াসে বঙ্গদেশে দ্বৈতশাসনের নিন্দা করতেন তাঁদের সে মনোবৃত্তি ও যে প্রকার আবহাওয়ার মধ্যে তা' করা হ'ত, তার একটি ধারণা উপরোক্ত ঘটনা থেকে করা যায়। আমার মনে হয়, এটিও সেই পুরাতন ধূয়া। "শাসন সংস্কার নিপাত যাক" কথাটিকেই মুষ্টিমেয় চরমপন্থী লোক নূতন ভাবে সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। কারণ সেই পুরোনো কথা এখন আর কেউ শুনতে রাজী হবে না। তাদের উদ্দেশ্যের স্বার্থে তার পুনঃ প্রতিষ্ঠা এখন আবার আবশ্যক হয়ে পড়েছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে কোন কোন মন্ত্রী পদত্যাগ করার ফলে বিষয়টির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেল। তা' ব'লে আমাকে যেন ভুল বোঝা না হয়। আমি একবারও বলছি না যে, দ্বৈতশাসন এক আদর্শ ব্যবস্থা। অথবা যে, এটি একটি সাময়িক সুবিধাজনক উপায় ভিন্ন অন্য কিছু। অপরাপর প্রদেশের বিষয় বা অবস্থা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। তবে বঙ্গদেশ সম্পর্কে দাবী ক'রে আমি বলতে পারি যে, দ্বৈতশাসনের ফলে অনেক উপকার এদেশে হয়েছে এবং অর্থাভাব যদি আমাদের না থাকত তা' হ'লে সম্ভবত আরও হ'ত।

কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের উল্লেখ করে আমি বলতে পারি যে, তা' কোলকাতার মিউনিসিপ্যাল সংগঠনকে গণতন্ত্র মূলক করেছে। তার মধ্যে প্রশংসনীয় যা' কিছু রয়েছে তার কথা বাদ দিলেও এমন কি, স্বরাজ্যদলের দৃষ্টিকোন থেকেও তাকে একটি ভাল আইন বলে গন্য করা যায়। কারণ, তারাও বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তে কার্য্যকর করবার জন্যই এ আইনটিকে বহুল পরিমানে ব্যবহার করেছে। এ আইন অনুসারে তারা যে সব পদ গ্রহণ করেছে তা'তেই প্রমান হয় যে, এ আইনের ব্যবস্থাগুলির প্রতি তাদের অনুমোদন রয়েছে। যে ব্যবস্থার ফলে তারা এ আইনটিকে পেয়েছে সে

দ্বৈতশাসনকে তারা যখন নিন্দা করে তখন তার মধ্যে যুক্তি বা সামঞ্জস্যের অভাব দেখে আমি বিস্মিত হই। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রচার করতে যারা মুখর তারাই আবার সেই সরকারের অধীন বিভাগ সমূহে সেই সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন হয়ে পদ গ্রহণ করে' বিরাজ করছে। আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে, ন্যায় সঙ্গত কাজের ক্ষেত্রে দ্বৈতশাসন ব্যর্থ হয়েছে বলার সঙ্গে বাস্তব ঘটনার কোনই সমন্বয় নেই।

বিষয়টি আরও একটু তলিয়ে দেখা যাক। এই যে বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, বঙ্গদেশের চাকরীর ক্ষেত্রে ভারতীয় করণের ব্যবস্থা হয়েছে, সে সবও ত দ্বৈতশাসন সরকারই প্রবর্ত্তন করেছে। সে সব সম্পর্কে কি বলবার আছে? বঙ্গদেশে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস থেকে লোক নিযুক্ত করার সংখ্যাকে বিয়াল্লিশ থেকে কমিয়ে চব্বিশ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে কি বলার আছে? মফস্বল অঞ্চলে যে এতগুলি মেডিক্যালস্কুল স্থাপন করা হয়েছে, কবিরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, সে সম্পর্কে কি বলবার আছে? দ্বৈতশাসনের অধীন বিভাগের সমস্ত ক্ষেত্রে যে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের অগ্রগতি হয়েছে, তাদের বিষয়ে কি বলবার আছে? সব শেষে, জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, রুগ্নের চিকিৎসা ও অন্যান্য শাখায় হস্তান্তরিত বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগে যে আবহাওয়ার মধ্যে পরিবর্ত্তন এনে দেওয়া হয়েছে, তাদের সম্পর্কে কি বলবার আছে?

দ্বৈতশাসনের বাস্তবিক অসুবিধা এই যে, মানুষের ব্যক্তিগত মনোভাবের অনিশ্চিততার উপর তাকে নির্ভর করতে হয়। আর তা' আবার প্রদেশ থেকে প্রদেশে এবং একই প্রদেশের অভ্যন্তরেও সময় থেকে সময়ে পৃথক পৃথক হয়। তা' থেকে রক্ষা পাবার জন্য কোন ধরাবাঁধা নিয়ম কানুন করাও অসম্ভব। তা' ছাড়া অনেক সময় তা' দুটি বিভিন্নমুখী ও পরস্পর বিরোধী (যেমন সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত)

স্বার্থের সংঘাতেরও সৃষ্টি করে। তার ফলে যে-দৃঢ়বদ্ধতা ও পূর্ব্বাপর কাজের সামঞ্জস্যের উপর কার্য্যদক্ষতা বাস্তবিক পক্ষে নির্ভর করে এবং যা' শেষ পর্য্যন্ত মানুষের নিকট স্বীকৃতি পায়, তা' রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে উঠে।

সর্ব্বশেষে, যে পর্য্যন্ত বুঝতে পারা যায়, শিক্ষিত জনমত দ্বৈতশাসনকে তীব্র ভাবে নিন্দা করেছে। জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আজকাল কোন জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানই টিকতে পারে না। সুতরাং মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে পাঁচবছর পরে এক পাল্যামেন্টারী কমিশন পাঠিয়ে সমগ্র পরিস্থিতিটি বিচারবিবেচনা করে' একটি রিপোর্টের জন্য যে সুপারিশ করা হয়েছে, আমিও তার সমর্থন করি।

দ্বৈতশাসন যথা সম্ভব সত্বর অপসারিত হওয়া উচিত। তার কারণ একথা নয় যে, সর্ব্বত্রই তা' ব্যর্থ হয়েছে। জনমত তার বিরোধী বলেই তার যাওয়া উচিত। কিন্তু তা' হলেও আবশ্যক মত নিরাপত্তার ব্যবস্থা না রেখে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতাও দেওয়া যায় না। স্বাধীনতা আমাদের চাই, তা' বলে' স্বেচ্ছাচারিতা নয়। স্বেচ্ছাচারিতা থেকেই বিপ্লবের উদ্ভব হয়। যে কোন স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের কার্য্যেই সংযমেরও ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। তা' আইন বলে, বা কোন নিয়মের বলে অথবা আচরিত প্রথার বলে করা যেতে পারে। মানুষের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত বিপদ আসা সম্ভব সে সমুদয় থেকে ইংরেজদের সংবিধানকে এভাবেই রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়েছে। এ জন্যই ইংলণ্ড পাল্যামেন্টসমূহের জননীস্বরূপা আর তাকে আদর্শ করেই সমস্ত পার্ল্যামেন্টজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয়। আমি একথা স্বীকার করি যে, তা'তে দক্ষতার অবনতি ঘটবারও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তা' হলেও আমাদিগকে তার সম্মুখীন হতে হবে। কারণ, শাসন ব্যবস্থা যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন, তা' কখনো স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প হতে পারে না।

স্বরাজ্যদলের প্রভুত্বই হ'ল প্রকৃত আশঙ্কার কারণ। গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ও প্রশাসনিক কাজে তাদের সুযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তা'তে তা'রা সফল হ'তে পারে নি। তাদের কর্ম্মপদ্ধতি দুর্নীতিমূলক ও স্বার্থপরতা দুষ্ট। কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কাজে তারা দলীয় স্বার্থের উদ্দেশ্যে জনমতকে বলি দিয়েছে। প্রদেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তারা যে অনুরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হয়ে অনুরূপ নীতি দ্বারা পরিচালিত হবে না, সে বিষয়ে কিছুই স্থিরতা নেই। তাদের ক্ষেত্রে ক্ষমতা তাদের সংযম শিক্ষা না দিয়ে তাদের মধ্যে সাংঘাতিক উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে। ন্যায় পরায়ণতার প্রতি অবজ্ঞাই যে দলের প্রধান নীতি, সে দল বেশী দিন ক্ষমতাসীন থাকতে পারে না। ভবিষ্যৎ স্বায়ত্ত শাসনের পক্ষে এটিই হ'ল আশার কথা। স্বায়ত্তশাসন ভগবানের আশীর্ব্বাদ। তার আত্মরক্ষা ও আত্মসংশোধনের বীজও তার মধ্যেই নিহিত।

বঙ্গীয় আইন সভা যে মুহূর্ত্তে গঠিত হ'ল, প্রায় সে মুহূর্ত্ত থেকেই চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলি মন্ত্রীদের বেতন হ্রাস করবার জন্য চিৎকার করতে লাগল। মন্ত্রীর গদীর জন্য যাঁরা লালায়িত ছিলেন, অথচ সে আশা যাঁরা সফল করতে পারেন নি, তাঁরাও তৎপর হয়ে সে চিৎকারের সঙ্গে সুর মিলালেন। আইনসভায় সদস্য ছিলেন একশ' চল্লিশ জন। তাঁদের থেকে তিন জনই মন্ত্রীর পদ পাবেন। অবশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে যাঁদের আশা ছিল অত্যন্ত উচ্চ তাঁরা অসন্তুষ্ট হলেন। কাউনসিল গঠিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এঁদের ভিতর থেকে এক ভদ্রলোক আমায় বলেছিলেন যে, তিনি দেখবেন যাতে মন্ত্রীরা পদচ্যুত হয় অথবা তিন মাসের মধ্যেই মন্ত্রীদের বেতন হ্রাস হয়। কাউনসিলের কার্য্যকালের নির্দ্দিষ্ট তিন বছর সময়ের মধ্যে বহু তিন মাস কেটে গিয়েছে। অথচ মন্ত্রীরাও গদীচ্যুত হননি আর তাঁদের বেতনও হ্রাস হয়নি। যথা সময়ে কার্য্যকাল শেষ হওয়ার পর কাউনসিল ভেঙ্গে গেল। বন্ধুবর তাঁর

ভোটদাতাদের নিকট ভোটের আশায় ফিরে গেলেন। তাঁর বাগাড়ম্বরে ভোটদাতাদের কিন্তু কোনই মোহ ছিল না। তাঁরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। মনে অসন্তোষ নিয়ে তিনি ফিরে গেলেন আপন ব্যক্তিগত কর্ম্মক্ষেত্রে। আবার সেই কলহ মূলক তর্কাতর্কির মহান ব্যবসা ক্ষেত্রে।

এই বিতর্কমূলক বিষয়টির প্রসঙ্গে আর একটি অদ্ভুত বিষয় ধরা পড়ে। আজও পর্য্যন্ত এ বিষয়টির কোন উত্তর পাওয়া যায়নি এবং তার সন্তোষজনক কোন উত্তর পাওয়া না গেলে, ভারতের জনমতের কোন-কোন অংশের যৌক্তিকতা ও সামঞ্জস্য সম্পর্কে দুর্ভাগ্যজনক সমালোচনার সুযোগ থেকেই যাবে। ১৯১৯ সালে শাসন সংস্কার আইন পাশ হবার প্রাক্কালে ভারতের প্রত্যেক দলের ও মতের লোকেরা এক মত হয়ে এক সুরে দাবী করেছিল যে, জনপ্রতিনিধিবর্গের ভিতর থেকে যে-সব মন্ত্রী নিযুক্ত করা হবে, তাঁদের পদমর্য্যাদা ও বেতন একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যদের সমান সমান হ'তে হবে। কিন্তু যেই মাত্র আইন পাশ হ'ল, কাউনসিল গঠিত হল, জনপ্রতিনিধিদের ভিতর থেকে মন্ত্রী নিযুক্ত করে তাদের উপর হস্তান্তরিত বিভাগগুলির ভার দেওয়া হ'ল, তখনই প্রত্যেক কাউনসিলে দাবী উঠল, মন্ত্রীদের বেতন হ্রাস করতে হবে। কিন্তু একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যদের বেতন পূর্ববৎ থেকে যাবে। কারণ তাদের বেতন নির্দ্ধারণ আইন সভার ভোটের আয়ত্তের বাইরে। এই আন্দোলনের উদ্ভাবক ছিল চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলি এবং সর্বত্রই আন্দোলনটি অবিরত চলতে লাগল। চরমপন্থীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও নরমপন্থীদল যে-সফলতার সঙ্গে শাসন সংস্কার আইনটিকে পার্ল্যামেণ্টের ভিতর দিয়ে পাশ করিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল কিছুটা তার মধ্যে আর কিছুটা ব্যক্তিগত মনোভাবের মধ্যেই ছিল এই আন্দোলনের মূল। বঙ্গীয় আইন সভার স্বল্পস্থায়ী জীবনে পাঁচবার এ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল এবং

প্রতিবারেই তা' অগ্রাহ্য হয়েছিল। মাত্র বার মাস পূর্বে সমগ্র দেশ একমত হয়ে যে মনোভাব প্রকাশ করেছিল, বিরোধী পক্ষ তাকেই অবজ্ঞা করে' নিজেদের কাজ করে যেতে লাগল। সমগ্র ভারত ঐক্যবদ্ধভাবে ও কাহারও বিনা আপত্তিতে যে বলিষ্ঠ মত প্রকাশ করেছিল মুহূর্ত্তের জন্য তার প্রতি একবার দৃষ্টি দেওয়া যাক।

১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইতে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। মিঃ হাসান ইমাম হয়েছিলেন তার সভাপতি। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সেই অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন,—"মন্ত্রীদের পদমর্য্যাদা ও বেতন একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যদের সমান সমান হইতে হইবে।" অন্যদের মধ্যে মিঃ নেহেরু (মতিলাল নেহেরু) ও মিঃ তিলক এ প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে বোম্বাইতে মধ্যপন্থীদলের প্রথম কনফারেন্সে রাইট অনারেবল মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করলে তা' সভায় গৃহীত হয়। যথা—

"মন্ত্রীদের পদমর্য্যাদা ও ভাতাদিসহ বেতন একজিকিউটিভ কাউনসিলারদের মর্য্যাদা ও বেতনের সঙ্গে সর্ব্বোতোভাবে সমান হতে হবে।"

আবার ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগেরও এক বিশেষ অধিবেশন বসেছিল। সেখানে সভাপতিত্ব করেছিলেন মামুদাবাদের অনারেবল রাজা। অনারেবল মৌলভী ফজলুল হক্ নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি সেই অধিবেশনে উত্থাপন করেছিলেন এবং তা' গৃহীত হয়েছিল,—

"মন্ত্রীদের পদমর্য্যাদা ও বেতন একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যগণের সঙ্গে এক সমান হ'তে হবে।"

কেন্দ্রীয় আইন সভার বেসরকারী সদস্যদের কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন নিম্নলিখিত সুপারিশটিও তার মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল :

"মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যদের বেতন ও ভাতার সঙ্গে সমপর্য্যায়ের রাখতে হবে।"

বঙ্গীয় আইন সভার বেসরকারী সদস্যগণ সংস্কার পরিকল্পনার উপর যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন তার মধ্যে মন্তব্য করেছিলেন, "মন্ত্রীদের পদমর্য্যাদা, বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও বেতনসহ ভাতা প্রাদেশিক একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যদের সঙ্গে একই প্রকারের হতে হবে।" লণ্ডনে যুগ্ম-পার্ল্যামেণ্টরী কমিটির সম্মুখে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ নেতা তাঁদের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তাঁদের মতামতকে এ বিষয়ে সর্ব্বাধিক নির্ভর যোগ্য বলে' আমরা গ্রহণ করতে পারি। সেই দৃঢ়বদ্ধ মতৈক্য এখানেও লক্ষ্য করা যাবে। এখানেও কোন ব্যক্তিই তার বিরোধীতা করে নি। যখন দেখা যায় মিঃ প্যাটেলের ন্যায় অসহযোগী এবং মিঃ শাস্ত্রীর ন্যায় সহযোগী একই মঞ্চে, তখন বলা যায় যে, মন্ত্রীদের বেতন হ্রাসের অজুহাত নিতান্তই তুচ্ছ। কংগ্রেস প্রতিনিধিদলের মিঃ মাধব রাও এবং মিঃ প্যাটেল যুগ্ম-কমিটির সামনে তাঁদের সাক্ষ্যে বললেন, "পদমর্য্যাদা ও বেতনের ক্ষেত্রে মন্ত্রিগণ ও একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করা চলবে না। চরমপন্থী সংবাদ পত্রগুলি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, মন্ত্রীর বেতন হ্রাসের বিপক্ষে ভোট দিয়ে আমি আমার অতীত জীবনের নীতি বিসর্জ্জন দিয়েছি। কারণ, আমি তখন সর্ব্বদাই বলেছি যে, সরকারী ব্যয় সংক্ষেপ করতে হবে এবং উচ্চ হারের বেতন হ্রাস করতে হবে। কিন্তু তা'রা সুবিধামত একটি কথা ভুলে গিয়েছিল যে, তখন আমি একটি বিষয়ে ব্যতিক্রমও করেছিলাম। এ বিষয়ে যুগ্ম-পার্ল্যামেণ্টারী কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় আমি কি বলেছিলাম তাহাই উদ্ধৃত করা যাক। এই হ'ল সেই প্রশ্ন আর তার উত্তর :—

প্রঃ—"যদি দ্বৈত ভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনাকে নীতি হিসাবে আপনি গ্রহণ যোগ্য মনে করেন, তা' হ'লে তার বিস্তারিত বিষয়ের

মধ্যে এমন কি কিছু আছে যার সংশোধন আপনি আবশ্যক বলে' বিবেচনা করেন ? যদি থাকে, সে বিষয়গুলি কি এবং আপনার মতে সেগুলি কিভাবে সংশোধন করা উচিত ?

উঃ—এ কয়টি বিষয় আমি অত্যন্ত আবশ্যক বলে মনে করি, যথা— (১) ভবিষ্যত আয় ব্যয়ের পরিকল্পনা রচনা করবার পূর্ব্বে সরকারের উভয় অংশ যুগ্মভাবে বসে সে বিষয়ে আলাপ আলোচনা করা উচিত এবং তা'দের একটি সমঅধিকার বিশিষ্ট অর্থভাণ্ডার থাকা প্রয়োজন ; (২) সংরক্ষিত বা হস্তান্তরিত বিষয় নিয়ে ভবিষ্যত আয়ব্যয় পরিকল্পনার উপর আইনসভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হ'বে একজিকিউটিভও তা' মানতে বাধ্য থাকবে। তবে তা' গ্রহণ করা বা না করা সম্পর্কে যুগ্ম-রিপোর্টে যে-ক্ষমতার ব্যবস্থা আছে উক্ত প্রস্তাব হবে সে-ক্ষমতা সাপেক্ষ ; (৩) একজিকিউটিভ কাউনসিলে দুজন মাত্র সদস্য থাকবেন এবং তন্মধ্যে একজন হবেন ভারতীয় ; (৪) বেতন ও পদমর্য্যাদাদির বিষয়ে একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যগণ ও মন্ত্রিগণ একই সমান সুযোগ সুবিধা পাবেন এবং সমান বলে গণ্য হবেন ; (৫) সংরক্ষিত বিষয় ও হস্তান্তরিত বিষয় সম্পর্কিত বিভাগগুলির প্রত্যেকের স্ব স্ব স্থায়ী কমিটি থাকবে এবং যুগ্ম-রিপোর্ট অনুসারে সহকারী সচিব থাকবে এবং (৬) প্রাদেশিক প্রয়োজনে যে কর আদায়ের ব্যবস্থা হবে তা'কে হস্তান্তরিত বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এবং মন্ত্রীদের বিনা অনুমোদনে আইন সভায় কোন কর আদায় সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে না।"

সারা ভারতের মনের কোণে যা' ছিল তা' হ'ল একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যগণ এবং মন্ত্রিগণ সমপদমর্য্যাদা, সমবেতন ও ভাতা ভোগ করবেন। আমি নিজেও বিশেষভাবে একথাটিই বলেছিলাম এবং কোনদিন তা' থেকে বিচ্যুত হই নি। গণপ্রতিনিধিগণের ভিতর থেকে নিযুক্ত মন্ত্রী ও একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্য উভয়েই একই

সরকারের অঙ্গ এবং উভয়েই একই প্রকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত। অথচ উভয়ের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য করা হয়েছে বলে প্রকাশ হয়, তবে তাদের পদগৌরবের কথা ছেড়ে দিলেও, ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি সবার অগোচরে মানুষের উপর যে ক্ষমতা বিস্তার করে, সেই ক্ষমতা ও তার উপযোগিতার পক্ষে উক্ত পার্থক্য মারাত্মক হ'ত। অর্থসংক্রান্ত বিচার বিবেচনা বাস্তবিকই মূল্যবান। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তদপেক্ষাও এক গুরুতর বিষয়ের উপর এক মহৎ ও অভিনব পরীক্ষার ভাগ্য নির্ভর করছিল। ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে সমগ্র ভারত মিলিত হয়ে যেরূপ মত প্রকাশ করেছিল ১৯২১ সালে কি কারণে যে সে মতকে উপেক্ষা করা হবে সে বিষয়েও কারও কোনরূপ যুক্তি ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত বিষয়টিই ছিল দলগত উদ্দেশ্যমূলক আর তার সঙ্গে যুক্ত ছিল ব্যক্তিগত মতামত এবং শাসন সংস্কার বিনষ্ট করবার এক গোপন অভিপ্রায়। প্রকৃত পক্ষে এক অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত আন্দোলনকে চাপা দেবার জন্যই ব্যয়হ্রাসের পবিত্র নাম মুখে উচ্চারণ করা হয়েছিল।

আমার মন্ত্রিত্ব গ্রহণের যৌক্তিকতার কথা মুহূর্ত্তের জন্য উল্লেখ করেই বোধ হয় আমি এ অধ্যায় যথাযথ ভাবে সমাপ্ত করতে পারি। এক শ্রেণীর চরমপন্থী সংবাদপত্র রব তুলেছিল যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা আমার পক্ষে উচিত হয় নি। এবং মিঃ সি. আর. দাস যখন আমার বিরুদ্ধে ভোট অভিযান আরম্ভ করেছিলেন তখন এ রবটিকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন! আমার প্রধান অপরাধ ছিল, আমি সরকারের একটি অঙ্গ ছিলাম। তার উত্তর স্বরূপ বিতর্কের অস্ত্রভাণ্ডারের অপ্রতিরোধ্য অস্ত্রের ন্যায় আমার এক চূড়ান্ত জবাব আছে। আমি সারা জীবন ক্রমান্বয়ে এক পা এক পা করে স্বায়ত্ত শাসনের জন্য কাজ করেছি। ভারতে বাস্তবিক পক্ষে কেউ যখন তার কথা চিন্তা পর্য্যন্ত

করতে পারত না, সমস্ত দেশ যখন পুরাতন ব্যবস্থায় পুরাতন নিয়মে কাজ ক'রে সন্তুষ্ট থাকত, আমি তখন তার জন্য কাজ করেছি। সরকার যখন তাকে আকাশ কুসুম কল্পনা বলে' উপেক্ষা করত, তখন আমি তার জন্য কাজ করেছি। মাত্র দশ বছর পূর্ব্বে আমার পরলোকগত বন্ধুবর তৎকালীন অর্থমন্ত্রী স্যার উইলিয়ম মায়ার এরই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় আইন সভাতে আমাকে এক "অস্থির আদর্শবাদী" ব'লে আখ্যা দিয়েছিলেন। আমাদের অবিরাম আয়াসসাধ্য চেষ্টার ফলে সে সবের পরিবর্ত্তন হয়েছে। এমন কি, সরকারেরও এখন আর সে দৃষ্টিভঙ্গি নেই। ২০ শে আগষ্ট তারিখের যে বাণী সে ত আমাদেরই সফলতার সপ্রশংস সমর্থন। যে জন্য গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধ'রে সংগ্রাম করেছি, আমাদের মধ্যে সেই স্বায়ত্ত শাসনের মন্দির নির্মাণ ক'রে তাকে সুপ্রতিষ্ঠ করতে, সমস্ত বৈষম্য ও অসমতা যাতে দূর হয়ে যায় এবং তা' জগতের স্বাধীন দেশসমূহের সমমর্য্যাদার প্রতীক হয়ে চিরকালের মত যাতে থাকতে পারে, সে উদ্দেশ্যে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে' হাত মিলাবার জন্য এখন আমাদের নিকট আমন্ত্রণ এসেছে। এই যে আমাদের প্রতি হস্ত প্রসারণ যাকে আমি অকৃত্রিম ও আন্তরিকতাপূর্ণ বলে' বিশ্বাস করি, তাকে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে কি উচিত হত? আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি যে, যদি সে রকম করতাম, তবে তা' হ'ত নিতান্ত অবিবেচকের কাজ। তা' হ'ত দেশদ্রোহিতা ও এক প্রকার বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। সুতরাং অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে, অপবাদের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হবার ভয় ও সর্ব্বপ্রকার দ্বিধামুক্ত হৃদয়ে আমি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে' সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম। আমরা বদলে গিয়েছি একথা বলা একটি অপরিচিত কূটনৈতিক চাল। প্রকৃতপক্ষে পরিবর্ত্তন যদি হয়ে থাকে, তা' হয়েছে আমাদের নয়, সরকারের। সরকারই নিজ বিবেচনা অনুসারে আধুনিক ভারতের দ্রুত প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে

আপনাকে মানিয়ে নিয়ে চলেছে। আমাদের আর সরকারের মধ্যে 'এখন যে মতভেদ রয়েছে তা' এই যে, আমরা মনে করি দেশের অগ্রগতির প্রয়োজনে অথবা মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে সরকারের যত দ্রুত চলা উচিত ছিল তত দ্রুত তাঁরা চলছেন না।

———

সপ্তত্রিংশতি অধ্যায়

উপসংহার

আমার অনেক বন্ধু আমাকে অনুরোধ করেছেন যে, আমি যাকে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের গোপন রহস্য ব'লে মনে করি, তা' যেন লিপিবদ্ধ করি। পঁচাত্তর বৎসর বয়ঃসীমা আমি অতিক্রম করেছি। কিন্তু এখনো আমি সুন্দর স্বাস্থ্য উপভোগ করছি এবং আমার মানসিক তৎপরতাও কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। লোকে বলে, আমার অভিজ্ঞতা লোকের উপকারে আসবে।

আমি সারা জীবন এ নীতিটি অনুসরণের চেষ্টা করেছি যে, স্বাস্থ্য রক্ষাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। অন্য সমস্ত কিছুই তার উপর নির্ভর করে। কোন যন্ত্র থেকে কাজ পাবার পূর্ব্বে তাকে কাজের উপযোগী করে তার কার্য্য ক্ষমতাকে পরিপাটি করে রাখা দরকার। আমাদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েক জনকে বাদ দিলে অবশিষ্ট প্রায় সকলেই অকালে দেহত্যাগ করেছেন। রামমোহন রায়, কেশব চন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, রামগোপাল ঘোষ এবং আরও অনেকে নিতান্ত অল্প বয়সে পরলোক গমন করেছেন। 'ভগবান যাঁদের ভালবাসেন তরুণ বয়সেই তাঁরা ইহলোক ত্যাগ করেন' —এরূপ যে প্রাচীন ল্যাটিন প্রবাদ আছে তাঁরা যেন তারই দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁরা যদি দীর্ঘায়ু হয়ে তাঁদের পরিপক্ক বিচার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে, তাঁদের দেশবাসীদিগকে পথের নির্দ্দেশ দিয়ে পরিচালিত করতে পারতেন, তা' হ'লে প্রভূত লাভ হ'ত।

শরীর ভাল রাখতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন নিয়মিত ভাবে যথা সময়ে ব্যায়াম করা। পরিমিত ভাবে এবং অতিরিক্ত উল্লসিত না হয়ে ব্যায়াম করতে হয়। অতিরিক্ত ব্যায়ামও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করলে শরীরের গঠন পেশীর ছন্দের সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে অভ্যস্ত হয়। সারা জীবন এবং এখনো আমি খালি পেটে

সকালে আধঘণ্টা এবং বৈকালে চা পানের পর চল্লিশমিনিট ব্যায়াম করি। বৈকালে অনেক সময় জনসেবার কাজে নিযুক্ত থাকলে ব্যায়াম করা সম্ভব হয় না, তবে রাত্রিতে আহারের পূর্ব্বেই আমি ব্যায়াম সেরে নিই। আমার মতে হাঁটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়াম। ছেলে বেলায় হাঁটার সঙ্গে আমি ডাম্বেল এবং মুগুরেরও চর্চ্চা করতাম। সকালে আহারের পূর্ব্বে ব্যায়াম করাই ভারতীয় পদ্ধতি। কুমারী হ্যারিয়েট মার্টিনো তার সমর্থন করেন। নিয়মিত ও সংযত জীবন যাপনও স্বাস্থ্যের পক্ষে সমান প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশবাসিগণ সকল সময়ে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না। তাঁদের আহার নিদ্রার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে না। তাঁরা অনুভব করেন না যে, শরীরও একটি যন্ত্র বিশেষ। অত্যন্ত নির্ভুল ভাবে তার কাজ চলে এবং অতি সতর্কতার সহিত তার প্রয়োজন মিটাতে হয়। আমি জীবন ভর সান্ধ্য অনুষ্ঠান ও সান্ধ্য ভোজ যথা সম্ভব পরিহার করতে চেষ্টা করেছি। 'সকাল-সকাল ঘুমান এবং সকাল-সকাল জাগা' —এক অতি উত্তম নীতি। আমি যখন বালক তখন টডের 'ষ্টুডেণ্টস্ গাইড' নামক পুস্তকে আমি তা' পড়েছিলাম। এবং সারা জীবন তা' অনুশীলন করতেও চেষ্টা করেছি। মন্ত্রী হওয়ার পর যখন আমাকে সরকারী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হত তখন আমি যত শীঘ্র সম্ভব পালাতে চেষ্টা করতাম। একবার আমি যখন সংবাদ পত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে লণ্ডনে ছিলাম, লর্ড ষ্ট্রেট কোণা এক সান্ধ্যভোজ সভার আয়োজন করেছিলেন। ভোজন শেষে স্বাস্থ্যকামী সুরাপান আরম্ভের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমি গোপনে সরে পড়েছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ আমার আসনের নিকটেই মুক্তবায়ু প্রবেশের জন্য একখানি দরজা খোলা ছিল। ভোজন আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই আমি তা' লক্ষ্য করেছিলাম এবং তা' শেষ হতেই আমি তৎক্ষণাৎ সে স্থান থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ি। জানি না আমাকে কেউ লক্ষ্য করেছিল কি না। তবে

এগারটার মধ্যেই আরাম করে' আমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম।

আর একবার কেন্দ্রীয় আইন সভার এক মিটিং-এ রাওলাট বিল নিয়ে আলোচনা চলতে-চলতে সান্ধ্য ভোজের সময় লর্ড চেমসফোর্ড সভার কাজ মূলতুবী করে দিয়ে সদস্যগণকে তার দেড়ঘন্টা পরে পুনরায় মিলিত হতে নির্দ্দেশ দিলেন। তাঁর কথা শেষ হতেই আমি দাঁড়িয়ে বললাম, "মাই লর্ড, আমি নয়টার সময় ঘুমাতে যাই।" লর্ড চেমস্‌ফোর্ড তাঁর সদা প্রফুল্ল হাসি ও শুভেচ্ছার সঙ্গে বললেন, "আপনাকে অব্যাহতি দেওয়া গেল, মিঃ ব্যানার্জী।" পরদিন সকালে যখন আমরা আবার মিলিত হলাম, আমি জানতে পারলাম যে, পূর্ব্ব রাত্রে যাঁরা মিটিং-এ ফিরে এসেছিলেন ভোটদেবার জন্য তাঁদের অনেককেই ঘুম থেকে জাগাতে হয়েছিল। আমার এই সকাল সকাল ঘুমাতে যাবার সংশোধনাতীত অভ্যাসের আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৮৯৭ সালে ওয়েবলি কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেবার উদ্দেশ্যে মিঃ গোখলে ও আমি তখন লণ্ডনে। উভয়ে থাকতাম হোটেল ভিকটোরিয়াতে। নিকটেই ছিল ড্রুরীলেন থিয়েটার। স্যার হেনরী আইরভিং সেখানে তখন নেপোলিয়নের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। মিঃ গোখলের ইচ্ছা ছিল আমি গিয়ে সে অভিনয় দেখি। আমি বললাম, "আপনি যদি সত্যই আমাকে চান, তা' হ'লে আমাকে বিছানা থেকে টেনে নিয়ে যেতে হবে, আর পুনরায় এগারটার মধ্যেই বাড়ী এনে দিতে হবে"। তিনি বললেন, "বেশ তাই হবে।" আমি ত শুয়ে পড়লাম। ন'টা বাজতেই আমার দরজায় শব্দ শুনতে পেলাম। ঘড়ীতে নয়টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ গোখলে উপস্থিত। এখন আর আমার পালাবার পথ নেই। শয্যা ত্যাগ ক'রে প্রস্তুত হতে হ'ল। মিঃ গোখলে সঙ্গে করে' আমাকে থিয়েটারে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমার পাশে বসে একাগ্র ভাবে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। আমার পক্ষে এ ছিল এক নূতন

অভিজ্ঞতার মত। তাঁর পক্ষেও এ এক নূতন অভিজ্ঞতা ছিল। তবে তা' আর এক অর্থে। তিনি দেখছিলেন আমার মত এক কট্টর নীতিবাদী, যিনি নাটক পরিহার করে চলতেন, তিনি কি ভাবে তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ অভিনেতার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অভিনয় খুব ভাল ভাবেই আমি উপভোগ করেছিলাম! মিঃ গোখলের পক্ষে তা' ছিল এক ব্যক্তিগত বিজয় লাভ স্বরূপ। সে আনন্দের দৃশ্য দেখে আমিও তার অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না কি ভাবে ছয় ফুটের চেয়ে উচ্চ একটি মানুষ স্যার হেনরী আয়ারভিং পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি থেকেও খাট একটি মানুষ নেপোলিয়নের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন। বিষয়টি আজও আমার কাছে এক প্রহেলিকার মত হয়ে রয়েছে। তবে, সে যাই হোক, সেই চমৎকার লোক মিঃ গোখলে রাত এগারটা নাগাদ আমাকে আমার ঘরে এনে উপস্থিত করেছিলেন।

সারা জীবনটাই আমি একই নিয়মে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ার নীতিটি মেনে চলেছি। এখন অবধি আমি যে সুন্দর স্বাস্থ্য ভোগ করছি তার জন্য আমি প্রধানত সেটিকেই কারণ বলে মনে করি। সকালে শয্যা ত্যাগ সম্পর্কে সে কথা আমি সঠিক বলতে পারি না। কারণ, সব সময় আমি দেরী করেই ঘুম থেকে উঠি। সাধারণত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি আট ঘণ্টা ঘুমাই আবার কোন কোন সময় নয়দশ ঘণ্টাও ঘুমিয়ে থাকি। ঘুমিয়েই আমি সবচেয়ে বেশী আনন্দ উপভোগ করতাম। এটা মোটামুটি আমাদের বাড়ীরই ধারা। যখন ঘুমাতে যাই তখন সমস্ত চিন্তাভাবনা থেকে আমি মনের দরজা বন্ধ করে' দিই। আমি যে গভীর নিদ্রা উপভোগ করি এটিই হল তার রহস্য। প্রথমে হয়ত এতে কিছু ইচ্ছাশক্তির দরকার হয়। পরে অনুশীলনের সাহায্যে তা' স্বভাবে পরিণত হয়। মস্তিষ্কের কাজে স্বাস্থ্যের অবনতি হয় বলে আমি মনে করি না। তবে তা' নিজের রুচি অনুযায়ী হওয়া দরকার এবং

দেখতে হবে তা'তে যেন ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। অপর পক্ষে বরং তা' রুচি অনুযায়ী হলে, তা থেকে যা' আনন্দ পাওয়া যায় তা' শরীরের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে' শরীর ও মনে বল সঞ্চার করে ও স্নায়ুকে সতেজ করে।

খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে এখনো আমি কিছু বলি নি। উত্তম স্বাস্থ্যের জন্য উত্তেজক পানীয় ও ধূমপান বর্জ্জন করতে বলা হয়। আমি সারা জীবন দুটিকেই বাদ দিয়ে এসেছি। সে জন্য যারা ধূমপান ও সুরাপান করে তাদের তুলনায় আমি জীবনে কম আনন্দ উপভোগ করেছি, একথা বলতে পারি না। সামাজিক আমোদ প্রমোদে হয়ত সেগুলো কিছুটা সহায়ক হ'তে পারে, কিন্তু তাদের পরিমিত ব্যবহারেও যে শরীরের ক্ষতি হবে না বা তাদের কোন প্রকারেই বর্জ্জন করে চলা যায় না, তা' আমার মনে হয় না। খাদ্য মানুষের জাতিগত পছন্দ অপছন্দ ও জলবায়ু অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্রত্যেক জাতিই মোটামুটি ভাবে জানে কোন খাদ্য তারপক্ষে ভাল বা মন্দ। পুরুষানুক্রমে এ ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। অবশ্য সময় ও স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারও পরিবর্ত্তন হয়। ইউরোপীয়গণ মাংসাশী। ভারতীয়েরা নিরামিষাশী। বাঙ্গালী মৎস্যাশী। মৎস্য লঘুপাক, স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিবিধায়ক খাদ্য। জাপানী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে খাদ্যের সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েই মাছ ভাত খেয়ে থাকে। তবে জাপানীরা অধিকতর মাংসপ্রিয়। একটি কথা খুব স্পষ্ট। অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তাহাই বলে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের পরিবর্ত্তন হতে থাকে। এ বিষয়ে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলা উচিত। বয়স যতই বাড়তে থাকে আমিষ ভোজনের রুচি ততই কমে আসে।

শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায়, প্রাচীন ল্যাটিন কবির কথাই ঠিক। তাঁর সময়ে যা' ছিল আজও তাই রয়েছে। সুস্থ শরীরের মধ্যে সুস্থ মনই হ'ল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। সুস্থ শরীর হ'ল ভিত্তি। আর সুস্থ মন তার উপরে নির্ম্মিত অট্টালিকা। দুশ্চিন্তা, দ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতি দোষ থেকে মুক্তি, পরিচ্ছন্ন বিবেক, মানসিক শান্তি ও সকলের প্রতি সদিচ্ছা—এ

সমস্তই হ'ল স্থায়ী ভিত্তি যার উপর শরীর নির্ভর করে। মূলত এ সমস্ত হ'ল নৈতিক ধর্ম্মী, বাস্তব-ধর্ম্মী নয়। শেষমেষ দেখা যায়, শরীর ও মন পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে' পরস্পরকে শক্তি যোগায়। মন শরীরের উপর প্রভুত্ব করে। শরীর নৈতিকজ্ঞানের সঙ্গে সহযোগিতা করে। এভাবে সব সমভাবে মিলেমিশে এক হয়ে মানুষের জীবনে যতকিছু মন্দ তার প্রতিরোধ করে এবং যা' কিছু ভাল তাকে উৎসাহ দেয় ও উন্নত করে। আর এমনি করেই মানুষ তার নিজের প্রতি ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য করে' তার ব্যক্তিগত উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করে।

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও তার আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়ে আমার মতামত ও আমার মানসিক আচরণ কি প্রকার ছিল তা' আমার এই স্মৃতিচারণের মধ্যে আমি প্রকাশ করেছি। কিন্তু আমি সামাজিক পরিস্থিতির কথা কিছুই বলি নি বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেবল যখন কোন রাজনৈতিক বা আপাত দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সমস্যার অংশ হিসাবে তা' উপস্থিত হয়েছে, তখনই প্রসঙ্গক্রমে তার কথা বলেছি। যেমন, হিন্দুসমাজে বাধ্যতামূলক বৈধব্যের কথা আমি দু' একবার উল্লেখ করেছি। হিন্দুদের চিন্তাধারার মধ্যে এ সমস্যা এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। এবং তার গুরুত্বও দিন দিন বেড়েই চলেছে। যাঁরা কোন সংস্কার বা পরিবর্ত্তনেরই পক্ষপাতী নন, তাঁরাও এ সমস্যাটি নিয়ে আলাপ আলোচনার প্রতি আগ্রহশীল। এ ছাড়া অন্যান্য যে সব সামাজিক সমস্যা আছে সে সব কিছুটা ভিন্ন স্তরের। তাদের সম্বন্ধে জনসাধারণের বোধ হয় সেরূপ আগ্রহ নেই। বর্ত্তমান ভারতের কোন মহাপুরুষের নামের সঙ্গে তাদের ইতিহাসও অনুরূপ ভাবে যুক্ত নয়। অবলাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বলে আজ যা' অবলারাও অনুভব করছেন, ওসমস্ত সমস্যার ফলে এ যাবৎ কারও মনে অনুরূপ কোন ধারণারও সৃষ্টি হয় নি। তা' সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে,

ভারতের সামাজিক সমস্যাবলী অস্বাভাবিক অসুবিধা ও জটিলতায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। হিন্দু সমাজের এমন কোন সামাজিক সমস্যার কথা চিন্তা করা যায় না, যা' তার ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত নয়। কোন সামাজিক ব্যবস্থার সমর্থনে যখন ধর্ম্মকে টেনে আনা হয়, তখন তা' মানুষের মনকে দৃঢ় ও অটলভাবে অধিকার করে বসে। এবং তার শিকড় যুক্তির পরিবর্ত্তে মানসিক প্রবণতাকে আশ্রয় করে।

এজন্য ভারতে সমাজ সংস্কারকগণকে এমন সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়, যা'কে লোকে প্রায় আধিদৈবিক বলেই বিশ্বাস করে। উপযোগিতা, প্রয়োজন, সাধারণবুদ্ধির ন্যায় গতানুগতিক ও পার্থিব অস্ত্রের সাহায্যে সে সব শক্তিকে ধ্বংশকরা এক প্রকার অসম্ভব। বংশপরম্পরায় এরূপ ধারণা হ'তে-হ'তে এখন তা'ও বদ্ধমূল সহজাত প্রবৃত্তির রূপ নিয়েছে। চৈতন্যদেবের ন্যায় কোন-কোন সংস্কারক সময় সময় উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। তা' থেকে কেবল যে সংস্কারকের অসাধারণ শক্তি ও ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তা' নয়, তা থেকে এও প্রমাণ হয় যে, যখন উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মহাপুরুষেরা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হন, ভারতের জনগণ তখন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁদের অনুসরণ করে। তথাকথিত পবিত্র ধর্ম্মের কোন বাধা তখন আর তার সম্মুখে দাঁড়াতে পারে না। স্বর্গীয় আলোর বন্যা প্রবাহের সঙ্গে তাঁর বাণী বিশ্বাসীগণকে অভিভূত করে এবং তাদের প্রাণে নূতন উৎসাহের সঞ্চার করে' সম্মুখে যা' পায় সমস্তই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মানুষ তখন অনুভব করে যে, যতকিছু জীর্ণপুরাতনকে অপসারিত করে' নূতনের প্রতিষ্ঠার বাণী নিয়ে এক অবতারের আবির্ভাব হয়েছে। কোন প্রচলিত রীতিনীতি দ্বারা তিনি আবদ্ধ নন। কোন বিধি বা অনুষ্ঠান তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। সব কিছু থেকে তিনি অনেক উর্দ্ধে। তাঁর মধ্যে রয়েছে এক দৈব প্রত্যাদেশের প্রেরণা। তাঁর অন্তর্নিহিত সত্যকে

তিনি এমন ভাবে প্রচার করেন যে, তা' মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করে' তার হৃদয় বৃত্তিকে নাড়া দেয়।

বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠতম সংস্কারক চৈতন্যদেব ছিলেন এরূপ এক অবতার। বুদ্ধের ন্যায় তিনি ছিলেন প্রাচীন কুসংস্কার ধ্বংশ করতে বিশেষ আগ্রহী। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। এবং বাধ্যতামূলক বৈধব্য প্রথাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। এক স্বর্গীয়-বাণীর মুখোমুখী দাঁড়াল সর্ব্বশক্তিমানের দ্বারা নির্বাচিত আর একজনের ভিতর দিয়ে প্রচারিত অন্য এক স্বর্গীয়-বাণী। সংঘাত আরম্ভ হ'ল। কিন্তু পুরাতন এখনো ধ্বংশ হয় নি। প্রাচীন ও নবীনের সংগ্রাম আজও চলছে। মানবিকতার যাঁরা বাস্তবিক বন্ধু শেষ জয়ের আশা নিয়ে তাঁরা বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিগুলির দিকে তাকিয়ে আছেন। নবনব ভাবধারা নব প্রেরণার পক্ষ বিস্তার করে' আজ ছুটে চলেছে। নূতন চিন্তাধারার-প্রভাবের মত শক্তিশালী কিছু জগতে আর নেই। প্রচলিত প্রথার পর্ব্বত প্রাচীর বেয়ে ক্ষীণ ঝর্ণাধারার মত এটি নেমে এসে তা'কে ক্ষয় করে' করে' ক্রমশ বিস্তৃত ও গভীর হবে এবং অবশেষে এক বিশাল ও ক্রমবর্দ্ধমান জলপথে পরিণত হবে।

মহাপুরুষদের সংখ্যা ব্যাং-এর ছাতার মত অগনিত হয় না। তার ফলে সামাজিক অগ্রগতির ধারাও স্বভাবতই মন্থর। ধর্ম্মীয় ভাব তার মধ্যে নিয়ে আসে জটিলতা। এ ছাড়া যে-সম্প্রদায় যত প্রকাণ্ড হয়, তার অগ্রগতিও তত ধীরে হয়। তা' সত্ত্বেও তার গতির কখনো বিরাম নেই। সামান্য প্রেরণা পেলেও জনগণ উৎসাহিত হয়ে উঠে।

আমাদের পরিবেশ যা' হয়েছে এবং পুরুষানুক্রমে যা' হয়ে এসেছে, তার ফলে প্রত্যেক হিন্দুর মধ্যেই এক প্রবল রক্ষণশীল পক্ষপাতিত্ব বাসা বেঁধে রয়েছে। মহামতি নেপোলিয়ন বলতেন, "একজন রুশবাসীর গায়ে আঁচড় দাও, দেখবে একজন তাতার বেড়িয়ে পড়েছে"। একজন হিন্দুর গায়ে আঁচড় দিলে দেখবে সেও গোঁড়া। অবশ্য উল্লেখনীয়

ব্যতিক্রমেরও অভাব নেই। ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের মত যাঁরাই কর্ত্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে জীবনের সামাজিক ব্যাপারাদিতে প্রগতিশীল ভাবধারা অনুসরণ ও অভ্যাস করেছেন, দেশের সামাজিক অগ্রগতির জন্য সমস্ত গৌরব তাঁদেরই প্রাপ্য। আমাদের অধিকতর গোঁড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁরা এক স্থায়ী প্রতিবাদ স্বরূপ। তবুও আমি ব্রাহ্মসমাজের এই প্রগতিশীল রীতিনীতিকে গ্রহণ করবার বিষয়ে কখনো মন স্থির করতে পারি নি। সে সবই যে সমাজের লক্ষ্য বস্তু এ বিষয়ে কোন ভুল নেই। তবে, ক্রমোন্নতির সঙ্গে ধীরে ধীরে তা'তে পৌঁছাতে হ'বে। জনসাধারণের কাজ করতে গেলে কোন বিশেষ নীতি নিয়ে বসে থাকলে চলে না। পরিস্থিতি বিচার করেই নীতি নির্দ্ধারণ করতে হয়। এডমাণ্ড বার্ক অবিরত এই সাধারণ নিয়মটিরই উল্লেখ করতেন। আর ভারতে তার প্রধান প্রচারক ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়। তিনি ছিলেন এক নূতন ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রবর্ত্তক। কিন্তু জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র ধারন করে' তিনি পুরাতনের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক অটুট রেখেছিলেন। এ বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁরই অনুসরণ করেছিলেন। আর এই দেবতুল্য মহর্ষিই ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ।

আমার মনে হয় সমাজিক জীবনে উন্নতি করতে হলে, যতদূর সম্ভব সমগ্র সমাজকে আমাদের সঙ্গে করে' চলতে হবে। নিয়মিত ভাবে ধীরে ধীরে তাকে উন্নত করে' তুলতে হবে। দেখতে হবে হঠাৎ যেন তার মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয় বা তার ভাঙ্গন না ধরে। নূতনকে মানিয়ে নিতে হবে পুরাতনের সঙ্গে। আর পুরাতনের মধ্যে যা' কিছু ভাল তা' করতে হবে নূতনের অঙ্গীভূত। শতাব্দীর পর শতাব্দী এপথ ধরেই হিন্দুসমাজের ক্রমোন্নতি হয়েছে। দু'শ' বছর পূর্ব্বে হিন্দুসমাজ যেখানে ছিল আজও সেখানেই পড়ে আছে মনে করা এক ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। কিন্তু যে পরিমাণে অগ্রসর হ'তে দেখলে হয়ত

অনেকেই আনন্দিত হ'ত, সে পরিমাণে না হলেও এ সমাজ যে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে একথার মধ্যে কিছুমাত্র ভুল নেই। গ্যালিলীওর ভাষায় বলতে হয়, "এটি চলেছে", তবে আমি যেভাবে বলেছি অনেকটা সে ভাবেই, নিজেকে মানিয়ে নেবার পথ ধরে'। সমুদ্র যাত্রা, বাল্যবিবাহ বা এমন কি, বাধ্যতামূলক বৈধব্যের প্রশ্নও বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে যেখানে ছিল, আজ আর সেখানে নেই। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে বিলেত-ফেরত ব্রাহ্মণ বলে' আমি ছিলাম জাতিচ্যুত। আজ সমাজে আমার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। হতে পারে, আমার জনসেবামূলক কাজ তা'তে কতক পরিমাণে সহায়তা করেছে। কিন্তু যদি অগ্রগতির নীরব ও মহান শক্তিগুলি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ও অপ্রতিরোধ্যভাবে সমাজের অন্তঃস্থলে কাজ করে' যে-আদর্শগুলিকে জনগণের অন্তরে রোপন করেছে তাদের ফলপ্রসূ হতে সহায়তা না করত, তা' হ'লে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর বহু বৎসর যেমন তাঁর সমস্ত জনসেবার কাজ শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল, আমার ক্ষেত্রেও অনুরূপই হত। জাতিভেদ প্রথার অপসারণ ও তার শিথিলতাকে নানা কারণেই অসাধারণ বলা যায়। মাত্র কয়েক বৎসর আগেও একজন অহিন্দুর সঙ্গে একত্র ভোজন এক জঘন্য কাজ বলে বিবেচিত হত। কিন্তু এখন খোলাখুলি ভাবে তাকে সমর্থন না করলেও, তা' নিয়ে কেউ আর কথা বলে না। গত কয়েক বছরের মধ্যে তার কঠোরতা আরও শিথিল হয়েছে। উচ্চ ও নীচ জাতির মধ্যে বিবাহে যে বাধা ছিল তা' হ্রাস হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণে-কায়েতে বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ। এখন এরূপ বিবাহ প্রায়ই হতে দেখা যায়। এবং এরূপ সংস্কার-কাজে আমি নিজেও অংশ গ্রহণ করেছি। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাদি অত্যন্ত হিতকর হয়েছে। কিন্তু তাদেরও পশ্চাতে ছিল অগ্রগতির জন্য সমগ্র সমাজের এক মন্থর অথচ বিরাট প্রচেষ্টা।

আমার স্মৃতিচারণ শেষ করেছি। এসব আমার দীর্ঘকালের বিচার

বিবেচনা ও পরিপক্ক চিন্তার ফল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার রাজনৈতিক জীবনের ন্যায় কারাগৃহ থেকে আইনসভাকক্ষ ও সরকারী কার্য্যে পদচ্যুতি থেকে মন্ত্রীর আসনে উন্নয়ন, এসবের মত এত ঘটনাবহুল ও পরিবর্ত্তনময় জীবনের বিবরণ আমার দেশবাসিগণের উপকারে আসতে পারে। আমাদের গন্তব্যে উপনীত হতে এখনো বহুদূর পথ অতিক্রম করতে হবে। দুস্তর মরুপথ এখনো আমরা শেষ করতে পারি নি। সবে আমরা প্রথম স্তরে এসে পৌঁছেছি। দীর্ঘকালের কঠোর চেষ্টা ও শ্রম আমাদের জন্য অপেক্ষা করে' আছে। এই ক্লান্তিকর চলার পথে, যে-সহযাত্রী তার যাত্রার প্রাথমিক অবস্থায় সামান্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল, পরিশ্রমের ও বিজয়ের আস্বাদ উপভোগ করেছিল, তার পরামর্শ ও দৃষ্টান্ত, পথ চলতে চলতে যাদের পা' ক্ষত বিক্ষত হয়েছে, কাজের গুরুভারে যাদের পিঠ নত হয়ে পড়েছে ও যারা পথের নির্দ্দেশের জন্য না হলেও অন্তত উদ্দীপনার জন্য আকুল নয়নে ইতস্তত তাকাচ্ছে, তাদের নিকট হয়ত সাদরে গৃহীত হবে। এই স্মৃতিচারণ লেখার পশ্চাতে স্বদেশের হিতসাধক এক মহান উদ্দেশ্য আমার ছিল বলে' আমি দাবী করতে পারি। আমার যে সমস্ত মাননীয় সহকর্ম্মী ইহলোক ত্যাগ করেছেন, আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতিও ন্যায় বিচারে ইচ্ছুক। আমি দেখাতে চাই কি ভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতি আরম্ভ হয়েছিল ও কি ভাবে তা' ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করেছিল। তা' থেকে ভবিষ্যতে পথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সর্ব্বোপরি, যে-সমস্ত বিপদ ও প্রলোভন আমাদের অভীষ্টের দিকে এগিয়ে যাবার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, সে সব সম্পর্কেও সতর্ক করে' দিতে আমি অভিলাষী। ১৯১৫ সালের ৩১শে মে তারিখে বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের অন্তর্গত রাঁচী সহরের এক সহরতলীতে নির্মিত আমার এক শান্তিময় ক্ষুদ্র কুটিরে বসে আমার এই স্মৃতিচারণ লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। তারপর থেকে স্থানীয় স্বায়ত্ত

শাসন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত আমি নিয়মিত ভাবে আমার এই লেখা চালিয়ে যাই। পরে তা' কিছুকাল বন্ধ থাকে। ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে আমার লেখা আমি পুনরায় আরম্ভ করি। এ ছিল আমার পক্ষে এক সখের শ্রম। এতে বারবার আমি আমার পুরাতন দিনগুলিকে ফিরে পেতাম। ফিরে পেতাম আমার যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী ও বন্ধুগণকে, মৃত্যুর নির্ম্মম হাত যাঁ'দিগকে আমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা লুপ্ত হয়ে যাবার পরও তার স্মৃতি অন্তরে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে তার মধ্যে বিচরণের আনন্দের সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা হয় না। বাস্তবিক পক্ষে তা' সজীব-বর্ত্তমান থেকে নিয়ে যায় এক নিষ্প্রাণ অতীতে—যে অতীত তখন আর নির্জ্জীব ও অসার না থেকে স্মৃতির কঠোর শ্রম ও ঐকান্তিক আশার স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে এই স্মৃতিচারণ কিসের নির্দ্দেশ দেয় আর তা' থেকে শিক্ষা করবারই বা কি আছে? এখানে আমি মিঃ রমেশচন্দ্র দত্তকেই উদ্ধৃত করব। তিনি কোন কল্পনা বিলাসীও ছিলেন না, আর কোন কিছুতে অতিরিক্ত উৎসাহও দেখাতেন না। তিনি ছিলেন একজন সংসারাভিজ্ঞ লোক এবং একজন সুবিবেচক। অবশ্য তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক কল্পনায় ভরপুর। তাঁর উপন্যাসগুলিতেই তার প্রমাণ রয়েছে। তবে এ কল্পনা ছিল কোনকিছু সম্পর্কে তাঁর অন্তর্নিহিত জ্ঞানের দ্বারা পরিশোধিত। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মিঃ জে. এন, গুপ্তের লেখা মিঃ রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনীতে একখানি চিঠির উল্লেখ আছে। বরোদার প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে মিঃ দত্ত চিঠিখানি আমার কাছে লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন,—"আমাদের জীবনের এই এক পুরুষের মধ্যেই কি অদ্ভুত বিপ্লবই না আমরা দেখলাম। কি পরিবর্ত্তন—আর তাতে কি মহান অংশ না আপনি গ্রহণ করেছেন। আমাদের সময়েই আমরা এই আশ্চর্য্যজনক

পরিবর্ত্তন দেখবার সুযোগ পেলাম।" আকৃতি ও প্রকৃতিতে তা' এক বিনারক্তপাতে বিপ্লবের রূপ নিয়েছে।

এ কথাগুলির মধ্যে অতিরঞ্জিত কিছুই নেই। নিছক সত্য কথাই যে তাতে প্রকাশ পেয়েছে, সমসাময়িক ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। রাজনীতির দিকে তাকিয়ে আমরা কি পাই? ১৮৭৫ সালে আমি যখন দেশসেবার কাজ আরম্ভ করি তখন লোক্যাল বডিগুলির মধ্যে জনসাধারণের কোন স্থানই ছিল না। আজ বঙ্গদেশে মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা একশ ষোল। তখন কেবল চারখানি মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়া অন্য সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যগণ সকলেই সরকারের দ্বারা মনোনীত হতেন। এবং তাদের উচ্চতম কর্ম্মাধ্যক্ষ যে চেয়ারম্যান, তিনিও সেরূপেই নিযুক্ত হতেন। আইন সভাগুলির অবস্থাও ছিল তদনুরূপ। সমস্ত সদস্যই হতেন সরকার মনোনীত। সরকারের প্রশাসনিকক্ষেত্র প্রশাসন সম্পর্কিত নীতি নির্দ্ধারণ ও তার ব্যবস্থাদি করত। তার মধ্যে কোন মনোনীত বা নির্ব্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধির স্থান ছিল না। মুষ্টিমেয় ভারতীয় ছিলেন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ছিল একদল বাছাই করা লোকের সমষ্টি। তাঁরাই দেশ শাসন করতেন। ভারতের জনমত ছিল দুর্ব্বল, কণ্ঠ ক্ষীণ। জাতীয় জীবনের কোন স্পন্দনই তখন অনুভব করা যেত না। বিশাল ভারত মহাদেশ তখন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ছিল বিভক্ত। একটির সঙ্গে অপরটির না ছিল কোন সঙ্গতি, না কোন সামঞ্জস্য। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে তাদের ঐক্যের ছিল অভাব। প্রত্যেকেই কথা বলত ভিন্ন সুরে। তর্কাতর্কি, ঝগড়াঝাটি, সংঘর্ষ, ভাষাবৈষম্য এবং পরস্পর বিরোধী মতামত নিয়ে দ্বন্দ্ব-কলহ করে' তারা শক্তি ক্ষয় করত।

সে চিত্রের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান চিত্র কিরূপ দেখা যাক। বঙ্গদেশে এবং অন্যান্য প্রদেশে জনমতকে ভিত্তি করেই লোক্যাল বডিগুলি সংগঠিত হচ্ছে। ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে কোলকাতা

কর্পোরেশন তার গঠনপ্রণালী গণতন্ত্রমূলক করা হয়েছে। জনমতের ধারা অনুসারেই আইন সভাগুলি গঠিত হয়েছে এবং জনপ্রতিনিধিই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। একজিকিউটিভ কাউনসিল সমূহেও ভারতীয়ের অংশ মন্দ নয়। দেশের প্রশাসনের ব্যাপারে তাদের মতকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। সর্ব্বশেষ, প্রদেশ সমূহে পার্ল্যামেণ্ট-জাতীয় আইন সভার প্রারম্ভিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়েছে। এবং তৎসঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে যে, পূর্ণস্বায়ত্ত শাসন আর দূরে নয়। চাকরীর ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর তৎপরতার সঙ্গে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় নিযুক্ত করা হচ্ছে। হতে পারে, একাজ আরও ত্বরান্বিত করা উচিত ছিল; কিন্তু ভারতীয়দের জন্যই যে ভারত, এ সত্যটি এখন প্রধান সরকারী নীতি হিসাবেও স্বীকৃতি পেয়েছে।

ভারতীয় জনমতের যে কি শক্তি, তা' বঙ্গভঙ্গ নীতির সংশোধনেই প্রমাণিত হয়েছে। এক সময়ে উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষ বারবার বলেছে, বঙ্গভঙ্গ স্থির ও অপরিবর্ত্তনীয় এক ব্যবস্থা। ভারতের জনমত তাকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ভারতের জনমতই জয়ী হয়েছে। মুদ্রাযন্ত্র আজ স্বাধীন, মুখর এবং সর্ব্বশক্তিমান না হলেও এক প্রকার সব বলা যায়। আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় সংগঠনে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছেয়ে গেছে। সুতরাং মাত্র পঞ্চাশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এক বিরাট বিপ্লব দেশের মধ্যে ঘটে' গেছে। কেবলমাত্র কোন-কোন ক্ষণস্থায়ী সন্ত্রাসমূলক হিংসা ছাড়া কোথাও কোন রক্তপাত হয় নি। যাঁরা অতিমাত্রায় উৎসাহী তাঁরা হয়ত যা' অর্জ্জিত হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁরা সমস্ত কিছুই আরও ত্বরান্বিত করতে বলেন এবং লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য আরও সোজা পথ হয়ত অবলম্বন করতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু একটা রূপান্তর যে ঘটে গেছে সে কথা কেহই অস্বীকার করেন না। বিশ্বের শক্তিগুলি তাতে কিছু পরিমাণ সাহায্য করেও বা

থাকতে পারে। কিন্তু আমরাও করেছি আমাদের টুকু। আমাদের রাজনৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল স্বায়ত্তশাসন এবং তা' অর্জ্জনের উপায় স্থির করা হয়েছিল বৈধ পদ্ধতি। ভারতের জাতীয় মহাসভা ছিল আমাদের সংগঠিত সর্ব্বপ্রধান সংস্থা। এই সংস্থা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে সেই স্বায়ত্ত শাসন অর্জ্জন করবার জন্য একমাত্র বৈধ পদ্ধতিকেই কর্ম্মনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ঐকান্তিক একাগ্রতার সঙ্গে সে-উদ্দেশ্যে ত্রিশ বছরের অধিককাল ধরে সে-বৈধ পথেই এ সংস্থা কাজ করে গেছে। আর তাহাতে যা' লাভ করা গেছে তা' বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

এখানে আমি একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই। কারও কারও ধারণা এই যে, প্রয়োজন হ'লে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সভ্যজগতে আমাদের প্রাপ্য মর্য্যাদা অর্জ্জনের জন্য আইনের বাঁধ ভেঙ্গে সাম্রাজ্যের সীমাও অতিক্রম করে' যাওয়া আমাদের উচিত। তাঁদের প্রতি আমার উত্তর এই যে, বৃটিশজাতির ইতিহাস পাঠ করে' যতদূর জানা যায়, তা' থেকে আমার মনে হয় না যে, আমাদের লক্ষ্য করার মত কোন পরিমিত সময়ের মধ্যে সেরূপ কোন প্রয়োজন কখনো দেখা দেবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখবার চেষ্টা ভ্রমাত্মক। সেরূপ করতে গেলে আমরা আদর্শের আবর্ত্তের দিকে ভেসে গিয়ে তা' পাবার চেষ্টায় আমাদের বর্ত্তমান কাজকর্ম্মের উন্নতি ও বিকাশের পথে ব্যাঘাতের সৃষ্টি করব। "কাল কি হ'বে ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ো না। তার বিধানও বিধাতা নিজে করবেন। প্রতিবারেই তুমি কেবল সেদিনের মতই বেঁচে থাকতে চেষ্টা কর"—এই শাস্ত্রোক্তি কোন সংসারী লোকের পক্ষেই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আমরা যদি বলি যে, বৃটিশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে' আমরা স্বাধীন হ'তে চাই, অথবা বলি যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হিসাবে আমাদের অবস্থাগত দায়দায়িত্বে আবদ্ধ না হয়ে আমরা কেবল স্বায়ত্ত শাসিত সরকার গঠন

করতে চাই, এরূপ দেশহিতকর, ন্যায্য ও ভাবমূলক এক উচ্চাশার প্রতি বাধা দেবার মত কারও কিছু থাকতে পারে না! তবে প্রত্যেক রাজনৈতিক নীতির রূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে তার অবস্থার উপর। আমরা যদি আমাদের দৈনন্দিন রাজনৈতিক কাজকর্ম্মের মধ্যে এই আদর্শকে অনুসরণ করি, তা হ'লে কি দাঁড়ায়? তখন দেখব সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য তার বিশাল শক্তি নিয়ে আমাদের আদর্শ সম্পাদনের পথে আমাদের বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরপক্ষে আমরা যদি আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি, তবে তার সমস্ত প্রভাব আমাদের অনুকূল হবে। তাতে আমরা কেবল যে কোন অসুবিধাতেই পড়ব না তা' নয়, বরং তাতে হয়ত আমরা বৃটিশ গণতন্ত্রীদের নিকট থেকে, এমন কি, হয়ত স্বায়ত্ত শাসিত উপনিবেশ সমূহের নিকট থেকেও, সক্রিয় সহানুভূতি অর্জ্জন করতে সমর্থ হব। বিচ্ছিন্নতায় তারা আপত্তি করবে এবং হয়ত সর্ব্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধও করবে। কিন্তু ঐক্য ও সংযুক্তিকে তারা সাদর অভ্যর্থনা জানাবে, এমন কি, সাহায্যও করবে।

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভ করবার পর প্রয়োজন হ'লে আরও অগ্রগতির জন্য কি করা উচিত তা' নির্ণয়ের ভার আমরা আমাদের উত্তরাধিকারীদের উপর দিয়ে যাব। তারাই হবে তা' নির্দ্ধারণ করবার উপযুক্ত পাত্র। তখনকার অবস্থা বিচার বিবেচনা করে' তা'রা তা' স্থির করবে। ইতিমধ্যে আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের এবং সম্ভবত সমস্ত সভ্য জগতের সাহায্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন অর্জ্জনের কাজ চালিয়ে যাব। চিন্তা করবার মত এই যে-সব বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলিকে অবজ্ঞা করা কি সম্ভব?

প্রশ্ন উঠতে পারে এই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন অর্জ্জনের পদ্ধতি কি হবে। তা' কি সুশৃঙ্খলভাবে ক্রমবিকাশের পথে হবে, না, কি খোলাখুলি ভাবে বৈপ্লবিক বা তারই অঙ্গীভূত কোন আনুষঙ্গিক উপায়ে

হবে? আমার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে নানা উত্থান পতন ঘটে গিয়েছে এবং তার ফলে এ সম্পর্কে বলবার মত কিছু যোগ্যতা আমি অর্জ্জন করেছি। ১৯০৯ সালে আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন স্যার উইলিয়ম কার্জ্জন-উইলী ও ডাক্তার লালকাকাকে হত্যা করে' ধিঙ্গড়া এক সন্ত্রাসবাদ মূলক অপরাধ করেছিল। একথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। তার ফল কি হয়েছিল? আমি সাঙ্ঘাতিক অসুবিধায় পড়েছিলাম। আমার রাজনৈতিক কাজকর্ম্ম হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। ইংলিশ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্রেরা এক গুরুতর দুর্দ্দশাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল। দোষ কাটিয়ে দিতে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল তার ঘোর এখনো সম্পূর্ণ কাটে নি। আমি আমার দেশবাসী-দিগের নিকট নিবেদন করে বলব, "বিদ্রোহের কথা বলবেন না, অথবা বাধা সৃষ্টি করার ন্যায় অনুরূপ কোন কৌশলের কথাও তুলবেন না। যদি তা' করেন তা' হলে আপনাদের অবস্থা হবে এক খাড়া ও ভয়ঙ্কর গিরিচুড়ায় দণ্ডায়মান থাকার মত। আপনাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা' আপনাদিগকে দ্রুত এক বাস্তবিক বিদ্রোহ, তার শোচনীয় পরিণাম, রক্তপাত ও একের পর এক তার প্রতিক্রিয়ার অতল গহ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। আমি আপনাদের নিকট অনুনয় করছি, আপনারা আগুন নিয়ে খেলবেন না। একবার যখন আন্দোলন আরম্ভ হয়, নানা প্রকার শক্তি তখন তাকে কেন্দ্র করে' এমন ভাবে জড় হ'তে থাকে যে, তা কোনদিন হয়ত আপনার কল্পনাতেও আসে নি। তারাই তখন আন্দোলনের আয়তন বৃদ্ধি করে' তাকে এতই ত্বরানিত করে যে, তার প্রবর্ত্তকেরা হয়ত তা' কখনো ভাবতেও পারে নি। সেই প্রবর্ত্তকেরা তখন তাকে নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হয়ে উঠে।"

আমরা হিন্দুরা বিদ্রোহকে এবং তার সঙ্গে যার সাদৃশ্য থাকে তাকে ঘৃণা করি। আমাদের আদর্শ—ক্রমবিকাশ। এ ক্ষেত্রে

প্রকৃতির নিয়মকেই আমরা অনুসরণ করে' থাকি। শিশু বড় হয়ে বালক হয়, বালক বড় হয়ে ক্রমশ যৌবনে পদার্পন করে। অনুরূপ ভাবে নৈতিক জগতেও মহাবিপ্লব বলে' কিছু নেই। সমাজের মর্ম্মস্থলে যে শক্তিগুলি বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে, তাদের দ্বারা সৃষ্ট, দেশহিতব্রতী কর্ম্মীদের কল্যাণমুলক কার্য্যাবলী এবং প্রগতিশীল সরকারের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত পালিত ও অনুপ্রাণিত বাস্তব জগতের অগ্রগতির রীতিকেই তা' ধাপে ধাপে অনুসরণ করে।

অসহযোগ আমাদের নিজস্ব সঙ্গতি ও কার্য্যাবলীর উপর আমাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে' নিজের পায়ে দাঁড়াতে আমাদিগকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু জগতের যে কৃষ্টি ও সভ্যতা চিরন্তন ও চিরপুষ্টিকর রস সিঞ্চন করে এবং যে প্রসারিত দৃষ্টি আমাদের অগ্রগতিকে সতেজ করে, অসহযোগ সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে তাদের থেকেও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়ে নিঃসঙ্গভাবে আমরা দাঁড়াতে পারি না। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েই আমাদিগকে থাকতে হবে। আমাদের নিকট দেবার মত যা' আছে আমরা তাদের দেব। এবং তাদের নিকট থেকে নেবার মত যা' আছে তা' আমরা নেব। এ ভাবেই মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাধারণ ভাণ্ডার পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হতে থাকবে। বিশ্বশক্তির সংস্পর্শে এসে এরূপে আমরা আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার বিস্তার ও উন্নতি সাধন করতে পারব এবং তার পরিবর্ত্তে আমরা আমাদের জাতি থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিকতা তাদের মধ্যে সঞ্চার করতে পারব। মনুষ্যজাতিকে আমাদের যা' দেয় তা' দিতে হবে এবং মনুষ্যজাতিও চক্রবৃদ্ধির সুদের অনুকরণে বর্দ্ধিত করে' তাদের কাছে যে জ্ঞান ও প্রেরণার অমূল্য সম্পদ রয়েছে তা' আমাদিগকে দিয়ে তার সে ঋণ পরিশোধ করবে।

পুরাতন যে ভিত্তি তার উপরেই আমাদের দাঁড়াতে হবে। তাকেই আমরা বিস্তৃত করি। তাকেই আমরা উদার করি। এবং তার উপরেই

আমরা আমাদের ইমারত গড়ি। নদীর স্রোতের ন্যায় জাতীয়জীবনও অবিরামগতিতে প্রবাহিত হতে থাকে। অতীত এসে মিলিত হয় বর্ত্তমানের সঙ্গে। আর বর্ত্তমান বিশাল মূর্ত্তিধরে বিশালতর হতে হতে সর্ব্বত্র মঙ্গলময় প্রভাব বিস্তার করতে করতে ও সঞ্জীবনীসুধা সিঞ্চন করতে করতে ভবিষ্যতের অদৃশ্যের দিকে ছুটে চলে। আমাদের অতীত আমাদের যে সহজাত প্রবৃত্তি ও ঐতিহ্যে আমাদের ইতিহাস রচনা করেছে এবং আমাদের ভবিষ্যতকে গঠন করে' তাকে রূপদান করবে, তার মধ্যেই আমাদের নোঙ্গর স্থাপন করতে হবে।

কিন্তু অতীতের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আমরা বসে থাকতে পারি না। যেখানে রয়েছি সেখানেই পড়ে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিধির বিধানে জগতে নিশ্চলতার কোনই স্থান নেই। অতীতের দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি রেখে, বর্ত্তমানকে প্রাণ ভরে ভালবেসে, ভবিষ্যতের জন্য আকুল আগ্রহ নিয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়া ভিন্ন উপায় নেই। সম্মুখের দিকে এই চলার পথে যেখানে যত কিছু উৎকৃষ্ট পাওয়া যাবে সমস্তই আমাদের চরিত্রে, কৃষ্টিতে ও সভ্যতার মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। যা' কিছু আমাদের প্রতিভার অনুকূল, যা' কিছু তাকে শক্তিশালী ও সতেজ করতে সক্ষম বলে' বিবেচিত হ'বে, তা' সংগ্রহ করে' তার সাহায্যে আমাদের জাতীয় জীবনকে সুশোভিত করতে হবে। সুতরাং আমাদের জনজীবনের বিকাশের পক্ষে অসহযোগের পরিবর্ত্তে সহযোগ, বিচ্ছিন্নতার পরিবর্ত্তে সংযুক্তিই হবে এক সজীব ও উন্নতিশীল উপাদান। এ ছাড়া অন্য যে কোন নীতিই হবে আমাদের শ্রেষ্ঠতম স্বার্থের পক্ষে আশঙ্কাজনক ও আত্মহত্যারই সমান। আমার দেশবাসীদের জন্য এটিই রইল আমার বাণী। কোন অধৈর্য্য বা অহেতুক ত্বরান্বিত করবার আগ্রহ নিয়ে এ স্মৃতিচারণখানি রচিত হয় নি। এটি আমার সমগ্র জীবনব্যাপী দেশসেবার অভিজ্ঞতা ও সুচিন্তিত এবং পরিপক্ক বিচার বিবেচনারই ফল

পরিশিষ্ট—ক

'ইণ্ডিয়া' নামক পত্রিকায় ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত মিঃ হিউম-এর নিবন্ধ (৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

"যে বাস্তব জীবন নাটকটিতে এক সময়ে এক গভীর দুঃখান্তক পরিণতির আশঙ্কা ছিল, কোলকাতা কর্পোরেশন বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের একটি আসনের জন্য নির্ব্বাচিত করার ফলে সে নাটকের প্রথম অঙ্ক সুখান্তক হয়ে সম্পূর্ণ হ'ল।

মিঃ সুরেন্দ্রনাথ বহু বৎসর পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন তখনই তাঁর শিক্ষকগণ লক্ষ্য করেছিলেন যে, তাঁরা এমন একজন ছাত্র পেয়েছেন যিনি যেমন অত্যন্ত মেধাবী তেমনই বিনয়ী ও প্রীতিভাজন। তিনি সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যথা সময়ে কোভেন্যাণ্টেড সিভিল সার্ভিসের মেম্বার হিসাবে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিছুকাল সমস্ত কিছুই যথারীতি চলল। তারপর তাঁর প্রধান দুর্ব্বলতা বলে কথিত তাঁর কোন এক অলসতাকে গোপন করবার উদ্দেশ্যে তাঁর দপ্তরের ফাইল সম্পর্কে অসত্য মন্তব্য করেছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হ'লে স্থানীয় সরকারের মতে তা' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় এবং তাঁরা সে বিষয়ে এক বিশেষ সরকারী কমিশনদ্বারা অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ করেন। তদনুসারে এক বিশেষ কমিশন নিযুক্ত হয় এবং কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে কিছু কিছু নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করলে সরকার তৎক্ষণাৎ তাঁকে চাকরী থেকে পদচ্যুত করেন।

এখন প্রথমত, ভারতে আমাদের মধ্যে আমি সহ অনেকেই এ সম্পর্কিত সমস্ত নথীপত্র দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং কমিশন যে সমস্ত ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন আমরাও সে বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমত ছিলাম। কিন্তু তাঁরা সে সবের যা' ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, আমাদের অভিমত ছিল তা' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তখনো আমরা এ অভিমত প্রকাশ করেছি এবং এখনো করছি যে, সামান্য আলস্য ও অসতর্কতা ভিন্ন এতে বাবু সুরেন্দ্রনাথের অপর কোনই অপরাধ ছিল না। এক অর্ব্বাচীন কর্ম্মচারীর এরূপ ত্রুটির জন্য তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করে' ও ভবিষ্যতে অধিকতর তৎপর হবার নির্দ্দেশ দিয়েই বিষয়টি শেষ করা যেত। সে কথা বাদ দিলেও, বিষয়টির ভার যাঁদের উপর ছিল তাঁদেরও ধারণা হয়েছিল যে, এমন কি, যে সকল দোষ প্রমাণিতও হয়েছিল বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তজ্জন্যও এক বৎসরের মত যদি তাঁর প্রমোশন বন্ধ করে দেওয়া হ'ত তবে তা'কেও সমুচিত সাজা বলে বিবেচনা করা যেত। বস্তুত কমিশনের একজন সদস্য মাত্র গত সপ্তাহেও আমাকে একথা বলেছিলেন। কিন্তু সরকার যখন শাস্তি স্বরূপ তাঁকে কর্ম্মচ্যুত করার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলেন, তখন এই বিচারকগণ তা'তে যেরূপ বিস্মিত হয়েছিলেন, তখন এমন কি, স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথও সেরূপ হন নি।

ইংলিশ পাঠকদের নিকট একথা জানিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে, কোভেন্যান্টেড সিভিল সার্ভিসে মিঃ সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতীয় অগ্রগামীদের অন্যতম। আমলাতন্ত্রীদের যুগে তাঁদের পবিত্র সীমারেখার অভ্যন্তরে কোন ভারতীয়ের প্রবেশকে তাঁরা অবিরত হিংসার চোখে দেখতেন এবং কখনো তা' অনুমোদন করতেন না। এরূপ একজন বিশিষ্ট আক্রমণকারীকে সরাসরি কর্ম্মচ্যুত করার ঘটনাটি বৃটিশ কর্ম্মচারীদের স্তাবকেরা তাঁদের জয়গান রচনার কাজে ও কোন

ভারতীয়কে তাঁদের সহকর্ম্মী নিয়োগে আপত্তি করে' সেই বৃটিশ কর্ম্মচারিগণ যে তাঁদের দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তা' প্রমাণ করবার কাজে ব্যবহার করেছিল। য়্যাংলো ইণ্ডিয়ানেরা যা' বলতে চেয়েছিলেন তা'র মর্ম্মার্থ হ'ল—'বটেই ত; খুব চালাক; যেমনটি বলেছিলাম। শ—বদমাশের দল; এই মহৎ অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও জগতের বাস্তবিক ভদ্রোচিত সিভিল সার্ভিসের কাজের সম্পূর্ণ অযোগ্য। ভারতীয়দের সিঁদেল চোরটি এইত ধরা পড়েছে। চাকরী পেয়েছে এখনো তিনটি বছর হয় নি, এরই মধ্যে তা'কে তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া সরকারের গত্যন্তর রইল না!'

বেচারা সুরেন্দ্রের প্রতি এই বিকট শাস্তি বিধানের জন্য এরূপ সর্ব্বব্যাপী মনোভাব কি পরিমাণ দায়ী ছিল, সে কথা বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তিনি যখন ন্যায়বিচার ও অনুকম্পার জন্য আবেদন করেছিলেন তখন যে অন্যায়ভাবে তা' অগ্রাহ্য হয়েছিল এবং তার মধ্যে উক্ত মনোভাবের যে ভূমিকা ছিল সে কথা সুনিশ্চিত। তিনি ও তাঁর সহস্র সহস্র দেশবাসী প্রতিবাদ করেছিলেন এবং আবেদন করেছিলেন, কিন্তু সবই হয়েছিল নিষ্ফল।"

আমার প্রতি যেরূপ আচরণ করা হয়েছিল এবং আমার চেয়েও গুরুতর অপরাধে অপরাধী এক ইউরোপীয় সিভিলিয়নের প্রতি যেরূপ আচরণ করা হয়েছিল এই দুই আচরণের পার্থক্য উল্লেখ করে মিঃ হিউম তৎপর লিখেছিলেন,

"আমরা যারা এ বিষয়টিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলাম, তাদের মনে ঘটনাটি এক অতি বীভৎস ধারণার সৃষ্টি করেছিল। সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর বিচারকেরা যে কারণে দোষী বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তার অল্প কয়েক দিন পরে তদপেক্ষা অধিক গুরুতর, সরকারী চাকরীর বর্ত্তমান ইতিহাসে তুলনাহীন ও অর্থ সম্পর্কিত গোলযোগের অপরাধের জন্য একজন ইংরেজ কোভেন্যান্টেড সিভিলিয়নকে তদুদ্দেশ্যে অনুসন্ধানকারী

অফিসারগণ দোষী সাব্যস্ত করেন। এই কর্ম্মচারীকে কি সেজন্য চাকরী থেকে পদচ্যুত করা হয়েছিল? একেবারেই না। তিনি সরকারের যে পরিমাণ টাকা কোন না কোন প্রকারে আপন ব্যক্তিগত তহবিলে জমা করেছিলেন, কেবল সে টাকাটিই সরকারের ঘরে ফিরিয়ে দেবার জন্য তিনি নির্দ্দেশ পেলেন এবং তাঁকে মাত্র বার কি পনর মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে চাকরী থেকে অপসারিত করা হ'ল। তার ফলে অবশ্য সে সময়ের জন্য তিনি তাঁর বেতন থেকেও বঞ্চিত হলেন। কিন্তু সেই অস্থায়ী পদচ্যুতির কাল শেষ হতে না হতেই, তিনি লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের আত্মীয় বলেই তাঁকে তাঁর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাম্য ও প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বেতনসম্পন্ন পদগুলির একটিতে নিযুক্ত করা হ'ল। আর তা' ছিল এমনই এক উচ্চপদ যে, সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু যদি নাও থাকত, তথাপি তিনি চাকরীতে নিযুক্ত ছিলেন বলেই হোক অথবা যোগ্যতার জন্যই হোক, কোন দিক থেকেই তাঁকে সে পদে নিযুক্ত করবার কিছু মাত্র কারণ ছিল না।

ভারতীয় জাতীয় মহাসভার বৃটিশ কমিটি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে অনুরূপ বর্বরোচিত কোন অন্যায়ের জন্য শাস্তি ভোগ না করে সহজে অব্যাহতি পাওয়া আর সম্ভব হয় নি। তবে এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, ভারতের রাজকর্ম্মচারীগণ কি প্রকারে ক্রমাগত ভারতীয় ও ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের সঙ্গে বৈষম্যসূচক আচরণ করতেন। গত সিকি শতাব্দী ধরে' ভারতের আমলাতন্ত্রী কর্ম্মচারীদের অধিকাংশের মনে কিরূপ ভাবধারা বিরাজ করত উপরোক্ত কর্ম্মচারীদ্বয়ের ঘটনা তার এক বিশেষ দৃষ্টান্ত।"

তাঁর নিবন্ধের উপসংহারে মিঃ হিউম বলেছেন,—"ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথের কি হ'ল? শিক্ষার নিমিত্ত বিলাত গমনে ও শিক্ষার খরচ যোগাতে তাঁর সর্ব্বস্বই প্রায় ব্যয় হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় অপমানিত, লাঞ্ছিত, কপর্দ্দকহীন, বিচুর্ণিত মনে নিরাশায় অভিভূত

হয়ে তিনি যদি আত্মহত্যাও করতেন তাতেও আশ্চর্য্য হবার মত কিছু থাকত না। কিন্তু এই চমৎকার নির্ভীক ব্যক্তিটি আপন জীবনের গোড়ার দিকের বৎসরগুলিকে যে অন্যায় ভাবে মেঘাচ্ছন্ন করা হয়েছিল সে কথা ভুলে গিয়ে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাবার মহৎ কর্ম্মে আপনাকে নিয়োজিত করলেন এবং নিজের জীবনের সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন যে, তাঁর স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে মানুষের মনে যে সমস্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল তা' সবই ভুল।

"সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা নির্যাতিত ভারতের মত দেশে সরকারের কোপগ্রস্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় জনজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে' সংগ্রাম পরিচালনার চেষ্টা যে কি প্রকার কষ্টসাধ্য সে কথা ইংলণ্ডের খুব অল্প লোকেই ধারণা করতে পারে। তাঁর প্রচেষ্টা জয়যুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরণ সংগ্রাম চালাবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে গ্রাণ্ট-এর মত এ পথ ধরে মিঃ সুরেন্দ্রনাথ কাজ করে যেতে লাগলেন। তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে' সেখানে শিক্ষকতা করতে লাগলেন। একখানি পত্রিকা প্রকাশ করে তার সম্পাদনা ও পরিচালনা করতে লাগলেন। প্রায় প্রত্যেক জনসভাতে বক্তৃতা করতে লাগলেন। এবং একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মীরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করে দেশবাসীদের প্রিয় হয়ে উঠলেন। কিন্তু সাহসের সঙ্গে জলের উপরে মাথা রেখে নাছোড়বান্দা হয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ঐকান্তিকভাবে সাঁতার কেটেও বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারলেন না।

"এ কথা সত্য যে, যারা ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে জানে, সব কিছুই তাদের করায়ত্ত হয়। হঠাৎ একদিন সুরেন্দ্রনাথের সামনে উপস্থিত হ'ল কঠোরতম সমস্যার এক অপ্রত্যাসিত সমাধান। যে উপেক্ষা ও অপমানের বেড়াজালে তিনি আবদ্ধ ছিলেন এবার তা ছিন্ন করতেই যেন তার আবির্ভাব। আর তা' যেন কোলকাতা হাইকোর্টের রূপ ধরেই এসে দাঁড়াল। উক্ত আদালতের কোন কাজকর্ম্ম সম্পর্কে

তাঁর পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এক মন্তব্যের জন্য আদালতের এক বিচারকমণ্ডলী সুরেন্দ্রনাথকে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। তারপরেই স্রোত ফিরে গেল। বহু সংখ্যক নাগরিকের সাহায্যে তাঁর বিদ্যালয়টি ভারতের বৃহত্তম কলেজে পরিণত হ'ল। তাঁর 'বেঙ্গলী' নামক পত্রিকাখানি ক্রমশ দেশের সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বাধিক ন্যায়নিষ্ঠ মধ্যপন্থী সংবাদপত্র বলে স্বীকৃতি পেল। তিনি কোলকাতা কর্পোরেশনে সদস্য নির্ব্বাচিত হলেন। তাঁর উদ্যম, সততা ও অনমনীয় স্বাধীনসত্বা প্রথমে কর্পোরেশনের সরকারী চেয়ারম্যানের প্রশংসা ও শেষে অটুট বিশ্বাস অর্জ্জন করল। আর এখন তাঁর বহু বৎসরের অক্লান্ত শ্রম যথাযথ ভাবে পুরস্কৃত হ'ল। আইন সভাতে কর্পোরেশন তাঁকে তাদের প্রথম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করেছে। তাঁর চমৎকার বক্তৃতার দ্বারা তাঁর এই প্রতিনিধিত্ব এক অনিচ্ছুক ও বিপরীত-মুখী সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্য আদায়ের ক্ষেত্রে পরোক্ষ ভাবে হলেও প্রচুর দান করেছে।

"মহৎ শিক্ষনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ এ এক বাস্তবিকই সুমহান কাহিনী। কিন্তু তার মধ্যেও সর্ব্বোত্তম বিষয় এই যে, আমাদের মধ্যে আমরা যাঁরা তাঁকে আমাদের বন্ধু বলে দাবী করে থাকি, তাঁরা প্রত্যেকেই দ্বিধাহীন ভাষায় বলতে পারেন যে, তাঁর সমস্ত শ্রম, দুঃখ ও কষ্টের মধ্যেও যুক্তরাজ্যের প্রতি সুরেন্দ্রনাথের আনুগত্য বা ভালবাসার কখনো কোন ব্যতিক্রম হয় নি। এমন কি, যাঁরা তাঁর তীব্র নিন্দা করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও তিনি কখনো কোন কটূক্তি করেন নি বা অযৌক্তিক কিছু বলেন নি। যখনই সামনে কোন বিপদ এসেছে তিনি তাকে ললাট লিখন বলে গ্রহণ করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কর্ত্তব্য জ্ঞান করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে' তিনি তাকে পরাভূত করেছেন।

"তাঁর এই বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হোক। তিনি দীর্ঘজীবী হয়ে তাঁর অসীম বিরত্ব ও পুরুষোচিত অধ্যবসায়ের ফল ভোগ করুন। আমরা

আশা করি, অচিরে তিনি ভাইস্‌রয়-এর মন্ত্রণা সভায় আসন লাভ করবেন। এবং যতই দিন অতিবাহিত হ'তে থাকবে ততই নবীন সমাজ তাঁকে বৃটিশ পার্ল্যামেণ্টে স্বাগত জানাবে। আমাদের বিশ্বাস, সেখানে তিনি তাঁর মনোহারিনী বাগ্মিতার সাহায্যে ভারতের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবিধানে সভা কক্ষকে জাগ্রত করে তুলতে সমর্থ হবেন এবং কোন সুনির্দ্দিষ্ট সম্মানজনক প্রস্তাবের দ্বারা অবশেষে ভারতের জনগণের প্রতি যাতে সুবিচার হয় তার ব্যবস্থা করতে পারবেন।"

পরিশিষ্ট—খ

ওয়েল্‌বি কমিশনে প্রদত্ত আমার সহকর্ম্মীদের সাক্ষ্য সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত মন্তব্য। [২৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

আমার যে সকল সহকর্ম্মী ওয়েলবি কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁদের নাম তাঁদের সমকালীন ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ছিলেন তাঁর যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃবর্গের অন্যতম। ভারতের জননায়কদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম সারির খাঁটি এক রাষ্ট্রপরিচালন-নীতিবিদ। তিনি মধ্যপন্থী দলেরও একজন নেতা ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যু দেশের পক্ষে ছিল এক গুরুতর ক্ষতি। মিঃ জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার ছিলেন বর্ত্তমান মাদ্রাজের নির্ম্মাতাদের মধ্যে একজন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে তাঁর প্রদেশ ও ভারতের অপরাপর অংশের অধিবাসিগণ শোকে অভিভূত হয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে এক ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তাঁর একখানি চিত্র উন্মোচন করে' আমি সন্তোষ লাভ করেছিলাম। মাদ্রাজের

অধিবাসিগণ চাঁদা দিয়ে এই চিত্রের ব্যয়ভার বহন করে' তাঁদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। সুখের বিষয় এই যে, স্যার দীনশা ওয়াচা এখনো আমাদের মধ্যে সশরীরে আছেন। তাঁর ব্যক্তিগত মূল্য ও তাঁর জনহিতকর চরিত্রের প্রশংসা না করে' কিছু বলা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন তিনি মাতৃভূমির সেবাতেই সমর্পণ করেছেন। জীবন সন্ধ্যায়, তাঁকে যাঁরা জানেন তাঁদের প্রত্যেকের নিকট থেকেই তিনি অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে যখন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন। এবং তারপর থেকে তিনি অবিরত অতুল একাগ্রতা ও বিশ্বাসের সঙ্গে তার সেবা করেছেন। মধ্যপন্থীদলের অন্যান্যদের সঙ্গে এখন তিনিও কংগ্রেসের সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। কিন্তু যখন বর্ত্তমান বিতর্কের অবসানে সমস্ত উত্তেজনা প্রশমিত হবে, সমস্ত ধূলিজাল কেটে যাবে, তখন কংগ্রেসের জন্য তিনি যা' করেছেন, তা' তাঁর দেশবাসিগণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবেন।
